বনফুল রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬২

সম্পাদনা ঃ

ডঃ সরোজমোহন মিত্র

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

সহযোগী ঃ

শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-রূপায়ণ ঃ

শ্রীশৈলেন শীল

শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা

সুদীপ প্রিণ্টার্স

৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

সূচীপত্র

উপন্যাস

পিতামহ

উৎসর্গ

সুকবি সুরসিক সুপণ্ডিত

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসুশীলকুমার দে

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ ১ ॥

যে চন্দনচর্চিত নীলাকাশতলে কল্পনার সহিত চার্বাকের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল সে চন্দনচর্চিত নীলাকাশ চিরকালের মতো হারাইয়া গিয়াছে। সেদিন জ্যোৎস্না-মণ্ডিত লঘু মেঘখণ্ডগুলিকে মেঘ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য নিপুণ হস্ত আকাশ-প্রাঙ্গণে চন্দনের আলপনা আঁকিয়া দিয়াছে। যে কুঞ্জে তাহাদের আলাপ হইয়াছিল তাহাও মনে হইতেছিল যেন পারিজাতকুঞ্জ। মর্তলোকেই সেদিন সহসা যেন অমর্তলোকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। চার্বাক নিজেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল। তাহার বারম্বার মনে হইতেছিল যে রূপসী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছে সে মানবী তো নিশ্চয়ই—স্বপ্ন মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে—এ জাতীয় কবিত্বের প্রশ্রয় আর যেই দিক চার্বাক দিবে না—কিন্তু আজ সমস্ত প্রকৃতিই এমন অপ্রকৃতিস্থ কেন, অতি সাধারণ ঝুমকো লতাকেই পারিজাত বলিয়া মনে হইবার কারণ কি। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতেই চার্বাক নির্জন প্রান্তরে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ভাবিতেছিল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহেশ্বরকে লইয়া কত অদ্ভুত জল্পনা যে কত লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক কার্যেরই সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য কেহই সচেষ্ট নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আজগুবি একটা জল্পনার উপর চক্ষু বুজিয়া নির্ভর করিবার জন্যই সকলে উন্মুখ···তাহার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া সহসা এই তন্বী রূপসী কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বানও করিল। তাহার পর হইতেই যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপার্থিব মনে হইতেছে ইহা বড়ই বিস্ময়কর।

"আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?"

বিস্মিত চার্বাক প্রশ্ন করিয়া কল্পনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমি? কই না।"

কল্পনার অধরের আকম্পনে যাহা সূচিত হইল তাহা ব্যঙ্গ না আমন্ত্রণ তাহা চার্বাক ঠিক বুঝিতে পারিল না।

"মনে হল আপনি যেন ডাকলেন আমাকে।"

"ও তাই না কি। তাহলে আসুন একটু আলাপ করা যাক।"

"আলাপ? ও, আচ্ছা, বেশ তো।"

চার্বাকের মুখে ঈষৎ ইতস্ততভাব দেখিয়া কল্পনার অধরপ্রান্তে অতি মধুর একটি হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

"আপনার যদি অবসর না থাকে তাহলে—"

"না, না অবসর আছে। আমি কেবল একটা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্যে নির্জনে এসেছিলাম। তা সে পরে হলেও ক্ষতি নেই!"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমিও আপনার চিন্তার অংশ নিতে পারি। নিঃশব্দ চিন্তার চেয়ে সশব্দ চিন্তা অনেক সময় বেশী ফলপ্রদ হয়। দুজনে মিলে যদি চিন্তার জট ছাড়াতে থাকি তাহলে—।"

কল্পনার ইন্দিবর নয়নের দিকে চাহিয়া চার্বাক বলিল, "সুবিধা হয়, যদি দুজনেরই চিন্তার পদ্ধতি একরকম হয়। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমাদের ধারণা পিতামহই সৃষ্টিকর্তা—।"

কল্পনার অধরে আবার হাসি ফুটিল।

আমার ধারণা তা নয়। আমার ধারণা পিতামহকে খতম করতে না পারলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না। পিতামহ আছেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে হবে।"

"আছেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"কোথায়?"

"আপনার মনে, আমার মনে। তাছাড়া সশরীরেও আছেন চতুর্মুখ। আমার জীবনের একটা লক্ষ্য চতুর্মুখকে সম্পূর্ণ নির্মুখ করা, তাঁকে ধ্বংস করতে না পারলে জগতের মঙ্গল নেই।"

চার্বাক রোমাঞ্চিত হইল। এই রূপসীর সহিত এমন মনের মিল হইয়া যাইবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। "নারীদের সহিত প্রায়শই মতের মিল হয় না, প্রয়োজনের খাতিরে ভান করিতে হয় যে মতের মিল হইয়াছে" ইহাই চার্বাকের ধারণা, এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটাতে, বিশেষত নারীটি রূপসী হওয়াতে, চার্বাকের স্বভাব-সুলভ অবিশ্বাস পুলক-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চার্বাক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা প্রকৃতই চার্বাকীয়। জ্যোৎস্না মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে, ঝুমকো লতাকে পারিজাত বলিয়া ভ্রম হইতেছে, মর্তলোকে অমর্তলোকের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপসী তরুণীটিও অপরূপা, এই লক্ষণ-পরম্পরা প্রণিধান করা সত্ত্বেও চার্বাকের মনে হইল সহসা আত্মসমর্পণ করা অনুচিত হইবে। অবিশ্বাস-নিকষে যাচাই না করিলে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। রমণীর সহিত কৌশলে আলাপ করিতে হইবে, একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলে চলিবে না।

"আপনার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে চমকিত হয়েছি। আপনার এই বিদ্রোহ-

বলিষ্ঠ ধারণার সম্পূর্ণ তাৎপর্য কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি না। পিতামহের শারীরিক অস্তিত্বও আপনি কল্পনা করেন ?"

"কল্পনা করি না, বিশ্বাস করি, জানি।"

"জানেন ? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?"

"এই মুহূর্তে।"

চার্বাকের ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া গেল। কল্পনার চক্ষুর্দ্বয়ে কৌতুক নাচিতে লাগিল।

"চক্ষু বিস্ফারিত করলে পিতামহকে দেখতে পাবেন না। চক্ষু বুজুন। বুজলেই দেখবেন পিতামহ চতুর্মুখ আপনার মানসপটে ফুটে উঠেছেন।"

"কিন্তু তার দ্বারাই কি শারীরিক অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় ?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা সংশয় অপনোদন করে থাকি। অনেক পণ্ডিত বলেন, মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পিতামহকে দেখে যদি আপনার তৃপ্তি না হয় অন্য কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে চান বলুন ? তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে চান ? তাঁর বাক্য শ্রবণ করলে কি আপনার প্রত্যয় হবে ? না, তাঁকে স্পর্শ করতে আপনি উৎসুক ? তাঁকে আঘ্রাণও করা যেতে পারে, এমন কি রসনা দ্বারা—"

চার্বাক বলিলেন—"আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি, বিস্তারিত করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার শারীরিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয় পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সেইরূপ নিঃসংশয় হতে চাই।"

"আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি কি নিঃসংশয় ?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটুকু নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব ততটুকু নিঃসংশয় বই কি। সন্দেহ নিরসনের যে নিরিন্দ্রিয় উপায় ঋষিরা বর্ণনা করে থাকেন তা আয়ত্ত করবার চেষ্টা আমি কখনও করিনি। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই আমি চরম বলে মানব। তবে মন নামক যে ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আপনি এখনই করলেন, তার একক সাক্ষ্যকে গ্রাহ্য করা বিপজ্জনক বলেই তা গ্রাহ্য আমি করব না। কারণ আমি জানি মন কল্পনা-প্রবণ, এমন অনেক অলীক বস্তু সে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করে যার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং তার উপলব্ধি অন্তত আর একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। আপনাকে যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছি পিতামহকে যদি তেমনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পারি তবেই তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করব।"

কল্পনার মুখ-মণ্ডলে যে জ্যোতি প্রতিভাত হইল তাহার উৎস যে গভীর আত্মপ্রত্যয় তাহাতে চার্বাকের কোনও সন্দেহ রহিল না। হর্ষ-কণ্টকিত হইয়া সে

প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করিতে লাগিল এই সহসা-আবির্ভূতা সৌন্দর্য-প্রতিমা হয়তো সত্যই তাহার সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবে। বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সে কল্পনার অপরূপ মুখ-শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। কল্পনা বলিল—"আপনি পিতামহকে চাক্ষুষই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়া করতে হবে। আর একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে আমাকে।"

"কি প্রক্রিয়া? কি প্রতিশ্রুতি? বলুন। যদি অসম্ভব না হয়—"

"মোটেই অসম্ভব নয়। প্রক্রিয়াটি অতীব সহজ। আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুতে হবে, তারপর চোখ বুজতে হবে। আমি যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ আপনি চোখ খুলতে পাবেন না। আমি আপনাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাব। ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে আমি আপনাকে চোখ খুলতে বলব, তখন আপনি পিতামহ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। হয়তো তাঁর কথাও শুনতে পাবেন।"

যুবতীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া জোৎস্নালোকিত নির্জন প্রান্তরে শয়ন করিতে চার্বাকের আপত্তি ছিল না কিন্তু তাহার যুক্তিবাদী মন প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—"এরকম করবার অর্থ কি?"

"অর্থ খুবই প্রাঞ্জল। সত্যকে সহজে পাওয়া যায় না। নানাবিধ প্রক্রিয়ার জটিল পথে ভ্রমণ করে তবে সত্যের সমীপবর্তী হতে হয়। কেউ যোগাসনে বসে প্রাণায়াম করেন, কেউ বিজ্ঞানাগারে বসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু লগ্ন করে বসে থাকেন, রসায়ন শাস্ত্রের গভীর অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েন কেউ বা। সত্যের সন্ধানে বহু জ্ঞানী বহু প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনাকেও হতে হবে। আমি যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম তা কঠিনও নয়—"

"কঠিন তো নয়ই, বরং কোমল। হয় তো অতি কোমল, সেই জন্য আশঙ্কা হচ্ছে হয় তো অভিভূত হয়ে পড়ব।"

"তাতে ক্ষতি কি?"

"অভিভূত চেতনা দিয়ে কি সত্যকে ঠিক মতো দেখতে পাব?"

"অভিভূত না হলে সত্যকে দেখাই যায় না। একটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই তো লোকে সত্যের সন্ধান করে এবং সেই ভাবের আলোকেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। যাঁরা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে দেখতে চান তাঁরাও 'আমি সর্ব সংস্কারমুক্ত' এই সংস্কারের অধীনতা স্বীকার করেন, যদিও সব সময়ে সেটা বুঝতে পারেন না। সুতরাং অভিভূত হতে ভয় পাবেন না, বরং কামনা করুন যাতে অভিভূত হতে পারেন—"

চার্বাক তখন অনুভব করিল যে তরুণীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিবার পূর্বেই সে অভিভূত হইয়াছে। ইহাও সে বুঝিতে পারিল যে এই মায়াবিনী তরুণীর সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া কোন লাভ নাই। ইহার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে পিতামহের সাক্ষাৎ মিলিবে এ বিশ্বাস চার্বাকের ছিল না, কিন্তু ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে যে ক্রোড়েই মস্তক ন্যস্ত হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল। চার্বাকীয় নীতি অনুসারে সুতরাং সে আর অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

"বেশ, তবে তাই হোক। আপনি বসুন।"

"একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে।"

"কি বলুন—"

"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়—"

"কিন্তু আমি জানি অবিশ্বাসটাই আলো। অবিশ্বাসের আলো দিয়েই সত্যের সত্যতা দেখা যায়—"

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। আলো দিয়ে সব জিনিস দেখাই যায় না—"

"যেমন ?"

"অন্ধকার।"

কল্পনার বিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত হইল। চার্বাকের দিকে চাহিয়া গ্রীবাভঙ্গী করত সে প্রশ্ন করিল—"আমাকেও কি আপনি অবিশ্বাস করছেন ?"

"মোটেই না।"

"তবে যা বলছি তা করুন। পিতামহকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবেন এই আকাঙ্ক্ষা আপনার সর্ববিধ অবিশ্বাসকে দূর করুক। আপনি বিশ্বাস করুন যে পিতামহ আছেন, তাকে আপনি দেখতে পাবেন। চোখ খুলে না রাখলে দেখতে পাবেন কি করে ? বিশ্বাসই আমাদের চক্ষু। বাইরের চক্ষু বন্ধ করে সেই চক্ষু খুলে রাখুন—।"

কল্পনার দিকে চাহিয়া চার্বাকের সর্বাঙ্গ আবার রোমাঞ্চিত হইল, সে যেন অনুভব করিল যে ফল যাহাই হউক আপাতত এই মনোরমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

"বেশ তাই হবে। আমি মনে কোনও অবিশ্বাস রাখব না। কিন্তু একটা কথা, সত্যই পিতামহ যদি থাকেন তাঁকে ধ্বংস করার সার্থকতা কি—আর কি করেই বা তা সম্ভব হতে পারে ?"

"খুবই সঙ্গত প্রশ্ন করেছেন আপনি এবার। পিতামহকে ধ্বংস করা প্রয়োজন, কারণ তাঁকে ধ্বংস না করলে তাঁর নবতম সৃষ্টি আমাদেরই ধ্বংস করে ফেলবে।

তিনি এবার সৃষ্টি করেছেন মারণঅস্ত্র। সে অস্ত্র এমনই মারাত্মক যে তার সামান্যতম প্রহারে নিখিল বিশ্ব লোপ পেয়ে যাবে।"

"তাই না কি।"

"আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা—সে অস্ত্র সশরীরে কোথাও বর্তমান নেই, অর্থাৎ তা বস্তু নয়। পিতামহের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ক্ষুদ্রতম ভাবরূপে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করছে তাঁর অবচেতন লোকে, এখনও তা অমূর্ত, কিন্তু যে মুহূর্তে তা মূর্ত হবে সেই মুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু। সেই জন্যই পিতামহকে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করা প্রয়োজন।"

চার্বাক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়াছিল! তাহার বিস্ময় শুধু যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহা নয়, তাহা আর বিস্ময় ছিল না, তাহা অবিশ্বাস আতঙ্ক প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অপরূপ একটা উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তরতম সত্তা এই পরম উপলব্ধিকে প্রশ্ন দ্বারা বিক্ষত করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু চার্বাকের চার্বাকীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় সে প্রশ্ন করিল—"এই অদ্ভুত খবর আপনি পেলেন কি করে?"

"তা যদি বলতে পারতাম, অর্থাৎ তা যদি বর্ণনীয় হত তাহলে এত ভণিতা করতাম না, বলে ফেলতাম। এই অদ্ভুত খবর আমি যে উপায়ে পেয়েছি আপনাকেও ঠিক সেই উপায়েই পেতে হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে হবে—।"

"আপনি কার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন জানতে পারি কি?"

"জানাতে আমার আপত্তি নেই। তিনি একজন পুরুষ, পরম পুরুষ—"

"কি করে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন?"

"আপনি যেভাবে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেদিনও জ্যোৎস্না এমনই মনহারিণী ছিল, সেদিনও আকাশ-পটে ঠিক এমনই সমারোহ ছিল শুভ্র মেঘমালার। আমিও সেদিন ঠিক আপনারই মতো প্রশ্নাকুল চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমনই এক নির্জন প্রান্তরে—"

"এমন সময় হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন?"

"মনে হল যেন আমার ভিতর থেকেই বেরিয়ে এলেন। আমার সম্বন্ধে আপনার ঠিক এরকম মনে হয়েছে কি না জানি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কিন্তু হয়েছিল।"

ক্ষণকাল হতবাক থাকিয়া চার্বাক বলিল—"পিতামহকে দেখেছেন আপনি?"

"দেখেছি। আপনিও দেখবেন। তাঁকে ধ্বংস করবার ভারও নিতে হবে আপনাকে। আপনাকে সেই মহৎ কর্মে নিযুক্ত করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি আগে থাকতেই জানতাম। পরম পুরুষের নির্দেশ মতোই আমি এখানে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য।"

"তিনি নিজে এলেও তো পারতেন"—চার্বাক সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিল।

"সম্ভব হলে আসতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি আপনার নাগাল পাবেন না, আপনার বোধ-শক্তির সীমায় আসবার মতো স্থূলতা তাঁর নেই, তাই তিনি আমার সাহায্য নিয়েছেন। আমাকে প্ররোচিত করেছেন তিনি, আমি করছি আপনাকে। তাঁকে কে প্ররোচিত করেছিল জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি পিতামহকে হত্যা করবার জন্যে অনাদিকাল থেকে যে ষড়যন্ত্র-খড়্গ প্রস্তুত হচ্ছে আমি তার একটি অংশ, আর তার সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।"

চার্বাকের সহসা মনে হইল বৈকালে দুই পাত্র মাধ্বী সুরা পান করিয়াছিলাম এই সকল অলীক ঘটনা পরম্পরা তাহারই ফল নয় তো! কিন্তু পরমুহূর্তেই কল্পনার কলহাস্য তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

"মাত্র দু পাত্র মাধ্বী সুরা চার্বাককে বিচলিত করতে পারে নি। আপনি যা প্রত্যক্ষ করছেন তা অলীক নয়, সত্য।"

চার্বাক বিস্মিত হইল। যাদুকরী না কি?

বিস্ফারিত চক্ষে চার্বাক কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল নর্তকী সুরঙ্গমাকে। সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতেও এমনি মোহিনী শক্তি ছিল। সুরঙ্গমা এখন কোথায়? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে সে বহুকাল পূর্বে মৃগয়ায় গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে সে এখনও হয়তো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া চার্বাক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

"পিতামহকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে? কোথায় পাব সে খড়্গ?"

"আপনাকেই আবিষ্কার করতে হবে সেটা। আগে পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোন, আসুন—"

চার্বাক এ আমন্ত্রণ আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সেই সুরভিত নিকুঞ্জ মধ্যে শ্যাম তৃণাস্তরণের উপর কল্পনা উপবেশন করিতেই তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিল। পরমুহূর্তেই কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিল

সে। কল্পনার মুখের দিকে উদ্ভাসিত নয়নে চাহিয়া বলিল—"খড়্গের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি।"

"ও করেছেন না কি? কি রকম সেটা?"

"সত্য। সত্যকে লাভ করলেই সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যাবে এবং তা জানা গেলে পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। তাঁকে চাক্ষুষ করবার তো প্রয়োজন নেই—"

কল্পনার নয়নযুগল হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"সত্যকে লাভ করবার কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন?"

"বৈজ্ঞানিক—"

"সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি বারম্বার পথ পরিবর্তন করে কিন্তু।"

"আমিও করব। নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ করা ছাড়া আর তো কিছু করতে শিখিনি।"

"বেশ, তাহলে আমি চললাম।"

না, আপনি যাবেন না। ভাগ্যবশে আজ আপনার দর্শন পেয়েছি, ঘটনাচক্রে আকাশে বাতাসে আজ মাদকতা সঞ্চারিত হয়েছে, আপনার কণ্ঠস্বরের মূর্ছনায় আমার সমস্ত চেতনা আজ সম্মোহিত, আপনি যাবেন না!"

"বেশ, বসছি তাহলে—।"

চার্বাক মুগ্ধনয়নে কল্পনার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আর বেশীক্ষণ কিন্তু আমাকে দেখতে পাবেন না, ওই দেখুন—"

চার্বাক দেখিল, বিরাট একটা কৃষ্ণমেঘ দিগন্ত পরিব্যপ্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইল, কল্পনাকে আর দেখা গেল না। ক্ষণকাল পরে চার্বাকের আকুল কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"ভদ্রে, আপনার পরিচয় দিন, বলুন আপনি কে?"

"আমি আপনার প্রেরণা।"

॥ ২ ॥

অন্ধকারে ঝটিকা-বেগে বিভ্রান্ত হইয়া চার্বাক কোথায় যে নীত হইয়াছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে শক্তির অমিত প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার

ছিল না। খরস্রোতে তৃণখণ্ডের মতো সে ঘটনা স্রোতে অসহায়ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। সেই তন্বী রূপসীর কথা কিন্তু সে নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শেষ কথাগুলি দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাহার চিত্তলোকে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"চার্বাক, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই তোমার যাত্রা শুরু হল। আমার কোলে ক্ষণিকের জন্যও তুমি মাথা রেখেছিলে, সত্যের পথ তাই আজ উন্মুক্ত হয়েছে। এর ভয়ঙ্কর ঝটিকাক্ষুব্ধ মূর্তি দেখে তুমি ভয় পেও না। অগ্রসর হও—"

চার্বাক অগ্রসর হইতেছিল না, বাহিত হইতেছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছিল বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তি বা যুক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। নিজের গতির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণশক্তি তাহার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইল। অবলুপ্ত হইবামাত্র কিন্তু আশ্বস্ত হইল সে। তাহার চতুর্দিক আর ভয়ঙ্কর রহিল না, সে যেন নূতন পরিবেশে নীত হইল। শুধু তাহাই নয়—তাহার দৃষ্টিগোচর হইল সে আর একক নহে, অদূরে একব্যক্তি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় নব-পরিবেশে চার্বাক নূতন জীবন লাভ করিল, সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল:

···অদূরে যে ব্যক্তিটি বসিয়াছিল তাহার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চার্বাক উপলব্ধি করিল ব্যক্তিটি অদূরে নাই, বহুদূরে আছে। বহুক্ষণ হাঁটিবার পর চার্বাক তাহার সমীপবর্তী হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে চার্বাক লক্ষ্য করিল চতুর্দিকে শ্যামলতার কোনও চিহ্ন নাই, আকাশে সূর্যও নাই, চন্দ্রও নাই, অন্ধকারও নাই। অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। আকাশ নির্মেঘ, আকাশের বর্ণ নীল নহে, রক্তাভ। নিজেরই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যলোকে চার্বাক এই নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছিল। সে বাহ্যত অজ্ঞান হইয়া গেলেও অন্তরের অন্তরতম সত্তায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তাহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্ধান করিতেছিল এই রক্তাভ আলোকের উৎস কোথায়, সূর্যচন্দ্রহীন এই দেশের নামই বা কি। উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চার্বাক আরও বিস্ময় বোধ করিল। ইহা সজীব মনুষ্য না প্রস্তরমূর্তি? এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি কোনও জীবন্ত মনুষ্যের হইতে পারে? কিন্তু কেশ চর্ম দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই তো ভ্রম হয়। চার্বাকের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিটি সহসা কথা কহিয়া উঠিল—"চার্বাক, তোমারই অপেক্ষায় আমি বসে আছি এখানে। আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে?"

চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লোকটির নয়নযুগল হইতে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

"আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।"

"আমার নাম কৌতূহল। তোমারই কৌতূহল আমি, তোমারই প্রেরণায় মূর্তি পরিগ্রহ করে, তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।"

"ও।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিল। তাহার নিজের প্রেরণা কিছুক্ষণ পূর্বে মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার নিজের কৌতূহল এখন আবার মূর্তিমান হইয়া কথা কহিতেছে। চার্বাকের আধিভৌতিক বুদ্ধির পক্ষে ব্যাপারটা একটু জটিল। কিন্তু জটিলতা দেখিয়া ভীত হইবার চরিত্র চার্বাকের নয়। বরং জটিলতাকে সরল করিবার প্রবৃত্তিই তাহাকে চিরকাল প্রবুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং সে সপ্রতিভভাবেই বলিল—"ও, বুঝেছি। কিন্তু এ কোন দেশে আমরা এসেছি বল তো। এখানে সূর্য-চন্দ্র নেই কিন্তু আলো আছে। আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ—"

"এর নাম সন্ধানলোক। তোমারই জন্য এ লোক তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ। এর কোনও ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। তুমি যে আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চাইছ তা চিরপ্রচলিত সূর্য-চন্দ্রের আলোক নয়, তা তোমারই প্রতিভার আলো। তুমি বিভিন্ন, তুমি স্বতন্ত্র, তাই তোমার আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ। তা পীতাভ, শ্যামল বা বেগুনিও হতে পারে, কিন্তু নীল কখনও হবে না। এই সন্ধানলোকে তোমারই জন্য আমি সংবাদ সংগ্রহ করে, অপেক্ষা করছি।"

"কি সংবাদ?"

"মৃতদেহটি নদীর পরপারে আছে এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। পিতামহ ব্রহ্মার কিছু খবর ওইখানেই পাওয়া যাবে। শুনেছি তাঁর সৃষ্টির কারখানাও ওই শবদেহের ভিতর আছে। তিনি নিজেও হয় তো আছেন।"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"নদীটি কত দূরে—"

"নদীটিই সমস্যা। ভাল করে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে বিরাটকায় শবদেহটি দূর প্রান্তরে শায়িত রয়েছে। দূরদিগন্তে ওটি পর্বত নয় ওটি শবের মুণ্ড। কিন্তু ওই শবদেহের সমীপবর্তী হতে চেষ্টা করলেই—এক দুকূল-প্লাবন নদী কোথা হতে আবির্ভূত হচ্ছে সহসা। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।—"

চার্বাক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই যাহা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন প্রান্তরভূমি

ছিল তাহা তরল তরঙ্গিণীতে রূপান্তরিত হইল। ক্রমশ তাহার তরঙ্গমালা আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন কোনও অদৃশ্য ঝটিকা-বেগে এই সহসা-আবির্ভূতা স্রোতোস্বিনী বিক্ষুব্ধ হইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি এই মায়াবিনী নদীতে অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত কিন্তু চার্বাক অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি, সে বিনা দ্বিধায় নদীতে নামিয়া পড়িল। সে ভাবিল ইহা যদি তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় স্পর্শশক্তি সে ভ্রম অপনোদন করিবে, আর ইহা যদি সত্যই নদী হয় তাহা হইলে সন্তরণ করিয়া নদীপারে যাওয়া অসম্ভব হইবে না। সন্তরণ করিয়া বহুবার বহু দুস্তর নদী সে অতিক্রম করিয়াছে। নদীতে নামিবামাত্রই কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। নদীর তরঙ্গমালা যেন রমণীর বাহুপাশের মতো তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নদীর কলধ্বনি আকুল প্রণয় নিবেদন করিল। চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল নদী মানবীর মতো কথা বলিতেছে।

"চার্বাক আমি নদী নই। তুমি অবগাহন করবে বলে আমি নদীরূপ ধারণ করেছি। তোমারই সৃষ্ট এই ঊষর সন্ধানলোকে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে বলে। আমি জানতাম তুমি আসবেই।"

"তুমি কে?"

"তুমিই তো আমার নামকরণ করেছ যুগে যুগে! আমি কে তা তুমিই জান, আমি জানি না। আমার বাপমায়ের-দেওয়া একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু সে নাম কখনও মর্যাদা পায় নি তোমার কাছে। তপস্বী কচের নিকট তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল প্রণয়াতুরা দেবযানী। দেবযানী তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দেবযানীর মধ্যে যে চিরন্তনী নারী ছিল সে তুচ্ছ হয় নি। তাকে তুমি কামনা করেছ বহুরূপে বহু নামে। অশরীরী আমাকে কেন্দ্র করে তোমার কামনা যুগে যুগে অনেক রঙীন ফুল ফুটিয়েছে, কিন্তু যেই আমি শরীর ধারণ করে ধরা দিয়েছি অমনি তোমার বিচক্ষণ বিশ্লেষণ আমাকে ম্লান করে দিয়েছে, পড়া পুঁথির মতো তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি দেখতে দেখতে। তাই আমি অশরীরী হয়েই অনুসরণ করছি তোমাকে। সুরঙ্গমার মধ্যে কিছুদিন আমি ভর করেছিলাম, কিন্তু আমাকে তুমি দেখেও দেখলে না। আমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, কিন্তু সুন্দরানন্দ যখন সুরঙ্গমাকে নিয়ে চলে গেল তখন তো তুমি বাধা দিলে না। তোমার অধ্যয়ন-স্পৃহা সুরঙ্গমার চেয়ে বড় হ'ল তোমার কাছে। সুরঙ্গমার চোখের ভিতর দিয়ে আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। কিন্তু তুমি তখন সামান্য একটা পতঙ্গের গতিবিধি নিয়ে এমন তন্ময় হয়েছিলে যে আমার দিকে ফিরেও তাকালে না একবার!"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ চার্বাককে ঘিরিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল।

বিপন্ন হইলে চার্বাকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া ওঠে, চার্বাক প্রশ্ন করিল—"তোমার কথাই যদি সত্য হয়, আমি সত্যই যদি তোমাকে চিরকাল অবহেলা করে থাকি, তাহলে আবার তুমি আমার কাছে এসেছ কেন ?"

"তোমাকে বা তোমার কৌতূহলকে ওই শবের কাছে কিছুতেই যেতে দেব না।"

"কেন ?"

নদী কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার কলধ্বনিতে অভিমান-আবদার অনুরোধ-অনুনয়ের স্বর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চার্বাকের মনে হইল একটা অস্ফুট রোদন-ধ্বনিও যেন শুনা যাইতেছে। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বিরাট কৌতূহল বিরাটতর হইয়াছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র কহিল—"তপস্যা আরম্ভ কর। একনিষ্ঠ তপস্যা' ভিন্ন এই কুহকিনীর মায়াজাল ছিন্ন করা যাবে না—।"

"তপস্যা ? এ অবস্থায় তপস্যা করা কি সম্ভব ? অনুকূল পরিবেশ না হলে আমি একাগ্র হতে পারি না।"

"তা আমি জানি। কিন্তু এখন যদি তুমি অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশায় তপস্যা স্থগিত রাখ, নদীর স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওই শোন—।"

নদীর কলধ্বনি আবার মানবীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

'চার্বাক, যুক্তিমার্গের কঙ্করে কণ্টকে জন্মজন্মান্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছ তুমি। তোমার বুদ্ধি তোমার কৌতূহল সত্য অনুসন্ধানের ছুতোয় তোমাকে ক্রমাগত বিপথে নিয়ে গেছে। অমৃতের সন্ধানে তুমি যাত্রা করেছ বিষবৃক্ষের অভিমুখে। শিথিলাঙ্গ হয়ে আমার তরঙ্গলীলায় আত্মসমর্পণ কর, তোমাকে আমি অমৃত-সাগরে নিয়ে যাব। তোমার মনে পড়ে কি বিশ্বামিত্ররূপে তুমি যখন পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলে, মেনকারূপে আমিই তোমাকে সে কঠোরতা থেকে রক্ষা করেছিলাম ? আমার সঙ্গে যে দশ বর্ষ তুমি যাপন করেছিলে তাতে কি অমৃতের আভাস পাও নি ? শকুন্তলাকে আমি কেন ত্যাগ করেছিলাম জান ? তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে বলে। একটা কথা কিন্তু তুমি জান না, শকুন্তলাকে আমি ত্যাগ করি নি, ত্যাগ করবার ভান করেছিলাম। যে শকুন্ত তাকে লালন করেছিল সে অন্য কেউ নয়, রূপান্তরিত মেনকাই। আমাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ, নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছ। আর বিপথে যেও না। তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাব—।"

"আমি পিতামহকে চাক্ষুষ করতে চাই।"

"তার জন্য তো কোথাও যেতে হবে না। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান, ভাল করে চেয়ে দেখলেই তাঁকে দেখতে পাবে।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"হঠাৎ পিতামহকে দেখবার বাসনা হল কেন তোমার। পিতামহকে তুমি তো কোনদিন কামনা কর নি, কামনা করেছ আমাকে। আমাকে লাভ করবার জন্যই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তুমি তপস্যা করেছ, যুদ্ধ করেছ। গাধিনন্দন তুমি বিশ্বামিত্র হয়েছিলে আমার জন্য, পিতামহের জন্য নয়। আমিই কামধেনু শবলা, আমাকেই তুমি চেয়েছ চিরকাল, আজ হঠাৎ পিতামহকে কামনা করছ কেন, এ প্রচেষ্টা তো স্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক কহিল—"মায়াবিনি, জন্মজন্মান্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করে তুমি আমাকে যা বলতে চাইছ তা আমার সহজ বুদ্ধির কাছে প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। তোমার এই বিস্ময়কর আবির্ভাবও মনে হচ্ছে স্বপ্নবৎ। আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি তা-ও বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আমার মস্তিষ্ক হয়তো সুস্থ নয়, বিকারের ঘোরে হয়তো আমি অলীক বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। একটি বিষয়ে কিন্তু আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ ; সৃষ্টিতত্ত্ব আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে, পিতামহ নামক পৌরাণিক উপকথাকে আমি সত্যের আলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেখতে চাই। তুমি যেই হও, তোমাকে অনুরোধ করছি আমার এ প্রেরণাকে মর্যাদা দাও, আমার অনুসন্ধানের পথে বাধাসৃষ্টি কোরো না।"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ কলহাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল।

"আমি জানি তোমার নবতম প্রেরণাটি সুন্দরী। সে সুন্দরী বলেই তার নির্দেশ তোমার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ যে সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটনের অজুহাতে তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্তিত হয় নি চার্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণ-জালে জড়িত হচ্ছ। আমি চিনি তোমাকে, আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না। এখনও আমার কথা শোন, ওই শবদেহের সমীপবর্তী হবার চেষ্টা কোরো না—ওতে আনন্দ নেই, আমার তরঙ্গ-দোলায় অঙ্গ বিস্তার করে দেখ কি আনন্দ।"

চার্বাক ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলের দিকে চাহিল।

কৌতূহল বলিল—"আর বিলম্ব কোরো না, তপস্যা শুরু কর।"

চার্বাক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

চার্বাকের ধ্যান যতই গভীর হইতে লাগিল, কৌতূহলের দেহ আয়তন ততই কমিতে লাগিল। কমিতে কমিতে ক্রমশ তাহা বিলীন হইয়া গেল। তরঙ্গিনীও মরীচিকাবৎ অদৃশ্য হইল।

চার্বাকের তপস্যা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। হয় তো তাহা কয়েকঘণ্টা মাত্র, হয় তো তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী, কিন্তু সে তপস্যার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং পিতামহ বিচলিত হইলেন। চার্বাক যদি এ সময়ে পিতামহকে চাক্ষুষ করিতে পারিত তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিত সন্দেহ নাই। এই কমনীয়কান্তি তরুণ যুবককে সে সৃষ্টিকর্তা পিতামহ বলিয়া চিনিতেই পারিত না। পিতামহ নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হইয়া ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় 'স্বৈরচর' নামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন বাস্তবে তাহাকে মূর্তিদান করা সম্ভব কিনা। সহসা তাহার মনে হইয়াছিল বৃক্ষলতা পশুপক্ষী বা জড়কে এক একটি দেহ-পিঞ্জরে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। আর কিছুর জন্য না হোক, বৈচিত্র্যের জন্যও অন্তত এমন এক-প্রকার জীব সৃষ্টি করা উচিত যাহারা ইচ্ছামত দেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে পক্ষী বা ব্যাঘ্র বা অন্য কিছু হইতে পারিবে। ভেক সর্প, অথবা সর্প ময়ূরে রূপান্তরিত হইবে। কেবল ইচ্ছা করিলেই গাছের এক ঝাঁক ফুল, এক ঝাঁক প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাইবে, পর্বতস্তূপ মেঘস্তূপ হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। এই অপূর্ব কল্পনায় তিনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। অর্ধ-সৃষ্ট এই জাতীয় কয়েকটি জীব তাহার আশেপাশে পড়িয়াছিল। একটি গোক্ষুর সর্পের কিছু অংশ মানবীতে রূপান্তরিত হইয়া তরুণকান্তি পিতামহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল, প্রকাণ্ড একটি হীরকখণ্ড ধীরে ধীরে আঙুরগুচ্ছে রূপান্তরিত হইতেছিল, একটি পুষ্পের একটি পাপড়ি পতঙ্গের ডানার আকার ধারণ করিয়া দ্রুত স্পন্দনে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পিতামহের কল্পনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মূর্ত হইতে পারিতেছিল না বিশ্বকর্মার জন্য। সৃষ্টিব্যাপারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাই পিতামহের প্রধান সহায়। পিতামহ কল্পনা করেন, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেন বিশ্বকর্মা। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে পিতামহ নিজেই নিজের কল্পনাকে রূপ দিতেন, কিন্তু ক্রমশ এত অসংখ্য সৃষ্টি-কল্পনা তাঁহার চিত্তলোকে ভীড় করিয়া আসিল যে, তিনি একজন সহায়কের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সৃষ্টি করিলেন বিশ্বকর্মাকে। অর্থাৎ বিশ্বকর্মার পিতা প্রভাস এবং মাতা যোগসিদ্ধাকে সম্ভব করিলেন। পিতামহই আদিতম স্রষ্টা, কিন্তু তাহার সৃষ্টিতে তাহার নিজের স্বাক্ষর কোথাও নাই। নিজেকে রহস্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়া পিতামাতাকেই সৃষ্টির কারণরূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে

প্রকট করিয়া তিনি আনন্দ পান। প্রভাস যোগসিদ্ধার মাধ্যমে তাই তিনি বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি ব্যাপারে এই বিশ্বকর্মাই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। কিছুদিন হইতে তাঁহার কিন্তু একটা সন্দেহ হইয়াছে। মনে হইতেছে বিশ্বকর্মা তাঁহার সমস্ত কল্পনাকে যেন ঠিকমতো রূপ দিতেছেন না। পালনকর্তা বিষ্ণুর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বিশ্বকর্মা যেন তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নতুবা এই সকল অযথা বিলম্বের কারণ কি? কেন ওই গোক্ষুর সর্প এখনও সম্পূর্ণরূপে মানবীতে রূপান্তরিত হয় নাই? ওই আঙুরগুচ্ছে এখনও কেন হীরকের কুচি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে? তাঁহার ইহাও মনে হইতেছিল এ বিশ্বকর্মা যদি তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি নূতন বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করিবেন। অর্ধপতঙ্গ পুষ্পটির দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তর করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। আহা, বেচারার উড়িবার কি আগ্রহ! এতদিন ধরিয়া কত সহস্র সহস্র পুষ্প মৌন-আগ্রহে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ঝরিয়া গিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্কও হইয়া পড়িলেন।

"বিশু—"

"আজ্ঞে যাই।"

বিশ্বকর্মা আবির্ভূত হইলেন।

"এদের তুমি এমনভাবে অসম্পূর্ণ করে রেখেছ কেন বল তো? এদের সম্পূর্ণ কর। আরও অনেক কিছু করতে হবে যে—"

"আমি অবিলম্বে এদের সম্পূর্ণ করে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে উদিত হওয়াতে আমি ইতস্তত করছি—"

"কি কথা?"

"আপনার সৃষ্টিতে এতকাল যে শৃঙ্খলা বর্তমান আছে এই অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্ট হলে সে শৃঙ্খলা আর থাকবে না। এই স্বৈরচর নামক প্রাণী যখন যা খুশী হয়ে আপনার সৃষ্টিকে বিশৃঙ্খল করে দেবে। ফুল যদি কখনও প্রজাপতি, কখনও পাখী, কখনও ভেক, কখনও বা অপর কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে সমস্ত প্রাণী সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হবে, সকলেই অস্থির হয়ে উঠবে।"

"উঠুক না, তোমার তাতে কি। তোমার বুদ্ধি মোটা বলে একটা কথা তুমি বুঝতে পার নি। সকলেই স্বৈরচর হতে চায়, হতে পারে না বলেই যত গোল। যত গোলমালের মূলই ওইখানে। সবাই সব হতে চায়। তোমার নিজের ব্যাপারেই দেখ না। তোমাকে সৃষ্টি করলাম মিস্ত্রী করে, তুমি নিজের কাজ ছেড়ে আমার

কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার দরকার কি? তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব, বড় জোর বিষ্ণু ঘামাতে পারে। কিন্তু তুমি ঘামাচ্ছ মানে—তুমিও ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু হতে চাও। আসলে তুমিও মনে মনে একটি স্বৈরচর। তোমারও অনেক কিছু হবার ইচ্ছেটি ষোল আনা আছে কিন্তু হবার সামর্থ্য নেই। দুনিয়া জুড়ে এই কাণ্ড চলেছে। সেই জন্যেই এত অশান্তি। তাই ঠিক করেছি সত্যি সত্যি এবার স্বৈরচর সৃষ্টি করব। তারা সব কিছু হয়ে দেখুক মজাটা কি। তুমি যদি চাও তোমাকেও ব্রহ্মা বানিয়ে দেব দিন কয়েকের জন্য। এখন এই কাজগুলো শেষ করে দাও—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।"

মাথা চুলকাইয়া বিশ্বকর্মা বলিলেন—"আজ্ঞে না আমি মাথা ঘামাই নি। বিষ্ণুই এ নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং বলছিলেন যে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।"

"ও, বলছিল বুঝি। আমি আগেই বুঝেছি তা। সৃষ্টি-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কথা বিষ্ণুরও নয়। কিন্তু ওর স্বভাবই হচ্ছে সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা। আচ্ছা, সে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করব এখন, তুমি কাজ শুরু করে দাও।"

বিশ্বকর্মা ইতস্তত করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু একটি গৈরিক-ধারিণী রূপসীর আকস্মিক অভ্যাগমে তিনি থামিয়া গেলেন।

পিতামহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কে?"

"আমি সাধনা।"

"এখানে কি চাই?"

"সিদ্ধি।"

"তাহলে গণেশের কাছে যাও। সিদ্ধি বিতরণ করবার জন্যে ওকেই ঠিক করে রেখেছি আমরা।"

"আমি আপনারই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, অন্য কোথাও যাবার আমার শক্তি নেই।"

"মুশকিলে ফেললে দেখছি! তুমি কার সাধনা?"

"তাতো জানি নে। আমি তাঁর চিত্তলোকে জন্মগ্রহণ করে আলোক বাহিত হয়ে আপনার উদ্দেশ্যে আসছি। আমি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটি কম্পমান আলোক-তরঙ্গ মাত্র ছিলাম, আপনার দ্বারে এসে সহসা মূর্তি পরিগ্রহ করেছি, আমি এতক্ষণ ছিলাম মৌন আকুতি, আপনার কাছে এসে ভাষা পেয়েছি। কিন্তু যাঁর চিত্তলোকে আমার জন্ম তাঁর কোনও পরিচয় আমি জানি না।"

পিতামহের নয়নযুগলে কৌতুক উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুকাল পূর্বে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই যেন মূর্তিমতী হইয়াছে।

"বেশ তাহলে তুমি আবার আলোক-তরঙ্গ হয়ে তাঁর চিত্তলোকে ফিরে যাও, আমি দেখি কোথা থেকে তুমি এসেছ।"

গৈরিক-ধারিণী তরুণী সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্যোতির্ময় আলোকরেখায় রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার মহাশূন্যপথে মর্তের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। পিতামহ এবং বিশ্বকর্মা উভয়েই একটু ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"ও, সেই ছোকরা—"

পিতামহের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কে বলুন তো!"

"আরে তুমিই ত তৈরি করেছ ওকে আমার কল্পনা অনুসারে। যুগে যুগে নূতন নূতন নামে নানা কীর্তি করেছে ও। আরও করবে।"

"ঠিক ধরতে পারছি না—"

"বিশ্বামিত্রকে মনে নেই? রাবণকে মনে নেই? আমার মানসপুত্র পুলস্ত্যের কীর্তি শোন নি?"

"আজ্ঞে না, পুলস্ত্য? তিনি বোধহয় অনেক আগে জন্মেছেন, তাঁর কথা আমি জানি না।"

"পুলস্ত্য তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে গিয়ে তপস্যা করছিল। কিন্তু মুনি-কন্যারা আর অপ্সরারা এমন বিরক্ত করতে লাগল তাকে—যে শেষ পর্যন্ত সে রেগে-মেগে অভিশাপ দিলে, যে মেয়ে তার দৃষ্টির সম্মুখে আসবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে। কিছুদিন পরে পড়বি তো পড় তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূই পড়ে গেল তার চোখের সামনে। বাস্ সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ ফলে গেল। তৃণবিন্দুর মাথায় হল বজ্রাঘাত। গর্ভবতী কুমারী মেয়ে নিয়ে সে যুগেও সমাজে বাস করা শক্ত ছিল। তৃণবিন্দু তখন ধরে বসল পুলস্ত্যকে—হবির্ভূকে বিয়ে করতে হবে। অন্যান্য মুনিঋষিরাও এসে ধরল। পুলস্ত্য একটু কাটখোট্টা রাগী গোছের লোক হলেও, লোক ছিল ভাল। হবির্ভূকে বিয়ে করলে সে। হবির্ভূ গর্ভবতী ছিলই, সে প্রসব করলে বিশ্রবাকে। এই বিশ্রবাই রাবণগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ, কুবেরও এর ছেলে। এরা সকলেই তপস্বী কিন্তু সকলেই ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। এই ধরনের একদল লোক সৃষ্টি করেছিলাম আমি। এদের হঠকারিতায়, এদের নাস্তিকতায়, এদের শৌর্যে বীর্যে আমার সৃষ্টিকাব্য বিচিত্র। হিরণ্যকশিপু, বিশ্বামিত্র এরা সব ওই দলের। চিরকাল এরা বিদ্রোহ করে এসেছে। আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে এদের,

বুঝলে। এই চার্বাককে নিয়ে একটু রগড় করতে হবে। কয়েকদিন থেকে ওর ঝোঁক হয়েছে আমাকে ও উড়িয়ে দেবে। আমি নেই এই প্রমাণ করবার জন্তে ও অহরহ আমার কথাই ভাবছে। ওর চিন্তার ধাক্কায় বিচলিত হয়ে সেদিন—না, থাক এখন, সব কথা ভাঙব না তোমার কাছে। তুমি যা মুখ-আলগা লোক, এক্ষুনি গিয়ে বিষ্ণুকে সব কথা বলে দেবে, আর সে এসে এই নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু করবে। তুমি ওকে এখন ওই মায়ানদী পার হবার ব্যবস্থা করে দাও। ও বুঝুক যেন ওর তপস্যার জোরেই এটা হ'ল—"

"স্বৈরচর এখন থাক তাহলে—"

"একটা সাঁকো করতে আর কতক্ষণ লাগবে। তারপর স্বৈরচরে হাত দিও। স্বৈরচর করতেই হবে।"

বিশ্বকর্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ওই মায়ানদীটি কে?"

"ও হচ্ছে ওই চার্বাকেরই অবচেতন লোকের কামনা।"

"ওর ওপারে কি রকম ধরনের সাঁকো আপনি তৈরী করতে বলছেন?"

"মায়ানদীর উপর মায়াসাঁকো বানাও।"

"কি রকম হবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

তরুণকান্তি পিতামহ বিশ্বকর্মার নাসিকাগ্রে একটি টোকা দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমার নাকের ডগাটি তো খুব সূক্ষ্ম। বুদ্ধি এত মোটা কেন!"

বিশ্বকর্মা অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতামহ বলিলেন—"আচ্ছা এক কাজ কর। উপনিষদের এক ঋষির শ্লোককেই মূর্ত করে দাও। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—মনে প'ড়েছে?"

"পড়েছে।"

"যাও তবে। বেশী দেরী কোরো না কিন্তু। স্বৈরচরদের তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে।"

"আচ্ছা।"

বিশ্বকর্মা অপসৃত হইলেন।

বিশ্বকর্মা চলিয়া গেলে পিতামহ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্রমশ তাহার সর্বাঙ্গ হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুবর্ণের বিদ্যুৎকণা তাহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলকে বিচিত্র ও বহ্নিময় করিয়া তুলিল। মনে হইতে লাগিল, তরুণকান্তি পিতামহের দেহের আয়তন ক্রমশ উজ্জ্বলতর কিন্তু ক্ষীণতর হইতেছে। তাঁহার দেহই যেন ধীরে ধীরে অসংখ্য বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। পিতামহ নূতনতর সৃষ্টি-স্বপ্নের কল্পনা-লীলায় আবিষ্ট

হইয়াছিলেন। নূতনতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন সম্পূর্ণ আলোকময় জীবের সৃষ্টি সম্ভব কি না—যাহার দৈহিক স্থূলতা থাকিবে না—কিন্তু বুদ্ধি থাকিবে, প্রতিভা থাকিবে, গতি থাকিবে। অর্ধ-সমাপ্ত গোক্ষুরমানবী পিতামহের ভাবান্তর দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"পিতামহ, আমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে আপনি কোথায় অন্তর্হিত হচ্ছেন?"

পিতামহ উত্তর দিলেন—"ভবিষ্যৎ লোকে। ভয় পেও না, সেখানে তোমরাও থাকবে। কথা বলে আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।"

পিতামহের সর্বাঙ্গ হইতে আরও বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

॥ ৪ ॥

মৃত্তিকা-বিদারণের শব্দে চার্বাকের তপস্যা ভঙ্গ হইল। চার্বাক চাহিয়া দেখিল মায়ানদী তখনও কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি তরঙ্গ তখনও যেন তরলিত অশ্লেষের ভঙ্গীতে তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, সুরঙ্গমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিই তাহাতে যেন আভাসিত হইতেছে। পুনরায় মৃত্তিকা বিদারণের শব্দ হইল। চার্বাক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখ ভাগের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি তীক্ষ্নাগ্র শাণিত ছুরিকা ভূতল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। চার্বাক রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই উদীয়মান ছুরিকাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—কার্যের সহিত যখন কারণ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এই বিস্ময়কর ঘটনারও নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। এই বৃহৎ ছুরিকা এ স্থানে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয় কেহ প্রোথিত করিয়া গিয়াছে। কেন? প্রোথিত ছুরিকাই বা কোন্ শক্তিবলে এই কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে? চার্বাকের যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের হেতু নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে হইল তপস্যা দ্বারা আত্মস্থ হইতে চাহিয়া তো কোনই ফল হয় নাই। অলৌকিক মায়ানদী তো তেমনই প্রবাহিত হইতেছে, উপরন্তু বৃহদাকার অদ্ভুত এই ছুরিকাটি কোথা হইতে আসিল? ইহা কি তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ? ক্ষীণভাবে মনে পড়িল—গত রাত্রে পিতামহ-বিষয়ক চিন্তা করিবার পর হইতেই এমন সব অলৌকিক ঘটনাবলী তাহার জীবনে ঘটিতেছে যুক্তির দ্বারা যাহাদের কারণ নির্ণয় করা শক্ত, প্রায় অসম্ভব। যে রূপসীটি নিজেকে তাহার প্রেরণা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল এ সব কি তাহারই কীর্তি? মেয়েটি কি সত্যই যাদুকরী? সত্যই কি যাদুশক্তি বলিয়া কোনরূপ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি আছে? সম্ভবত নাই। কিন্তু জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। সীমাবদ্ধ

বুদ্ধি ও বোধশক্তি লইয়া অসীম সম্ভাবনার পরিমাপ করা কঠিন। হয়তো পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক, স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেরই অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু "হয়তো"র উপর নির্ভর করিয়া কি চার্বাক তাহার জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবে? অসীম অনিশ্চয়তা অপেক্ষা সীমাবদ্ধ নিশ্চয়তা কি বেশী স্বস্তিকর নহে? যাহা প্রত্যক্ষ সত্য তাহাই কাম্য, সে সত্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, পরবর্তী নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় যদি সে সত্যের রূপান্তরও ঘটে তথাপি তাহাই কাম্য। নানাবিধ চিন্তা চার্বাকের মস্তিষ্কে ভীড় করিতে লাগিল।

ছুরিকাটি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও শ্লথগতি হয় নাই। চার্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল ছুরিকাটি কিছুদূর উর্ধ্বমুখে উঠিয়া ক্রমশ নদীর দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং পরপারে পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যাহা অলৌকিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহাও আর পরমুহূর্তে অলৌকিক বা অসম্ভব রহিল না, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া চার্বাককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, এখানে কি জন্য এসেছেন?"

চার্বাক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল—"আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্ন করব ভাবছিলাম। আপনি কে?"

"আমি পাতাল-নিবাসী রাজপুত্র কালকূট। এখানে এসেছি ওই শবদেহে প্রবেশ করব বলে। কিছুদিন পূর্বেও এসেছিলাম, কিন্তু এই ছলনাময়ী মায়ানদী আমাকে পার হতে দেয় নি। তাই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আবার পাতালে। আমার প্রেয়সী নাগ-কন্যা বর্ণমালিনী বললেন—তুমি আবার ফিরে যাও, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে মায়ানদীর উপর সাঁকো তৈরী করে দেব, তুমি তার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হয়ে যাও। ওটা ছুরিকা নয়, নাগকন্যা বর্ণমালিনীর জিহ্বা।"

"কিছু যদি না মনে করেন, তাহলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।"

"করুন।"

"আপনি ওই শবদেহে কেন প্রবেশ করতে চাইছেন?"

"শুনেছি পিতামহ ব্রহ্মার ওইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উনি নিজের ওই কীর্তি-মন্দিরে বাসও করেন এও শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব, তাই ওই শবদেহে প্রবেশ করতে চাই।"

"তাঁর কাছে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?"

"তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।"

"কিসের বোঝাপড়া?"

"সে অনেক কথা। আমরা তাঁর পৌত্র কশ্যপের বংশধর। আমি জানতে চাই একই পিতার বংশধর কেউ দেব, কেউ দানব, কেউ নাগ হল কেন। একজনের স্থান স্বর্গে আর একজনের পাতালে কেন, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী বিশ্ববরেণ্যা অথচ আমার পত্নী বর্ণমালিনীকে কেউ চেনে না কেন। বর্ণমালিনী রূপে গুণে শচীদেবীর চেয়ে কম নন। তিনিও অনন্যা। তবে এ অবিচার কেন?"

চার্বাক লক্ষ্য করিল কালকূটের চক্ষু দুইটিতে নিষ্ঠুর ভুজঙ্গভাব প্রকটিত হইয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখও হয়তো এখনই ফণায় রূপান্তরিত হইবে।

চার্বাক বলিল—"আমিও পিতামহের দর্শনপ্রার্থী। আমিও শুনেছি যে পিতামহ ওই শবদেহে আছেন, এই মায়ানদী আমাকেও বাধা দিয়েছে ক্রমাগত। কিন্তু—"

চার্বাক থামিয়া গেল। যে কথাটা মনে জাগিয়াছিল তাহা কালকূটের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ হইল।

"কিন্তু কি, বলুন থেমে গেলেন কেন?"

"আমি পিতামহকে দেখতে চাই সত্যভাবে, একটা ভোজবাজির চমৎকৃতির ভিতর দিয়ে নয়। আমার মনে হচ্ছে কি করে জানিনা আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। যা আমি প্রত্যক্ষ করছি তা মনে হচ্ছে অসম্ভব। কিন্তু এ অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেও পারছি না, প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করব কি করে?"

"আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়তো অভাবিত উপায়ে নূতন শক্তি অর্জন করেছে। সেই শক্তিবলে আপনি অভিনব জগৎ প্রত্যক্ষ করছেন, পুরাতন যুক্তি দিয়ে বিচার করছেন বলেই অসম্ভব মনে হচ্ছে। নূতন যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি কি অভাবিত উপায়ে এ ভাবে বদলে যেতে পারে? এই মায়ানদী, বর্ণমালিনীর এই বিস্ময়কর জিহ্বা, ওই বিরাট শবদেহ, এ সমস্তই কি সত্য? পিতামহ কি সত্যই আছেন?"

"আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আপনার শৈশবে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরের জগৎকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করত এখনও কি ঠিক সেই ভাবেই করে? এখনও কি অন্ধকার রাত্রে গাছকে ভূত বলে মনে করেন? মনোহরকান্তি সর্পের দিকে কি এখনও নির্ভয়ে হাত বাড়াতে পারেন?"

"বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক ভ্রান্তি অপনোদিত হয়েছে মানছি।

কিন্তু বৃক্ষের বৃক্ষত্ব বা সর্পের সর্পত্ব তখনও আমার কাছে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। আপনাকে আমি সর্প-বংশজাত বলে মানতে প্রস্তুত নই। আমার মনে হচ্ছে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি।"

"মোহগ্রস্তই হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, আপনার যুক্তির অহঙ্কারই আপনার মোহ। আমাকে সর্পকুলজাত বলে মানতে প্রস্তুত নন আপনি? কেন? আমার আকৃতি মানুষের মতো বলে? দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন—"

দেখিতে দেখিতে কালকূট এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্পে রূপান্তরিত হইলেন এবং তর্জন করিয়া বলিলেন—"কিছুদিন পরে আপনার দেহ যে ভস্মে ও বায়বীয় আকারে পরিণত হবে সে তখন যা প্রত্যক্ষ করবে তা এখন কল্পনা করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি। যুক্তির শৃঙ্খলে কখনও নিজেকে বন্দী করবেন না, আপনার যুক্তি হবে আপনার সত্য নির্দ্ধারণের উপায় স্বরূপ। তা যদি আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আপনি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সত্য উদ্ধার করতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আপনাদের মতো বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সম্বল, যদি কোনও কারণে, তা সে কারণ যত বড় যুক্তি-যুক্তই হোক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ জন্মায় তাহলেই আপনি দিশাহারা হয়ে পড়বেন। যা প্রত্যক্ষ করছেন তা আপনাকে মানতেই হবে।"

কালকূট পুনরায় মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"প্রত্যক্ষ সত্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই, অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র প্রদীপশিখার উপর নির্ভর না করে যেমন উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও বলছি ওটা খুব নির্ভর-যোগ্য ব্যাপার নয়। আপনি পিতামহের দর্শনপ্রার্থী কেন তা জানতে পারি কি?"

চার্বাক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল—"কৌতূহল মাত্র। আমার ধারণা তিনি নেই, অনুসন্ধান করে দেখছি আমার এ ধারণা ঠিক না ভুল।"

"বেশ, তাহলে আসুন, বর্ণমালিনীর জিহ্বার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হওয়া যাক।"

"আপনার পত্নীর জিহ্বার উপর পদার্পণ করবার অধিকার আপনার হয়তো আছে কিন্তু আমার তো নেই।"

"সে অধিকার আপনাকে আমি দিচ্ছি। আপনার সাহস আছে কিনা সেইটে আপনি ভেবে দেখুন। বর্ণমালিনীর ওই জিহ্বা শুধু স্পর্শদ্বারা বিবর্ণকুলকে ধ্বংস করেছে—"

"আমি চার্বাক। সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে

আমি প্রস্তুত। আমার কিন্তু একটা খটকা লাগছে—সর্পের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত শুনেছি।"

"ঠিকই শুনেছেন। অধিকাংশ সর্পের জিহ্বাই দ্বিখণ্ডিত, কারণ তারা সমুদ্র-মন্থনের পর অমৃতের লোভে কুশলেহন করেছিল। বর্ণমালিনীর পূর্বপুরুষ শৃঙ্গনাসা এ হীনতা স্বীকার করেন নি, তাই তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জিহ্বা অখণ্ডিত আছে।"

চার্বাক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কি ভাবছেন?"

"ভাবছি ওই শবদেহের মধ্যে যে সম্ভাব্য সত্য আছে তার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিনা। বর্ণমালিনীর জিহ্বার বিষাক্ত স্পর্শে হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে, ভাবছি এই বিপদ বরণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা।"

"আপনি যদি বর্ণবিরোধী হন তাহলে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিবর্ণ-বাদীদের ধ্বংস করবার জন্যেই বর্ণমালিনী তপস্যা করে ওই বিশেষ রাসায়নিক শক্তি লাভ করেছিলেন।"

"আমি বর্ণবিরোধী নই।"

"তাহলে আপনি নির্ভয়ে আসতে পারেন। আসুন—"

কালকূট সেই ধনুকাকৃতি সাঁকোর উপর আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চার্বাকও অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা তাহার নজরে পড়িল মায়ানদী অদৃশ্য হইয়াছে, নদীর খাতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে একদল আলেয়া। চার্বাক আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া সাঁকোর উপর আরোহণ করিল। কিছুদূর উঠিয়াও সে কিন্তু কালকূটকে আর দেখিতে পাইল না। চার্বাকের মনে হইল মায়ানদীর মতো কালকূটও কি তাহা হইলে মায়া? আর একটা কথাও চার্বাকের মনে হইতে লাগিল। বর্ণমালিনীর জিহ্বায় কোন কোমলত্ব নাই কেন? ক্ষুরধার লৌহকঠিন এই বস্তুটি কি কোনও জীবন্ত প্রাণীর জিহ্বা হইতে পারে? জিহ্বা যদি না হয় তাহা হইলে ইহা কি? চিন্তা করিতে করিতে চার্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুরধার পথে অন্যমনস্ক হইয়া চলা কঠিন, চার্বাক স্খলিতচরণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু শূন্যপথে এক দ্যুতিমান বৃহদাকৃতি পতঙ্গ আবির্ভূত হইয়া কহিল—"চার্বাক, অন্যমনস্ক হোয়ো না। আমার উপর ভর দাও, আমি তোমাকে নির্বিঘ্নে পার করে দেব।"

"তুমি কে?"

"আমি তোমার মনীষা।"

চার্বাক পতঙ্গের উপর ভর দিয়া সেই ক্ষুরধার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

বিশ্বকর্মা পিতামহের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন যে সকল অর্ধসমাপ্ত স্বৈরচর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহারাও কেহ নাই। ইহাতে কিন্তু বিশ্বকর্মার বিস্ময় হইল না। কৌতুকী পিতামহের বহুবিধ কৌতুক-পরায়ণতার পরিচয় তিনি ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছিলেন। পিতামহ নিজেকে নানারূপে পরিবর্তিত করিয়া বহুবার তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছেন। এই তো সেদিনের কথা, যখন তিনি হিমালয় নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদা গভীর নিশীথে ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে গিরিগাত্র বিদীর্ণ হইয়া নিদারুণ অগ্নি উদ্গত হইল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী দগ্ধ হইতে লাগিল, হিমালয়ের কিছু অংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল, ধরিত্রীর অন্তঃস্থল হইতে গলিত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্র উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশপটে অভিনব জ্যোতির্ময় উৎসব করিতে লাগিল, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বিশ্বকর্মা সৃষ্টিকার্য স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষামানসে পলায়নপর হইয়াছিলেন এমন সময় গর্জমান অগ্নিশিখার প্রচণ্ড গর্জন প্রচণ্ড হাস্যে রূপান্তরিত হইল। অগ্নিশিখার ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন—"ভয় পেলে না কি বিশু, ভয় পেও না, তোমার সৃষ্টি একটু বদলে দিলাম।"

বিশ্বকর্মা একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন।

"বদলে দিলেন মানে?"

"তোমার মাপজোক বড় নিখুঁত হচ্ছিল। সৃষ্টি ব্যাপারে অত জ্যামিতি পরিমিতি মেনে চললে কি চলে? কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম, কোথাও উষর, কোথাও ধূসর, কোথাও শ্যামল, কোথাও রঙীন—খেয়াল খুশীর বৈচিত্র্য থাকা চাই; তুমি যা করছিলে তাতো একটা ঢিবি। এইবার দেখতো কেমন হল—"

আর একবার, বিশ্বকর্মা যখন গভীর সমুদ্রের তলদেশে শুক্তি সজ্জিত করিতেছিলেন বিশালকায় এক জীব আসিয়া তাঁহার সম্মুখে মুখ ব্যাদন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মস্তকের উভয় দিক হইতে তীব্র আলোকচ্ছটা নির্গত হইয়া সহসা সমুদ্রের অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, মনে হইতেছিল সমুদ্রের জলে বুঝি সহসা আগুন লাগিয়া গেল। সেবারও বিশ্বকর্মা ভয় পাইয়াছিলেন, সেবারও সেই ভীষণ জলজন্তু পিতামহের কমনীয় কান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। আমি ভাবছিলাম তোমার এই চমৎকার মুক্তোগুলো পাহারা দেবার জন্য ভয়ঙ্কর

একটা জানোয়ার সৃষ্টি করলে কেমন হয় ? সুন্দরের ঠিক পাশেই ভয়ঙ্কর না থাকলে সুন্দর আর সুন্দর থাকবে না, খেলো হয়ে যাবে ; কি বল ?” পিতামহের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মাকে বহুবিধ সামুদ্রিক জীবও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বকর্মার মনে হইল পিতামহ সম্ভবত অনুরূপ কোন কৌতুকে মত্ত হইয়া নূতন ক্রীড়ায় লিপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই শূন্য কক্ষেই পিতামহ অবস্থান করিতেছেন ইহা ধরিয়া লইয়া বিশ্বকর্মা বলিলেন—“পিতামহ আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে চার্বাককে মায়ানদী পার করে দিয়েছি, কিন্তু আমি নিজের বুদ্ধিতে আর একটা কাজও করেছি, জানি না আপনি তা সমর্থন করবেন কিনা।”

শূন্য কক্ষের বায়ুস্তর কয়েকটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণে ক্ষণিকের জন্য চমকিত হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্তেই পিতামহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

“তুমি যা করেছ তা আমি জানি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে যা করেছ তাও আমার অজানা নয়, কারণ সে বুদ্ধি আমিই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। মুখরা বর্ণমালিনীর জিভটাকে তাক মাফিক খুব কাজে লাগানো গেছে। কালকূটের সঙ্গে চার্বাকের দেখা হওয়াতেও খুব ভাল হয়েছে। দুই গোঁয়ারে জুটে কি ভীষণ কাণ্ড করে দেখ না—”

“ভীষণ কাণ্ড করবে না কি ?”

“নিশ্চয়। সুন্দ-উপসুন্দের কথা মনে নেই, যার জন্য তোমাকে তিলোত্তমা বানাতে হ'ল, যে তিলোত্তমাকে দেখতে গিয়ে আমি চতুর্মুখ হয়ে গেলাম এরাও সেই সুন্দ-উপসুন্দের জাত। তুলকালাম করে তবে থামবে।”

বিশ্বকর্মা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“তাই না কি, কি করবে বলুন তো !”

“তা এখনও আমি ঠিক করি নি।”

কথাটা বিশ্বকর্মা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

পিতামহ বলিলেন—“ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। সেদিন যে নূতন দ্বীপটি সৃষ্টি করেছ তার জন্যে কয়েক অক্ষৌহিনী ক্যাঙারু তৈরী করগে যাও। বেশ বড় বড় ক্যাঙারু চাই।”

বিশ্বকর্মা ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“স্বৈরচর তৈরী তাহলে এখন স্থগিত রইল ?”

“না, তাদের ভার আমি স্বয়ং নিয়েছি। তাদের নিয়ে আমি এখন বাস করছি ভবিষ্যৎলোকে।”

“ভবিষ্যৎলোকের সৃষ্টি আবার কবে হল ?”

“হয় নি, হবে। তাই নিয়েই ব্যস্ত আছি আমি।”

"কোথায় আছেন আপনি ?"

"ভবিষ্যৎলোকে।"

"ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার। যে লোক নেই সেখানে আপনি আছেন কি করে।"

"তাই যদি বুঝতে পারবে তাহলে তুমি বিশ্বকর্মা না হয়ে ব্রহ্মা হতে। তোমার যেটুকু বুদ্ধি আছে তা অতিশয় কুচুটে বুদ্ধি, নিজের কাজ না করে তাই তুমি বিষ্টুর সঙ্গে জুটে গোপনে আমার নামে যা তা আলোচনা কর।"

"আজ্ঞে না, যা তা আলোচনা তো কখনও করি নি। বিষ্ণুই বলছিলেন যে আপনি যদি সত্যিই স্বৈরচর সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টি আর থাকবে না।"

"এমনিতেই সৃষ্টি আছে না কি। বিষ্ণুকে বলে দিও যে আমি একদিন আমার সমস্ত সৃষ্টির হিসাব তার কাছে দাবী করব। সে হিসাব তিনি যদি নিখুঁতভাবে না দিতে পারেন তাহলে এমন এক স্বৈরচর তৈরী করব যে তাঁর বিষ্ণুত্বই লোপ করে দেবে সে। বিষ্ণুকে বলে দিও এ কথা।"

শূন্যকক্ষের বায়ুস্তরকে চিরিয়া সশব্দে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। বিশ্বকর্মা মুখব্যাদন করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না। সশব্দে আর একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সর্পাকারে প্রলম্বিত হইয়া চতুর্দিকে ফণা বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পিতামহের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। যা বললাম তা কর গিয়ে। তোমার যেমন ভাবে খুশী তেমনি ভাবে কর, তোমাকে আমি আর বাধা দেব না, কারণ আমার বাধা দেবার সময় নেই! ভবিষ্যৎলোক নিয়ে আমি মহাব্যস্ত আছি। ঠিক করেছি ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করব নানা মাপের বিদ্যুৎ তরঙ্গ দিয়ে, ওই তরঙ্গগুলোই হবে সেই লোকের নিয়ামক। সৃষ্টি ঠিক এমনিই থাকবে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হবে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রভাবে। নানারকম বিদ্যুৎ তরঙ্গের সম্ভাবনা আমি সৃষ্টি করছি মহাকাশে! তোমার সাহায্যের দরকার নেই এতে, কারণ কল্পনাই এ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তুমি ক্যাঙারু তৈরী কর গে যাও। আর বিষ্ণুকে বোলো আমার সৃষ্টির হিসাবটা যেন ঠিক করে রাখে, হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হব আমি। পালনকর্তা নিজের কর্তব্যটা কেমন ভাবে করেছেন দেখতে চাই। তুমি যাও।"

বিশ্বকর্মা বলিলেন—"পিতামহ, যদি অভয় দেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করবার এ অদ্ভুত প্রেরণা আপনি পেলেন কি করে?"

"প্রেরণা যোগাচ্ছে ওই চার্বাকের দল। ওদেরই জিজ্ঞাসায় বিচলিত হয়ে আমি নানারূপে বিবর্তিত হয়ে আত্ম আবিষ্কার করছি। ওরা আমাকে ধরতে

চাইছে, আর আমি নানা ছদ্মবেশে এড়িয়ে যাচ্ছি ওদের। এই লুকোচুরি খেলা চলছে, এই খেলাই আমার প্রেরণা।"

বিশ্বকর্মা নির্বাক হইয়া রহিলেন।

পিতামহ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন।

"অমন হাঁ করে আছ কেন। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা অস্থির হচ্ছ কেন। এ সব তোমার মাথায় ঢুকবে না। যে যাতে আনন্দ পায়, তাই তার মাথায় ঢোকে। জোঁক তাই রক্ত বোঝে, ভ্রমর বোঝে মধু আর বিশ্বকর্মা বোঝে মিস্ত্রিগিরি। এ নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—ক্যাঙারু তৈরী শেষ হলে তিমি বানিয়ে দিও কিছু। কিছুক্ষণ আগে উত্তর মেরুতে গিয়েছিলাম দেখলাম তিমি খুব কমে গেছে। সেখানে এমন একদল মানুষ জুটেছে যে বড় বড় তিমিগুলোকে ধরে ধরে সাবাড় করে দিচ্ছি। এই মানুষগুলোকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়া গেছে, তছনছ করে ফেললে সব। ওই যে সরো এসে গেছে, ওর জন্যই অপেক্ষা করছি, তুমি যাও এবার।"

একটা অপরূপ সুর দ্বারপথে প্রবেশ করিল। বিশ্বকর্মা বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রস্থান করিলেন না, তিনি দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেবী বীণাপাণির অভিনব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সুর ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সহসা সুর থামিয়া গেল, আলোক বিকশিত হইল। বিশ্বকর্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন—সহস্রবর্ণ এক শতদল শূন্যে বিকশিত হইয়াছে, ক্রমশ দেবী বীণাপাণি তাহার উপর মূর্ত হইলেন।

পিতামহ পুলকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—

"সরো, বড্ড বেশী ভড়ং করছ তুমি আজকাল। চার্বাককে ভোলাবার জন্যে এসব দরকার হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অতটা না-ই করলে। আচ্ছা সরো, ভবিষ্যৎ যুগেও চার্বাক থাকবে না কি।"

সরস্বতীর অধরে একটি মৃদু হাস্য কম্পিত হইতেছিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—"অনন্ত জিজ্ঞাসাই তো যুগে যুগে চার্বাকের রূপে মূর্ত হয়েছে পিতামহ। আপনারই প্রেরণা তো সৃষ্টি করেছে তাদের। ভবিষ্যৎ যুগেই বা সে থাকবে না কেন। জিজ্ঞাসার তো অন্ত নেই।"

পিতামহ হাসিয়া বলিলেন—"জিজ্ঞাসার অন্ত থাকলেও বা থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কোনও অন্ত নেই। তুমিই তো নাচাচ্ছ আমাকে। শুধু আমাকে কেন বিষ্টুকেও। মহাদেবকেও। যিনি সরস্বতী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই দুর্গা। তুমি কম না কি!"

পিতামহ আবেগভরে অগ্রসর হইয়া বীণাপাণিকে চুম্বন করিলেন।

"কি যে বলেন পিতামহ, লক্ষীর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া।"

"ওসব বাইরের মৌখিক ঝগড়া। আসলে তুমি, লক্ষী আর দুর্গা তিনজনেই এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের জন্যে এককে ভেঙে তিন করতে হয়েছে। একটাকে নিয়ে তিন জনে তো আর কাড়াকাড়ি করা যায় না। ওঃ এককালে কি মারপিটই করা গেছে—"

"কি হয়েছিল বলুন না।"

"সে অনেক কথা, অত কথা বলবার এখন সময় নেই।"

"একটু বলুন না—"

"কি হবে সে সব শুনে। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক এস। ভাবীকালের চার্বাক কেমন হবে, তার পরিণতি কি হবে, তারই একটা আঁচ দাও বরং তুমি।"

"তা দেব। কিন্তু আপনি আগে ওই গল্পটা বলুন।"

"কি মুশকিল। ছাড়বে না যখন শোন তবে। ডিম ফেটে আমি যখন বেরুলাম তখন দেখি কোথাও কেউ নেই। চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। ভাবলাম ভালই হয়েছে, আমাকে যখন সৃষ্টি করতে হবে তখন চারিদিকে ফাঁকা থাকাই ভাল। নিজের সৃষ্টি দিয়ে চারিদিক পরিপূর্ণ করে তুলব। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চারিদিকে। ভাবতে লাগলাম প্রথমে কি সৃষ্টি করা যায়। অনেকক্ষণ ভেবে স্থির করলাম সৃষ্টির প্রাণ হচ্ছে রস। সুতরাং প্রথমে রস-সৃষ্টি করতে হবে। যেমনি কথাটি মনে হওয়া আর অমনি চারিদিক জলে থৈ থৈ করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে ভাসতে ভাসতে বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কে হে। বিষ্ণু উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি বললাম—কি রকম, সৃষ্টিকর্তা তো আমি। আমার কথা শুনে বিষ্ণু এত চটে গেলেন যে চড়াৎ করে তাঁর কপালটা ফেটে গেল, আর সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলেন রুদ্র। ইনিই পরে মহাদেব হয়েছেন। এঁকেও জিজ্ঞেস করলাম—বাবাজি, তুমি কে। বাবাজী উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি তো অবাক। দুজনকে দেখেই তখন অবাক হয়েছিলাম। তেত্রিশ কোটি তখনও জোটে নি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মহাশূন্য অতি মধুর কলহাস্যে শিউরে উঠল যেন! ঘাড় তুলে দেখি অপরূপ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি মহাশক্তি। আমাকে যিনি লাভ করতে পারবেন তিনিই হবেন সৃষ্টিকর্তা, কারণ আমার সহায়তা ভিন্ন কোনও

সৃষ্টিই হতে পারে না।" তিনজনই তখন উদ্বাহু হয়ে ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। তিনিও ছোটেন, আমরাও ছুটি। কিছুদূর ছোটবার পর বিষ্ণু জাপটে ধরে ফেললে তাকে। তারপর আমি এসে দুজনকেই জাপটে ধরলুম। ময়শা মোটা মানুষ, অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেও শেষকালে এসে আমাদের তিনজনকেই জাপটে ধরলে। চরম জাপটা-জাপটি চলছে জলের ভিতর, হঠাৎ আমার মনে হল এই ধস্তাধস্তিতে অমন সুন্দর মেয়েটি বোধহয় মারা গেল। আহা, ওকে যদি কোনরকমে সরানো যায়! আমার একটা ক্ষমতা আছে, তোমরা বোধহয় জান না, আমি যক্ষুণি যা মনে করব তক্ষুণি তাই হয়ে যাবে। আমি মনে করবামাত্র মহাশক্তি অন্তর্ধান করলেন, কোথায় বা কি ভাবে তা আমি এখনও জানি না। তিনজনে মিলে বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে যখন আমরা গলদঘর্ম এবং পরিশ্রান্ত তখন বিষ্ণু সকাতরে মহাদেবকে বললেন—আপনি আমার পিঠের উপর থেকে নামুন, আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি সরে পড়েছে। মহাদেব আমাকে বললেন, আমার কোমরটা ছাড়ুন তাহলে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি সত্যিই মহাশক্তি নেই। বিষ্ণু আর কথাবার্তা না বলে চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে সরে পড়লেন। মহাদেব আমার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আপনি কে বলুন দেখি। বললাম—আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। মহাদেব হেসে বললেন—তাই না কি! আপনিও সৃষ্টিকর্তা? আচ্ছা, আমার জন্যে বেশ নধর একটি ষাঁড় তৈরী করুন দেখি। আমি বললাম—কেন ষাঁড় নিয়ে কি হবে? মহাদেব বললেন—এই জলে ছপ ছপ করে কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। একটা ষাঁড় পেলে তার পিঠে চড়ে বেড়াতাম। আমি বললাম—তুমি তো নিজেই সৃষ্টিকর্তা বাবাজি, নিজেই নিজের ষাঁড় সৃষ্টি করে নাও না। ময়শা কি বললে জান? বললে—আমি নিজের জন্যে কখনও কিছু সৃষ্টি করব না, যা কিছু করব পরের জন্যে। কি ধূর্ত দেখ। আসলে ও দেখতে চাচ্ছিল যে আমি সত্যি কিছু সৃষ্টি করতে পারি কি না। দিলাম একটা ষাঁড় সৃষ্টি করে। বিরাট এক ষাঁড়। ময়শা টপ করে চড়ে বসল তাতে। আমার দিকে ফিরে বললে—আমি চললুম। আবার দেখা হবে। পারেন তো আমার জন্যে একটা ভালো পাহাড় তৈরী করে দেবেন। আমিও কম ধূর্ত নই, সঙ্গে সঙ্গে বললাম—তোমার জন্যে তো ষাঁড় তৈরী করে দিলুম, তুমি আমার জন্যে কিছু একটা করে দিয়ে যাও। নিজের জন্যে কিছু করাটা সত্যিই ভাল দেখায় না। ময়শা বললে—বেশ আপনি কি চান বলুন। আমি বললাম—আমার জন্যে একটি হাঁস করে দাও বাপু। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র চলবে। ময়শার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। আকাশের

দিকে চেয়ে তিনটি তুড়ি মারলে কেবল, আর পাখা ঝটপট করতে করতে বিশাল এক রাজহংস নেমে এল আকাশ থেকে। ময়শা ষাঁড়ে চড়ে চলে-গেল। আমিও চড়ে বসলাম হাঁসের পিঠে। হাঁস উড়ে চলল মহাশূন্যে, অন্ধকার মহাশূন্যে, তখনও সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হয় নি, বাতাসও সৃষ্টি হয় নি। সেই নিবাত নিষ্কম্প অন্ধকারে হাঁসের পিঠে চড়ে আমি উড়ে চললুম। কতকাল যে চলেছিলুম তা জানি না। যে সৃষ্টি তখনও হয় নি সেই সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ দেখলাম—খানিকটা অন্ধকার কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে। আর একটু কাছে যেতেই কথা শুনতে পেলাম। অন্ধকার মহাশূন্য বাণীর আবেগে কাঁপছিল। শুনতে পেলাম—কোথায় তুমি, আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে সফল কর, সৃষ্টির উল্লাসে আমাকে বিকশিত কর, অন্ধকারের অন্তরালে আমাকে সংহরণ করে রেখেছ কেন সৃষ্টিকর্তা। নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মুক্তি দাও আমাকে। আমার হাঁস মহাশূন্যে পক্ষ বিস্তার করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল—এরই উদ্দেশ্যে সে যেন উড়ে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম—কে তুমি? কাকে ডাকছ? উত্তর পেলাম—আমি মহাশক্তি। তোমাকেই ডাকছি। তোমারই কল্পনার নির্দেশে আমি এই অন্ধপুরীতে অজ্ঞাতবাস করছি। আমাকে মুক্ত কর, তুমি বললেই আমি মুক্তি পাব। তোমাদের তিনজনের কলহ-নিবারণের উপায়ও আমি ভেবে রেখেছি। আমাকে মুক্তি দাও, সব বলছি। অপরূপ এক কল্পনায় আমার চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে, আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে প্রকাশ কর। আমি বললাম—মুক্ত হও। অন্ধকারের আবরণ সরে যাক। তোমার সম্পূর্ণ মহিমায় তুমি প্রকাশিত হও। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি প্রকাশিত হলেন। মহাশূন্যের প্রগাঢ় অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আবার আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। আমি বললাম—কলহ নিবারণের কি উপায় ভেবেছ এইবার বল। মহাশক্তি বললেন—বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও সৃষ্টিকর্তা, ওঁদেরও বঞ্চিত করলে চলবে না, ওঁদের বঞ্চিত করলে তোমারই সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ঠিক করেছি আমি ত্রিধাবিভক্ত হব। আমার এক একটি ভাগ এক একজনের কাছে থাকবে। আর একটি ব্যবস্থাও করতে হবে। তোমাদের তিনজনের কাজ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। তোমার অফুরন্ত সৃষ্টির কাজ যদি অনাদিকাল অক্ষুন্ন রাখতে চাও তাহলে তোমার এই বিশাল সৃষ্টির দেখাশোনা করবার ভার আর একজনকে নিতে হবে। তুমি নিজে যদি সে ভার নিতে যাও তাহলে তুমি বৈষয়িক হয়ে পড়বে আর স্রষ্টা থাকবে না। আমার মতে বিষ্ণুকে তুমি পালনকর্তা করে দাও। আর মহাদেবকে কর সংহারকর্তা। কারণ সৃষ্টিকে চিরনবীন রাখতে হ'লে পুরাতনকে অপসারিত

করতে হবে। মহেশ্বর সেই কাজ করুন। সৃষ্টি ব্যাপারকে অনাবিল অব্যাহত রাখতে হলে এই তিনটি জিনিসই দরকার। তোমরা তিনজন সৃষ্টিকর্তা এই তিনটি বিষয়ের ভার নাও, তাহলে তোমাদের ঝগড়াও থাকবে না, সৃষ্টিও নব নব বৈচিত্র্যে ভরে উঠবে। আমি বললাম—কল্পনাটি করেছ মন্দ নয়, কিন্তু এসব হবে কি করে। মহাশক্তি বললেন—তুমি ইচ্ছা করবামাত্রই হবে। তুমি বললেই আমি ত্রিমূর্তি হয়ে যাব। বলেই দেখ না। আমি বললাম—মহাশক্তি তুমি তিনরূপে আবির্ভূত হও। বলবার সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি অন্তর্হিত হলো। একটু পরেই দেখি তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছ।"

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"কি যা তা বলছেন বানিয়ে বানিয়ে।"

"এসব তোমার বেদে পুরাণে নেই। দু' একজন ঋষি তপোবলে খানিকটা খানিকটা জেনেছিলেন তাই বাড়িয়ে কমিয়ে খাদ মিশিয়ে সাতকাহন করে লিখেছেন। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।"

"বেশ, তারপর কি হল বলুন।"

"তারপর আমি তোমার মুখের দিকে চাইলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ নীচু করলে। বুঝলাম আমাকেই পছন্দ হয়েছে তোমার। আমি আর কালবিলম্ব না করে বললাম হৃদয়েশ্বরি আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ কর। বলবামাত্রই কিন্তু তুমি যা করলে তা আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি কথাটা বলেছিলুম রূপক ছলে, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি এসে আমার হৃদয় জুড়ে বসে পড়লে। অর্থাৎ বাইরে তোমার আর কিছু রইল না। বহুকাল পরে নদীরূপে তোমাকে যখন ব্রহ্মাবর্তের সীমারেখা করে সৃষ্টি করেছিলাম তখন যেমন তুমি বালির মধ্যে ঢুকে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হয়েছিলে—আমার কাছে প্রথম যখন এলে তখনও তুমি একেবারে আমার অন্তর্লীলা হয়ে গেলে। আমার কল্পনায় ওত-প্রোত হয়ে বিরাজ করতে লাগলে।"

"তারপর ?"

"তারপর যা ঘটেছে তাতো তোমার অজানা নয়। তারপর থেকে আমি যা করেছি তোমারই প্রেরণাতে করেছি। লক্ষ্মী আর দুর্গার দিকে আমি নির্নিমেষে চেয়েছিলাম তাই প্রথমেই সমুদ্র আর হিমালয় সৃষ্টি করতে হল।"

"কেন—"

"তুমি মনের ভিতর বসে খোঁচা দিতে লাগলে, আর কেন। ক্রমাগত বলতে লাগলে—ওদের সরাও চোখের সামনে থেকে। সমুদ্র সৃষ্টি করে লক্ষ্মীকে রেখে এস তার তলায়, আর হিমালয় সৃষ্টি করে দুর্গাকে পাঠিয়ে দাও সেখানে।"

সরস্বতীর নয়নযুগলে হাস্য টলমল করিতেছিল। তিনি আরও ক্ষণকাল পিতামহের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।"

"তোমার তো মনে থাকবার কথা নয়। তুমি আমার কল্পনায় ভর করে যা কিছু কর তা আমার মনে থাকে। তোমার থাকবে কি করে? তোমার কি তখন এই কুন্দেন্দুকান্তি দেহ থাকে, না মন থাকে? কখনও আলোর মতো—কখনও শিখার মতো—কখনও দেহ-হীন প্রেরণার মতো এসে আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ কর তুমি। তখন তোমার ভাবগতিক একেবারে অন্য রকম থাকে যে।"

"বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হল কবে?"

"মনে মনে তাঁদের আহ্বান করলুম। তাঁরা আমার মানসলোকে এসে হাজির হলেন। ময়শাই ষাঁড়ে চেপে প্রথমে এল। আমার সব কথা শুনে বললে—বেশ আমার কিছুতেই আপত্তি নেই. বিষ্ণুকে ডেকে একটা পরামর্শ করুন। কিন্তু তার আগে খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা দরকার যে। জলে ছপছপ করে কাঁহাতক ঘুরে বেড়ানো যায়। আমাকে যে কাজ দেবেন তাতেই আমি রাজী আছি। একটি বেশ উঁচু দেখে পাহাড় করে দিন আমাকে, আর আমি কিছু চাই না। এই বলে মহেশ্বর তো অন্তর্ধান করলেন। আমি তখন সেই বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে তেকোণা একটি স্থলভাগ সৃষ্টি করলুম. আর তার একদিকে করলাম একটা পাহাড়। তোমার ভারতবর্ষ আর হিমালয় গো। সেই তেকোণা জায়গায় বিষ্ণু একদিন ঠেকলেন এসে ভাসতে ভাসতে। মহাদেবও এলেন। সেই ত্রিভুজাকৃতি স্থানের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের তিনজনের চুক্তি—আমি হব সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হবেন পালনকর্তা এবং শিব হবেন সংহারকর্তা। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার কথা রইল যে আমি যখন খুশী আমার সৃষ্টির হিসাব তার কাছে একদিন দাবী করতে পারব। বিষ্ণুও রাজি হল তাতে। এইবার বিষ্ণুর কাছে হিসাবটা একদিন দাবী করব ভাবছি। আগে ভবিষ্যংলোকটা সৃষ্টি করে ফেলি, সেই ভবিষ্যংলোকেই বিষ্ণুকে টেনে আনা যাবে একদিন।"

বিশ্বকর্মা এই পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যংলোকে কিন্তু আর একটি জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

"কি বল তো।"

"দেবসেনা এবং দৈত্যসেনা বলে আপনার দুটি মুখরা পত্নী জুটবে।"

"তাতো জানিই। আসলে ও দু'টি স্বৈরচর। ওরা নানারকম হবে। অপ্সরী

হয়ে দেবতাদের ভোলাবে, মাছ হয়ে সমুদ্রে নদীতে সাঁতরে বেড়াবে, খেঁকি কুকুর হয়ে পথে ঘাটে ঝগড়া করবে। শেষকালে কিছুদিনের জন্তে ওদের সখ হবে স্বয়ং ব্রহ্মার পত্নী হয়ে ব্রহ্মার উপর প্রভুত্ব করতে! তাই হবে।"

"তারপর ওদের পরিণতি কি হবে?"

"সে তো ঠিক করবে তুমি। চার্বাকের কাছে যে ইচ্ছেটি প্রকাশ করেছ তাতো সাংঘাতিক। তাই যদি তোমার প্রাণের বাসনা হয় তাহলে তাও পূর্ণ করতে আমি ইতস্তত করব না। তোমার বা তোমার চার্বাকদের ছুরির তলাতেই গলা বাড়িয়ে দেব।"

ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া দেবী বীণাপাণি বলিলেন—"আমি চার্বাকের কাছে কোনও ইচ্ছে তো প্রকাশ করি নি।"

"বাঃ, তাকে বল নি যে পিতামহকে হত্যা না করলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না?"

"বলেছি। বলা প্রয়োজন মনে করেছি বলে বলেছি। কিন্তু আপনি কি করে মনে করলেন যে ওটা আমারই প্রাণের ইচ্ছে? যান আপনার কোন ব্যাপারে আর আমি থাকব না।"

পিতামহের মুখমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বীণাপাণির কটিদেশ বেষ্টন করত পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন—"একটু রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় তাই একটু রাগিয়ে দিলুম। আমি কি তোমার মনের কথা জানি না? তোমারও কি আমাকে চিনতে বাকী আছে সখি? তোমার বীণার স্বরই যে আমি, আর আমার বীণারও স্বর যে তুমি। আমরা পরস্পরকে বাজাচ্ছি, চিরকাল বাজাব। ভাবী যুগের চার্বাকের ছবি কি রকম এঁকেছ একবার একটু দেখাও।"

বীণাপাণি হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"মাঝে মাঝে একটু রাগের ভান না করলে আপনাকে কাছে পাওয়া যায় না। ভাবী যুগের চার্বাকের ছবি আঁকবে ভাবী যুগের কবি। সেই কবির কাছেই নিয়ে যাব আপনাকে।"

"কোথায় আছেন তিনি—"

"ভবিষ্যৎ লোকে। সেখানে তিনি যে গল্পটা লিখবেন সেইটেই আপনি দেখে আসবেন মাঝে মাঝে গিয়ে।"

"বেশ।"

"তুমি যে ভবিষ্যৎ লোকের কথা ভেবেছ কত দূরে সেটা?"

"বেশী দূরে নয়।"

"অর্থাৎ স্বৈরচরদের তখনও প্রাধান্ত হয় নি ?"

"না, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে।"

"কি রকম ?"

"সে দেখবেন তখন।"

পিতামহ হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে বীণাপাণির মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দেহ হইতে একটা স্বচ্ছ সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই আলো দেখিতে দেখিতে বীণাপাণির সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পিতামহের অন্তরোৎসারিত প্রেম যেন সবুজ আলোর রূপ ধরিয়া বীণাপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছে। ক্রমশঃ দেবী বীণাপাণিও যেন সম্মোহিত হইয়া চিত্রার্পিতবৎ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর পিতামহ বলিলেন—"সরো, একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে ?"

"কি বলুন।"

"তোমার কি বিশ্বাস সত্যি আমি আছি ?"

"হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার মানে ?"

"চার্বাকদের যুক্তি-টুক্তি শুনে মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয় যে আমি বোধহয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হয় যে ওই চার্বাকদের বুদ্ধি যখন তুমিই জোগাচ্ছ, তখন তোমারও ধারণা বোধহয় যে আমি নেই। আমরা পরস্পরকে বোধহয় ঠকিয়ে চলেছি, আমরা কেউ বোধহয় নেই—কিন্তু মনে করছি যে আছি।"

বীণাপাণির মুখমণ্ডল এক অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"ওই মনে করাটাই যে থাকা। অস্তিত্বের আর কি প্রমাণ আছে বলুন—"

"তবে ওরা যে বলছে—"

"ওরা বলছে না, ওদের আমরা বলাচ্ছি, ওদের যুক্তির নিকষে আত্মপ্রকাশ করছি আমরা।"

পিতামহ পুনরায় আবেগভরে বীণাপাণিকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমাকে ঠকাবার জো নেই। একটু আগে ঠিক এই কথাই আমি নিজে বিষ্ণুকে বলছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে দেখে খুশী হলাম। যাক আমরা আছি তাহলে! আচ্ছা শ্রীমান চার্বাককে মড়ার কাছে হাজির করেছ কেন বল দেখি ? অমন বিরাট দেহ মড়া পেলেই বা কোথা থেকে তুমি।"

"আমি তো ওকে মড়ার কাছে নিয়ে যাই নি। ওর অবচেতন লোকের

কৌতূহলই ওকে মড়ার কাছে নিয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে মানুষই যখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তখন সৃষ্টিকর্তার কিছু খবর ওর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই আমি ওদের অবচেতন লোকে শবদেহ শুইয়ে দিয়েছি একটা। কালকূটের অবচেতন লোকেও ঠিক ওই একই ঘটনা ঘটেছে কি না, সে-ও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"অত বড় মড়া তুমি পেলে কোথায় ?"

বীণাপাণি হাসিয়া বলিলেন—"ওটি আমার প্রণয়ী দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ, আমার অনুরোধে মড়া সেজে শুয়ে আছে।"

"বল কি! প্রণয়ী জোটালে কবে আবার।"

বীণাপাণি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"রোজই জুটছে। অর্থাৎ আপনিই নানারূপে এসে জুটছেন আমার কাছে!"

"বাজে কথা। আমি দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হতে যাব কোন দুঃখে।"

বলিয়াই পিতামহ হাসিয়া ফেলিলেন এবং বীণাপাণির থুতনি ধরিয়া বলিলেন—"কত রঙ্গই যে জান! আচ্ছা কালকূটের ব্যাপারটা কি বল তো। ও হঠাৎ ক্ষেপল কেন ?"

"ও প্রমাণ করতে চায় যে বর্ণমালিনী কারো চেয়ে খাটো নয়, অন্তত মেঘমালতীর চেয়ে নয়।"

পিতামহ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"মেঘমালতী আবার কে ?"

"কিছুদিন আগে আপনিই তো মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে ওই অপ্সরীটিকে সৃষ্টি করেছেন!"

পিতামহ অধিকতর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"হাঁ, মনে পড়েছে বটে। কিন্তু সৃষ্টি করবামাত্রই তো ইন্দির তাকে শচী দেবীর সখি করে নিয়েছে, মানে গ্রাস করে বসে আছে; সে পাতালে গেল কি করে ?"

"আপনারই চক্রান্তে।"

"আমার ?"

"ভ্রমর সেজে আপনি যান নি তার কাছে ?"

পিতামহের মুখমণ্ডল পুনরায় হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি কি করে টের পেলে বল দিকি ?"

"কি মুশকিল, সেই ভ্রমরের কণ্ঠে যে গান ছিল তাতে আমিই তো সুর দিয়েছি। একটা কথা কিন্তু বুঝি নি মেঘমালতীকে পাতালে পাঠালেন কেন। আপনার মনের ভাবকে আমি সুরে গেঁথে তাকে জানালাম বটে যে ওগো

মেঘমালতী পাতালপুরীতে প্রবালশাখায় সোনার চাঁপা ফুটে আছে তোমারি অপেক্ষায়, তুমি যাও সেখানে, তাকে তুলে এনে তোমার কবরী অলঙ্কৃত কর— কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কেন তাকে পাতালে যেতে বলছেন।"

"কালকূটকে তাতাবার জন্যে।"

"তাতে লাভ ?"

"কাব্য জমবে। মেঘমালতী শুদ্ধ ভাষায় কিন্তু বেশ ধাতানি দিয়েছিল ছোঁড়াকে। মনে আছে তোমার কথাগুলো—"

"আছে বই কি। কথাগুলো যে আমারই তৈরী। মেঘমালতী বলেছিল—'আমি সেই শচীদেবীর সহচরী যিনি ইন্দ্রাণী, যিনি অনন্যা, আমি স্বর্গের অপ্সরী, আমি দেবভোগ্যা। তোমার স্পর্শ পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারব না। নাগকন্যা বর্ণমালিনীকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক। আপনার মনের ভাবকেই আমি ভাষা দিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারি নি কেন আপনার মনে এ ভাব জাগছে।"

"সত্যি পার নি ?"

"না।"

"আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধাক্কা মেরে বেড়াচ্ছি কোথাও সাড়া মেলে কি না। অধিকাংশই নিঃসাড়। কালকূট, চার্বাক দুজনেই কিন্তু সাড়া দিয়েছে, এইবার ওরা কি করে দেখা যাক। তুমি বলছ চার্বাক আর কালকূট দুজনের অবচেতনলোকেই কামনা-মায়ানদী আছে, শবদেহও আছে ?"

"আহা, নিজে যেন কিছু জানেন না !"

"তোমার মুখ থেকে শুনলে বেশ নতুন নতুন ঠেকে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ তো এখন মড়া সেজে শুয়ে আছে, তারপর ওরা যখন গিয়ে খোঁচা-খুঁচি শুরু করবে তখন ও কি করবে ?"

"দেখতেই পাবেন।"

"দানবটিকে পাকড়ালে কোথায় ?"

"আপনারই খেলা-ঘরে, আপনারই প্রেরণায় সৃষ্টি করেছি ওই স্বৈরচরকে। প্রথমে ছিল ও একটি মশা, আমার কানের কাছে এসে গুনগুন করত আর মনে মনে ভাবত—আহা আমি যদি দৈত্য হতাম একে বাহুপাশে বাঁধতে পারতাম। আপনারই মন্ত্রে দিলাম ওকে দৈত্য করে এবং নিজে হয়ে গেলাম মশা। ও তখন আমাকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, আর আমি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। এই সময়ে আপনি আমাকে স্মরণ করলেন চার্বাক আর কালকূটের জন্য। ওদের অবচেতনলোকে আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম শবদেহ।

তখন মশকরূপে ক্ষিপ্রজন্তের কানে কানে বললাম—তুমি ওদের অবচেতনলোকে গিয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাক, তাহলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

"ও বাবা, এত কাণ্ড করেছ তুমি, কিছু তো জানি না।"

পিতামহ বেশীক্ষণ কিন্তু ভান করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন —"আমিই যে মশা সেজে তোমার কানের কাছে গুনগুন করছিলাম তা তুমি টের পেয়েছিলে?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বীণাপাণি সহাস্যে উত্তর দিলেন—"না, তা কি আর পেয়েছিলাম!"

"নিজে পট করে মশা হয়ে গিয়ে কিন্তু ভারী মুশকিলে ফেলেছিলে আমাকে। তোমাকে এঁটে ওঠা শক্ত।"

সহসা এক সুমিষ্ট মাদকগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতামহ বলিলেন—"ডাক এসেছে। এবার যেতে হবে।"

"কার ডাক?"

"পারিজাতের। নন্দনকাননে কাল এক পারিজাত কুঁড়িকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে তুমি ফুটলেই আমি আসব। আমাকে খবর দিও। খবর এসে গেছে, দুজনেই যাই চল।"

"পারিজাতকুঞ্জে কখন গিয়েছিলেন?"

"গভীর রাত্রে, শিশিরের রূপ ধরে। তুমি তখন তারায় তারায় আলোর গান গাইছিলে। চল, যাই।"

"চলুন। চার্বাক আর কালকূট কিন্তু শবের কাছাকাছি এসে পড়েছে।"

"আসুক না, আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে। প্রজাপতির রূপ ধরে যাই চল।"

"চলুন।"

দুইটি রঙীন প্রজাপতি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

॥ ৬ ॥

চার্বাক এবং কালকূট উভয়েই বিরাট শবদেহটিকে নীরবে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা সরিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে কালকূট চার্বাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার মনে হচ্ছে এমনভাবে পরিক্রমা করলে কোনও লাভ হবে না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে

হবে। শবদেহের বহিরঙ্গে তো ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পাচ্ছেন কি?"

"না, আমিও পাচ্ছি না। আমার এ-ও মনে হচ্ছে যে শবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করেও যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলেও ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাব না। আমার কৌতূহল আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। ব্রহ্মা কোথাও যদি থাকেন জীবন্ত পরিবেশের মধ্যেই থাকবেন, মৃতদেহের মধ্যে তাঁকে সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যা মৃত তার মধ্যে কেবল মৃত্যুই থাকা সম্ভব, জীবনের সন্ধান তার মধ্যে মিলবে কি?"

"মৃত্যুর মধ্যেই কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা একদিন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞরূপ মৃত্যু যখন তাঁদের কবলিত করেছিল, তখন সেই মৃত্যুর মধ্যেই তাঁরা বাঁচবার মন্ত্রলাভ করেছিলেন। সুতরাং এ মৃতদেহ মৃত বলেই তাকে তুচ্ছ করতে পারি না। হয়তো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এর মধ্যেই আত্ম-গোপন করে আছেন। এ শবদেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করেই দেখতে হবে।"

"বেশ দেখুন। কিন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করবেন কি করে? আপনার কাছে কি কোনও অস্ত্র আছে?"

"আছে।"

কালকূট কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন।

চার্বাক বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি কার প্ররোচনায় এই শবদেহ লক্ষ্য করে এসেছেন? আমি তো এসেছিলাম আমার কৌতূহলের নির্দেশে। আপনি?"

"আমার নির্দেশ আমার অন্তরের মধ্যেই ছিল। বাল্যকালে আমি একবার সর্পদেহ ধারণ করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করছিলাম। সেই সময় একদিন এক চণ্ডাল আমার পিঠে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে দংশন করি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। চণ্ডালের যে মৃত্যু হবে তা আমি প্রত্যাশা করি নি। সুতরাং আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। অভিভূত হয়ে পাশের এক ঝোপে বসে লক্ষ্য করতে লাগলাম চণ্ডালের গতি কি হয়। কিছুক্ষণ পরে চণ্ডাল-পত্নী হাহাকার করতে করতে এসে হাজির হল, চণ্ডালের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরাও এল। চণ্ডালকে তুলে নিয়ে-গেল তারা। আমিও কৌতূহলবশত তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা চণ্ডালকে নিয়ে গিয়ে এক নদীতে নিক্ষেপ করলে। শুনলাম, সর্পাহত ব্যক্তিকে না কি দগ্ধ করতে নেই। সে না কি সম্পূর্ণ মরে না, হয়তো আবার বেঁচেও উঠতে পারে এই জন্য তাকে দগ্ধ করা নিয়ম নয়। চণ্ডালকে নদীতে নিক্ষেপ করে সবাই চলে গেল—আমি কিন্তু যেতে পারলাম না, নদীতীরের এক ঝোপের

মধ্যে বসে আমি সেই ভাসমান শবের দিকে চেয়ে রইলাম। গ্রন্থকার যেভাবে তার প্রথম গ্রন্থের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে আমিও তেমনি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইলাম আমার প্রথম কীর্তির দিকে। নদীতীরেই যে শ্মশান ছিল তা আমি জানতাম না। কিছুক্ষণ পরেই লেলিহান অগ্নিশিখায় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জলন্ত চিতা পূর্বে আর কখনও দেখি নি। ভীত হয়ে আরও দূরে সরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে চিতার আগুন নিবে গেল। শ্মশান কিন্তু অন্ধকার হল না। দেখলাম মশাল হস্তে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি চতুর্দিকে কি যেন অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। তার প্রদীপ্ত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কপালে সিন্দূর তিলক, এক হস্তে মশাল, আর এক হস্তে ত্রিশূল। আমি আরও ভীত হয়ে আরও দূরে সরে গেলাম। আমার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হল না। একটি বৃক্ষে আরোহণ করে আমি সেই মশালধারী ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই যা দেখলাম তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি নদী থেকে সেই চণ্ডালের শবকে টেনে তুলছে, টেনে তুলে কাঁধে করে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাট একটি বটবৃক্ষ ছিল, সবিস্ময়ে দেখলাম কাপালিক শবদেহকে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের তলদেশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আর থাকতে পারলাম না, গাছ থেকে নেমে পড়লাম। বটবৃক্ষের সমীপস্থ হয়ে যা দেখলাম তা আরও অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই ভীমদর্শন কাপালিক চণ্ডাল-শবের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। শবের মাথার দিকে মশাল জলছে, আর পায়ের দিকে পোঁতা আছে সেই ত্রিশূলটা। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বটবৃক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাখাপল্লবকে প্রকম্পিত করে মধ্যে মধ্যে একটা কর্কশকণ্ঠ পেচক চীৎকার করছে শুধু। আর কোনও শব্দ নেই। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বটবৃক্ষের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, সহসা কলহাস্যে সচকিত হয়ে দেখলাম চণ্ডালের শবদেহ থেকে অসংখ্য রূপসী নির্গত হচ্ছে, পচা মাংসপিণ্ড থেকে যেমন কীট নির্গত হয়, তেমনি সেই শবদেহ থেকে রূপসী নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে রূপসীর হাট বসে গেল সেই কাপালিককে ঘিরে। তারা কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে, কেউ নৃত্য করছে, কেউ নানা দেহভঙ্গী করে কাপালিকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। সে রকম রূপসী আমি জীবনে কখনও দেখি নি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-শিখা যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। আমি স্বচক্ষে দেখলাম তারা সেই শবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বহির্গত হচ্ছে আবার সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হল ওই শবদেহ

যেন অনন্ত রূপের আকর, অনন্ত সম্ভাবনার লীলাক্ষেত্র। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সেই রূপসীরা যখন কাপালিকের তপোভঙ্গ করতে পারলে না, তখন মরীচিকাবৎ তারা অন্তর্ধান করলে সহসা। যে অন্ধকার তাদের কলহাস্যে ছন্দিত হচ্ছিল সে অন্ধকার হঠাৎ আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকও নিঃশব্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। আমিও অভিভূত হয়ে বসে রইলাম। আমার মনে হতে লাগল যে আমার বিষই হয়তো ওই চণ্ডালকে অনন্ত সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।···

সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকটা চীৎকার করে উঠল আবার। তারপর দেখতে পেলাম একটা রক্তাভ আলোয় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, আর সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই শবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে। তার নির্নিমেষ চক্ষু দুটি যেন জলন্ত অঙ্গার-খণ্ডের মতো জলছে। ক্রমশঃ দেখলাম তার দেহ থেকে দেহহীন মুণ্ড, মুণ্ডহীন কবন্ধ, বিকটদশনা প্রেতিনী, সিংহবদন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একচক্ষু পিশাচ, বহুবাহু দানব প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাণী সকল নির্গত হতে লাগল। তাদের অট্টহাস্যে, অসংযত নৃত্যে, উদ্দাম কলরবে অন্ধকার শিউরে উঠতে লাগল বারম্বার। কর্কশকণ্ঠ পেচকটা উন্মাদের মতো চীৎকার করতে লাগল তাদের ছন্দ-তাল-হীন অনৈক্য তানের সঙ্গে সঙ্গে। কাপালিক কিন্তু নির্বিকার। ধীর স্থির ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন তিনি। মনে হল তিনি যেন অন্ধ এবং বধির, কিম্বা যেন একটা শবাসীন শব। এই ভীষণ দৃশ্যও অবলুপ্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণ পরে। আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, পেচকটা নীরব হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে। নূতন ঘটনা ঘটল আবার একটু পরে। প্রচণ্ড একটা গর্জন হল, আবার রক্তাভ আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অন্ধকার। দেখলাম বিরাট একটা সিংহ কাপালিকের দিকে চেয়ে আছে! ক্রমশঃ সেই সিংহের চতুর্দিকে জুটল—ব্যাঘ্র, বক, শিবা, সারমেয়, তরক্ষুর দল। সবাই চীৎকার করতে লাগল। সেই চণ্ডালের শবদেহ থেকে আরও যে কত প্রাণী বার হতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ কীট, ভীষণ-দর্শন পতঙ্গ, রোমশ গুটিপোকা, আরও কত কি। কীট-পতঙ্গের দল কাপালিকের সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে বেড়াতে লাগল, আর শ্বাপদকুল চীৎকার করতে লাগল তাঁর চতুর্দিকে। কাপালিক কিন্তু বিচলিত হলেন না একটুও। নিস্পন্দ নীরব হয়ে বসে রইলেন। আবার সব মিলিয়ে গেল, আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আমি আচ্ছন্নের মতো সেই বটবৃক্ষের একটি কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলাম। মনে হল কে যেন আমার কানে কানে বলতে লগল—এইবার তুমি

ওই কাপালিকের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধর, ওকে বিচলিত কর, তা না হলে হার

খুলে দিতে হবে ওকে, যে দ্বার আমি প্রাণপণে বন্ধ করে রেখেছি, যে দ্বার আমি কিছুতে খুলব না, সেই দ্বারে ও করাঘাত করছে, ওকে অন্যমনস্ক করতে না পারলে দ্বার খুলে দিতেই হবে। তুমি ওকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা কর, ওকে বেষ্টন কর, ওর মুখের কাছে ফণা বিস্তার করে তর্জন কর। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি। উত্তর পেলাম—আমি প্রকৃতি। মানুষ আমার রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ করে দিতে চায়। সহজে আমি সেখানে ঢুকতে দিই না কাউকে। কিন্তু একাগ্রচিত্তে কেউ যদি ক্রমাগত আমার দ্বারে আঘাত করে তাহলে আমাকে দ্বার খুলতেই হয়, নিরুপায় হয়ে খুলতে হয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের অন্যমনস্ক করে দেওয়া। এই লোকটা যে মুহূর্তে ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানে এসে চণ্ডালের শবদেহের উপর সমাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছে, সেই মুহূর্তেই ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সেই মুহূর্ত থেকে ওর করাঘাতে আমার রুদ্ধদ্বার ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হচ্ছে। তোমারই কীর্তি ওই শবদেহ। ওই শবদেহ না পেলে এ শক্তির পরিচয় ও দিতে পারত না, তুমিই আমাকে এই বিপদে ফেলেছ, তুমিই এখন আমাকে উদ্ধার কর। আমি বললাম—বলেন তো ওকেও গিয়ে দংশন করি। দংশন করবামাত্র ওর মৃত্যু হবে, আপনিও নিরাপদ হবেন। প্রকৃতি আকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—না, না, ওর মৃত্যু আমি চাই না, ওকে অন্যমনস্ক করতে চাই। ওকে এরকম হীনভাবে হত্যা করে ফেলা আমার লক্ষ্য নয়, আমি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাই ওর দৌড়টা কতদূর, তুমি ওকে দংশন কোরো না, কেবল ভয় দেখাও। গভীর অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি কে, কোথায় আছেন, তাঁর আকৃতি কি রকম—কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে তিনি যদিও ওই কাপালিককে বিচলিত করবার বহুবিধ আয়োজন করছেন কিন্তু মনে মনে যেন উনি কাপালিককে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কাপালিক ওঁর রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ করুক এতে যেন ওঁর আপত্তি নেই, উনি যেন কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কাপালিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কিনা এবং কতক্ষণে হবেন। আমি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে কাপালিকের দেহে সঞ্চরণ করে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। মনে হল যেন প্রস্তরের উপর সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু একটু তফাত ছিল। প্রস্তর সাধারণত শীতল থাকে, কিন্তু কাপালিকের প্রস্তরবৎ দেহ ছিল উত্তপ্ত। আমি খানিকক্ষণ তাঁকে বেষ্টন করে বার কয়েক তর্জন করলাম। কিন্তু কোনই ফল হল না। কাপালিক নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন। আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে

পারলাম না, কাপালিকের উত্তপ্ত দেহ ক্রমশঃ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে আমাকে নেমে পড়তে হল! তারপর আবার ঘনিয়ে এল নিবিড় অন্ধকার। আমি আবার ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলাম আমার কোটরের মধ্যে। কতক্ষণ যে বসেছিলাম তা জানি না, হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে সচকিত হয়ে দেখলাম যে সেই শবের মুণ্ডটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার মস্তকের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যেন আলোর ফোয়ারা উঠছে। তারপর সবিস্ময়ে দেখলাম সে যেন হাসছে, তার চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো যেন নড়ছে। মনে হল কাপালিককে সম্বোধন করে কি যেন বলছে সে। কি বলছে তা শুনতে পেলাম না, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলাম এক বিরাট পেচকে আরোহণ করে এক অপরূপ রূপসী আবির্ভূত হলেন। তিনি কাপালিককে সম্বোধন করে যা বললেন তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। তিনি বললেন—তপস্বী, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এইবার বর গ্রহণ কর, কঠোর তপস্যা থেকে নিরত হও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন এখনই তোমার কাছে এসে স্তূপীকৃত হবে, তোমার তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ তুমি সেগুলি গ্রহণ কর। আর তপস্যা কোরো না। আমি লক্ষ্মী, আমি তোমাকে বরদান করছি, আর তোমার তপস্যা করবার প্রয়োজন নেই। এই বলে লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। শবমুণ্ডের জ্যোতিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক রকমের অদ্ভুত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সেই আলোকে দেখলাম কাপালিকের চতুর্দিক মণি-মাণিক্য হীরা-মুক্তা স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি রূপসী। তারাও যেন প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন। তারা প্রত্যেকেই কাপালিককে অনুনয় করতে লাগল, হে তপস্বি, এবার তুমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও, আমাদের গ্রহণ কর। কাপালিক কিন্তু নির্বিকার, অচঞ্চল। মনে হল এসব কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করছে না। অনেকক্ষণ অনুনয়-বিনয় করে, রূপসীরা যখন দেখলেন যে কোন ফল হচ্চে না, তখন তাঁরা একে একে অন্তর্দ্ধান করলেন ওই শবদেহের মধ্যে। ওই সব মণি-মুক্তা হীরা-মাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপও বিলীন হয়ে গেল ওই শবদেহেই। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই দিন থেকেই আমি জানি যে শব মৃত নয়, তা অনন্ত সম্ভাবনার আকর!"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"আপনার কাহিনী খুবই মনোজ্ঞ। শব এবং কাপালিকের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি হল?"

"শেষ পর্যন্ত কি হল, তা আমি দেখতে পারি নি। কারণ একটু পরেই দেখলাম গরুড়ে চড়ে স্বয়ং বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। গরুড় আমাদের চিরশত্রু,

তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে স্থান ত্যাগ করতে হল আমাকে। কিন্তু সেই দিনই আমি বুঝেছিলাম যে মৃতদেহ অনন্ত সম্ভাবনাময়। এই শবটি খুবই অসাধারণ মনে হচ্ছে, আসুন আমরা দেখি এর মধ্যে কি আছে। আমি যদি কাপালিকের মতো তপস্বী হতাম তাহলে শবারূঢ় হয়ে তপস্যা করতাম এবং খুব সম্ভবত আমার তপস্যা প্রভাবে পিতামহকে টেনেও আনতে পারতাম। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই, আমি বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমি শবকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেখতে চাই পিতামহের কোনও সন্ধান এতে পাওয়া যায় কিনা।"

চার্বাক কিছুক্ষণ স্মিতমুখে কালকূটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যদি অনুমতি দেন সেটি ব্যক্ত করি।"

"অবশ্য ব্যক্ত করুন। এর জন্য অনুমতির প্রয়োজন কি।"

"প্রয়োজন এই জন্য যে প্রশ্নটি হয়তো আপনার কোনও গোপন অহঙ্কার বা বেদনাকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। আমিও বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমিও একটা বিশেষ কারণে পিতামহ ব্রহ্মার সন্ধানে বেরিয়েছি এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার হচ্ছে যে উক্ত কারণটি আমার কাছেই স্পষ্ট ছিল না এতক্ষণ, এখনই একটু আগে স্পষ্ট হয়েছে তা। সেই জন্যে মনে হচ্চে যে আপনিও হয়তো অনুরূপ কোনও কারণবশত এই দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—।"

"আপনার কি মনে হয়েছে বলুন।"

"আচ্ছা, আপনার এই অভিযান কি কোনও নারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ?"

কালকূটের মুখমণ্ডলে বিস্ময় পরিস্ফুট হইল।

"এ কথা আপনার কেন মনে হচ্চে বলুন তো।"

"মনে হচ্চে, কারণ আমি নিজে একটি নারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি।"

"তাই না কি! যদি আপত্তি না থাকে আপনার কাহিনীটি আর একটু বিশদ করুন।"

"আসুন, তাহলে উপবেশন করা যাক।"

বিরাটকায় ক্ষিপ্রজন্তুর শবদেহের পার্শ্বে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। চার্বাক বলিল—"সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্তকীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমি কিছুকাল থেকে তার হৃদয় জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। হৃদয় জয় কথাটি কবিদের অনুকরণে আমি ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা 'হৃদয়-জয়' না বলে

'হৃদয়-ক্রয়' বা 'হৃদয়-অর্জন' বললে ব্যাপারটি আরও সত্যভাবে ব্যক্ত হয়। কারণ উপযুক্ত মূল্য না দিলে কোন পুরুষ বা রমণীর হৃদয় অধিকার করা যায় না। সাধারণত অর্থমূল্যেই নর বা নারীর হৃদয় বিক্রীত বা বিজিত হয়ে থাকে, কিন্তু সুরঙ্গমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম; সুরঙ্গমা রাজ-নর্তকী, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা রক্ষিতা, অর্থের তার কোনও অভাব নেই। কুমার সুন্দরানন্দ তাকে বসনে-ভূষণে মণি-মাণিক্যে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছেন যে ও সবে তার আর রুচি নেই। রুচি থাকলেও কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি পারতাম না। সুতরাং আমি যে মূল্য দিয়ে তার হৃদয় ক্রয় করবার প্রয়াস পেতে লাগলাম তা যদিও উজ্জ্বল বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের চেয়ে অধিকতর মহার্ঘ, কিন্তু তা বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের মতো স্থূল বস্তু নয়, তা সূক্ষ্ম চিন্তার বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধির প্রাখর্যে দ্যুতিমান। অর্থাৎ আমি আবেদন জানিয়েছিলাম তার বুদ্ধির কাছে। তাকে বলেছিলাম—'সুন্দরানন্দ ভালবাসছে তোমার দেহটাকে তোমাকে নয়, তোমার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সে উদাসীন, তাই তোমাকে সে যে সব উপহার দিয়েছে তা দেহ-সজ্জারই উপকরণ, তোমার প্রদীপ্ত বুদ্ধিকে প্রদীপ্ততর করতে পারে এমন কিছুই সে দেয় নি। আমি তোমাকে তাই দিতে চাই। তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবন সম্বন্ধে আমি কম সচেতন নই, কিন্তু তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনই যে তুমি নও তা-ও আমি জানি। আমি এ-ও জানি যে তোমার যৌবন চিরস্থায়ী নয়, ওর গতি অধোমুখী, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে যদি সম্যক উপায়ে তাকে লালন কর। তোমার যৌবন যখন থাকবে না তখন তোমার ওই উজ্জ্বল বুদ্ধিই শ্রীমণ্ডিত করবে তোমার দেহকে নবরূপে, তখন যে আভরণে সে মহিমান্বিত হবে তা কোনও স্বর্ণকারের বিপণিজাত অলঙ্কার নয়, কোনও সুন্দরানন্দের মূল্যের অপেক্ষায় তা পরহস্তগত হয়ে থাকবে না, তা তোমার অন্তরোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রভা, তা কোনও দিন মলিন হবে না। আমি তোমার সেই অন্তরতম সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, তারই কাছে আনতে চাই আমার অর্ঘ্যভার। আমি চাই আমার দর্শনে তুমি যেমন অপরূপ হয়েছ, তোমার দর্শনেও আমি যেন তোমার কাছে তেমনি অপরূপ হয়ে উঠি। শুধু আমি কেন, তোমার মানবী প্রকৃতি প্রত্যেক সমর্থ মানবকেই নূতন মহিমায় প্রত্যক্ষ করুক, নির্বাচন করুক, আহ্বান করুক। সুন্দরানন্দের কারাগারে তুমি বন্দিনী হয়ে থাকবে কেন?' আমার এই বক্তৃতায় সুরঙ্গমার নয়নে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরিত হল। গ্রীবাভঙ্গী করে সে বললে—'মহর্ষি চার্বাক, প্রথমেই আপনার একটা ভ্রম অপনোদন করে দিতে চাই। সুন্দরানন্দের ঐশ্বর্য দেখে

আমি মুগ্ধ হইনি, আমি মুগ্ধ হয়েছি তার শৌর্যে। ভল্লের এক আঘাতে তাকে বিশাল ব্যাঘ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি, তার সুনিক্ষিপ্ত খড়্গে ভীষণ খড়্গীকে নিপতিত হতে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তার উদারতা, নারীর প্রতি তার সৌজন্য। সে শক্তিমান সভ্য পুরুষ, ধনবান পশুমাত্র নয়।' তার এ কথা শুনে তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম—'আমার ভ্রম অপনোদিত হল। শুধু তাই নয় আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে কুমার সুন্দরানন্দের যে শক্তি তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা কেবলমাত্র দৈহিক শক্তি নয়, তা মানসিক উৎকর্ষ। কিন্তু সুন্দরানন্দ কি তোমার মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন? তোমার লীলায়িত নৃত্যছন্দের নেপথ্যে যে শিল্পী নব নব সৃষ্টি-স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হচ্ছে তাকে কি সুন্দরানন্দ পূজা করে? না, সে তোমার দেহটা নিয়েই বিভোর কেবল? হয়তো সে শিল্পী-সুরঙ্গমাব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সুরঙ্গমার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তা কি সে জানে? সে সব সম্ভাবনাকে মূর্ত করবার চেষ্টা করেছে সে কি কখনও? সে নর্তকী সুরঙ্গমার দেহ-ছন্দকে উপভোগ করতেই অভ্যস্ত, তার মধ্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিককে দেখতে সে কি প্রস্তুত আছে? আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, প্রথমে অবশ্য তোমার দেহ দেখেই। কিন্তু আমি তোমার সমগ্রতাকেও সম্পূর্ণভাবে দেখতে চাই, জাগিয়ে দিতে চাই সেই সুরঙ্গমাকে যাকে কেউ কখনও দেখে নি।' আমাব কথা শুনে সুরঙ্গমা বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে লীলাভরে হেসে বললে—'আমি কিন্তু জাগতে চাই না মহর্ষি কুমার সুন্দরানন্দের নিকট যখন আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম তখন আমাকে তার কুলদেবতা চতুরাননের সম্মুখে শপথ করতে হয়েছিল যে সুন্দরানন্দ ছাড়া আর কোনও পুরুষের দিকে আমি চাইব না। সে শপথ যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আর জেগে লাভ কি বলুন।' সুরঙ্গমার মুখে যদিও এই ভাষা ফুটল কিন্তু তার অপাঙ্গদৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটল তা অন্যরকম। আমি বললাম—'দেখ সুরঙ্গমা, সুন্দরানন্দের পূর্বপুরুষরা প্রস্তরনির্মিত চতুরানন মূর্তির মধ্যে নিজেদের অন্ধ কুসংস্কারকেই মূর্ত করে রেখে গেছেন। তার সম্মুখে যদি কোনও শপথ করেই থাক—তাহলে সে শপথ রক্ষা করবার যে বিশেষ একটা যুক্তিযুক্ত দায়িত্ব আছে তোমার তা আমি মনে করি না। প্রস্তরনির্মিত চতুরাননের সম্মুখে শপথ করার কি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে? তবে শপথটাকেই যদি তুমি মূল্যবান মনে করে তার মর্যাদা দিতে চাও সে স্বতন্ত্র কথা। চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়াননের সঙ্গে শপথকে জড়িত করছ কেন। তোমার শপথ তোমারই শপথ, তা রক্ষা করা না করা তোমারই ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন মানুষ একথা তো কোন সময়েই ভুলে যাওয়া উচিত নয় সুরঙ্গমা।'

সুরঙ্গমা বললে—'আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, আমি কিন্তু করি। আমি বিশ্বাস করি তিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সম্মুখে যে শপথ আমি করেছি তা ভঙ্গ করলে অপরাধ হবে আমার এবং সে অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তিভোগও করতে হবে, ইহজন্মে বা পরজন্মে।' আমি বললাম—'তুমি যদি সাধারণ কোনও নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে তা মনে হচ্ছে নারীসুলভ ছলনা-মাত্র। চতুরানন-বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই; কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যিসত্যি বিশ্বাস কর এই ধারণাটা। সুতরাং ও ধারণাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।' সুরঙ্গমা সুমধুর হেসে বললে—'আমি কিন্তু সত্যিই চতুরাননের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আপনি কি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে চতুরানন নেই?' আমাকে তখন বলতে হল, 'নিশ্চয় পারি। কিন্তু সে প্রমাণ যদি তুমি সংগ্রহ করতে চাও তাহলে আমার কুটিরে তোমাকে আসতে হবে। তা কি তুমি পারবে? সুন্দরানন্দের বিলাসকক্ষের বাইরে যাবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? যদি থাকে এস, আমি তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করব।' তারপর থেকে সুরঙ্গমা প্রায়ই আমার কাছে আসত, তার সঙ্গে অনেক শাস্ত্র অনেক বিজ্ঞান আলোচনা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমি বিশ্বাস করাতে পারিনি যে চতুরানন নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের সঙ্গে মৃগয়া-অভিযানে চলে গেল মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রবেশ করলাম চিন্তার অরণ্যে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে ব্রহ্মার অনস্তিত্ব আমি প্রমাণ করবই। তারপর থেকে কিন্তু যা যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব।'

কালকূট বলিলেন—"সুরঙ্গমা আপনার কুটীরে বারম্বার আসত তবু আপনি তার হৃদয় হরণ করতে পারলেন না?"

"হৃত বস্তুকে বেশী দিন আয়ত্ত অধিকার করে রাখা শক্ত। অর্জিত বস্তুকেই স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যায়। আমি সুরঙ্গমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করিনি, আমি তা অর্জন করতে চেয়েছিলাম। তাই আমি মনের দিকেই বেশী মন দিয়েছিলাম দেহের দিকে নয়। আমি জানতাম তার মনকে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রভাবিত করতে পারি তাহলে তার দেহ আপনিই এসে ধরা দেবে আমার কাছে। তাই আমি তাকে সৃষ্টি তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। ফুল ফল পক্ষী পতঙ্গদের জীবন লীলার সত্য রূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলাম। তাকে এ-ও

বোঝাতে চেয়েছিলাম যে প্রকৃতির এই সত্য রূপকে আচ্ছন্ন করে কতকগুলি ধূর্ত লোক রহস্যের ধূম্র সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই ধূম্রের নাম শাস্ত্র, অন্ধ লোকাচার। জীবনের আলোকে মরণের কুহেলী দিয়ে আচ্ছন্ন করে অদ্ভুত সব প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে তারা। সুরঙ্গমাকে এই প্রহেলিকা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলাম আমি, এমন সময় হঠাৎ সুরঙ্গমা একদিন এসে বললে—'কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমাকে মধ্যপ্রদেশে মৃগয়ায় যেতে হবে। কুমারকে আমি বলেছিলাম যে, আমি মহর্ষি চার্বাকের কাছে এখন বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছি। মৃগয়ায় গেলে সে পাঠ বিঘ্নিত হবে।' কুমার বললেন—'মহর্ষি চার্বাক পালাবেন না, কিন্তু যে কস্তুরী মৃগদলের সন্ধান পেয়েছি তারা হয়তো পালিয়ে যাবে। আর সদ্য ধৃত বন্য কস্তুরী মৃগ যদি তোমাকে অবিলম্বে উপহার দিতে না পারি তাহলে এই মৃগয়া অভিযানের সার্থকতাই বা কি। এখন আপনিই বলুন আমার কি করা উচিত, আমি যাব, না থাকব ?' আমি উত্তর দিলাম—'ভদ্রে, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।' সুরঙ্গমা চলে গেল। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমার মনে হল চতুরাননের কাছে ও যে শপথ করেছিল সেই শপথই ওকে টেনে নিয়ে গেল। আমি ওর বিশ্বাস টলাতে পারিনি। আমার সববিধ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল আমি সত্যিই তো ওকে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারিনি। আমি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি সে সব যুক্তি সম্ভবত খণ্ডন করেছেন সুন্দরানন্দের কুলপুরোহিত আচার্য পর্বত-শিখর। আচার্য পর্বত-শিখর ঘোর আস্তিক, তিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন, তাঁর ধারণা আমাদের অবিশ্বাসের মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার মূলে যে বিশ্বাস-প্রবণতা তা তিনি মানতে চান না। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমি পর্বত-শিখরের আশ্রমে গেলাম একদিন। ভাবলাম তাঁকে যদি আমি প্রভাবিত করতে পারি তাহলে সুরঙ্গমাও একদিন না একদিন প্রভাবিত হবেই। কিন্তু গিয়ে দেখলাম পর্বত-শিখরে আরোহণ করা কঠিন। আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্যক্ত আত্মা, অব্যক্ত আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য কিন্তু দুরারোহ প্রস্তর নিচয় তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে তাঁর যুক্তির নাগাল পাওয়া শক্ত। সেখানে গিয়ে কিন্তু আর একজনের নাগাল পেলাম, তাঁর কন্যা ধারামতীর। আমি নাগাল পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিনি, আমাদের আলোচনা শুনে সে-ই আকৃষ্ট হল আমার প্রতি। জ্যোৎস্নাকুল গভীর নিশীথে একদা আমি কিছু মাধবী সুরা এবং বন্য কুক্কুটের মাংস সহযোগে যখন উপলব্ধি করছিলাম যে আনন্দময় জীবনযাপন করার চেয়ে মহত্তর আর কি থাকতে পারে, থাকলেও তার

সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধন করবার প্রয়োজনই বা কি তখন সহসা বল্কলবাসা ধারামতী আমার আশ্রমে এসে প্রবেশ করল। দেখলাম তার দুর্বার যৌবন বল্কলবাসের বাঁধন মানতে চাইছে না। যে শক্তি নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে নিখিল বিশ্বে সতত উন্মুখ তারই প্রকাশ তার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিতে দীপ্যমান। আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসি হেসে সে বললে—"ভগবন, আশা করি আমার আগমনে আপনার আনন্দ বিঘ্নিত হল না। কৌতূহল আমাকে এখানে টেনে এনেছে। পিতার সহিত আপনি এ কয়দিন যে সকল আলোচনা করেছেন তার সারবত্তা হয়তো তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যুগে সকলেই যখন অলীক কল্প-লোকের স্বপ্নে আকুল তখন আপনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের ভূমিতে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যে সত্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি।" আমি শুনেছিলাম ধারামতী শবরী কন্যা। শবরী ভল্লুকীর গর্ভে ওর জন্ম। ভল্লুকী ছিল পর্বত-শিখরের পরিচারিকা। পর্বত-শিখরের আশ্রমেই ধারামতীর জন্ম হয়। ধারামতীর পিতা কে তা আমি ঠিক জানি না, অনেকে বলেন পর্বত-শিখরই ওর জন্মদাতা; ওঁর প্রবল আস্তিক্যবুদ্ধি এবং নীতি-বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও ওঁর একবার না কি পদস্খলন হয়েছিল। সে যাই হোক ধারামতীকে যে উনি কন্যা স্নেহে লালন করেছিলেন তাতে কোনও সংশয় নেই, ওঁর বিদ্যা বুদ্ধি এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ওঁকে শিক্ষাও দিয়েছিলেন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, সুতরাং ধারামতীর কথা শুনে প্রথমে আমি বিস্মিত হলাম। সন্দেহ হল হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে। বললাম—"ভদ্রে, তুমি আসাতে আমার আনন্দ বিঘ্নিত হয়নি, কিন্তু তুমি আসাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তুমি যে পরিবেশে লালিত হয়েছ তোমার আচরণ ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না। তবু যখন এসেছ, বস।"

আমার কথা শুনে ধারামতী আমার পার্শ্বে উপবেশন করে হেসে বললে—"পর্বত স্থাণু হতে পারেন কিন্তু তার থেকে যে ধারা নির্গত হয় তা চঞ্চলা। সুতরাং পর্বতের স্বভাব দেখে ধারার বিচার করবেন না।" উপমাটি শুনে আমি খুব খুশী হলাম। বললাম—"তাহলে আপত্তি যদি না থাকে এই কুক্কুট মাংস এবং মাধ্বী সুরার অংশ গ্রহণ কর। সেদিন সেই গভীর নিশীথে ধারামতীর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব।"

কালকূট ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যদি সম্ভব হয় আপনার কাহিনীটি একটু সংক্ষিপ্ত করুন। শেষ পর্যন্ত কি হল বলুন।"

"শেষ পর্যন্ত যা চিরকাল হয়ে থাকে, যা হওয়া উচিত, তাই হল। ধারামতীর

যৌবন ধারায় আমি অবগাহন করতে লাগলাম। কিন্তু স্বরঙ্গমাকে ভুলতে পারলাম না আমি কিছুতে। স্বরঙ্গমার অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আমার যুক্তি যে অবশেষে পরাজিত হয়েছে এই অপমানের ক্ষতটা প্রতিদিন যেন আমার হৃদয়ে গভীরতর হতে লাগল। আমার এ-ও মনে হতে লাগল যে ওর ওই অন্ধ বিশ্বাসটা হয়তো ভান, আমার যুক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার ছল মাত্র। আমার মনের এক অদ্ভুত অবস্থা হল। যুক্তির অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, কারণ ওরই ওপর আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, যে নারী সেই ব্যক্তিত্বকে বিচলিত করতে চায় তার সঙ্গ কাম্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি স্বরঙ্গমাকেই কামনা করতে লাগলাম। ধারামতী আমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই আমাকে ভজনা করেছিল। প্রথম প্রথম আমিও তার অর্চনায় তুষ্ট হয়েছিলাম কিছুদিন, প্রতিরাত্রে সে যখন অভিসারে আসত আমি চন্দন-লিপ্ত দেহে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে সুরা মাংসের প্রাচুর্য নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম আমি মনে মনে স্বরঙ্গমারই প্রতীক্ষা করছি, ধারামতীর সঙ্গে সম্পর্কটা নিতান্তই দৈহিক হয়ে উঠছে ক্রমশ।"

কালকূট অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবিস্ময়ে ভাবিতেছিলেন তিনিও বর্ণমালিনীর সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিতেছেন। বর্ণমালিনী যে নারী-শ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মার অনুসন্ধান করিতেছেন, কারণ তাঁহার আশা আছে যে স্তবে তুষ্ট হইয়া চতুরানন হয়তো তাহাকে মেঘমালতীরই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ করিবেন। হয়তো তিনি মেঘমালতীর মনোভাবই পরিবর্তন করিয়া দিবেন। এই দুরাশার বশবর্তী হইয়াই কি তিনি এই বিশাল শবদেহের সমীপবর্তী হন নাই? তিনি চার্বাকের একটি কথাও শুনিতেছিলেন না। সহসা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, চার্বাক বলিতেছে—"হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটল একটা। সম্ভবত পর্বত-শিখরের নির্দেশ মতোই স্বন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্ভ্রক আমাকে খবর পাঠালেন যে ধারামতীর সঙ্গে আমার ধারাবাহিক নৈশ ঘনিষ্ঠতার সংবাদ কারও অগোচর নেই। আমি যদি অবিলম্বে ধারামতীকে পত্নীত্বে বরণ করি তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হয়। না করলে ন্যায়ত আমাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আমি জিম্ভ্রককে গিয়ে বললাম যে ধারামতীর ইচ্ছানুসারেই তাকে আমি সম্ভোগ করেছি। সে যদি আপত্তি না করে তাহলে তাকে বিবাহও করব। ধারামতীকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। অর্থাৎ তাকে বললাম যে এখনও মনে মনে আমি স্বরঙ্গমাকে আকাঙ্ক্ষা করছি, তাকে মানসলোক থেকে চ্যুত করবার বাসনা আমার নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ঘটেছে তা-ও কম

আনন্দজনক নয়, জিম্ভ্রক বলছেন তোমাকে বিবাহ করে সে আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে। মানে, তিনি ভাবছেন যে বিবাহ হলে ইহজন্মে তো বটেই পরজন্মে এবং পরবর্তী বহু জন্মেও তুমি আমার একাধিপত্য সহ্য করবে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। পতিকে ত্যাগ করে বহু বরনারী ইহজন্মেই পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পরজন্ম আছে কি নেই তা-তো অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। কিন্তু একমত না হলেও তোমাকে বিবাহ করতে আমি অনিচ্ছুক নই। আমার হৃদয় তোমার কাছে উদ্ঘাটিত করছি, সমস্ত জেনে শুনে তুমি যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও, কর।" ধারামতী কিছুক্ষণ অধোবদনে বসে রইল, তারপর বলল—"মহর্ষি আমি আপনার হৃদয়েশ্বরী হব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম, সে হৃদয়ে যখন সুরঙ্গমার মতো সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সমাসীনা তখন আমার কোনও আশা নেই। নিরাশ হৃদয়ে আপনার ক্রমশ ক্ষীয়মাণ দেহটাকে মাত্র সম্বল করে আমি আপনার সেবা করতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন।" রোরুদ্যমানা ধারা-মতীকে আমি কিছুতেই স্বমতে আনতে পারলাম না। আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম না অকপট সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করতে না পারলে পদে পদে দুঃখ পেতে হয় এবং সে দুঃখকে ঢাকবার জন্য পদে পদে আশ্রয় নিতে হয় ভণ্ডামির। ধারামতী কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত না করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সে গিয়ে মহর্ষি পর্বত-শিখরকে কিছু বলেছিল কি না এবং তা শুনে মহর্ষি পর্বত-শিখর সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্ভ্রককে প্ররোচিত করেছিলেন কি না তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু যখন সুন্দরানন্দের সেনাধ্যক্ষ কুলিশপাণি আমাকে এসে বললেন—"আপনি যদি অবিলম্বে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ না করেন তাহলে আপনাকে বন্দী করবার আদেশ জিম্ভ্রক আমাকে দিয়েছেন।" তখন কর্তব্য স্থির করতে আমার বিলম্ব হল না। কুলিশপাণিকে বললাম—"সুন্দরানন্দের রাজ্য বহু বিস্তৃত। অবিলম্বে তা ত্যাগ করা শক্ত। পদব্রজে সে রাজ্য ত্যাগ করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" কুলিশপাণি উত্তর দিলেন—"ভগবন, আপনাকে পদব্রজে যেতে হবে না। জিম্ভ্রক আপনার জন্যে একটি দ্রুতগামী অশ্বতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি তাতেই আরোহণ করুন।" তাই করতে হল। অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করলাম। দুই দিন দুই রাত্রি সেই অশ্বতর সংসর্গে বাস করে এই কথাই আমার বারম্বার মনে হল যে অধিকাংশ মানবই অশ্বতর-সদৃশ। তারা সম্পূর্ণ অশ্বও নয়, নিখুঁত গর্দভও নয়। অর্থাৎ তারা অন্ধ সংস্কার-তাড়িত পশুও নয়, চক্ষুষ্মান

বুদ্ধি-চালিত মানবও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণে তারা এমন এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে এমন এক অদ্ভুত সমাজ সৃষ্টি করেছে যে সে সমাজে নির্বোধ পশু বা বুদ্ধিমান মানব কেউ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে না। তারা গাভীর দুগ্ধ সবলে অপহরণ করে তাকে করুণাময়ী জননী বলে পূজা করে, যজ্ঞীয় পশুকে হত্যা করে কল্পনা করে যে সে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হল, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকের সহজ যুক্তি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উপেক্ষা করাই তাদের ধর্মনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়। এই ধরনের চিন্তা পরম্পরা থেকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করতে অবশেষে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্যসীমা অতিক্রম করলাম। যে রাজ্যে এসে পদার্পণ করলাম তা ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি বলিষ্ঠ-বীর্যের। আমি যখন সে রাজ্যে এসে প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পল্লীপথে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েছে। একটি পথিককেই কেবল দেখতে পেলাম এবং তাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে আমি বলিষ্ঠ-বীর্যের শাসনাধীন হর্ষ-নীড় নামক গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। মাত্র এইটুকু খবর দিয়েই পথিক নিজ গন্তব্যপথে চলে গেল, আমি নিবিড় অন্ধকারে ঝিল্লী-মুখরিত এক বিরাট বৃক্ষের সমীপে সেই অশ্বতর-পৃষ্ঠের উপর বসে চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় এখন আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। কোনও গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে যদি উপস্থিত হই তাহলে ভদ্রতাবশত সে হয়তো আমাকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু অযাচিতভাবে কারও আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। এ-ও মনে হল যে কোনও সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন গৃহস্থ যদি আশ্রয় দেবার পূর্বে আমার পরিচয় জানতে চান তাহলে হয় সে পরিচয় আমাকে দিতে হবে, নতুবা মিথ্যাচার করতে হবে। এর কোনটা করবারই আমার ইচ্ছা হল না। মনে হল হর্ষ-নীড় গ্রামে যদি কোনও পান্থশালা থাকে কিছু শুল্কের বিনিময়ে সেইখানেই আমি রাত্রিবাস করব। আমার কাছে এক কপর্দকও ছিল না, কারণ জিমূত্রকের আদেশ অনুসারে একবস্ত্রেই আমাকে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল অশ্বতরটি বিক্রয় করে কিছু অর্থসংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। নিবিড় অন্ধকারে আমি পান্থশালার সন্ধানে হর্ষ-নীড় গ্রামের পথে পথে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। একটি গৃহেরও দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেলাম না। গ্রাম পার হয়ে গ্রামপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম অবশেষে। সেখানে দেখলাম একটি কুটির থেকে আলোক নির্গত হচ্ছে এবং দ্বারদেশে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়ে দেখলাম নারীটি বিগতযৌবনা কিন্তু সুসজ্জিতা। আমার দিকে কয়েকবার অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম নারীটি রূপজীবিনী। অশ্বতর থেকে অবতরণ করে

বললাম—"ভদ্রে, তোমার গৃহে রাত্রিবাস করার সৌভাগ্যলাভ করতে পারি কি ?" নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহ সম্মতি দান করে আমাকে আহ্বান করলে এবং স্বীয় চেটিকা কর্পূরীকে আদেশ করলে পাদ্যঅর্ঘ আনতে। নীলোৎপলার গৃহেই আমি আশ্রয় পেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠেই পরিশ্রান্ত অশ্বতরটিকে বিক্রয় করে যে ক'টি মুদ্রা পেলাম তা নীলোৎপলাকে দিয়ে বললাম—"এই আমার যথাসর্বস্ব। এর বিনিময়ে তুমি কয়েকদিনের জন্য আমার আহার ও শয়নের ব্যবস্থা কর। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি উপার্জনের কোনও পন্থা আবিষ্কার করতে পারব আশা করি।" নীলোৎপলা বললে—"আপনার আহারের কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু শয়ন সম্বন্ধে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমার গৃহে জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। দিনের বেলাতেও অনেকে আসেন। সুতরাং শয়নের ব্যবস্থা আপনি অন্যত্র করুন। আমার পিছনের দিকে একটি ঘর আছে অবশ্য, তাতে আপনি শয়ন করতে পারেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো আপনার নিদ্রা বিঘ্নিত হবে।" আমি বললাম—"নিরুপায় ব্যক্তির নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া কঠিন। নিদ্রা বিঘ্নিত হলেও আপাতত আমি তোমার ওই পিছনের ঘরেই শয়ন করব যতক্ষণ না অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি।" পরদিনই আমি এক কুম্ভকারের অধীনে একটি কর্ম সংগ্রহ করলাম। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেই মাটি দিয়ে কর্দম প্রস্তুত করবার ভার পেলাম। অপরাহ্ণে ছুটি পেলে আমি গ্রামের বাহিরে গিয়ে নদীতে স্নান করে নীলোৎপলার বাসায় ফিরে আসতাম। নীলোৎপল প্রতিদিনই আমাকে কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিত। আহারাদি শেষ করে আমি চলে যেতাম গ্রামপ্রান্তরের একটি বিরাট প্রান্তরে। সেইখানেই পাদচারণা করতে করতে আমি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতাম কি উপায়ে আমি প্রমাণ করব যে ব্রহ্মা নেই। কারণ সুরঙ্গমাকে আমি ভুলতে পারিনি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে তার অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তি যুক্তির আঘাতে আমি শিথিল করবই। একদিন সন্ধ্যায় কিছু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।"

যে সব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে চার্বাক তাহাই কালকূটের নিকট বিশদ করিয়া বলিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া কালকূট কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, কি আশ্চর্য, ইনি যদি ব্রহ্মাকে সত্যই দেখিতে পান আনন্দিত হইবেন না, হতাশ হইবেন। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাই আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না, কারণ মেঘমালতীর যে রোষ-বহ্নি আমার জীবন দগ্ধ করিতেছে, পিতামহের প্রসাদ লাভ করিলে তাহা নির্বাপিত করিতে পারিব এ আশা

আমার আছে। আমরা উভয়ে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই শবদেহের সমীপবর্তী হইয়াছি!

"কি ভাবছেন আপনি"—চার্বাক প্রশ্ন করিল।

"ভাবছি আর কালবিলম্ব না করে শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু করা উচিত।"

"বেশ করুন।"

"প্রথমে কোন জায়গাটা কাটব?"

"পেটটাই কাটুন।"

কালকূট পেটের মধ্যভাগটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ছুরিকাটি বাহির করিয়া যেই অস্ত্রোপচার করিতে যাইবেন অমনিই বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘ উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"আপনারা কে!"

"আমার নাম কালকূট। এঁর নাম আমি জানি না।"

"আমি চার্বাক।"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ একবার কালকূট এবং একবার চার্বাকের মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে বিজৃম্ভন করিল।

"আপনারা আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করলেন কেন?"

"আপনি কি ঘুমাচ্ছিলেন? আমরা ভেবেছিলাম আপনি মৃত।"

কালকূটই কথা বলিতেছিলেন, চার্বাক নীরবে বসিয়াছিল।

"মৃত্যুরই অপর নাম যে মহানিদ্রা তা কি আপনাদের জানা নেই? আমি মহানিদ্রা-ঘোরেই পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম, আপনারা কেন আমাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন বলুন তো।"

চার্বাক এইবার কথা কহিল।

"আমাদের ধারণা জীবনই সর্বপ্রকার আনন্দের উৎস। সেই আনন্দ উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই তো আমি মৃত্যু বলে মনে করি।"

"জীবন আনন্দের উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু ঝঞ্ঝাটেরও উৎস। জীবন মুখরা ঈর্ষা-পরায়ণা স্ত্রীর মতো। স্বাধীনচেতা আনন্দকামীরা তার কবল থেকে দূরে পলায়ন করতে সতত উৎসুক থাকেন কিন্তু সব সময়ে পলায়ন করতে পারেন না। জীবনের করাল আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আমি অনেক কষ্টে তা ছিন্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের স্পর্শ-প্রভাবে যা ছিন্ন ছিল তা আবার যুক্ত হয়ে গেল, আমি পুনরায় সেই মুখরার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হলাম। আপনারা এ কাজ করলেন কেন?"

কালকূট উত্তর দিলেন।

"আপনাকে বিব্রত করছি এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমার অন্তত ছিল না আমি আপনার অঙ্গচ্ছেদ করতে এসেছিলাম সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে। এঁরও উদ্দেশ্য তাই ছিল।"

"সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে? তাঁকে বাইরে সন্ধান করছেন কেন, তিনি তো আপনাদের মধ্যেই আছেন। সূর্য যদি আলোর সন্ধানে চন্দ্র ব্যবচ্ছেদ করতে যান তাহলে তা যেমন হাস্যকর হবে, আপনাদের আচরণও ঠিক তেমনি হাস্যকর হচ্ছে।"

চার্বাক চুপ করিয়াছিল। এইবার কথা বলিল।

"আমাদের আচরণ যে হাস্যকর তা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে চাই। আপনি যা বললেন পুস্তকেও তা লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তা আমরা যাচিয়ে নিতে চাই।"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল চতুর্দিক যেন বজ্র গর্জনে সচকিত হইয়া উঠিল।

"দেখুন, কোন কিছু প্রত্যক্ষ করতে হলে চোখ থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের তা নেই।"

"কি করে এ অসম্ভব মনে হল আপনার।"

"আমার মতো একজন জলজ্যান্ত মানুষকে আপনারা মড়া ভেবেছিলেন, এইটে কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

"চক্ষুষ্মান মনুষ্যেরও ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম অহরহই করে থাকি কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে আমাদের চক্ষু নেই? বলতে পারেন আমাদের দর্শন সব সময় নির্ভুল নয়, বলতে পারেন আমাদের চক্ষুর বোধশক্তি সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের চক্ষু নেই একথা বললে—"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল।

"ধরুন, আমি যদি মড়াই হতাম. আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে কি তথ্য আপনারা আবিষ্কার করতেন, বলুন।"

"কি করে বলব! যা এখনও আবিষ্কার করিনি তার স্বরূপই তো অজ্ঞাত আমাদের কাছে।"

এমন সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের বিশাল দক্ষিণ চক্ষুর কালো অংশটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বাতায়নের মতো খুলিয়া গেল এবং সেই বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি রূপসী নারী চার্বাককে সম্বোধন করিলেন—

"আপনাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য আমি আপাত-মৃত ক্ষিপ্রজঙ্ঘকে পুনর্জীবিত

করেছিলাম। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্ষিপ্রজজ্ঞের শব-রূপের মধ্যেই আপনারা কোনও সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন আশা করে এসেছিলেন। আমি আপনাদের হতাশ করব না। আমি নিজেকে সংহরণ করছি। আপনারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোন। আমি কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকট হব ওর দেহে। আশা করি ততক্ষণে আপনারা আপনাদের অনুসন্ধান সমাপ্ত করতে পারবেন।"

চার্বাক আর বিস্মিত হইতেছিল না। তাহার বোধ শক্তি যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে নির্বাক হইয়া ক্ষিপ্রজজ্ঞের অক্ষি-বাতায়ন-বর্তিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কালকূট প্রশ্ন করিলেন—"ভদ্রে, আপনার এই পরমাশ্চর্য আবির্ভাবে আমি অতিশয় বিস্মিত হয়েছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পরিচয় দিন।"

"আমি ক্ষিপ্রজজ্ঞের প্রাণ-লক্ষ্মী। আমি ওর দেহের অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছি অনাদিকাল থেকে, ওকে বিবর্তিত করছি, আনন্দিত করছি নানারূপে নানাভাবে।"

"কিন্তু ক্ষিপ্রজজ্ঞের কথা শুনে মনে হল আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই উনি নাকি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করছিলেন। আমাদের স্পর্শ প্রভাবে ওঁর মহানিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।"

"আপনাদের স্পর্শ দ্বারা আমি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি এ ধারণা আমিই ওঁর মধ্যে সম্ভব করেছি। আমাকে ত্যাগ করে উনি মহানিদ্রাঘোরে আনন্দ উপভোগ করছিলেন এ ধারণাও আমারই সৃষ্টি। ওঁর প্রতিটি কার্য আমিই নিয়ন্ত্রিত করছি। আপনারা ওঁর দেহকে ছিন্ন করে দেখুন, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ হোক, আমি কিছুক্ষণের জন্য সরে থাকছি।"

"কিন্তু ওঁর ছিন্ন ভিন্ন দেহে আপনি আবার প্রবেশ করবেন কি উপায়ে - "

"আমি তো কোথাও যাব না, আমি সরে থাকব, সংহরণ করব নিজেকে। আপনাদের মনে হবে ক্ষিপ্রজজ্ঞ জীবন্ত নয়, মৃত, এতক্ষণ যেমন মনে হচ্ছিল।"

"ক্ষিপ্রজজ্ঞ কি বরাবর জীবিতই ছিলেন ?"

"ছিলেন এবং থাকবেন। আমি কখনও কোন কারণেই ওঁকে ত্যাগ করে যাব না ? ক্ষিপ্রজজ্ঞের অথবা আপনাদের যখন মনে হবে যে ওর দেহটা শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয় তখনও আমি থাকব। ওঁর দেহের সঙ্গে আমি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমরা দুজনেই বারবার রূপান্তরিত হব, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ কখনও ঘটবে না।"

"আমরা যদি ওঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করি বা ভস্মীভূত করি তাহলেও কি আপনার অস্তিত্ব নষ্ট হবে না?"

"সৃষ্ট বস্তু কখনও নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। তবে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ আছে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহকে বেশী ছিন্ন ভিন্ন করবেন না। ওঁর দেহের বর্তমান রূপটি অবলম্বন করে নূতন রকম আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা আছে। এবার আমি সরে যাচ্ছি। আপনারা কার্য আরম্ভ করুন।"

অক্ষি-বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ শুইয়া পড়িল।

চার্বাক অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"অদ্ভুত।"

কালকূট বলিলেন—"মহর্ষি চার্বাক, এখন বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। আমরা যা করতে এসেছি তা করতেই হবে। এই শবদেহের মধ্যেই আমরা পরমাশ্চর্যময়ী প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রত্যক্ষ করলাম। হয়তো ব্রহ্মাকেও প্রত্যক্ষ করব। কোন অঙ্গ থেকে আরম্ভ করি বলুন তো? আমার মনে হয় উদর ছিন্ন ভিন্ন করবার আগে হাতটা ব্যবচ্ছেদ করলে কেমন হয়?"

চার্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—"বেশ, তাই করুন।"

॥ ৭ ॥

চন্দ্রালোকে সপ্তশিরা পর্বতের উপত্যকাটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কলস্বরা তটিনীটি তরঙ্গ-ভঙ্গে চতুর্দিক আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল মনে হইতেছিল সে যেন তটিনী নয়, সে যেন কোনও উচ্ছ্বসিতা কিশোরী, অশ্রান্ত কলকল স্বরে অন্তরের আনন্দকে ছন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই তটিনী-তীরবর্তী বিশাল বটবৃক্ষের গ্রন্থিল এক শাখায় বিচিত্রবর্ণ যে বিরাট বিহঙ্গমটি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল তাহার প্রতিবিম্ব জ্যোৎস্নালোকে তটিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল সেই প্রতিবিম্বকে কেন্দ্র করিয়াই বুঝি তরঙ্গিনীর তরঙ্গলীলায় আকুলতা জাগিয়াছে। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তরঙ্গাঘাতে প্রতি মুহূর্তে রূপ-পরিবর্তন করাতে তরঙ্গিনী যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে যেন প্রতিবিম্বের একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না, বুঝিতেছিল না যে তাহার নিজের অসংযত আগ্রহই প্রতিমুহূর্তে প্রতিবিম্বকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। উপত্যকার নৈশ নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া সেই বিচিত্রবর্ণ বিরাট বিহঙ্গম সহসা কথা কহিয়া উঠিল।

"অয়ি, নদী-রূপিণী বিনতা, তুমি বিচলিত হ'য়ো না। তোমার এই অধীরতাই

বারম্বার তোমার কষ্টের কারণ হয়েছে। অধীরতাবশেই তুমি তোমার দ্যুতিমান পুত্র অরুণকে বিকলাঙ্গ করেছ, তার অভিশাপই তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছে। এখনও তুমি তোমার সপত্নী কদ্রুর সেবা করে চলেছ। এখনও তোমার দাসীত্ব মোচন হয়নি।"

নদী আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই কদ্রু, কোথা সে—"

"তোমার সপত্নী কদ্রুও রূপ পরিবর্তন করেছে। তুমি নদী হয়েছ, কদ্রু হয়েছে তোমার উভয় পার্শ্ববর্তী তটভূমি। তার গর্ভ-বিবরে এখনও সর্পকুল সঞ্জাত হচ্ছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ তাদের সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করতে পারেনি। আর তুমি তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার সপত্নী ও সপত্নী-সন্ততির সেবা করে যাচ্ছ। এখনও তুমি অভিশাপ মুক্ত হওনি।"

"বৎস গরুড়, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন।"

"আমি গরুড় নই। আমি তার মূর্ত স্মৃতি মাত্র।"

"কিন্তু আমি যে তোমার শ্বেত বদন, রক্ত পক্ষ, কাঞ্চনসন্নিভ দেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নেমে এস বৎস, জননীকে ছলনা কোরো না।"

"অধীর হয়ো না বিনতা। যে গরুড় গজকচ্ছপরূপী কলহপরায়ণ ধনলোভী ভ্রাতাদের আহার করেছিল, অমৃত অর্জনের জন্য যে গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হয়নি, সে গরুড় বহুকাল পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। একটি বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করতে সে এসেছিল, ব্রত শেষ হয়েছে, সে চলে গেছে। যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছিল সেই শক্তিতে সে লীন হয়ে গেছে। সে এখন বিষ্ণুর বাহন, তোমার কেউ নয়। তুমিও কি আর সেই বিনতা আছ? কশ্যপের পত্নী যে বিনতা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ সম্বন্ধে সপত্নী কদ্রুর সমক্ষে সত্য ভাষণ করেছিল সে বিনতা কোথায়? সে-ও আর নেই। সৃষ্টির বিশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে সে-ও রূপান্তরিত হয়েছে। একথা বিস্মৃত হয়ো না। বিনতা যে আজ তুমি নবরূপে নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছ, নদীরূপে যে মহাসাগরের দিকে তুমি প্রধাবিত হচ্ছ সেই মহাসাগরই এখন তোমার উপাস্য, সেই মহাসাগর কইশ্যপ। তোমার মধ্যে স্বামীর নবরূপই এখন তোমাকে নবসম্পদে শক্তিশালিনী করবে। তুমি সেই সম্পদের জন্য প্রস্তুত কি না তাই নির্ধারণ করবার জন্যে আমি গরুড়রূপে নিজেকে তোমার মধ্যে প্রতিফলিত করেছি। দেখছি গরুড়ের সম্বন্ধে এখনও তুমি মোহাচ্ছন্ন। তুমি ভুলে গেছ যে কদ্রুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করাই তোমার উদ্দেশ্য, সেইজন্যই তুমি পুত্র কামনা করেছিলে। কিন্তু দু'জন মহাবলশালী পুত্র লাভ করেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। তোমার অত্যধিক

ব্যগ্রতা অরুণকে পঙ্গু করেছে, আর তোমার নিরর্থক তর্ক-প্রিয়তার ফলে তোমাকে যে দাসীত্ব বরণ করতে হয়েছিল গরুড়ের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তোমাকে সেই দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং তা করতে গিয়ে গরুড় হয়ে গেছে বিষ্ণুর ভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে তোমার দাসীত্ব মোচন হলেও প্রকৃতপক্ষে তুমি স্বাধীন হওনি। নবজন্মেও তুমি তটরূপিনী কদ্রুর সেবা করে চলেছ, তার নাগ সন্ততিদের লালন পালনে সহায়তা করছ। আমি জানতে এসেছি সত্যই কি তুমি স্বাধীনতা চাও?"

"নিশ্চয় চাই। কিন্তু আমি গরুড়কে চাই। সে মাকে ভুলেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না।"

"বিষ্ণুকে পেতে হলে মাকেও ভুলতে হয়।"

"তবে তার এ অশোভন বিস্মৃতি ভাঙতে হবে।"

"এইবার তুমি দক্ষ-কন্যার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তার এ বিস্মৃতি ভাঙতে হলে কি করতে হবে জান?"

"কি?"

"তাকে বিষ্ণুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।"

"তাই আনব যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হবে তাও বলে দাও।"

"নূতন শক্তি অর্জন করতে হবে।"

"কি করে?"

"প্রথমেই প্রবলভাবে ইচ্ছা করতে হবে। তোমার ইচ্ছার প্রাবল্যই তোমাকে শক্তি দেবে এবং সেই শক্তির আকর্ষণে আরও শক্তি সঞ্চারিত হবে তোমার মধ্যে। অমিত ইচ্ছা-শক্তিতে তুমি যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন তোমার ইচ্ছাই তোমাকে রূপান্তরিত করবে। সেই রূপান্তরিত তুমি গরুড়কে বিষ্ণুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে তখন।"

বিহঙ্গমের কথায় নদীরূপিণী বিনতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—"তুমি যদি সত্যই গরুড় না হও, তাহলে কে তুমি, আত্মপরিচয় দাও। তোমার বাহ্য রূপের সঙ্গে গরুড়ের সাদৃশ এত বেশী যে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি—"

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গরুড় মূর্তি অন্তর্হিত হইল। বিনতা সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"প্রভু, আপনি—"

"হ্যাঁ আমিই। সমুদ্রমন্থনের পরই সমুদ্রের মৃত্যু হয়েছিল। পিতামহের আদেশে আমি মৃতসমুদ্রে জীবন সঞ্চার করে জীবন্ত সমুদ্ররূপে দিগ্বিদিকে প্রসারিত ছিলাম। সহসা কাল তিনি আমাকে স্বৈরচর করে দিয়েছেন, আমি এখন যা খুশী হতে পারি। সেই শক্তিবলেই আমি গরুড় হয়েছিলাম। পিতামহের কৃপায় তুমিও স্বৈরচর হতে পার। স্বৈরচর হলে গরুড়ের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হবে না। তোমার অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধা তাহলে হয়তো তৃপ্ত হবে।"

"কি করে স্বৈরচর হওয়া যায়।"

"তোমার একাগ্র ইচ্ছার সঙ্গে পিতামহের ইচ্ছা সম্মিলিত হলে।"

আমার তরঙ্গ ধারা যে আমাকে প্রতিমুহূর্তে বিক্ষিপ্ত করছে।"

"নিজেকে সংযত কর, সংহত কর। যে সমুদ্রের দিকে তুমি প্রবাহিত হচ্ছিলে আমি তা ত্যাগ করেছি, তুমি তোমার গতিবেগ রুদ্ধ কর এইবার। আমি চললাম। কদ্রুর দাসীত্ব থেকে যদি সত্যিই মুক্তি চাও তপস্যা কর। যদি স্বৈরচর হতে পার তাহলেই প্রকৃত মুক্তি পাবে।"

এই বলিয়া কশ্যপ বিরাট কূর্মে রূপান্তরিত হইলেন এবং সপ্তশিরা পর্বতের একটি শিরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সপ্তশিরা পর্বতের শীর্ষদেশে একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য প্রকট হইয়াছিল। সপ্তশিরার উচ্চতম শৃঙ্গ সহসা বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে এবং সেই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি বিশাল শ্বেতপদ্ম আরও সাতটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখিতেছিল। বস্তুত, মনে হইতেছিল ওই শ্বেতপদ্মগুলির অলৌকিক স্বপ্নই যেন জ্যোৎস্নারূপে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। মধ্যবর্তী বৃহৎ শ্বেতপদ্মটির মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছিল একটি প্রদীপ্ত ভ্রমর, মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না ও তুষারের সমন্বয়ে যেন তাহার দেহ গঠিত হইয়াছে। ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জনে স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে ঊর্মিমালা শিহরিত হইতেছিল, শ্বেতকমলগুলির সৌরভে বায়ু মন্থর হইয়া আসিয়াছিল, আকাশের নক্ষত্রকুল যেন অধীর আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত চরাচর যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছিল, একটা ভাষাহীন প্রতীক্ষাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল চতুর্দিকে। সহসা সেই প্রগাঢ় প্রতীক্ষাকে বিচলিত করিয়া বৃহৎ শ্বেতপদ্ম কথা কহিয়া উঠিল। ভ্রমরের গুঞ্জন বন্ধ হইয়া গেল। শ্বেতপদ্ম কহিতে লাগিল—"হে আমার মানসপুত্রগণ, এতকাল তোমরা আকাশে সপ্তর্ষিরূপে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করছিলে। ধ্রুবের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, ব্যক্ত কর। আমার মনে হল যে নক্ষত্ররূপে হয়তো আমি তোমাদের ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করেছি,

হয়তো ধ্রুব সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল ম্রিয়মাণ হয়েছে, তাই আমি তোমাদের স্বৈরচর করে দিয়েছি। তোমরা যা খুশী হতে পার। ইচ্ছে করলে পুনরায় তোমরা আকাশে নক্ষত্ররূপেও ফিরে গিয়ে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করতে পার। আমি শুধু জানতে চাই—বিষ্ণু-ভক্ত ধ্রুব সম্বন্ধে তোমরা কে কি ধারণা করেছ? বালক ধ্রুব যখন তপস্যাবলে বিষ্ণুর হৃদয় হরণ করেছিল তখন বিষ্ণুর অনুরোধে আমি ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে ওই বালককে স্থির নক্ষত্ররূপে তার মধ্যস্থলে স্থাপিত করেছিলাম। তোমাদের আমি সপ্তর্ষিরূপে সৃষ্টি করেছিলাম ওই ধ্রুবের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। এইবার তোমাদের পর্যবেক্ষণের ফল ব্যক্ত কর।"

অত্রি কহিলেন—"আমার বিশ্বাস ধ্রুব স্থির নয়, চঞ্চল। তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের সঙ্গে নয়, প্রবহমাণ স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"আমরা যে আপনার নির্দেশে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করেছি আমার কাছে এইটেই একমাত্র ধ্রুব বলে মনে হয়েছে। অরুন্ধতীরও তাই অভিমত।"

অঙ্গিরা ভিন্নমত পোষণ করেন দেখা গেল।

তিনি বলিলেন—"যে নামেই তাকে অভিহিত করুন, যে রূপেই তাকে প্রত্যক্ষ করুন একনিষ্ঠ তপস্যার ফলই যে ধ্রুব, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

পুলস্ত্য বলিলেন—"ভোগই ধ্রুব—তা সে সুখভোগ দুঃখভোগ যাই হোক। আমার মনে হয় তপস্যার লক্ষ্য যে মুক্তি তা-ও একপ্রকার ভোগ। সেজন্য মনে হয় ধ্রুব ভোগেরই প্রতীক।"

পুলস্ত্যের এই উক্তির পর একটা নীরবতা চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে পুলহ বলিলেন—"ধ্রুব ধ্রুবই, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রতুও তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি বলিলেন—"ধ্রুব সৃষ্টিকর্তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অসামান্য প্রতিভাশালী স্রষ্টার সৃষ্টি বলেই তা অনন্য, স্বতন্ত্র।"

মরীচি উত্তর দিলেন সর্বশেষে।

তিনি বলিলেন—"পিতামহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। অনেক সময় তারা পরস্পর-বিরোধী। আমার নিজের বংশেই সর্প ও সর্পশত্রু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি এইটেই উপলব্ধি করেছি, সৃষ্টির সর্বপ্রকার বিকাশের শেষ লক্ষ্য ধ্রুবলোক। ধ্রুবের মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। আমার বংশের শেষ নাগ ও গরুড় ধ্রুবলোকেরই সন্ধান করছে। ধ্রুব সর্ববিধ বৈচিত্র্যের মিলনতীর্থ।"

সপ্তর্ষিগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতপদ্মরূপী পিতামহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। তোমরা যে সকলেই এক একজন গুরুগম্ভীর ঋষি হয়েছ তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। একই রূপে একই পরিবেশে একই ধ্যানের কারাগারে বহু যুগ বন্দী থাকলে এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবও নয়, পাষাণের পক্ষে জলের সাবলীলতা বা বায়ুর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যেমন সম্ভব নয়। আমি তাই ইচ্ছা করেছি নূতন স্বৈরচর-বিশ্ব সৃজন করব। সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতাই হবে সে বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম যুগে তোমরা সাতজনই ছিলে আমার মানস-পুত্র। তোমাদের মাধ্যমেই আমি সৃষ্টি-কল্পনাকে মূর্ত করেছিলাম। সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগবংশ, বালখিল্য, ঋষি-রাক্ষস সবই সম্ভব করেছ তোমরা। আমার নব-সৃষ্টিতেও তোমরাই অগ্রণী হও।"

অঙ্গিরা কহিলেন—"পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো নিত্য নবায়মান। মানব-প্রতিভায় আপনি যে রুচি সৃষ্টি করেছেন তা তো নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, তাহলে আবার—"

"বৎস, তুমি বহুকাল মানব-সমাজচ্যুত হয়ে আকাশে বাস করছ। তুমি ভুলে গেছ অধিকাংশ মানবকে আমি পশু করেই সৃষ্টি করেছিলাম। তারা নানাভাবে তাদের পশুত্বকেই বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পশুর মতোই ভাবছে যে তারা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই হাস্যকর অহমিকার নানা রূপই এখন নানা দেশের মানব সমাজ। তারা স্রষ্টাকে ভুলেছে, কিম্বা মানতে চাইছে না। এদের মূঢ়তায় আমি নিজেই লজ্জিত। সেই জন্যেই মনে করেছি এ সব ছবি মুছে ফেলে এবার নূতন ছবি আঁকব।"

পিতামহের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহাকাশে এক প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল। সুমিষ্ট হাস্য করিয়া পিতামহ বলিলেন—"সপ্তর্ষিদের আকর্ষণে যে সব নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সপ্তর্ষিরা অপসৃত হওয়াতে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে পরস্পরকে চূর্ণ করছে—।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"পিতামহ, ধ্রুবলোকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নীহারিকাকে বহুকাল ধরে আমরা কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। সেটিও কি বিনষ্ট হয়ে যাবে?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমি যখন বাঘ সৃষ্টি করেছিলাম তখন অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে ছাগকুল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহেশ ছাগবংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেন নি। কিছু কিছু ছাগ আছে এখনও। স্বৈরচর সৃষ্টি করলে হয়তো তেমনি হবে। কেউ যাবে কেউ থাকবে। তোমাদেরই যদি

ইচ্ছা হয় যে পূর্বরূপ ধারণ করে উক্ত নীহারিকার পরিণতি লক্ষ্য করবে স্বচ্ছন্দে তা করতে পার। যা খুশী হবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো দিয়েছি তোমাদের। এই পদ্মরূপ তোমরা ইচ্ছা করলেই পরিহার করতে পার।"

পদ্মরূপী পিতামহের অন্তর্নিহিত কৌতুক শ্বেতপদ্মের প্রতি পর্ণে ঝলমল করিতে লাগিল। প্রতিটি পর্ণ অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল পিতামহ তাঁহার নব-রূপ-ধারী মানসপুত্রগণের উপর তাঁহার উক্তির প্রভাব কি হইল জানিবার জন্য স-কৌতুক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, যেন তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইবার ঘটিবে। ঘটিতে বিলম্ব হইল না। সাতটি শ্বেতপদ্ম সাতটি বৃহৎ খদ্যোতে রূপান্তরিত হইয়া ধ্রুবলোকের উদ্দেশে উড়িয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশপটে পূর্বের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া ধ্রুবলোক পরিক্রমায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ তুষারশুভ্র যে ভ্রমরটি এতক্ষণ পিতামহ পদ্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়াছিল সে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

"পিতামহ, আপনার মানসপুত্রগণ তো আপনার নব-সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না।"

"পুরাতনের মোহ ত্যাগ করা সহজ নয় সখি। নূতন অজানা পথে চলতে পারেন কেবল সৃষ্টিকর্তা নূতন সৃষ্টির আগ্রহে। এঁরা তো নিজেদের আগ্রহে স্বৈরচর হননি, আমি জোর করে কয়েকজনকে স্বৈরচর করে দিয়েছি কি হয় দেখবার জন্যে। এই ঋষির দল সব বিষ্টুর পক্ষে. যা আছে তাই আঁকড়ে থাকতে চান। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের দিকে যাবার সাহস এঁদের নেই। কশ্যপের হয়তো কিছুটা আছে বলে মনে হল। তাকেও স্বৈরচর করে দিয়েছি। সে আমাকে সাহায্য করতে পারে।"

"কিসে সাহায্য করবে।"

"বিষ্টুকে একটু জব্দ করতে চাই। সে আমার নূতন সৃষ্টি-প্রেরণাকে ব্যাহত করছে। বিশ্বকর্মাও জুটেছে ওর সঙ্গে। সিশু ভাবছেন স্বৈরচর সৃষ্টি হলে ওঁর নিজের শিল্প-কীর্তি সব লোপ পেয়ে যাবে। আর বিষ্ণু ভাবছেন যেহেতু তিনি পালনকর্তা সেই হেতু তিনি সর্বেসর্বা, আমাকেও ওঁর তালে তাল রেখে চলতে হবে।"

ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলিল—"বিষ্ণু পালন না করলে কিন্তু আপনারি সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত।"

"দেবী ভারতি, এমনিতেই আমার সৃষ্টি শুধু লোপ নয়, লোপাট হয়ে যাচ্ছে। তারই হিসেব আমি নিতে চাই বিষ্টুর কাছ থেকে। কিন্তু এমনি হিসেব চাইলে

ও কি দেবে? প্যাচে ফেলতে হবে ওকে। কশ্যপ আসছে না কেন। তার তো এখানেই আসবার কথা ছিল।"

আমি কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না পিতামহ! আপনারও করা উচিত নয়। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের হাতখানাকে ওরা কাটতে আরম্ভ করেছে। একবার আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

"চল তাহলে আমরাই এগিয়ে দেখি কশ্যপের কি হল। বিনতাকে পেয়ে পুরানো প্রেম উথলে উঠল না তো। ওরা যে হাত কাটতে শুরু করেছে তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি।"

"কশ্যপকে যদি খুঁজতে যান তাহলে দেরি হয়ে যাবে।"

"কিছু দেরি হবে না। এস এবার ভোল-পালটানো যাক।"

পিতামহ কমনীয়-কান্তি যুবকে রূপান্তরিত হইলেন। ভারতী ভ্রমর-রূপ পরিহার করিয়া হইলেন একটি কিশোর বালক।

"তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে গেলে যে!"

"আপনার ওই সব মুনিঋষিদের কাছে যুবতী-রূপে যাবার ইচ্ছে নেই।"

পিতামহ বীণাপাণির নাকে ছোট্ট একটি টোকা দিয়া বলিলেন—"একটা কথা তুমি ভুলে যাও বারবার। নিজেকে তুমি কিছুতেই লুকোতে পার না। যে বেশই তুমি ধারণ কর না কেন—তোমার রূপ উথলে পড়ে তোমার সবাঙ্গ থেকে। তুমি যে প্রকাশের দেবতা তুমি নিজেকে কি লুকোতে পার?"

সপ্তশিরা পর্বত হইতে উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া বালক-রূপী বীণাপাণি সহসা বসিয়া পড়িলেন।

"এত ঢালু পাহাড় থেকে আমি নামতে পাচ্ছি না।"

"পট করে পাখী হয়ে উড়তে শুরু কর।"

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"তা-ও হবার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে?"

বালকরূপী সরস্বতীর নয়নে দুষ্টামিভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি একটি শিশুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

"ও, বুঝেছি তোমার মতলব।"

পিতামহ শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন, শিশু তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটিয়া গেল। তাহার পর শিশু পিতামহের কানে কানে বলিল—"লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

"কোথায় ?"

"কুবেরের অলকাপুরীতে।"

"সেখানে তুমি কি করতে গিয়েছিলে ?"

"কুবেরের এক গণ্ডমূর্খ নাতিকে সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম করবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক দরিদ্র, অর্থলোভে অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজি হয়েছিলেন, এখন ব্যাপার দেখে আমাকে ডাকাডাকি করছেন ব্রাহ্মণ।"

"তুমি কি করলে ?"

"মূর্খকে কি করে আপাত-বিদ্বান করা যায় তারই পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার স্বৈরচর লোক স্থাপিত হলে হয়তো মূর্খরা ইচ্ছা করলেই বিদ্বান হতে পারবে, কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়। এখন—"

'যাক, ও কথা। লক্ষ্মী কি বললেন।"

"আপনি যে বিষ্ণুকে জব্দ করতে চান তা তিনি টের পেয়েছেন। কি করে পেয়েছেন তা জানি না। আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই কলহে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি।"

"তুমি কি বললে।"

"বললাম, কলহ যদি বাধে আমি তাঁর পক্ষে থাকব।"

পিতামহের চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্মিতমুখে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"হাঁসের পক্ষ দুটি, কিন্তু যখন সে ওড়ে তখন তার গতি এক দিকেই হয়। তোমার গতি যে কোনদিকে হবে তা আমি জানি সুতরাং আমার ভয় নেই।"

পিতামহ 'উঃ' বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

"কি হল ?"

"ওরা খুব জোর ছুরি চালাচ্ছে।"

"আপনার লাগছে না কি ?"

"লাগছে না ? তোমার ?"

বীণাপাণির শিশু-অধরে একটি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল কেবল, তিনি ইহার কোনও উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কশ্যপের তো কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।"

"এখানেই তার আসবার কথা ছিল। সপ্তর্ষিরা যে এত শীগ্‌গির যজ্ঞে ভঙ্গ দেবেন, তা ভাবিনি। সেই জন্য তাকে বলেছিলাম মধ্য রাত্রিতে আসতে। মধ্য

রাত্রির আর বেশী দেরীও নেই, চল ওই বড় পাথরটার উপর বসে অপেক্ষা করা যাক। এই পথেই সে আসবে।"

অদূরে একটি গোলাকার বিরাট প্রস্তর ছিল। উভয়ে তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল।

"এ কি।"

প্রস্তর কথা কহিল।

"আমি কশ্যপ। প্রস্তর রূপ ধারণ করে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

পিতামহ বীণাপাণিকে কোলে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন।

"কি আপদ! এত জিনিস থাকতে তুমি প্রস্তররূপ ধারণ করতে গেলে কেন?"

কশ্যপ উত্তর দিলেন—"সমুদ্ররূপে বহুকাল অশান্ত ছিলাম। প্রস্তরের সুনিবিড় স্থৈর্য খুব ভাল লাগছিল পিতামহ।"

"স্বৈরচর হওয়ার সুবিধাটা দেখ! যাই হোক বিনতা কি বললে।"

"তাকে স্বৈরচর করে দিলে গরুড়কে ঠিক টেনে আনবে। আমি গরুড় রূপ ধরে তার কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম এখনও সে গরুড়ের জন্য উতলা।"

"সবাইকে তো আর চট করে স্বৈরচর করা যায় না। আগে দেখি তার দৌড়টা কতদূর।"

"সে তপস্যা করছে।"

"দেখা যাক।"

পিতামহ সানন্দে লক্ষ্য করিলেন কশ্যপের মুখমণ্ডলে একটা গদগদভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন। সম্মোহিত ভক্তকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। বিনতা প্রসঙ্গেই আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল কিন্তু শিশুরূপিণী বীণাপাণির নয়নের দিকে চাহিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। মনে হইল কশ্যপকে তিনি বোধহয় কিছু বলিতে চান।

পিতামহ কশ্যপকে বলিলেন—"কশ্যপ তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এই শিশুটিকে রেখে আসছি।"

বীণাপাণিকে কোলে করিয়া পিতামহ পুনরায় পর্বতারোহণ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদূর উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তেই পর্বতগাত্রস্থ শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যে দুইটি অপরূপ নৈশ বিহঙ্গম কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল তাহারাই যে পিতামহ ও সরস্বতী তাহা কল্পনা করা কশ্যপের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সরস্বতী কহিলেন—"আপনার কশ্যপকে একটু কাজে লাগাতে চাই পিতামহ।"

"স্বচ্ছন্দে। কি করতে হবে বল। ও যে রকম মুগ্ধ হয়েছে এখন যা করতে বলব তাই করবে। কি করতে বলব বল।"

"আপনি বললে হবে না, আমি বলব। আপনি একটু অন্তরালে থাকুন।"

"বেশ। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি বেশী বিলম্ব কোরো না। আমি বরং এক কাজ করি, তারাকে নিয়ে আসি। তাকে একটু দরকার।"

"কোন্ তারা ?"

"বৃহস্পতির বউ গো, চাঁদ যাকে নিয়ে পালিয়েছিল। বুধের মা।"

"বুঝেছি। আচ্ছা, যান।"

পিতামহ আলোক-রেখা-রূপে আকাশের দিকে চলিয়া গেলেন। বীণাপাণি কশ্যপের সমীপবর্তী হইলেন শবরীর রূপ ধারণ করিয়া।

॥ ৮ ॥

ক্ষিপ্রজঙ্ঘের হস্তের পেশীশিরাসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কালকূট অবশেষে চার্বাককে বলিলেন—"মহর্ষি, একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে। জানি না, আপনারও তা মনে হয়েছে কিনা।"

"কি বলুন।"

"আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। শিরা-উপশিরা পেশী অস্থির গঠন ও স্থাপন নৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন কোনও বিরাট নগরী প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু সে নগরীর নির্মাতাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তপস্যা করতে হবে, সেই কাপালিক যেমন করেছিল।"

"এই ছিন্নভিন্ন শবের কাছে চোখ বুজে বসে থাকবেন তার মানে ?"

"থাকলে ক্ষতি কি।"

"সময় নষ্ট হবে, আর কিছু যদি না-ও হয়।"

"মহর্ষি আপনি তো একাধিকবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপকাঠিতে অসম্ভব তা-ও সম্ভব হল। আপনি আমাকে সর্পে রূপান্তরিত হতে দেখলেন, এই শবের মধ্যে মূর্তিমতী প্রাণ-দেবতাকে দেখলেন, তবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে—যা আমরা অসম্ভব বলে মনে করি তার হেতু আমাদের বুদ্ধির অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে যে, এই অসম্পূর্ণ বুদ্ধির

উপর নির্ভর করাও তো নিরাপদ নয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে এইটে মেনে নিয়ে তাই আমি আপাতত চুপ করে থাকতে চাই, আপনি যদি তপস্যা করতে চান করুন !"

"আপনি কি চুপ করে বসে থাকবেন ? আপনিও যদি তপস্যায় ব্রতী না হন তাহলে আপনার উপস্থিতি আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হবে এবং বলা বাহুল্য, আমার তপস্যাও বিঘ্নিত হবে তাহলে।"

"বেশ, আমি উঠে যাচ্ছি। চারিদিকে ঘুরে দেখি দেশটা কেমন। আপনি তপস্যা করুন।"

"বেশ।"

কালকূট নয়নযুগল মুদিত করিয়া বদ্ধপাণি হইতেই চার্বাকের অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময় ও করুণার এমন একটা সমন্বয় হইল যাহা প্রকৃতই চার্বাকীয়। নীরব ভাষায় সে দৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল— 'আহা, স্বল্পবুদ্ধি লোকগুলির কি দুর্দশা।' পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার মনে হইল, 'আমিও তো কিছুক্ষণ পূর্বে মায়ানদীর তীরে বসে অনুরূপ মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলাম। মানুষের কিসে কখন যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় কিছুই বলা যায় না। তীব্র সুরাই হয়তো আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করেছে, কে জানে!' চার্বাক উঠিয়া পড়িল এবং উপলবহুল পার্বত্য উপত্যকায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রূপসী সুরঙ্গমার অঞ্জন-সুন্দর খঞ্জন-নয়ন দুইটিও তাহার মানস প্রাঙ্গণে যেন কৌতুক ভরে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। চার্বাক পুনরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল— 'চতুরাননের অনস্তিত্ব আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছে তা কিছুক্ষণ পরে অপসারিত হবে নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে তখন আমি নিশ্চয় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব। সুরঙ্গমার বিশ্বাসকে বিচলিত করতেই হবে।' একটা ঝম্ ঝম্ শব্দে চার্বাকের স্বগতোক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। চার্বাক দেখিতে পাইল একটা বিরাটকায় শজারু তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সর্বাঙ্গের কণ্টক সমুত্থিত হওয়াতে তাহাকে এক চলমান বিরাট বিচিত্র কদম্ব ফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। চার্বাক সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া রহিল।

"চার্বাক, আমি তোমারই অপেক্ষায় এখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"কে তুমি ?"

"আমি তোমার কৌতূহল।"

"এ মূর্তি কেন তোমার।"

"আমি সংশয়-কণ্টকিত হয়েছি। শব-ব্যবচ্ছেদ করে বিশেষ কোন লাভ তো হল না। কালকূটের তপস্যার ফলেও যে বিশেষ কিছু হবে—তা মনে হচ্ছে না। তোমার এই সন্ধান-লোকে নূতন আর কি পাওয়া যেতে পারে?" কিসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা?"

"ইচ্ছা করে তো আমি এখানে অপেক্ষা করছি না, আমাকে এখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ দেশের নাম সন্ধানলোক না অদ্ভুতলোক তা-ও আমি জানি না। আমার কৌতূহল কি উপায়ে যে আমার দেহের বাইরে এসে মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে তা-ও আমার বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে যদি আমার মানসিক অবস্থা বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি।"

"আমি তাহলে এখন অন্তর্ধান করি।"

"তুমি বারবার রূপান্তরিত হচ্ছ কি করে?"

"তা জানি না। আমি আপনা-আপনিই বদলে যাচ্ছি, তুষার যেমন জল হয়। অনুভব করছি আবার একটা পরিবর্তন আসছে। এই দেখ—"

শজারু পিপীলিকায় পরিণত হইল।

"তুমি যতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবে ততক্ষণ আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমি চললুম।"

পিপীলিকা গর্তে প্রবেশ করিল। প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিলাসী চার্বাক অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "যে সব অনুমানবাদী বেদবিৎ পণ্ডিতদের আমি এতকাল উপহাস করেছি তাঁরা যদি এখন আমার দুরবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে আনন্দের কিছু খোরাক পেতেন নিশ্চয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি ক্রমশ। মনে হচ্ছে—কিন্তু না, আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। বিকারের ঘোরে অসম্ভব প্রলাপকে সত্য বলে মনে করছি। দেখি এই বিকার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কতদূর বিকৃত করতে পারে। নির্বিকার হয়ে সেইটেই যদি লক্ষ্য করতে পারি তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারব। কালকূটের কার্যকলাপই একটু অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করা যাক্ আপাতত। এ ছাড়া আর করবার তো কিছু নেই।"

চার্বাক পুনরায় সেই শবদেহের অভিমুখে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে কালকূট নিমীলিতনয়নে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। চার্বাক নিকটস্থ একটি ঝোপে আত্মগোপন করিয়া নীরবে কালকূটকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল বর্ণমালিনী যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্যে ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার রূপের

তুলনা করিয়া ক্ষুব্ধ হওয়াই বা কেন। পাতালনিবাসী রাজপুত্র? পাতালে কি জনসমাজ আছে? কি রকম রাজ্যের রাজপুত্র ইনি? কালকূটকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ চিন্তা চার্বাকের মস্তিষ্কে আবর্তিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পূর্বে এক অদ্ভুত উর্ণনাভকে দেখিয়া তাহার মনে যে-জাতীয় বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল সেইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চার্বাক ঘন ঝোপে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্রায়িত হইল, নয়নের প্রখর দৃষ্টিতে মূর্ত হইল কৌতুক ও করুণা।

॥ ৯ ॥

সপ্তর্ষিগণের সাময়িক অন্তর্ধানে অন্তরীক্ষে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়াছে। সুধাকর সোমদেবতার বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। নিজস্ব চন্দ্রলোকে তিনি নির্মল কৌমুদী বিস্তার করিয়া পুনরায় রোহিণীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয়ে ছায়াপাত হইল। মনে হইল যে জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালে তারা দেবী আত্মহারা হইয়া স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিলেন সেই শুভ্র মেঘখণ্ড সহসা গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত বিরাট এক মনুষ্যমুখে রূপান্তরিত হইয়া তারা দেবীর সহিত আলাপ করিতেছে। ঈর্ষায় কলঙ্কীর মুখমণ্ডল আরও কালো হইয়া গেল। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন, বৃহস্পতি হয়তো কোনও দূত পাঠাইয়াছেন তাহার কাছে। লোকটা এত অপমানিত হইল তবু ছাড়িবে না? হইতে পারে তারা তাঁহার ধর্মপত্নী, কিন্তু সে যখন তাঁহার কাছে থাকিতে রাজী নয়, সে যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত পলাইয়া আসিয়াছে, তখন ইহা লইয়া আর মাতামাতি কেন? তারার পুত্র বুধ যে আমারই পুত্র ইহা সবজনবিদিত। পিতামহ নিজে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরও বৃহস্পতি যদি··। চন্দ্রের চিন্তাধারা কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। সেই মেঘনির্মিত মনুষ্যমুখ তাহারই দিকে সবেগে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রদেব চমকিত হইলেন—একি, এ যে স্বয়ং পিতামহ!

পিতামহ নিকটস্থ হইয়া চন্দ্রদেবকে ঘিরিয়া অপরূপ শোভা-সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওহে চাঁদ, আমি তোমার তারা দেবীকে নিয়ে চললাম। মেঘের আড়ালে যেটা রইল, সেটা তারার মতোই দেখাবে বটে, কিন্তু সেটা ওর কঙ্কাল—ওটার সঙ্গে প্রেম করতে যেও না, সুখ পাবে না।"

চন্দ্র শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কোথা নিয়ে চললেন ?"

"মর্তলোকে। পাতালের এক পাগল রাজপুত্রকে ভোলাতে।"

"ভোলাতে ?"

চন্দ্র হতবাক হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিতামহ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, তোমার ভয় হচ্ছে, ও যদি নিজেই ভুলে যায় তাহলে তোমার দশা কি হবে। ভয় নেই, ও ভুলবে না। একটি পুরুষের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করে সারাজীবন তার দাসী হয়ে থাকার মতো মনোভাব এদের নয়। এদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম অভিনেত্রী করে। মোহিনী প্রেয়সীর অভিনয়ে এদের জোড়া নেই। তোমাকে কি ভাবে ভুলিয়েছিল মনে আছে তো ? আমার বিশ্বাস পাতালের রাজপুত্র ওকে বাগাতে পারবে না। তোমার কাছেই ও ফিরে আসবে আবার। তুমি ওকে যথেষ্ট সুখে রেখেছ দেখছি।"

"কিন্তু পিতামহ, যদি না আসে—"

"তাহলে বৃহস্পতির যে দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে।"

"কিন্তু পিতামহ—"

"দক্ষ রাজার সাতাশটি মেয়েদের উপর তো একাধিপত্য করছ ! তবু তোমার আশা মিটছে না ? এদিকে শুনছি যক্ষ্মা হয়েছে—।"

রোহিণী অপ্রত্যাশিতভাবে বলিয়া উঠিল—"তারাকে নিয়ে যান আপনি। ওর কথা শুনবেন না—."

বাকী ছাব্বিশ জন দক্ষ কন্যাও সমস্বরে সমর্থন করিল সে কথার। পিতামহ অন্তর্ধান করিতেছিলেন এমন সময় চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"একটা কথা শুধু বলে যান পিতামহ।"

"কি বল।"

"তারাকে কার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে ?"

"মেঘমালতীর।"

"সে আবার কে ?"

"স্বর্গের একজন অপ্সরী।"

"কি করে তা সম্ভব হবে পিতামহ। তারা কি তারা ছাড়া আর কিছু হতে পারে ?"

"ওকে স্বৈরচর করে দেব। ও যা খুশী হতে পারবে। আপাতত ওকে মেঘমালতী হতে হবে, আর প্রয়োজন মতো মাছিও হতে হবে মাঝে মাঝে।"

"মাছি ?"

"হ্যাঁ, কালকূটের সঙ্গে একা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মেঘমালতী সেজে থাকবে, তারপর যেই তার বউ বর্ণমালিনীর সাড়া পাবে অমনি পট করে মাছি হয়ে যাবে!"

"কেন?"

"প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। নাগিনী বর্ণমালিনী নক্ষত্র-বধূদের মতো উদারচেতা নয়। সপত্নীর সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সে মনোহারিণী, কিন্তু হিংসা বিষে পরিপূর্ণ, তার সুদীর্ঘ জিহ্বা ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ। যদিও নিজেকে সে বর্ণবিরোধী বলে প্রচার করে, যদিও মুখে সে বলে যে সমস্ত পৃথিবী একরঙা হয়ে যাক, কিন্তু নিজে সে বিচিত্রবর্ণা, কালকূটকে সম্পূর্ণভাবে সে নিজে অধিকার করে রাখতে চায়। সুতরাং তারাকে সাবধানে থাকতে হবে।"

"এ সব বিপজ্জনক জটিলতার মধ্যে কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন পিতামহ।"

পিতামহ স্মিতমুখে কিছুক্ষণ শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"দেখ, আমার নিজের তৈরী খেলাঘরে আমার নিজের তৈরী পুতুল তোমরা। তোমাদের আমি যখন যেখানে খুশী রাখব, যখন যেমন খুশী সাজাব। তোমরা খেলাটাকে খেলার মতোই উপভোগ কর—তাহলে যেটাকে বিপজ্জনক জটিলতা মনে হচ্ছে, তাতেই আনন্দ পাবে। ওগো তোমরা এই ছেলেমানুষটাকে একটু ভোলাও তো!"

পিতামহের কথা শুনিয়া সাতাশটি নক্ষত্রের সর্বাঙ্গে নব নব দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বাতী হাসিয়া বলিল—"আপনি যান, আমরা ওকে সামলাব।"

"আমার একটা নালিশ আছে পিতামহ।"

রোহিণী আগাইয়া আসিল।

"কি হল তোমার আবার।"

"কিছু হয়নি, কিন্তু আপনি মানুষ নামক যে জীব সৃষ্টি করেছেন তাদের এত বোকা করেছেন কেন বলুন তো।"

"কেন কি করেছে তারা তোমার?"

"একজন মানুষ জ্যোতিষী নাকি বলেছে যে, আমার চেহারা ষাঁড়ের মুখের মতো! দেখুন দিকি কাণ্ড! অশ্বিনীকে বলেছে ঘোড়া-মুখো, শতভিষাকে কুম্ভ, ধনিষ্ঠাকে মৃদঙ্গ। আপনি ওদের বুদ্ধিটাকে একটু ঘসে মেজে ঠিক করে দিন।"

"আমাকেই ওরা চতুর্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। ওদের কাছে কি ঘেঁসবার জো আছে। ওরা নিজেদের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর শক্তি দিয়ে নিজেদের মতো জগৎ সৃষ্টি

করে তাতে মশগুল হয়ে আছে। ওদের কিছু করা যাবে না। ওরা নিজেদের পথে নিজেরাই বদলাবে ক্রমশ।"

"আমরা কিছু করব না ?"

"আমরা মজা দেখব।"

নক্ষত্র-রূপসীদের নয়নে অধরে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

চন্দ্রদেব পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন—"পিতামহ, আমি কি তাহলে আর তারার দেখা পাব না ?"

"যদি মাছি হয়ে পাতালে যেতে পার তাহলে পাবে। তারা যখন মাছি-রূপ ধারণ করবে, তখন তুমি মাছি-রূপে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারবে।"

"তা কি করে সম্ভব।"

"খুবই সম্ভব। এর নজীরও আছে অনেক। অশ্বিনীকুমারদের জন্মের ইতিহাসটা স্মরণ কর না। মনে নেই ?"

"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই শুনিনি। বাইরের কোন খবর রাখবার অবসরই পাই না।"

"পাবার কথাও নয়। সাতাশটি পত্নী, উপরিও দু' একটা আছে। ঘটনাটা শোন তবে। বিশ্বকর্মার মেয়ে সজ্ঞার বিয়ে হয়েছিল সূর্যের সঙ্গে। দুটি ছেলে—বৈবশ্বত মনু আর যম এবং একটি মেয়ে যমী হবার পর সজ্ঞা কাবু হয়ে পড়ল। মার্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রেম সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে তখন তার এক দাসী ছায়াকে পতিদেবতার কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়ল বনে তপস্যা করবার জন্যে এবং সম্ভবত সূর্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু সহস্রাক্ষ সূর্যের দৃষ্টি এড়ান সহজ কথা নয়। সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে হাজির হলেন তার কাছে গিয়ে। ফলে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম হল। ইচ্ছা কর তো তুমিও মক্ষিকারূপ ধারণ করে তারার কাছে যেতে পার।"

চন্দ্রদেব নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মক্ষিকা ? তা পারব না পিতামহ।"

"তাহলে বিরহ ভোগ কর কিছুদিন। আমি চললুম। আপত্তি না কর তো তোমার প্রেয়সীদের অধর সুধা চেখে যাই একটু।"

"না, না, আপত্তি আর কি।"

পিতামহ সাতাশটি নক্ষত্রকে একে একে চুম্বন করিয়া সূক্ষ্ম আলোকরেখা-রূপে পুনরায় মর্তের দিকে নামিয়া গেলেন।

"দেখ দেখ, কত বড় উল্কাপাত হল একটা।"

ভরণী দেবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

"ওটা উল্কা নয়। শ্রীমতী তারা পিতামহকে অনুসরণ করছেন। কত ঢঙই যে জানেন।"

চন্দ্রদেব ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন, তাহার পর রোহিণীর দিকে ফিরিয়া যথারীতি প্রণয় নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

॥ ১০ ॥

কালকূট তপস্যা করিতেছিলেন। প্রতিমুহূর্তে প্রত্যাশা করিতেছিলেন যে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, ঝোপের অন্তরালে চার্বাক নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ছিন্নভিন্ন হস্তকে ঘিরিয়া কতকগুলি রক্তলোভী মক্ষিকা ভনভন করিতে লাগিল কেবল। নিমীলিত নয়নে কালকূট মক্ষিকাদের গুঞ্জন কলরবই শুনিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল মক্ষিকা-গুঞ্জনের অন্তরালে যেন মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। বহুদূর হইতে কে যেন বলিতেছে—ভয় নাই, আমি আসিতেছি। কালকূট একাগ্রচিত্তে সেই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং পিতামহই বুঝি মক্ষিকাগুঞ্জনের ভিতর দিয়া বার্তা প্রেরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মক্ষিকাগুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল। কালকূট চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহও উঠিয়া বসিল এবং তাহার অক্ষিবাতায়নে সেই রূপসী আবির্ভূতা হইলেন। কালকূটকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—আপনার অনুসন্ধান কি সমাপ্ত হয়েছে? আপনি এর হস্তের শিরা উপশিরা পেশী স্নায়ু ছিন্নভিন্ন করে কোন রহস্যের সন্ধান পেলেন কি? যে হস্ত গুরু খড়্গ ধারণ করে নৃশংস হত্যায় সহায়তা করে, যে হস্ত নিপুণ বিলাসে লঘু তুলিকা চালনা করে মনোরম চিত্র অঙ্কন করে, যে হস্ত এক মুহূর্তে পেলব পল্লবতুল্য—পরমুহূর্তে কঠিন বর্তুলবৎ হতে পারে, যে হস্ত বরদান করে, ভিক্ষাদান করে, যে হস্ত সেবা করে, চপেটাঘাত করে, যে হস্ত কখনও মৌন কখনও ভাষাময়, কখনও লুণ্ঠক কখনও দাতা, সে হস্তের প্রকৃত রূপ কি আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাহলে অনুমতি দিন আমি অন্যান্য প্রার্থীদের বাসনা চরিতার্থ করবার আয়োজন করি। আপনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন তখন একদল প্রার্থীর বাসনা আমি পূর্ণ করেছি—।"

কালকূট উত্তর দিলেন—"দেবি, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহে আপনার যেমন প্রয়োজন ছিল, আরো অনেকের

তেমনি প্রয়োজন আছে, সকলকেই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে তাদের প্রয়োজনও আমি মেটাব। আপনাদের প্রয়োজনের বৈচিত্র্যেই আমি আনন্দিত। এখনই একদল মক্ষিকা ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ক্ষতস্থানে বসে আমাকে প্রচুর আনন্দ দান করে গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহব্যবচ্ছেদ করে আপনি যে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন তাতেও আমি কম আনন্দিত হইনি। ওই দেখুন, আর একদল প্রার্থী বসে আছে।"

কালকূট দেখিলেন অনতিদূরে কয়েকটি শৃগাল বসিয়া রহিয়াছে।

"ওই শৃগালদের মুখে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন ?"

"আত্মসমর্পণ করেই আমি যে কৃতার্থ।"

"দেবি, আমি কিন্তু এখনও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিনি।"

"কি ধরনের সিদ্ধি আপনি লাভ করতে চান বলুন। হস্ত ব্যবচ্ছেদ করে আপনি কি পেলেন ?"

"আমি যা পেয়েছি তা সবই প্রত্যাশিত। আমি আশা করেছিলাম অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে।"

"সে প্রত্যাশাও আপনার সফল হবে হয়তো। এই মানবদেহ অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ব্যবচ্ছেদিত হস্তের মধ্যবর্তী শিরাটি লক্ষ্য করুন। শিরাটি কি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে না ?"

কালকূট অবিলম্বে শিরাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে সত্যই তাহা ক্রমশ স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা রজ্জুবৎ হইয়া উঠিল, তাহাতে বহুবর্ণের শল্ক সমাবিষ্ট হইল, অবশেষে তাহা আর শিরা রহিল না, সর্পে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই সর্প মুহূর্তমধ্যে ফণা বিস্তার করিয়া কালকূটকে সম্বোধনও করিল—"কালকূট, তুমি স্পষ্ট ভাষায় বল তুমি কি চাও। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব তুমি কামনা করছ কেন ? তাঁর একটা বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ? না, আর কোন উদ্দেশ্য আছে ? সত্যভাষণ যদি কর তাহলে আমি তোমাকে সহায়তা করব।"

"আপনি কে ?"

"আমি তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ। পিতামহের আদেশে আমি তোমার প্রকৃত মনোভাব জানতে এসেছি। তুমি যদি তোমার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত কর তাহলে তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন।"

"তিনি কি আমার মনোভাব জানেন না ?"

"তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবই জানেন। কিন্তু তোমার মুখ থেকে তিনি তোমার

অভিলাষ আমার মাধ্যমে শুনতে চান। তুমি নাগপুরী পাতাল পরিত্যাগ করে এসেছ কেন? সেখানেও তো তপস্যার উপযোগী বহু স্থান ছিল।"

কালকূট কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—"আমার পত্নী বর্ণমালিনীর অগোচরে আমি এ তপস্যা করতে চাই, নাগপুরীতে তা সম্ভব নয়।"

"বর্ণমালিনী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এই প্রমাণ করতে তুমি বেরিয়েছ, বর্ণমালিনীকে এই কথা তুমি বলেও এসেছ, তা কি তাহলে মিথ্যা?"

কালকূট বলিলেন—"আমি যা বলব তা বর্ণমালিনী টের পাবে না তো?"

"না। তুমি নির্ভয়ে সত্যভাষণ কর।"

"হ্যাঁ, তা মিথ্যা। আমি তাকে প্রতারণা করেছি।"

"কেন।"

"আমি যা কামনা করেছি তা সফল হলে বর্ণমালিনী ক্ষেপে যাবে। ক্ষিপ্তা বর্ণমালিনীর প্রকোপে আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে তাহলে।"

"আমি তো শুনলাম তুমি পিতামহের দর্শন কামনা করছ। পিতামহ যদি তোমাকে সত্যই দেখা দেন তাহলে বর্ণমালিনী ক্ষিপ্তা হয়ে উঠবে একথা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পিতামহকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়, বর্ণমালিনীই বা না হবে কেন। তুমি কি তাহলে পিতামহকে দর্শন করতে চাও না?"

"পিতামহকেই আমি দর্শন করতে চাই।"

"তাহলে বর্ণমালিনী রাগ করবে কেন বুঝতে পারছি না। বৎস কালকূট, তুমি সরলভাবে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।"

"আপনি আমার আদিপুরুষ পরম পূজনীয় কশ্যপ। আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছি।"

"আমার শারীরিক সান্নিধ্যই কি তোমার লজ্জার কারণ হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, আমি অশরীরী হচ্ছি। তুমি স্পষ্ট করে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।"

সর্প অন্তর্হিত হইল।

কালকূট শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি মেঘমালতীকে চাই, তাই আমার এ তপস্যা। পিতামহ অসম্ভবকে সম্ভব করে। শবদেহের মধ্যে একদিন আমি অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাই আমি শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, মর্তের মায়ানদীর পারে অবস্থিত সন্ধানলোকে আমি বিরাটকায় এক শবের সন্ধান পাব যদি আমি সেই মায়া নদী পার হতে পারি। বর্ণমালিনীর জিহ্বার সাহায্যে আমি সে নদী পার হয়েছি, বর্ণমালিনী আমাকে

জিহ্বা বিস্তার করে সহায়তা করেছে, কারণ তাকে বলেছি যে ত্রিভুবনে তারই রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই আমার তপস্যা। কিন্তু তুমি তো জান, পিতামহ, আমার তপস্যা মেঘমালতীর জন্য, তুমি আমার এ বাসনা চরিতার্থ কর। যতক্ষণ আমি সিদ্ধিলাভ না করি ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, হে অসম্ভব-সম্ভব-কর্তা আদিজনক, তুমি প্রসন্ন হও—।"

মহাশূন্যলোকে একটি শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিতেছিল, মনে হইতেছিল একটি প্রসন্ন শুভ্র হাস্য যেন মেঘরূপ ধরিয়াছে। সহসা তাহার উপর স্বর্ণালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্ণালোককে সম্বোধন করিয়া শুভ্র মেঘখণ্ড বলিল—"সরো, শুনলে তো ?"

"শুনলাম।"

"মানে, ও ক্রমাগত জ্বালাতন করবে। খেলনাটা না পাওয়া পর্যন্ত ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকবে ক্রমাগত। চল, আর দেরি করে কি হবে? নেমে পড়ি। তুমি বায়ুরূপে বহন কর আমাকে।"

"বহন করে কোথায় নিয়ে যাব?"

"সেই পদ্ম সরোবরে। তারা সেখানে পদ্মের পরাগ মাখছে ভ্রমরীর বেশ ধরে।"

"চলুন।"

বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইল। শুভ্রমেঘ লীলায়িত গতিতে ধীরে ধীরে চক্রবাল রেখার পরপারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কালকূটের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক কালো হইয়া গেল। স্বর্গালোক অবলুপ্ত হইল না, কেবল তাহা কৃষ্ণাভ হইয়া হিংস্র হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন অভূতপূর্ব উপায়ে কোন ক্রূর বিষধরের নয়নের দৃষ্টি মূর্ত হইয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই কৃষ্ণাভ আলোকে কশ্যপ পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কালকূট কশ্যপকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি সর্পরূপে আসেন নাই, নীলাভ জ্বলন্ত শিখার রূপে আসিয়াছিলেন। সেই শিখা যখন কথা কহিয়া উঠিল তখনই কালকূট বুঝিতে পারিলেন। শিখা বলিল—"বৎস কালকূট, তোমার অকপট মনোভাব জ্ঞাত হয়েছি। এখনই পিতামহের নিকট গিয়ে তা আমি ব্যক্ত করব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। আমি লজ্জিত হয়েছি। নাগবংশের কুলতিলক শেষ-নাগ কেন যে সহোদরদের সংসর্গ বর্জন করে তপস্যায় দেহপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা এখন আমি বুঝতে পারছি। নাগ বংশীয়েরা ক্রূর ও খল; তারা কুলাঙ্গার ও মন্দস্বভাব, তাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, তাদের

তপস্যা তুচ্ছ বরলাভের জন্য। আমি সুর, অসুর, দৈত্য, দানব, নাগ, পশু, পক্ষী সকলেরই জনক, তাদের আচরণের নিন্দা বা গৌরব আমাকেই বহন করতে হয়, তাই আমি কঠিনপৃষ্ঠ কূর্মরূপ ধারণ করে থাকি। বৎস, তোমার এই কদর্য আচরণের জঞ্জাল-স্তূপও আমি বহন করব। কিন্তু বৎস, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি পরিচ্ছন্ন হও, সত্যকে কামনা কর, সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে ধ্রুবকেই সন্ধান কর।"

কালকূট বলিলেন—"বর্ণমালিনী এবং মেঘমালতীর মধ্যে কে ধ্রুব?"

জ্বলন্ত শিখা ইহার কোন উত্তর দিল না। সহসা তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া পরমুহূর্তে নির্বাপিত হইয়া গেল। কালকূট সবিস্ময়ে দেখিল এক পর্বতাকার বিরাটকায় কূর্ম দিগ্বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিশাল পৃষ্ঠে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ। সে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, আবর্জনা, কঙ্কাল, কর্দম, সুদৃশ্য খাদ্য, বহুবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার—একটা বিরাট জগৎ যেন। কালকূট বিস্ফারিত নয়নে সেই চলমান পর্বতের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেখিতে পাইল কূর্মপৃষ্ঠস্থ একটি নরকঙ্কাল ক্রমশ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহা মেঘমালতীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালকূটের মনে হইল মেঘমালতী হস্ত সঙ্কেতে যেন তাহাকে আহ্বানও করিতেছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে অনুসরণ করিতে লাগিল।

॥ ১১ ॥

আকাশ যেখানে গিয়া কল্পলোকে মিশিয়াছিল সেখানে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই ছিল না, বাতাসও ছিল না, আলোক তো ছিলই না। কল্পলোকের প্রগাঢ় অন্ধকার তথাপি স্পন্দিত হইতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন একটি সুর সেই অন্ধকার জগৎকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন সেই অদৃশ্য সুরেই সেই অন্ধকার লোক বিধৃত হইয়া আছে। তাহার অণুপরমাণু যেন সেই সুর-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। ক্রমশ একটি সুর ভাঙিয়া দুইটি হইল, একই যেন দুই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মনে হইতে লাগিল দুইটি সুর-রেখা সমান্তরালে সেই অদৃশ্যলোকের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বাঙ্ময় হইল।

"হে স্রষ্টা, তুমি আর একবার বল, কিসে তুমি প্রকৃত আনন্দ পাও?"

"সৃষ্টিতে।"

"সৃষ্টির অর্থ কি ?"

"অয়ি ছলনাময়ি, তুমিই তো আমার সর্বসৃষ্টির বাণী। সৃষ্টির অর্থ কি তোমার জানা নেই ? না, এটা তোমার ছলনা।"

"যদি ছলনাই হয় তাহলে তা-ও আপনার সৃষ্টি। কারণ আমি আপনারই বাণী। আমি আপনার সৃষ্টি-প্রেরণার ভাষা। কিন্তু সৃষ্টি মানে কি তা আমি জানি না।"

"যা ছিল না তাই সম্ভব করাই সৃষ্টি। এতেই আমার আনন্দ।"

"সৃষ্টি-রক্ষায় আপনার আনন্দ নেই ?"

"সৃষ্টি-রক্ষা বিষয়ে আমি উদাসীন।"

"তাহলে আপনি বিষ্ণুকে সৃষ্টির হিসাব দাখিল করতে বলেছেন কেন ?"

"তাতেও একটা সৃষ্টি হবে।"

"কি রকম সৃষ্টি ?"

"রস-সৃষ্টি।"

সহসা দুইটি বিভিন্ন স্বরের কলহাস্যে অন্ধকার আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পর একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল কল্পলোকের সেই নিবিড় অন্ধকার যেন তপস্যা-মগ্ন হইয়া গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার যেন নিবিড়তর হইতেছে, যুগ যুগান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সহসা সেই মহাশূন্য আবার বাঙ্ময় হইয়া উঠিল।

"বাণী, কোথা তুমি ?"

"এই যে।"

"আমাকে আর তুমি স্রষ্টা বলে সম্বোধন কোরো না।"

"কেন ?"

"কারণ আমি স্রষ্টা নই। মানুষই স্রষ্টা। মানুষই তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে। তাদের কল্পনা আমাদের সৃষ্টি করছে, তাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের ধ্বংস করছে। আমি সেই সংশয়াচ্ছন্ন সত্য-সন্ধানীকে, তোমার আমার স্রষ্টাকে, যেন দেখতে পাচ্ছি। সে ধন চায় না, মান চায় না, স্তুতিনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না, চায় শুধু সত্য—অর্ধ-সত্য নয়, সম্পূর্ণ সত্য। তার সত্য সন্ধানের খেলা ঘরে আমরা তারই তৈরী খেলনা মাত্র। আমাকে স্রষ্টা বলে আর ডেকো না তুমি।"

"আপনি কি চার্বাক কালকূটদের কথা ভাবছেন ?"

"ওরা সত্য চায় না, ওরা চায় আত্মপ্রসাদ। সেই আলেয়ার পিছনে ছুটে

ছুটে ওরা সব অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের মধ্যেই সেই সত্য-সন্ধানী আছে যে দ্রষ্টা যে স্রষ্টা।"

"আমি আপনি কেউ নই তাহলে ?"

"আমি ওদের প্রেরণা, আর তুমি ওদের ভাষা। ওরা যেমন বদলাবে আমরাও তেমনি বদলাব। ওরাই কবি, আমরা ওদেরই সৃষ্টি।"

"কিন্তু আপনি যে স্বৈরচর সৃষ্টি করলেন!"

"তা ওদেরই প্রেরণায়, ওদেরই প্রেরণাকে আমি রূপ দিয়েছি কল্পলোকে। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষ হয়তো থাকবে না, আমরাও তখন থাকব না।"

"মানুষ থাকবে না কেন!"

"যারা একান্তভাবে সত্যকে চায় তারা একদিন সত্যেই লীন হয়ে যায়, তাদের আলাদা অস্তিত্ব আর থাকে না। সত্য সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না, বাণীরও প্রয়োজন নেই তার।"

"এ অবস্থায় পৌঁছতে মানুষের কত দেরি আছে ?"

"অনেক দেরি। হয়তো কোনও দিনই কেউ পৌঁছবে না। কিন্তু সম্ভাবনা আছে ওদেরই।"

"যতদিন না পৌঁছচ্ছে ততদিন—"

"ততদিন এস আমরা খেলা করি দেব-দৈত্য, দানব-মানবদের কামনা নিয়ে। ভবিষ্যৎ যুগের এক চার্বাকের ছবি তুমি দেখাবে বলেছিলে।"

"চলুন তাহলে নিয়ে যাই আপনাকে ভবিষ্যৎ যুগের কবির মানসলোকে। কিন্তু উপস্থিত যে চার্বাকটি ঝোপের ভিতর বসে আছে তার গতি কি হবে ?"

"তাতো আমি এখনও জানি না। ওর নব প্রেরণায় যে নবব্রহ্মা সৃষ্টি হবে সেই চালিত করবে ওকে।"

সহসা সেই কল্পলোকে এক আর্ত কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"পিতামহ, পিতামহ, গরুড় আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছে, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাকে রক্ষা করুন।"

পিতামহ বলিলেন—"চল! নাটক করা যাক্।"

পিতামহের কল্পলোকের মহাশূন্যে বর্তমান সহসা ভবিষ্যতে পরিণত হইল। সেই সহসা-সৃষ্ট ভবিষ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে যে লীলা নাটক তাঁহার মানস-লোকে মূর্ত হইল তাহার অসম্ভব অবাস্তবতায় তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সত্যই যদি এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিতেন—কি অদ্ভুত কাণ্ডই না হইত! কিন্তু তিনি জানেন সৃষ্টিকর্তাও স্বাধীন নহেন, তিনিও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। সুদক্ষ যাদুকরের মতো স্বৈরচর সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে বিস্মিত করিতে পারেন, বীণাপাণিকে আনন্দিত করিতে পারেন, নিজের কল্পনা-বিলাসে বিভোর হইয়া অসম্ভব-সৃষ্টি-সম্ভাবনায় মগ্ন থাকিতে পারেন. কামনাতুর চার্বাক-কালকূটদের ভোজবাজি দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিতে পারেন, কিন্তু সত্যই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন না। করিতে পারেন না বলিয়া কিন্তু পিতামহের দুঃখ হইতেছিল না। বরং তাঁহার মনে হইতেছিল বাস্তব-অবাস্তবের প্রভেদ তো অনুভূতির তারতম্য মাত্র। চক্ষুহীনের চেতনায় আলোক অবাস্তব, বর্ণসমারোহ অর্থহীন। তাঁহার মানস-লোকেই যদি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন, সত্যই যদি অমূর্ত মূর্ত হইয়া ওঠে, বস্তুলোকের মানদণ্ডে তাহার মহিমা না-ই বা ধরা পড়িল। তিনি নিজে আনন্দিত হইতেছেন ইহাই তো যথেষ্ট।

…নাটক সুতরাং জমিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ সত্যই পিতামহ সাজিয়া বসিয়াছিলেন। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, আস্কন্ধ-বিলম্বিত পক্ব কেশদাম, শুভ্র উত্তরীয়, নিষ্কলুষ কাষায় বস্ত্র তাঁহাকে সনাতন পিতামহের মহিমা দান করিয়াছিল। তাঁহার বাম পার্শ্বে ছিল রত্নখচিত অহিফেনের কৌটা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল সুবর্ণনির্মিত বৃহৎ একটি গড়গড়া। দুগ্ধধবল বিরাট তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পিতামহ নিমীলিত-নয়নে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। গলা খাঁকারির শব্দ পাইয়া তিনি চক্ষু খুলিলেন। দেখিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন।

বিষ্ণু। পিতামহ, অতিশয় বিপন্ন হয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমার বাহন গরুড় সহসা মানব-মূর্তি পরিগ্রহ করে তার জননীর কাছে ফিরে গেছে। হর্ষ-নীড় নামক গ্রামে বাস করছে তারা। আপনি হয় আমাকে আর একটি বাহন সৃষ্টি করে দিন, না হয় গরুড়কে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে আদেশ করুন। আপনার কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

পিতামহ। আমি কিছু করব না। আমি চটেছি। বহুকাল থেকে তুমি

তোমার কাজে ফাঁকি দিচ্ছ। গরুড়ের পিঠে চড়ে কমলিকে বাঁ পাশে নিয়ে তুমি আকাশে আকাশে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ কেবল। কাজকর্ম কিছুই করছ না।

বিষ্ণু। আপনার মুখে একথা শুনব প্রত্যাশা করিনি। নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অহোরাত্র আমি ব্যস্ত। এক মুহূর্ত আমার বিশ্রাম নেই।

পিতামহ। [অধীর ভাবে] ওসব একদম বাজে কথা। তোমার অক্ষমতা ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়ছে বিষ্টু। কথা ছিল আমি সৃষ্টি করব, তুমি রক্ষা করবে। তা কি তুমি করছ?

বিষ্ণু। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পিতামহ।

পিতামহ। এর নাম চেষ্টা করা? আদিম যুগে আমি যে সব বিশাল সমুদ্র, বিরাট পর্বত, দিগন্তপ্রসারী তুষারপ্রান্তর সৃষ্টি করেছিলাম তার চিহ্ন পর্যন্ত আছে আর?

বিষ্ণু। আপনি একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন পিতামহ। আপনি নিজেই যে নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে দিলেন হঠাৎ একদিন। সব উলটে পালটে গেল, মহেশ্বর তাই সুবিধে পেলেন।

পিতামহ। কিন্তু তুমি কি করছিলে? মহেশ্বরকে রুখলে না কেন তুমি? তোমার পালন করবার কথা না?

বিষ্ণু। ন্যায্য কারণ ঘটলে মহেশ্বরকে রোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই যে পিতামহ। আপনি নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে না দিলে—

পিতামহ। [ধমক দিয়া] আরে, কি বিপদ! বড় শিল্পী মাত্রেই নিজের রচনার একটু আধটু অদল বদল করে থাকে, তাই বলে সব উড়িয়ে দিতে হবে! গোড়ার যুগে আমি যে সব অপূর্ব উদ্ভিদ, অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলাম সব উপে গেল ওই জন্যে? ওসব কিছু শুনতে চাই না। হিসেব দাখিল কর তুমি।

বিষ্ণু। কোন যুগের হিসেব চাইছেন আপনি? প্রোটারোজোয়িক না আর্লি প্যালিয়োজোয়িক?

পিতামহ। কি বললে?

বিষ্ণু। প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক। মানে—

পিতামহ। ওসব আবার কি কথা!

বিষ্ণু। মানুষেরা আপনার বিভিন্ন যুগের সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ করেছে কি না!

পিতামহ। মানুষেরা! তাই নাকি। কি রকম, কি কি নাম শুনি।

বিষ্ণু। অ্যাজোয়িক, প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক, লেটার প্যালিয়োজোয়িক, ক্যাইনোজোয়িক—

[বিষ্ণু দ্বারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উর্বশী আসিয়া প্রবেশ করিল।]

উর্বশী। [মধুর হাসিয়া] অর্ধ-স্ফুট পারিজাতের নব পরাগে প্রতি প্রভাতে যে ললিত সুষমা জাগে, তাকেই আজ মূর্ত করেছি একটি রাগিণীতে। শুনবেন পিতামহ ?

পিতামহ। কাজের কথা হচ্ছে, ভ্যান ভ্যান কোরো না এখন, যাও।

[উর্বশী বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপসৃতা হইল।]

পিতামহ। মানুষ কোন যুগে আছে ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক যুগে। মানুষ আবার নিজের যুগকে নূতন নানা নামে ভাগ করেছে। আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। দৈত্যেরা কোন যুগে আছে ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক।

পিতামহ। দেবতারা ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িকই বলতে হয়।

পিতামহ। রাম রাবণ চার্বাক প্রহ্লাদ সবাইকে এক গোয়ালে পুরেছে। ধাষ্টামো যত।

বিষ্ণু। স্তন্যপায়ী জীবমাত্রকেই ওরা এক যুগে ধরেছে। কিন্তু সভ্যতার প্রগতি হিসাবে ওই যে বললাম, আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। ধাষ্টামো, ধাষ্টামো, সব ধাষ্টামো। তুমি এই সব বাজে খবর সংগ্রহ করে সময় নষ্ট করেছ খালি। তোমার আসল কর্তব্য ছিল সৃষ্টি রক্ষা করা, সেইটিই করনি কেবল।

বিষ্ণু। যথাসাধ্য করেছি বই কি পিতামহ।

পিতামহ। কিচ্ছু করনি।

বিষ্ণু। এ কথা বলছেন কেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো এখনও আছে।

পিতামহ। আমি যে সব মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলাম, কোথায় সে সব ? বহু যোজনব্যাপী বিশাল দেহ সরীসৃপ, দ্বীপাকৃতি কূর্ম, দিগন্তবিস্তৃত-পক্ষধারী বিহঙ্গম, পর্বতপ্রমাণ রোমশকায় হস্তী, কোথায় তারা ? গোটাকতক ছুঁচো ফড়িং আর চামচিকে বাদে সব তো লোপাট হ'য়ে গেছে।

বিষ্ণু। তার জন্যে আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। আমি চেষ্টার কসুর

করেছি কি ? কিন্তু কিছুতেই রাখা গেল না, কি করব বলুন। আপনার মহাকাব্য-গুলি যে বড় বেশী রকম অমিত ছিল পিতামহ। বিরাট পাখী, বিরাট তার ঠোঁটের ভিতরও আবার বড় বড় দাঁত।

পিতামহ। আমি কি তোমার ফরমাশ অনুযায়ী সৃষ্টি করব না কি !

বিষ্ণু। আজ্ঞে না, আমি তা বলছি না।

পিতামহ। তবে ও কথা বলবার মানে ?

বিষ্ণু। মানে, আমি বলছি কিছুতেই রাখা গেল না ওদের। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে গেল কিছু কিছু, গেল প্রাকৃতিক প্রভাবে।

পিতামহ। কিন্তু তুমি করছিলে কি ! তোমার কর্তব্য ছিল তাদের রক্ষা করা।

বিষ্ণু। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। প্রত্যেকবার অবতার হয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছি আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে। কূর্ম, মৎস্য, বরাহ রূপ ধারণ করে অসীম কষ্ট সহ্য করেছি কাদায়, জলে, বনে-বাদাড়ে। সে যে কি অসহ্য কষ্ট—।

পিতামহ। মজাও কম লোট নি। কৃষ্ণলীলার অজুহাতে বৃন্দাবনে তুমি যে রকম স্ফূর্তি উড়িয়েছ (সহসা) অথচ যদুবংশটাকে রাখতে পারলে না। একটি মুষল জুটিয়ে—আঃ। একটু দুরন্ত দামাল কিছু হলেই অমনি মহেশটাকে ডেকে ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস ! ওই এক শিখেছ [চীৎকার করিয়া] ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করেছ তুমি।

[বিষ্ণু কাতরভাবে পুনরায় দ্বারের দিকে চাহিলেন। যে সিনেমা-তারকাটি মর্তলোক অন্ধকার করিয়া সম্প্রতি দেবলোকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রবেশ করিলেন। ভাত-খেকো ভুঁড়িদার চেহারা। বিষ্ণুর বিশ্বাস ছিল আধুনিকা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে পিতামহের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, বিশ্বাস কিন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল।]

পিতামহ। [রুক্ষকণ্ঠে] তুমি এখানে ঘুরঘুর করছ কেন ?

সিনেমা-তারকা। [সসঙ্কোচে] আপনার আফিঙের কৌটতে আফিঙ আছে কি না দেখতে এসেছি। ভাবলুম, সন্ধে হয়ে গেছে—।

পিতামহ। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও এখান থেকে। ফক্কড় কোথাকার।

[সিনেমা-তারকা মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।]

বিষ্ণু। আপনার অহিফেন-সেবনের সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে পিতামহ।

পিতামহ। ওসব চালাকি রেখে দাও। হিসেব চাই আমি।

বিষ্ণু। হিসেব কি করে দোব তা তো বুঝতে পারছি না।

পিতামহ। তা বুঝতে পারবে কেন! [সগর্জনে] আমি আজ পর্যন্ত যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তার পাই পয়সা নিখুঁত হিসেব চাই।

বিষ্ণু। এ যে অসম্ভব কথা বলছেন পিতামহ। আপনার সৃষ্টি অনন্ত—।

পিতামহ। শুধু অনন্ত নয়, অপরূপ, বিচিত্র, বিস্ময়কর। তুমি আর ময়শা মিলে গোল্লায় দিয়েছ সব। আবার না কি যুদ্ধ বাধবে শুনছি। ময়শা আবার না কি লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। হিসেব দাও। তোমার উপর রক্ষা করবার ভার দিয়েছিলাম, পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দাও আমাকে।

বিষ্ণু। কি মুশকিল। হিসেব কি করে দোব বলুন। নানা বিবর্তনে—

পিতামহ। হিসেব দিতে তুমি বাধ্য।

[বিষ্ণু কি যে বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।]

পিতামহ। কথার জবাব দিচ্ছ না যে?

বিষ্ণু। সেদিন একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল, তাকেই না হয় ডেকে আনি, তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক খবর বলতে পারবেন।

[পিতামহকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন এবং হেকেলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

পিতামহ। এ কে?

বিষ্ণু। ইনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক; (হেকেলকে) বলুন—

হেকেল। [সবিনয়ে] আমি অবশ্য খুব বেশী জানি না। ফসিলে মিসিং লিংক্সের যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম তার থেকে আমি মানুষ আর অ্যানথ্রোপয়েডস্‌দের একটা যোগসাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম।

পিতামহ। [বিষ্ণুকে] বাজে ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ।

বিষ্ণু। আজ্ঞে ধাপ্পা নয়, ফসিলেই আপনার সৃষ্টির ইতিহাস নিহিত আছে।

পিতামহ। ফসিল? সে আবার কি!

হেকেল। ভূস্তরে মৃত প্রাণীদের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম ফসিল। কোথাও হয়তো একটা দাঁত পাওয়া গেছে, কোথাও বা মাথার খুলির খানিকটা, কোথাও হয়তো পায়ের এক টুকরো হাড়, কোথাও—

পিতামহ। [যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল] অ্যাঁ, আমার সৃষ্টির এই দুর্দশা হয়েছে না কি! কোথাও একটা দাঁত, কোথাও একটা মাথার খুলি, আর তাই শোনাচ্ছ আমাকে এসে।

হেকেল। এই সব থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে—

পিতামহ। [সহসা ফাটিয়া পড়িলেন] বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরিয়ে যাও।

[হেকেল দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।]

বিষ্ণু। পিতামহ, ধৈর্য রক্ষা করুন। শুনুন—

[পিতামহ এতক্ষণ একমুখ ছিলেন, সহসা চতুর্মুখ হইয়া গেলেন।]

পিতামহ। [চতুর্মুখ একসঙ্গে] মূর্খ, ভণ্ড, ক্রূর, শঠ।

বিষ্ণু। শুনুন।

পিতামহ। অস্পৃশ্য, নারকী, দুরাত্মা, দুর্মতি।

বিষ্ণু। পিতামহ, পিতামহ।

পিতামহ। দুঃশীল, পাপাশয়, নীচমনা, বিভীষণ।

বিষ্ণু। [অতিশয় শশব্যস্ত] শুনুন, শুনুন পিতামহ—

[অতঃপর পিতামহ প্রাকৃত ভাষা শুরু করিলেন।]

পিতামহ। জালিয়াত, ধড়িবাজ, লম্পট, স্বার্থপর—।

[পিতামহের অষ্ট নয়নে ক্রোধবহ্নি ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় বিষ্ণু শেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও পিতামহের দুই পত্নী দেবসেনা, দৈত্যসেনাকে ডাকিয়া আনিলেন।]

দৈত্যসেনা। ভীমরতি হয়েছে মুখপোড়ার—

দেবসেনা। [বিষ্ণুকে] আমরা পেরে উঠব না। ডাক্তার ডাক। দু'জন বিলেত ফেরত ডাক্তার স্বর্গে এসেছেন সম্প্রতি, তাঁদেরই ডেকে আন। বেশ ছেলে দুটি—।

পিতামহ। [সগর্জনে] দূর হও, ধুমসি, মুটকি, ধ্যাদ্ধেড়ে, ধুকড়ি—

[দেবসেনা দৈত্যসেনা চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু ত্বরিত-গতিতে গিয়া ডাক্তার দুইজনকে ডাকিয়া আনিলেন।]

প্রথম ডাক্তার। এখানে টেরামাইসিন পাওয়া যাবে কি ?

দ্বিতীয় ডাক্তার। সালফানিলামাইড ট্রাই করলেও মন্দ হয় না।

পিতামহ। [ক্ষিপ্ত হইয়া] গুণ্ডা, গাড়োল, উল্লুক, গাধা।

প্রথম ডাক্তার। এ রাঁচির কেস মশাই। টেরামাইসিন দিলে—

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমি কিন্তু একটা এনকেফালাটিসে সালফানিলামাইড দিয়ে বেশ উপকার পেয়েছিলাম। ও মশাই, খড়ম তোলে যে চলুন চলুন—।

[সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার দুইজন সরিয়া পড়িলেন। গালাগালি দিতে দিতে পিতামহের চতুর্মুখ ফেনময় হইয়া গেল। নিরুপায় বিষ্ণু তখন যাহাকে পাইলেন

তাহাকেই ডাকিয়া আনিলেন। সকলেই আসিলেন, কিন্তু কেহই কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। সকলেই অবশ্য পিতামহকে প্রশমিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ দূরে সারিবদ্ধ হইয়া কেহ মধুর হাস্য, কেহ বা কটাক্ষ দ্বারা মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন। কিন্নরদল গান গাহিতে লাগিলেন। স্বয়ং পবন আসিয়া চামর হস্তে লইলেন, বরুণ শীকর-স্নিগ্ধতা সৃজন করিলেন। বীণাপাণিও আসিয়াছিলেন, তিনিও বীণায় ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল. তিনি অতিশয় মধুর একটি রাগিণী আলাপ করিতে করিতে পিতামহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পিতামহের চতুর্মুখ হইতে সমবেগে চারচারটি করিয়া গালি একসঙ্গে ছুটিতে লাগিল।]

বিষ্ণু। [সকাতরে] শুনুন পিতামহ—।

পিতামহ। দমবাজ, বদমাস, বেইমান, জোচ্চর।

[সহসা বিষ্ণু করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন এবং সকলকে তাহাই করিতে ইঙ্গিত করিলেন।]

পিতামহ। জঘন্য, অন্ত্যজ, পাপী, পাজি।

সকলে। [সমস্বরে] হে ব্রহ্মা, হে পিতামহ, হে কমলযোনি চতুরানন, তুমি সর্বতোমুখ বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

পিতামহ। ফক্কড়, ফাজিল. ডেঁপো—।

সকলে। হে কবি, সৃষ্টিকর্তা, সূর্য যেমন প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করত কুজ্ঝটিকাকুল পদ্ম বনকে পুলকিত করে, তুমিও তেমনি আলোকশুভ্র প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া দিশাহারা আমাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত কর।

পিতামহ। নির্লজ্জ, নচ্ছার—।

সকলে। [দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্বরে] হে আদিকারণ, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। হে অজ, সলিলগর্ভে একদা যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্বসমুদ্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মরূপী, হে গুণাকর, হে অনন্ত সৃষ্টিনিধান, হে পিতামহ—।

পিতামহ। যতো সব—

সকলে। [সমস্বরে] হে জগৎপতি; তুমি ঋষি, তুমি সুখ, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি যুবাশ্রেষ্ঠ, তুমি অমিতবল, তুমি অমৃত, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমিই সর্বোত্তম, তুমিই পরিত্রাণস্থান, সর্বপ্রকার কল্পনার আকর, হে আদীশ্বর তোমা ভিন্ন কাহারও গতি নাই, হে দেবোত্তম, হে মূলাধার—

[এই ভাবে সকলে তারস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ প্রার্থনা চলিবার পর দেখা গেল পিতামহের চতুরাননে হাসি ফুটিয়াছে এবং তিনি আফিঙের কৌটা খুলিতেছেন।]

বিষ্ণু। [করজোড়ে] পিতামহ, গরুড়কে ফিরিয়ে দিন।

পিতামহ। এদের সবাইকে চলে যেতে বল, তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করবার আছে।

[বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সমাগত দেবদেবীরা অন্তর্ধান করিলেন।]

বিষ্ণু। কি বলুন।

পিতামহ। আমরা কোথায় আছি জান ?

বিষ্ণু। স্বর্গলোকে।

পিতামহ। কবিদের কল্পনায়। কবিরাই আমাদের স্রষ্টা। সম্প্রতি একদল যুক্তিবাদী ঋষি পদে পদে সেই কবিদের অপদস্থ করছে। কবিরা যদি লোপ পায়, তাহলে আমরাও লোপ পাব। সুতরাং কবিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বৈদিক ঋষিরা একদা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্নির জলন্ত শিখায় পবিত্র হবিঃ দান করে দেবতাদের মূর্ত করেছিলেন। সেই বৈদিক ঋষিরা আজকাল বিপন্ন হয়েছেন চার্বাক নামক এক অর্বাচীন যুবকের যুক্তিজালে। বীণাপাণি চেষ্টা করেছিলেন তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে। কিন্তু সফল হননি। অলৌকিক নানারকম দৃশ্য দেখে চার্বাক বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তিভ্রষ্ট হয়নি। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে তার যুক্তি আঁকড়ে বসে আছে। শক্তিশালী গরুড়কে তাই লাগিয়েছি এবার। চার্বাককে কাবু করতেই হবে। তা না করতে পারলে আমরা গেলাম। তুমিও লেগে পড়, মহেশকেও ডাক।

বিষ্ণু। আমাদের কি করতে হবে ?

পিতামহ। চার্বাকের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। হর্ষনীড় গ্রামে গরুড়কে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি, তোমরাও যাও।

বিষ্ণু। আর আপনি ?

পিতামহ। আমি তো যাবই। কিন্তু আমি আড়ালে থাকব।

বিষ্ণু। দেবী বীণাপাণি চার্বাককে কি ভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন ?

পিতামহ। দেবী বীণাপাণির আজকাল নূতন একটা বাই চেপেছে। তিনি মানুষের অবচেতনলোকে ঢুকে কি সব যেন করছেন। চার্বাকের অবচেতন-লোকেও তিনি নানারকম কারিকুরি করেছিলেন, কিন্তু কিছু হয়নি, তার নাস্তিক্য-বুদ্ধি বেশ টনটনে আছে। ওসব সূক্ষ্ম কারিকুরির মর্ম চার্বাক বুঝবে না। ওর

কাছে স্থূল ব্যাপারের অবতারণা করতে হবে। অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলে ও কোনদিনই মানবে না, সে শক্তিই ওর নেই। ধরবার ছোঁবার মতো একটা বাস্তবিক কিছু হাজির করতে হবে ওর কাছে। সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্তকীকে ভোলাবার জন্যে ও মনে মনে ব্যগ্র হয়ে আছে। সেই রন্ধ্র পথে ঢুকে দেখ যদি কিছু করতে পার।

বিষ্ণু। বেশ, সেই চেষ্টাই করি তাহলে।

পিতামহ : হ্যাঁ, যাও।

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-পাত হইল।

ক্ষণপরেই দেখা গেল মর্তের এক গহন কান্তারে বিশাল এক ময়ুর পেখম বিস্তার করিয়া একটি তন্বী ময়ূরীকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

॥ ১৩ ॥

প্রখর সূর্যালোকে চার্বাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া প্রথমেই সে দেখিতে পাইল আলুলায়িত-কুন্তলা নীলোৎপলা ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নীলোৎপলাই প্রথমে কথা কহিল।

"আপনি যে ঘরে শয়ন করেন সেই ঘরের কোণে একটি ভাণ্ডে সুরা ছিল, তা কি আপনি পান করেছেন ?"

চার্বাক সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গেল। এতক্ষণ সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল তাহা যে সুরা-জনিত অলীক স্বপ্ন নিমেষের মধ্যে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে আত্মস্থ হইল, সূর্যালোক-স্পর্শে কুজ্মটিকার রহস্যলোক যেন বিলীন হইয়া গেল।

নীলোৎপলা অধীর ভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বলুন, আপনি কি তা পান করেছেন ?"

"করেছি। ওই ভাণ্ডে আমি নিজের জন্য পানীয় জল রাখতাম। কাল দেখলাম জলের পরিবর্তে সুরা রয়েছে। মনে হল আমার শ্রান্তি অপনোদন করবার জন্যে তুমিই হয়তো তাতে সুরা রেখে দিয়েছ। নারীরা স্বভাবতই করুণাময়ী, আর তুমি তো নারী-শ্রেষ্ঠা।"

"আমিই আপনার জলভাণ্ডে সুরা রেখেছিলাম। কিন্তু ঠিক করুণাবশত রাখিনি। আমার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। কাল আপনি যখন রাত্রে ফিরলেন না তখন বড় ভাবনা হয়েছিল আমার। নিজেই তাই আজ সকালে আপনার

সন্ধানে বেরিয়েছি, আপনাকে জীবিত দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি কি সমস্ত রাত এই মাঠেই পড়েছিলেন ?”

“আমার দেহটা হয়তো ছিল, কিন্তু আমার মন—”

সহসা চার্বাক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নীলোৎপলার দুই হস্ত ধরিয়া প্রদীপ্ত নয়নে কহিল,—“ভদ্রে, গতরাত্রে আমি এক আশ্চর্য জীবন যাপন করেছি।”

“কি রকম।”

“কাল সমস্ত রাত্রি আমি এমন এক রূপকথালোকে বিচরণ করেছি যেখানে অসম্ভব সম্ভব হয়, যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে কোনও প্রভেদ নেই, যেখানে অলীক এবং বাস্তব অভিন্ন। প্রভেদ নির্ণয় করবার উপায় নেই। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল হয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি।”

চার্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলার মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

“বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ তাহলে মিথ্যাভাষণ করেন নি দেখছি। যে সুরা তিনি আমাকে দিয়েছেন তা প্রকৃতই তাহলে আশ্চর্য ফলপ্রদ। আপনার উপর ওই সুরার প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্যই আমি আপনার জলভাণ্ডের জল ফেলে দিয়ে তাতে সুরা রেখেছিলাম। আপনার বিশেষ কোনও কষ্ট হয়নি তো ? চলুন, স্বহস্তে আমি আপনাকে আজ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করে দেব। আহারাদি করে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আজ আর আপনাকে মাটি কাটতে যেতে হবে না।”

“ভদ্রে, আমার সঞ্চিত অর্থ তো কিছু নেই। প্রতিদিন পরিশ্রম না করলে—।”

“আজ অন্তত আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার আজকের পারিশ্রমিক আমিই দেব। আর ওই সুরা-প্রভাবে যদি ধনকুবের মহাশকুন্তকে সম্মোহিত করতে পারি তাহলে কোনদিনই হয়তো আপনাকে আর অর্থোপার্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না !”

“ধনকুবের মহাশকুন্ত ব্যক্তিটি কে ?”

“তিনি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠী একজন।”

“সুরা-প্রভাবে তাকে সম্মোহিত করতে হবে কেন। তোমার সান্নিধ্যই কি যথেষ্ট নয় ?”

“মহাশকুন্ত ধনকুবের কিন্তু জরাগ্রস্ত স্থবির।”

“ও—”

“চলুন সব কথা বলছি আপনাকে। বাড়ী চলুন।”

নীলোৎপলা বলিতেছিল—"কোনও নির্ভরযোগ্য পুরুষকে বিবাহ করে গৃহস্থালি স্থাপন করাই সাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরাপদ পথ। যারা তা করতে পারে তারা ভাগ্যবতী। কিন্তু আমি দুর্ভাগিনী, তাই আমাকে নিত্য নব-পুরুষের মনোরঞ্জন করে জীবিকানির্বাহ করতে হয়। বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ আমার এখানে আসেন মাঝে মাঝে। তিনি আমার দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি সহস্র খদ্যোতের নির্যাস রক্তকমলের মধু, মহুয়া ও আরও নানাপ্রকার উপকরণ দিয়ে এই অদ্ভুত সুরা প্রস্তুত করে আমাকে দিয়েছেন। বলেছেন এই সুরা প্রভাবে আমি নিজের পছন্দমত যে কোনও ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারব।"

"কেন, এ সুরার বিশেষ গুণ কি—।"

"এতে মানুষের কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। এ সুরা পান করলে দুর্বলও নিজেকে সবল মনে করে। ভাবে তার দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হচ্ছে। মনে মনে সে যা হতে চায় এ সুরা প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য তা হতে পারে।"

নীলোৎপলার কথা শুনিতে শুনিতে চার্বাক সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি আমার ছিল কোন-দিন? বৈদিক পণ্ডিতদের অলৌকিক কাব্যকাহিনী আমার মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই হয়তো সুরা-প্রভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি আমি···চার্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। নীলোৎপলা তাহার ব্যর্থজীবনের কাহিনী বলিয়া চলিয়াছিল, তাহার কথা চার্বাকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল বটে কিন্তু হৃদয়-স্পর্শ করিতেছিল না। সহসা নীলোৎপলার একটি প্রশ্নে চার্বাকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"আমি আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি। আমার একটি কাজ করে দেবেন আপনি?"

"বল কি কাজ।"

"আমার একটি আলেখ্য এবং লিপিকা মহাশকুন্তের কাছে পৌঁছে দিন।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"নবীনা গ্রামে। যে প্রান্তরে আপনি কাল সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তরের পশ্চিম দিকে একটি পথ আছে। সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গেলে আপনি একটি তরুবীথিকা দেখতে পাবেন। বকুল, চম্পক এবং কৃষ্ণচূড়া ছাড়া আর কোনও গাছ সেই বীথিকায় নেই। সেই বীথিকা অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হলেই আপনি শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হর্ম্য দেখতে পাবেন। সেই

হর্ম্যের শিখরদেশে দেখবেন বিরাট এক স্বর্ণ কলস শোভা পাচ্ছে। চিনতে কষ্ট হবে না আপনার।"

একজন বার-বনিতার প্রণয়-দৌত্য করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে আত্মসম্মান-হানিকর কি না এ প্রশ্ন চার্বাকের বিবেককে বিব্রত করিল না। অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

"এ উপকারটি করবেন আমার?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ করিল নীলোৎপলা।

"ভদ্রে, তোমার নিকট এ অঞ্চলের অনেক লোক তো প্রত্যহ আসে। তাদের কাউকে নিয়োগ না করে আমাকে তুমি নির্বাচন করছ কেন বুঝতে পারছি না।"

"আমার নিকট যারা আসে তারা দরিদ্র হলেও আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তাদের কারো কাছে এ প্রস্তাব করা অসম্ভব আমার পক্ষে। কথাটা তাদের কাছ থেকে আমি গোপনই রাখতে চাই। আপনার সঙ্গে আমার সে রকম কোনও সম্পর্ক নেই, তাছাড়া যদিও আমি আপনার সম্যক পরিচয় জানি না কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কোনরূপ অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে আমার আশ্রয় নিয়েছেন। সেজন্য মনে করি আপনি যদি ভার নিতে সম্মত হন আমার কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।"

চার্বাক হাসিয়া উত্তর দিল—"তোমার কথা শুনে তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেলাম। সত্যই আমি অবস্থা বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছি। তুমি যে কাজ করতে আমাকে অনুরোধ করছ তা আমি করব। আমি খুশী হব, যদি তুমি আমাকে এর জন্য দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দাও। দশটি স্বর্ণ মুদ্রা পেলে আমি আবার ভদ্রভাবে কোথাও গিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারব।"

নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। ক্ষণ পরে সে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা, হস্তীদন্তের উপর নিপুণভাবে অঙ্কিত একটি আলেখ্য এবং পুষ্পরেণু সুবাসিত একটি লিপি চার্বাকের হস্তে দিয়া বলিল—"আপনার দৌত্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মহাশকুন্তকে যদি বশীভূত করতে পারি আপনার ভবিষ্যতের ভাবনাও আর থাকবে না।"

"আমি এখানে বেশী দিন থাকব না ভদ্রে। তোমার এ কার্যটি সম্পন্ন করে অন্যস্থানে যেতে হবে আমাকে। যে অর্থের অভাবে আমি যেতে পারছিলাম না সে অর্থ তুমি আমাকে দিয়েছ। আর আমার এখানে থাকবার বাসনা নেই। তবে তোমার কাজটি আমি সুসম্পন্ন করে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তোমার লিপিটি বেশ দীর্ঘ মনে হচ্ছে।"

নীলোৎপলা আনত-নয়নে বলিল—"কবি শশাঙ্কের মিলনোৎকণ্ঠা নামক কবিতাটির ভাবানুবাদ করে দিয়েছি আমি নিজের ভাষায়।"

"আমার পরামর্শ যদি শোন, তাহলে তুমি নিজের ভাষায় নিজের ভাবই ব্যক্ত কর। আর সেটা কর সংক্ষেপে। মহাশকুন্ত সত্যই যদি স্থবির হয়ে থাকেন তাহলে দীর্ঘপত্র ক্লান্তিজনক হবে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া কবি শশাঙ্কের কবিতাটি তিনি যদি পড়ে থাকেন তাহলে তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা হবে না তাঁর।"

চার্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

"আমি কি লিখব তাহলে বলে দিন।"

"শুধু লেখ, শুনেছি আপনি সুরসিক, তাই আপনার কাছে পাঠাচ্ছি শিল্পের সামান্য নিদর্শন। যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হব। আরও কৃতার্থ হব, যদি কোনদিন আলাপের সুযোগ দেন—ইতি নীলোৎপলা।"

"ওইটুকু লিখলেই হবে?"

"হবে। ইঙ্গিতময়ী রমণীরাই তো বিজয়িনী হয়। মনের কথা সম্পূর্ণভাবে খুলে বলতে নেই। তার আভাসমাত্রই ফলপ্রদ।"

"বেশ, তাহলে আপনি যা বলছেন তাই করি।"

নীলোৎপলা পাশের ঘরে গিয়া পুনরায় লিপিরচনায় মনোনিবেশ করিল।

॥ ১৪ ॥

ঘন নীল মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মৃদু মৃদু মেঘগর্জন দূরাগত মৃদঙ্গধ্বনির মতো শুনাইতেছে। গহন কান্তারের ঘনশ্যাম শোভা ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। যে ময়ূরটি এতক্ষণ পেখম বিস্তার করিয়া তন্বী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত ছিল সে সহসা উচ্ছ্বসিত কেকারবে কাননকান্তার মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই কেকাধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্টিকর্তার আনন্দ মূর্ত হইয়া উঠিল যেন। মনে হইল সেই ধ্বনির স্পন্দনে স্পন্দনে যেন সৃষ্টি প্রেরণার উল্লাস তরঙ্গিত হইতেছে। তাহারই সংঘাতে যেন নবোদিত নীল জলধরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, কদম্ব-কেশরে শিহরণ জাগিল।

ময়ূররূপী পিতামহ কহিলেন—"সখি এই তো আনন্দ···কিন্তু ·"

তন্বী ময়ূরী এতক্ষণ অন্যমনস্কতার ভান করিয়া শস্যকণা আহরণ করিতেছিল। পিতামহের কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার অপাঙ্গে এক ঝলক হাসি ঝিকমিক করিতে লাগিল কেবল। সে ভাষায় কিছু বলিল না, তাহার হাস্যদীপ্ত অপাঙ্গ দৃষ্টিতেই যেন তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

"কথা বলছ না কেন বাণী ?"

"বলবার তো কিছু নেই।"

"আমি এতক্ষণ কি করছিলাম জান ?"

"জানি।"

"কি বল তো ?"

"নিজের খেয়ালে মত্ত ছিলেন।"

"মত্ত নয়, উন্মত্ত ছিলাম। আমি কি কল্পনা করছিলাম জান ?"

"বলুন, শুনি।"

"আমি কল্পনায় এমন সব কাণ্ড করেছিলাম যে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বকর্মাকে বরখাস্ত করে নিজেই স্বৈরচর সৃষ্টি করতে লেগে পড়েছিলাম। বিষ্ণুকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলাম, গরুড়কে মানুষ করে পাঠিয়েছিলাম হর্ষ-নীড় গ্রামে, মাতাল চার্বাকটা মদের ঘোরে যে সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিল আমি কল্পনা করছিলাম—তুমি বুঝি তার অবচেতনলোকে ঢুকে তাকে ওই সব স্বপ্ন দেখাচ্ছ, এ নিয়ে কল্পনায় তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছি। কশ্যপ, বিনতা, সপ্তর্ষি সবাইকে স্বৈরচর বানিয়ে নানারকম আজগুবি স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম।"

"এখনও হয়তো আছেন।"

"ঠিক ধরেছ। কল্পনার আমার অন্ত নেই। একটা কথা কিন্তু বুঝতে পারছি—একবার যা সৃষ্টি করে ফেলেছি, তার বেশী আর কিছু করা যাবে না। মনে মনে যতই না কল্পনা করি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তাই নানাভাবে বিকশিত হচ্ছে। সবাই মনে করছে নূতন সৃষ্টি হচ্ছে বুঝি, কিন্তু আমি জানি সব পুরোণো। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আর আনন্দ পাচ্ছি না কোন। তাই আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি। কিন্তু আজগুবি কল্পনা নিয়েই বা কতকাল থাকা যায়। কি করি বল তো।"

ময়ূরীর নয়নে আর এক ঝলক হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

ময়ূরী বলিল—"আপনি আপনার প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ বপন করেছেন। অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যেই কি অনন্ত অভিনবত্বের সূচনা নিহিত নেই ? ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা সুপ্ত আছে। সে মহীরুহের জীবন-যাত্রায় যে অসংখ্য উত্থান-পতন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব আপনি সূচিত করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কি আপনি জানেন ?"

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানলেও— "

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন যে, আপনার পুরাতন

সৃষ্টি চিরনূতন। আপনার যে কোনও একটি সৃষ্টির প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করেন তাহলেই আনন্দ পাবেন।"

"কিন্তু আমি আনন্দ পাই সৃষ্টি করে। অন্য আর কিছুতে আমার আনন্দ নেই।"

"আপনার একটি সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই আপনি কল্পনা করুন—তার কি কি পরিণতি হতে পারে, তার পর মিলিয়ে দেখুন—সত্যি সত্যি তা হল কিনা। আপনার প্রতিটি সৃষ্টি নানা সুরে প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। তাদের এই নিরন্তর অনুসন্ধানই আবার পরস্পরকে ব্যর্থও করে দিচ্ছে। শার্দূলের আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে হরিণের প্রচেষ্টাকে। হরিণ আবার তৃণদলের প্রকাশ-লীলাকে বিঘ্নিত করছে, তৃণদল বাধা দিচ্ছে মহীরুহদের, কিছুতেই তাদের বীজকে ভূমিস্পর্শ করতে দিচ্ছে না। বিশ্ব জুড়ে এই চলছে।"

"তুমি এই সব লক্ষ্য করেছ?"

"আমি যে সকলেরই আত্মপ্রকাশের ভাষা।"

"ও, তুমি যে বাণী। সব সময়ে মনে থাকে না কথাটা। যা বলছ তা মন্দ নয়। কাকে লক্ষ্য করা যায় বল তো।"

"আপনার ওই চার্বাককেই করুন না।"

"বেশ। তুমি চললে কোথায়?"

"ওই মেঘলোকে। ও অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে আমাকে।"

ময়ূরী পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মেঘলোকে বিলীন হইয়া গেল।

॥ ১৩ ॥

শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হস্তে নীলোৎপলার লিপি এবং আলেখ্য সমর্পণ করিয়া চার্বাক প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। শ্রেষ্ঠী যে নীলোৎপলার আমন্ত্রণে পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাব দেখিয়াই চার্বাক অনুমান করিতে পারিয়াছিল। নবীনা গ্রামে দুই চারিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া চার্বাক ইহাও শুনিয়াছিল যে মহাশকুন্তের প্রথমা পত্নী বহুকাল পূর্বে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর মহাশকুন্ত আরও চারবার বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পত্নী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, একটি পত্নী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে, চতুর্থা পিতৃগৃহে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং মহাশকুন্ত আর্থিক জগতে সমৃদ্ধিশালী হইলেও মানসিক জগতে

অতি দরিদ্র। কোনও রমণী, যদি তাহার এই আন্তরিক বুভুক্ষাকে শান্ত করিতে পারে তাহা হইলে মহাশকুন্ত যে তাহার নিকট ক্রীতদাসবৎ থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুরাপ্রভাবে নীলোৎপলা সত্যই যদি এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা হইলে সে-ই মহাশকুন্তের এই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। নীলোৎপলার বাক্যগুলি পুনরায় চার্বাকের মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে তাহার মনস্কাম যদি পূর্ণ হয় তাহা হইলে চার্বাকের জীবনের অর্থ সমস্যাও সে সমাধান করিয়া দিবে। চার্বাককে আর কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইবে না। চার্বাক চিন্তা করিতেছিল—কি করা উচিত? নীলোৎপলার নিকট ফিরিয়া যাওয়াই কি সঙ্গত হইবে? স্বার্থের দিক দিয়া ভাবিলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু চার্বাকের ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যে বর্ণ সমারোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা যেন বর্ণের অবর্ণনীয় ভাষায় তাহাকে বলিতেছিল, তোমার নিকট তো দশটি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, তবে আবার কেন ওই কুৎসিত উপযাচিকার নিকট যাইতে চাহিতেছ, তোমার মানসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর, মধ্যপ্রদেশ কত দূর?

চার্বাক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণচূড়ার শিখরে শিখরে কামনার লেলিহান শিখা জ্বলিতেছে, স্বর্ণকান্তি চম্পকের উগ্র গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত, বকুল তরুর নিম্নে সহস্র সহস্র বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া পাপিয়া সারা আকাশকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এক অনির্বচনীয় রসে চার্বাকের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি যদি সুরঙ্গমার হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে তাহা হইলে সে যুক্তির মূল্য কি? সুরঙ্গমাকে কাছে পাইলে···সহসা সে দেখিতে পাইল চক্রবালরেখালগ্ন পথ বহিয়া শকটশ্রেণী চলিয়াছে। তাহার মনে হইল ওই শকট-চালকগণ নিশ্চয়ই দেশের পথঘাটের সহিত পরিচিত, কোন পথে গেলে মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায় এ খবর উহারাই হয়তো দিতে পারিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া চাবাক শকটশ্রেণীর উদ্দেশ্যে পদচালনা করিল। সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। নির্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্য জ্বলিতেছে। উপল-বহুল প্রান্তর অমসৃণ ও বন্ধুর। চার্বাকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল, তাহার সমস্ত সত্তা একাগ্র হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে বকুলচম্পকের গন্ধে, কৃষ্ণচূড়ার বর্ণ-মহিমায়, নীলাকাশে প্রতিফলিত স্বচ্ছ স্বর্ণকিরণ জালে, পাপিয়ার আকুল সঙ্গীত ধারায় যাহা সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার জীবনেও আনন্দময় রূপ পরিগ্রহ করিবে—যদি সে সুরঙ্গমার হৃদয় জয়

করিতে পারে এবং কিছুদিন যদি সুরঙ্গমার নিকটে থাকিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহার অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চয়ই সে আলোকপাত করিতে পারিবে এবং আলোকপাত করিলেই...।

শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া চার্বাক ছুটিতে লাগিল।

চার্বাকের মাথার উপরে দুইটি চিল চক্রাকারে উড়িতেছিল। প্রথম চিল দ্বিতীয় চিলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"পিতামহ, ছুটন্ত চার্বাককে দেখে কি বুঝতে পারছেন যে এর পর ও কি করবে ?"

"না, ঠিক পারছি না। ভৃগু হয়তো পারতো। যে রকম ছুটছে ভয় হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে না যায়—বা! বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে!"

"আমি তো বলেছিলাম আপনার যে কোনও সৃষ্টির প্রতি মুহূর্তের বিকাশ যদি লক্ষ্য করতে পারেন, তা কাব্যের মতো মনোরম হবে।"

"দেখ, দেখ, বেশ বড় একটা গর্ত ও একলাফে পার হয়ে গেল। বাহাদুর আছে ছোকরা।"

"লক্ষ্য করে দেখলে আপনার প্রত্যেক সৃষ্টিই নানা রসের আধার।"

"কিন্তু নিজের সৃষ্টির পিছনে দৌড়োদৌড়ি করতে বেশীক্ষণ ভাল লাগবে কি! বিশেষ করে এই চড়চড়ে রোদে।"

"চলুন, এই বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক—পাতার আড়ালে বসে বসে লক্ষ্য করা যাক কি করে ও।"

"শাখাপত্র-নিবিড় এক বিশাল মহীরুহের উচ্চ-শিখরে উপবেশন করিয়া পিতামহ বলিলেন—"এখন মন্দ লাগছে না। ছোকরা এখনও ছুটে চলেছে দেখছি।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পিতামহ পুনরায় বলিলেন—"কিন্তু তুমি যাই বল বাণী, ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খানিকটা সময় কাটানো যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল আনন্দ কল্পনায়।"

"বেশ তো কল্পনা করুন না আপনি।"

"বেশ আমি কল্পনা করছি তুমি তাতে ভাষা দাও। এ রকম একঘেয়ে বসে থাকতে ভাল লাগবে না বেশীক্ষণ।"

"বেশ। কল্পনা করুন, আমি তাদের ভাষা যোগাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"দেখ, কয়েকদিন আগে কল্পনা করেছিলাম তুমি যেন আমাকে ভবিষ্যৎ যুগের চার্বাকের গল্প শোনাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। ওই কল্পনাটাই রং দিয়ে ফলাও করা যাক, কি বল ?"

"করুন।"

"ভবিষ্যৎ যুগের চার্বাকরা কি রকম হবে বল দেখি ?"

"বৈজ্ঞানিক হবে। যন্ত্র আবিষ্কার করবে নানারকম।"

"কি করে বুঝলে ?"

"ওই যে চার্বাক এখন মাঠ ভেঙে ছুটছে আমিই যে তার মনের ভাষা। ও চাইছে ওর শক্তি শতসহস্র গুণ বর্ধিত হোক। যে সীমা ওর চলচ্ছক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তিকে আবদ্ধ করে রেখেছে সেই সীমাকে ও লঙ্ঘন করতে চায়। সুরঙ্গমাকে দেখবার জন্যে যে কামনা ওকে উতলা করেছে সেই কামনাসিদ্ধির যত রকম বাধা আছে বুদ্ধিবলে তা ও নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়।"

"ও বাবা!"

"আশ্চর্য হচ্ছেন কেন এতে। আপনি যে সীমা সৃষ্টি করেছেন সে সীমা লঙ্ঘন করবার বুদ্ধি এবং শক্তিও যে আপনি সৃষ্টি করেছেন।"

"তা তো করেছি। কিন্তু সব রকম সীমা লঙ্ঘন করে ওরা গিয়ে থামবে কোথায় শেষটা।"

"ওরাও থামবে না, আপনার কল্পনাও থামবে না।..."

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"আমি একটু আগে কালকূট নামে এক পাতালনিবাসী নাগবংশীয় রাজপুত্রকে কল্পনা করেছিলাম—সে তার প্রেয়সীকে পায়নি, কেবল দূর থেকে তার আভাস পেয়েছিল। তাকেও ভবিষ্যযুগের কল্পনায় আনব কি ?"

"ক্ষতি কি। ভবিষ্যযুগেও ওরকম লোক থাকবে।"

"বেশ। আরম্ভ করা যাক তাহলে।"

"করুন।"

শকটশ্রেণীর সমীপবর্তী হইয়া চার্বাক দেখিল যে প্রত্যেক শকটে বৃহদাকৃতি কলস সজ্জিত রহিয়াছে। একজন শকট চালককে সম্বোধন করিয়া সে বলিল— "ভাই, আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের শকটে একটু স্থান পেতে পারি কি ?"

"পিছনের কোন শকটেই স্থান নেই। প্রথম শকটে আমাদের নায়ক আছেন, সেখানে স্থানও আছে। তিনি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর কাছে যান, তিনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন।"

"এ সব কলসে কি আছে ?"

"ঘৃত।"

"এত ঘৃত কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ?"

"কুমার সুন্দরানন্দ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, তাতেই এই সব ঘৃত লাগবে।"

"কোথায় যজ্ঞ হবে ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। আমরা শ্রৌণী গ্রামে এই কলসগুলি পৌঁছে দেব। সেখান থেকে আর একদল শকট এগুলিকে বহন করবে, কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না, আমাদের নায়ক হয়তো জানেন।"

চার্বাকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমাদের নায়কের নাম কি ?"

"গুণপতি।"

আর বাক্যালাপ না করিয়া চার্বাক প্রথম শকটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চার্বাককে দেখিবামাত্র গুণপতি হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন—"আসুন, আসুন, মহর্ষি চার্বাক, আপনাকে এখানে দেখব প্রত্যাশা করিনি। কোথায় চলেছেন ?"

"শ্রৌণী গ্রামে যাব।"

"আমরা তো সেখানে চলেছি। সুন্দরানন্দের মহাযজ্ঞে আপনিও একজন ঋত্বিক না কি ?"

"আপনার শকটে একটু স্থান হবে কি ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন।"

চার্বাক শকটে আরোহণ করিল। পূর্বপরিচিত গুণপতিকে দেখিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও তাহার মুখমণ্ডলে সে ভাব প্রকটিত হইল না।

গুণপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি যজ্ঞে যোগদান করতে যাচ্ছেন ?"

চার্বাক মৃদুহাস্য করিয়া কহিল—"যজ্ঞে যোগদান করাই তো প্রচলিত রীতি।"

"নিশ্চয়। এ যজ্ঞটিও একটু নূতন ধরনের হচ্ছে। শুনছি বিদেশ থেকে এক ম্লেচ্ছ রাজা এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে সুন্দরানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, বন্ধুত্বও হয়েছে। তিনিই নাকি সুন্দরানন্দকে এই যজ্ঞ করতে উৎসাহিত করেছেন।"

"এ যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক কে ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি যে মহর্ষি পর্বত ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ অশ্ববাহিত রথে কয়েকদিন পূর্বে যাত্রা করেছেন। আপনিও নিশ্চয় নিমন্ত্রিত হয়েই যাচ্ছেন ?"

চার্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল গুণপতি ব্যঙ্গ করিতেছেন কি না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখা গেল না যাহা সন্দেহজনক।

"না, আমি নিমন্ত্রণ পাইনি। আমি তো ছিলাম না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ?"

"দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি।"

"ও।"

এইবার কিন্তু গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা ধরা পড়িল। চার্বাক বুঝিতে পারিল যে গুণপতি সমস্ত খবরই জানেন। চার্বাক নীরব হইয়া রহিল।

গুণপতি বলিলেন—"তাই আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার দেখা পাইনি।"

চার্বাক নীরব হইয়াই রহিল। কারণ—ঠিক ইহার পরই যে প্রসঙ্গ অনিবার্য-ভাবে আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা হইতেছিল তাহা প্রীতিকর তো নহেই, বর্তমান মুহূর্তে অসুবিধাজনকও।

গুণপতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"অবশ্য এটা আমি জানি যে আমার টাকা মারা পড়বে না। যেদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেইদিনই আপনি ঘিয়ের দামটা দিয়ে দেবেন।"

চার্বাক বুঝিল—বিস্মৃতির দোহাই না পাড়িলে মানরক্ষা হইবে না।

"আপনি ঘিয়ের দাম পাবেন নাকি আমার কাছে ? আমার মনেই নেই।"

"তাতে কি হয়েছে। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তো আপনাদের মনে থাকবার কথাও নয়। কত বড় বড় দার্শনিক ব্যাপার নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন আপনারা।"

গুণপতির অতিবিনীত ভাষণে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহাতে চার্বাক বিশেষ বিব্রত বোধ করিল না। এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গ ও রূঢ়তর ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। মনে মনে সে চিন্তা করিতে লাগিল গুণপতির সহিত কিরূপ আচরণ এখন সঙ্গত অর্থাৎ সুবিধাজনক হইবে। বৎসরাধিককাল গুণপতি তাহাকে ধারে উৎকৃষ্ট ঘৃত সরবরাহ করিয়াছে। সমস্ত মূল্য যদি এখনই শোধ করিতে হয় অন্তত দুইটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ হইয়া যাইবে। খরচ করিতে চার্বাকের আপত্তি ছিল না, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়াই সে শঙ্কিত হইতেছিল। মাত্র দশটি স্বর্ণমুদ্রাই তাহার সম্বল, তাহার পঞ্চমাংশ যদি ঋণ-শোধ করিতেই চলিয়া যায় তাহা হইলে—। সহসা চার্বাক ভীত হইয়া পড়িল। সুন্দরানন্দের রাজত্বে কেবল গুণপতির নিকটেই যে সে ঋণী তাহা নয়,

অনেকেই তাহার নিকট টাকা পাইবে। সুরা-বিক্রেতা সুসেনও কি সুন্দরানন্দের যজ্ঞ দেখিতে যাইতেছে না কি! তাহার নিকট যে অনেক ধার! ব্যাধ গম্ভীরের নিকটও অনেক মৃগমাংস ও বন্যকুক্কুটের মূল্য বাকী আছে। ইহাদের সকলের সহিত যদি সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে তো সে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে! কিন্তু—। সহসা সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। সুরঙ্গমার নিকট যখন যাইতেই হইবে তখন গুণপতিকে খুশী না করিয়া উপায় নাই।

"কত পাবেন আপনি?"

"বেশী নয়। মাত্র পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা।"

"আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।"

"বেশ, আমি ভাঙিয়ে দেব।"

চার্বাক স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।

॥ ১৬ ॥

চিল-রূপে পিতামহ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি হইতে লাগিল। সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাণী, ছোঁ মারতে ইচ্ছে করছে। ওই যে লোকটা ঠোঙায় করে তেলে-ভাজা নিয়ে যাচ্ছে।"

চিল-রূপিণী বাণী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"ওই সব দিকে যদি আপনার মন যায়, তাহলে আর গল্পে মন দেবেন কি করে?"

"তা বটে। কিন্তু তেলে-ভাজাও নিতান্ত খারাপ জিনিস কি?"

"তাহলে তেলে-ভাজা নিয়েই থাকুন। ভবিষ্যযুগের চার্বাকের গল্প থাক তাহলে।"

"না, না—ওটা শুনতেই হবে। তাহলে এক কাজ করি এস, এই চিল-রূপ পরিত্যাগ করি। কারণ যতক্ষণ চিল থাকব ছোঁ মারতে ইচ্ছে করবে খালি। হাঁস হতে আপত্তি আছে?"

"আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু হাঁস হলে একটা বিপদ আছে। হাঁস হলে অনেক শিকারীর লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা অবশ্য মরব না, কিন্তু গল্পটা বিঘ্নিত হবে।"

"গল্প তৈরী হয়ে গেছে না কি?"

"অনেকক্ষণ! বাইরে আপনি তেলে-ভাজার দিকে নজর দিল্লেও আপনার মনের আকাশ যে অনেক আগেই কল্পনার রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে।"

"কি করে বুঝলে ?"

"বাঃ, আমি বাণী, আমি বুঝব না ?"

"সঙ্গে সঙ্গে গল্পও বানিয়েছ ?"

"গল্পটা কিন্তু শুনতে হবে একজন কবির মারফত। ঠিক শুনতে নয়—দেখতে হবে।"

"দেখতে হবে ? তার মানে।"

"সে লিখে যাবে, আর তার মনের ভিতর বসে আপনি দেখবেন। আপনার একটা অংশ তার মনকে কল্পনাবিষ্ট করবে—আর একটা অংশ তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখবে সে কি লিখছে।"

"আর তুমি কোথা থাকবে ?"

"তার লেখনীর মুখে।"

"বুদ্ধিটা মন্দ করনি। চল, তাহলে হাঁসই হওয়া যাক। নীল রঙের হাঁস হলে কেউ আমাদের আর দেখতে পাবে না। আকাশের সঙ্গে মিশে যাব আমরা।"

"বেশ।"

"চার্বাক সামনের গাড়িতে বসে বেশ খোশগল্প জমিয়েছে দেখছি ! আচ্ছা এত গাড়ি কোথা চলেছে ? বড় বড় সব কলসী রয়েছে প্রত্যেক গাড়িতে। ব্যাপারটা কি ?"

"মনে হচ্ছে ওগুলো ঘৃতপূর্ণ। কোথাও যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে বোধহয়। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি, দেখতেই পাবো সব।"

ক্ষণকাল পরে উর্ধ্বে ঘন-নীল-বর্ণ হংস-মিথুন শকটশ্রেণীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপরে নিঃশব্দে পাখা ঘুরিতেছে। নিঃশব্দে জ্বলিতেছে বৈদ্যুতিক আলোটা। মনে হইতেছে যেন এক বিচিত্রবেশী বৃহৎ পতঙ্গ কবির টেবিলের উপর নীরবে বসিয়া আছে, অপরূপ-জ্যোতিতে তাহার সর্বাঙ্গ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন সবিস্ময়ে দেখিতেছে কবি লিখিতেছেন।

ভবিষ্যযুগের কবি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার প্রেরণার মূলে যে সৃষ্টিকর্তা পিতামহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ভাবকে ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং বাণী যে লেখনীমুখে প্রচ্ছন্নরূপে আসিয়াছেন—এসব কথা কবির সুদূরতম

কল্পনাতেও ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি নিজেই বুঝি স্রষ্টা। কথা ও কাহিনী সবই বুঝি তাঁহার নিজস্ব।

আবেগভরে লিখিতেছিলেন তিনি।

"যা চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে গেছে তাকে, মানে, তার দেহটাকে—অভিমান-ভ্রূভঙ্গী-হাসির ঝলক যে তন্বী দেহটাকে ক্ষণে ক্ষণে স্থুলতার সীমা পার করে নিয়ে যেতে চাইত কিন্তু পারত না এবং সেই পারা-না-পারার দ্বন্দ্ব আরও অপরূপ করে তুলত যাকে—সেই দেহটাকে, আলিঙ্গন-পাশে বাঁধবার সম্ভাবনাটুকুও যখন অবলুপ্ত হল তখন তাকে নূতন রকমে যে আবার পাওয়া যেতে পারে এ আশা আমার মনে জাগেনি কোনদিন। কল্পনায় তাকে পাচ্ছিলাম অবশ্য অহরহ, নানা রূপে, নানা বেশে, নানা ভঙ্গীতে—আমার চেয়ে ঢের বেশী বিদ্বান, ঢের বেশী রূপবান, তাকে বিয়ে করেছে এ জেনেও ক্ষণকালের জন্য তাকে পর ভাবতে পারিনি, আমি নিজেও বিয়ে করেছি একজন অনবদ্যা সুন্দরীকে, কিন্তু আমার মানসলোক পূর্ণ করে রেখেছিল আলেয়া—হ্যাঁ, মনে মনে তাকে পাচ্ছিলাম অহরহ, কিন্তু বাস্তবেও যে তাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পেয়ে যাব, পাওয়া যে সম্ভব, একথা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। পেয়ে গেলাম কিন্তু। অভিনব উপায়ে। আপিসের ছুটি ছিল সেদিন। বউবাজার স্ট্রীটে যে বোর্ডিং হাউসে থাকতাম তারই ছাতে উঠে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম। মনের মধ্যে অসংখ্য মধুকর যেন গুঞ্জন করছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কোন বসন্তের আগমনী গাইছে ওরা? একটা খামখেয়ালী এলোমেলো হাওয়া চারদিক তোলপাড় করছিল। কোলকাতা শহরের হট্টগোলও যেন মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছিল সেই হাওয়ার তোড়ে···অসংখ্য মধুকর গুঞ্জন করে চলেছিল আমার মনে · এমন সময়, বসন্ত নয়, হঠাৎ বর্ষার সম্ভাবনা সূচিত হল ঈশান কোণে। মুগ্ধ নেত্রে উদীয়মান নব-জলধরের দিকে চেয়ে রইলাম। আকাশ পরিব্যাপ্ত করে মদমত্ত ঘনকৃষ্ণ হস্তীযূথ ছুটে আসছে! সেই কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটা শাদা বাড়ি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতিপূর্বে শাদা বাড়িটা একাধিকবার আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু ওর বিশিষ্ট রূপটা ইতিপূর্বে দেখিনি। কালো মেঘের পটভূমিকায় সেদিন প্রথম দেখতে পেলাম। মনে হল যেন বাড়ি নয়, অহল্যা, অভিশপ্তা-পাষাণী, বুক-ভরা তৃষ্ণা, মুখে ভাষা নেই, নবোদিত মেঘের দিকে চেয়ে আছে অবরুদ্ধ মৌন প্রত্যাশায়। তারপরই ঠিক ··নবোদিত মেঘে তখনও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয়নি ···আমার সমস্ত দেহে, শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। ওই পাষাণ-

অট্টালিকার ক্ষুদিত আত্মাকে যেন মূর্ত দেখলাম। ছাতের উপর আলসে ধরে চেয়ে আছে মেঘের দিকে, নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে, নীলাম্বরীর আঁচলটা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে, মনে হচ্ছে তার মৌন অধীরতা যেন ভাষা পেয়েছে ওই উড়ন্ত অঞ্চলপ্রান্তে, যেন ওর সমস্ত সত্তা উড়ে যেতে চাইছে অসীম আকাশে ওই কালো মেঘের দিকে···হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথার কাপড়টা সরে গেল, আলেয়াকে চিনতে পারলাম। আলেয়া? এত কাছে আছে? নিরুপমবাবু এলাহাবাদ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন না কি! এর পর খানিকক্ষণ আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক কি করেছিলাম, কি ভেবেছিলাম মনে নেই। ঘণ্টাখানেক পরে আপাদমস্তক জলে ভিজে দুরবীণটা কিনে যখন বাসায় ফিরলাম তখন আলেয়া ছাত থেকে নেমে গেছে। তখন তাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তার পর থেকে অনেকবার দেখেছি। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন ঘটনার আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যে বহুবার কাছে পেয়েছি তাকে। অনেক দূরে নাগালের বাহিরে যে বীণাটা বাজছিল ওই দূরবীণের সহায়তায়, তার নানা আলাপ নানা ঝঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ করে তুলেছে আমার ক্ষুধিত চিত্তকে। বস্তুতঃ, ওই দূরবীণটাই শেষে হয়ে উঠল আমার অবসরবিনোদনের একমাত্র সঙ্গী এবং ওই দূরবীণের মাধ্যমেই আমি শিখর সেনকেও আবিষ্কার করলাম।

আমি শিখর সেনের গল্পটাই লিখতে বসেছি। আমার কথাটা এসে পড়ল প্রসঙ্গত। শিখর আমার বাল্যবন্ধু। তাকে কিন্তু আমি চিনিনি। আমার জীবনে যেমন মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটেছে তার জীবনে যে তেমনি ঘটেছিল তা আমি অনেকদিন জানতামই না। শিখর স্বল্পভাষী লোক ছিল, তাছাড়া অনেকদিন ছাড়াছাড়িও হয়েছিল আমাদের। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই চাকরী নিতে হয়েছিল আমাকে, শিখর গিয়েছিল কলেজে। পিতৃমাতৃহীন শিখরকে মানুষ করেছিলেন তার বিপত্নীক মামা। তিনিই তাকে এম. এস. সি পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। শিখরের খবর আমি মাঝে মাঝে পেতাম চন্দ্রমোহনের কাছে। চন্দ্রমোহন আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল। একই গ্রামে বাস ছিল তাদের। তাই মাঝে মাঝে চন্দ্র-মোহনের সঙ্গে যখন দেখা হত তখন শিখরের খবর পেতাম। চন্দ্রমোহন লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কিন্তু ব্যবসা করে প্রচুর উন্নতি করেছে সে। বাড়ি কিনেছে কোলকাতায়। ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই আসতে হয় তাকে এবং যখনি আসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তার মুখেই শিখর সেনের অনেক খবর পেয়েছি। শিখর সেন প্রথম যৌবনে যে ডায়েরি লিখত সেই ডায়েরিটাও হস্তগত করেছিল চন্দ্র-মোহন। বলেছিল, শিখর সেন যখন মামার সঙ্গে কলহ করে চলে আসে তখন

তার মামা শিখরের সমস্ত বই খাতা বিক্রি করে দেন এক মুদিকে। সেই মুদির দোকান থেকে সে উদ্ধার করেছিল ডায়েরিটা। এই ডায়েরির পাতাতেই শিখরের প্রথন যৌবনের প্রণয় কাহিনীটা লিপিবদ্ধ আছে। এ কাহিনী আমি জানতাম না। তার জীবনের দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ মামার সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কোলকাতায় সে যে জীবন যাপন করেছে সেই জীবনের খানিকটা, আমি শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে। কিছু কিছু আমি নিজেও দেখেছি স্বচক্ষে। অর্থাৎ শিখর সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তার সবটা আমার প্রত্যক্ষ নয়। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি, কল্পনাও করেছি কিছুটা। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কি এই তিনের সমন্বয় নয়? আমার নিজের জীবনের সঙ্গে ওর জীবনের অদ্ভুত রকম একটা মিল আছে বলেই ওর কাহিনীটা লিখতে বসেছি। দূরবীণের ভিতর দিয়ে আমার আলেয়ার অপরূপ আবির্ভাব দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেলাম শিখর সেনকে, এক নূতন শিখর সেনকে, যাকে আমি চিনতাম না। দেখলাম সেও অনুসরণ করছে আর এক আলেয়াকে। মনে হল সে শিখর সেন নয়, পতঙ্গ, আমারই মতো পতঙ্গ, প্রদক্ষিণ করে চলেছে এক জ্বলন্ত শিখাকে, যে শিখা শেষে তাকে—কথাটা মনে হলে এখনও আমি শিউরে উঠি। উমেশ মামার (আমার সেই আত্মীয় পুলিশ অফিসারটির) কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ভয় হয়, আমারও ওই পরিণাম হবে না কি! মাঝে মাঝে লোভও হয়, মনে হয় আহা সত্যিই যদি ওরকম পরিণাম, ওরকম নাটকীয় পরিণাম আমার জীবনেও হত, ওরকম একটা তীব্র জ্বালাময় আনন্দময় দৃশ্যের শেষে আমার জীবনেও সত্যি যদি যবনিকাপাত হত, কি ক্ষতি ছিল তাতে? শিখর সেনকে ঈর্ষা হয়। নিজের আদর্শ থেকে সে চ্যুত হয়নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সত্যকে আঁকড়ে ছিল।...”

এই পর্যন্ত লিখিয়া লেখক থামিয়া গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। বিদ্যুৎ-প্রদীপ্ত টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কাহিনীর গঠন-কৌশল কিরূপ হইবে সেই চিন্তায় তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, সীমাহীন কল্পনালোকে দিশাহীন হইয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা কাহিনীর সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু টেবিল ল্যাম্পকে দেখিতেছিলাম না। তিনি উৎসুক নেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন যাহা সহজে দেখা যায় না, যাহা মাঝে মাঝে সহসা দেখা দেয়। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া অবশেষে তিনি যে অধ্যায়টি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার নামকরণ করিলেন—‘কমল-কিশোরের আত্মকথা’। তাহার পর আর একটি ছোট

কাগজে লিখিয়া রাখিলেন—'শিখর সেনের কলিকাতা প্রবাসের ডায়েরি'। তাঁহার মনে হইল এই দুই অংশে গল্পটি বলিলে সম্পূর্ণভাবে গল্পটি বলা হইবে।

অগণিত নক্ষত্রের আলোকে আকাশ ঝলমল করিতেছে। আস্তাচলচূড়াবলম্বী শুক্লা তৃতীয়ার শশী দিগন্তরেখায় মোহাচ্ছন্ন মানসে স্বপ্নলোক সৃজন করিতেছে। আলো-আঁধারির প্রহেলিকায় মহাকাশ রহস্যময়, ছায়াপথের নিহারিকা-লোকে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা আহত বীণাতন্ত্রীবৎ কম্পিত হইতেছে। পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে নীল হংস-মিথুন।

পিতামহ বলিলেন—"কমল-কিশোরই কালকূট হয়ে উঠল না কি শেষে।"

বাণী উত্তর দিলেন—"স্রষ্টার কল্পনায় যা একদা কালকূট ছিল তাই যদি এখন কমল-কিশোর হয়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পঙ্কই তো পঙ্কজে রূপান্তরিত হয়।"

"এক্ষেত্রেও তা হচ্ছে কি? কালকূটই কি কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হচ্ছে? বিশ্বাস কর বাণী, আমি যখন সৃষ্টি করি তখন বুঝতেই পারি না যে ছাই পাঁশ কি হচ্ছে। একটা অদ্ভুত আনন্দ-স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে যা দেখি বা অনুভব করি, তাই আমার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কি যে হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না তুমি যতক্ষণ না তাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দাও। আমার ভাবের তুমিই ভাষা। তাই তোমাকে জিগ্যেস করছি, কালকূটই কি কমল-কিশোর হয়ে ফুটছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কালকূটের কামনা ওর মধ্যে ফুটেছে; কিন্তু সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখনও।"

পিতামহ আর কোন কথা বলিলেন না।

নীল হংস-মিথুন পুনরায় উড়িয়া চলিল। তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, অস্তগামী চন্দ্রকে তাহারা বুঝি কিছু বলিবে, তাই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গিয়াছে।

কবি পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শিখর সেন সত্যই শেষ পর্যন্ত সত্যকে আঁকড়ে ছিল। Everything is fair in war and love—এই বিদেশী প্রবচনের নির্দেশ মানেনি সে। সে মেনেছিল বিবেককে। বিবেকের বাঁধনে সে নিজেকেও বেঁধেছিল, অবন্ধনাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। অবন্ধনা কিন্তু বাঁধা পড়েনি। শিখর সেনের ক্ষণিকের দুর্বলতার ছিদ্র দিয়ে সেই যে সে পালিয়েছিল আর ধরা দেয়নি। তাকে কাছে পেয়েও আর অধিকার করতে পারেনি শিখর। তার ধারণা হয়েছিল—ভুল ধারণাই

হয়েছিল—যে অবন্ধনা যে পাপ-পথে নেমেছে সে পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনতে পারলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়ে যায়নি, অত সহজে কিছুই ঠিক হয়ে যায় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবন্ধনাকে শিখর ভালবাসেনি ঠিক অর্থাৎ ভালবেসে অন্ধ হয়ে যায়নি। যে ভালবাসা অন্ধ করতে পারে না সে ভালবাসার জোর কতটুকু? সে যে অন্ধ হয়নি, অবন্ধনা তা বুঝেছিল। আমার মনে হয় সেই জন্যই সে ধরা দেয়নি, পাপ-পথ থেকেও নড়েনি একচুল। অবন্ধনার বাবা অদ্ভুত লোক ছিলেন শুনেছি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যান, সন্ন্যাসী হয়ে নয়, জাহাজের নাবিক হয়ে। অবন্ধনার তখন জন্মও হয়নি। যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, যদি মেয়ে হয় নাম রেখ অবন্ধনা, আর যদি ছেলে হয় তাহলে রেখ মহাকাল। মহাকাল মুখোপাধ্যায়, মন্দ শোনাবে না।' তাঁর নিজের নাম ছিল নীলাম্বর। তিনি আর ফেরেনই নি। ফিরলে হয়তো শিখর সেনের জীবন-কাহিনী অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু আমার মনে হয় এতই গতানুগতিক হত তা যে 'কাহিনী' কথাটার পুরো স্বাদ পাওয়া যেত না তাতে। নীলাম্বর মুকুজ্যে ফিরলে শিখর সেনের জীবনের এই সমুজ্জ্বল মর্মান্তিক পরিণতি আমরা দেখতে পেতাম কি না সন্দেহ। বিদ্রোহী নীলাম্বর জাতের গণ্ডী অনায়াসেই ডিঙিয়ে যেতেন, শিখরের সঙ্গে অবন্ধনার বিবাহের কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাহিনীটা জমবে বলেই অবন্ধনাকে জন্মাতে হল তার দূরসম্পর্কীয় পিসেমশাইয়ের আশ্রয়ে গোঁড়া গাঙুলী পরিবারে। সে পরিবারের কর্তা কয়াধুনাথ গাঙুলীকে গ্রামের রসিক ছোকরারা বলত কয়েদী গাঙুলী, এত রকম আচার-বিচারের শৃঙ্খলে তিনি নিজেকে বন্দী করে রাখতেন। আমি দেখেছি ভদ্রলোককে। শীর্ণ-কান্তি লোকটি, শ্যামবর্ণ, বেঁটে, কপিশ বর্ণের গোঁফ-দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, চোখ দুটি ছোট ছোট রক্তবর্ণ। কয়াধুনাথের পিতা ভবতোষ গাঙুলী ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নাস্তিক ছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের চেয়ে দৈত্যদের তিনি নাকি শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তাই ছেলের ওই রকম অদ্ভুত নামকরণ করেছিলেন। বিদ্রোহী হিরণ্যকশিপুকে বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল হিরণ্যকশিপু একজন খাঁটি ভারতীয় বীর ছিলেন, বিজয়ী আর্য রাজাদের অনুগ্রহলালিত পুরাণকারেরা বিদ্বেষবশত তাঁর গায়ে মিথ্যা কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে। তিনি বলতেন পরবর্তী যুগেও এ ঘটনা ঘটেছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট বাঙালী বীর শশাঙ্ককে হেয় করতে কুণ্ঠিত হননি। কয়াধুনাথ নিজ পুত্রের নাম যদি প্রহ্লাদ রাখতেন বেশ মানানসই হত—কিন্তু তিনি সুর আর একটু চড়িয়ে ছেলের নাম রাখলেন জগন্নাথ। ভবতোষ ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক,

কয়াধুনাথ হলেন গোঁড়া আস্তিক। জগন্নাথ হয়েছেন গোঁড়া কেরাণী। আস্তিক্য নাস্তিক্য কোন কিছুরই ধার ধারেন না তিনি।

এই কয়াধুনাথের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নীলাম্বর-দুহিতা অবন্ধনা যে ইতিহাস সৃষ্টি করল তা চিরন্তন ইতিহাস। একজন ধনীর ড্রয়িংরুমে আমি একবার এই চিরন্তন ইতিহাসের অপরূপ নজির দেখেছিলাম মনে পড়ছে। সুদৃশ্য টবে একটি বিদেশী ফুল ফুটেছিল। ড্রয়িংরুমের জানালাগুলো বন্ধ ছিল কাচের দরজা দিয়ে তবু কিন্তু সেই বন্দিনী বিদেশিনীর বর্ণমদির গন্ধ-সুষমা ব্যর্থ হয়নি সেদিন। ওই বন্ধ ঘরের ভিতরও ভ্রমর এসেছিল দু'একটি, গুঞ্জন করছিল ফুলটিকে ঘিরে। যে গোঁড়ামীর প্রাচীর দিয়ে কয়াধুনাথ তাঁর পরিবারকে ঘিরে রাখতেন সে প্রাচীর লঙ্ঘন করতে অবন্ধনারও যে বিলম্ব হয়নি—তার জীবন-কাহিনীই তার প্রমাণ। নীলাম্বর মুকুজ্যে আর ফেরেনি, কিন্তু তার দুঃসাহসী কবি-প্রকৃতি ফিরে এসেছিল তার কন্যার চরিত্রে। নীলাম্বরের স্ত্রী মৃন্ময়ী ছিলেন অতিশয় কোমল-হৃদয়া। কন্যাকে শাসন করতে পারতেন না, কয়াধুনাথের প্রখর শাসন থেকেও বাঁচাতে চেষ্টা করতেন তাকে যথাসাধ্য। অবন্ধনার কোনও দুষ্কৃতিই কয়াধুনাথের কর্ণগোচর হত না। দৃষ্টি-গোচর হবারও উপায় ছিল না, কারণ কয়াধুনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত শাস্ত্রসম্মত পরলোকের দিকে। ঠাকুর ঘরেই অধিকাংশ সময় কাটত তাঁর জপতপ নিয়ে। কয়াধুনাথের পত্নী ষোড়শী ইচ্ছে করলে হয়তো অবন্ধনাকে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও সে ইচ্ছে করেন নি, কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথই অবন্ধনার চিত্তকে বহুমুখী করেছিল। জগন্নাথই প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে আমবাগানে ঘুরে বেড়াত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত। স্বামীর কাছে অবন্ধনার দুষ্কৃতি কীর্তন করতে গেলে জগন্নাথেরও করতে হয়। পুত্রবৎসলা ষোড়শী তা করতে ভয় পেতেন, কারণ স্বামীকে চিনতেন তিনি। সুতরাং অবন্ধনা সত্যিই অবন্ধনা হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। শিখর ছিল জগন্নাথের প্রতিবেশী এবং সহপাঠী। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই অবন্ধনার সঙ্গে শিখরের পরিচয় ঘটেছিল। শিখর, জগন্নাথ, চন্দ্রমোহন এবং আমি—আমরা সব এক স্কুলেই পড়তাম। কিন্তু অবন্ধনাকে আমি কখনও দেখিনি, দেখবার সুযোগই হয়নি। কারণ আমি আসতাম ভিন্ন গ্রাম থেকে। অন্য দিকে মন দেবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না আমার, কারণ তখন থেকেই···ওই বোধহয় আলেয়া এসে দাঁড়িয়েছে জানালায় ···নীলাম্বরী-খানা পরেছে মনে হচ্ছে···ও কি জানে যে আমিই ওকে রোজ দেখি···।"

কবি তদ্গত চিত্তে লিখিয়া চলিয়াছিলেন। সম্মুখের আলোকিত শুভ্র দেওয়ালে

দুইটি বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতি আসিয়া পাশাপাশি বসিল। তাহাদের সর্বাঙ্গ হইতে অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কবি কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, তিনি নূতন একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

শিখর সেনের ডায়েরি

১৭-৬-৩৪

ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল্‌স্' পড়লাম। অদ্ভুত বই। মাঝে মাঝে অনেক জায়গা বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছিল যেন জঙ্গলে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলছি। অচেনা কথার জঙ্গল, ঘটনার জঙ্গল, মানব-মানবীর জঙ্গল। সমস্তই অচেনা, সমস্তই অপরিচিত। এই অচেনা অপরিচিতের ভিড়ে একটুও ভয় করছিল না কিন্তু, আনন্দ হচ্ছিল। এদেরই মধ্যে চেনা এবং পরিচিতের আভাস পাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এরা আমার চেনা লোকই, অনেকদিনের চেনা, কিন্তু কোথায় কি যেন সব অদল বদল হয়ে গেছে বলে চিনতে পারছি না। খুব ভাল লাগল জ্যাভার্টকে। মনে হল যেন খাঁটি একটি আর্যচরিত্র মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। আমাদের দেশে পুলিশের লোককে লোকে ঘৃণা করে কেন? এদেশে কি জ্যাভার্টের মতো পুলিশ অফিসার নেই?…এ দেশে আমাদের ক্লাসের জগুর বোন অবু আজও এসেছিল দক্ষিণপাড়ার বাগানে। নিজের সম্বন্ধে মেয়েটির ধারণা খুব উচ্চ বলে মনে হল। তার ধারণা সে যদি নিজের মুখে কোনও জিনিস চায় তাহলে তাকে তা দিতেই হবে। তার দাবীকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। অনায়াসেই আমাকে বলে বসল ওই উঁচু ডাল থেকে আমাকে পেয়ারাটা পেড়ে দাও না। পেয়ারা অবশ্য আমি পেড়ে দিলাম, কিন্তু ওরকম বলাটা কি ওর উচিত হয়েছে? একটু পরেই দেখি বিশাই বাগ্‌দির ছেলে নব্‌নে এক ঝাঁক পদ্মফুল এনে হাজির। অবুর আদেশেই না কি সে-ও সাপে-ভরা পালংদীঘিতে নেবেছিল পদ্মফুল জোগাড় করতে। একটা আধফোটা পদ্ম নিজের মাথায় গুঁজতে গুঁজতে এমন ভাবে সে চাইলে আমার দিকে, যার অর্থ—দেখলে? তুমি আমাকে সামান্য একটা পেয়ারা পেড়ে দিতে ইতস্তত করছিলে—নব্‌নে প্রাণ তুচ্ছ করে পদ্মফুল আনতেও দ্বিধা করেনি! বেশ একটু অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে অবু। জগন্নাথকে তো সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না দেখলাম। অথচ জগন্নাথ ওর দাদা। অন্তত চার পাঁচ বছরের বড়। আগে তুমি বলত, এখন তো তুই-তোকারি করে। চাকরের মতো ফরমাস করে, আর জগন্নাথটা ওর ফরমাস খেটে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। যে সামান্য একটা অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক বুঝতে পারে না, তার কি কোন পদার্থ আছে…।"

প্রথম প্রজাপতি দ্বিতীয় প্রজাপতিকে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বাণী, ভিক্টর হুগো লোকটি কে ? আমিই অবশ্য সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"ভিক্টর হুগো একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি।"

"ও। আচ্ছা, অ্যালজ্যাব্রা জিনিসটা কি বল তো ?"

"গণিতশাস্ত্রের একটা শাখা।"

"ও।"

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রথম প্রজাপতি বলিল—"গল্পটা তোমার ভাল লাগছে বাণী ?"

"আমি শুধু অপ্রকাশকে প্রকাশ করছি। আমার ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার কথা আমি ভাবছি না, কোন কালেই আমি ভাবি না। ভবিষ্যৎযুগে মানুষের মনীষা যে মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টি করবে সে-ও ভাববে না।"

"হেঁয়ালি ছাড়। এখনি আর একটা মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলুম, বুঝলে।"

"কি ?"

"কালকূটকে দেখতে পেলুম। দেখলুম পর্বতপ্রমাণ কূর্মপৃষ্ঠ থেকে যে কঙ্কাল মেঘমালতীর রূপ ধারণ করে কালকূটকে ইঙ্গিতে ডাকছিল সে যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ছে—আর কালকূট উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তার পিছু পিছু।..."

"আপনি ওই সব ভাবছেন তাই কবির লেখাও থেমে গেছে দেখুন। উনিও ভাবছেন বসে বসে।"

"ভাবুক একটু। চল আমরা একবার চার্বাকের খবরটা নিয়ে আসি।"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

॥ ১৭ ॥

নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নিগূঢ় মহিমা আছে। সন্ধ্যাকালে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে গভীর রাত্রে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। সেই আত্মপ্রকাশের ছন্দ অত্যন্ত মৃদু, অতিশয় প্রচ্ছন্ন, অতীব নিগূঢ়। তাহাতে কোনও ঝনৎকার নাই। নিদ্রিত পৃথিবীর বুকে তাহা স্বপ্নের মতো অতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। জ্যোৎস্নাকুল নিশীথ রাত্রিতে যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারাও প্রথমে বুঝিতে পারে না যে রূপ-লোকের ঐশ্বর্য পরিবৃত হইয়া তাহারা অরূপলোকের কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রির গহন মর্ম হইতে যে নীরবতা নিখিল বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করে তাহাও যে ভাষাময়, তাহারও যে গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত

আছে চিন্তাশীল দ্রষ্টার নিকট তাহা অবশ্য বেশীক্ষণ অজ্ঞাত থাকে না। স্বকীয় চিন্তার শত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহার চিন্তাধারা জ্যোৎস্নাপ্লুত হইয়া যায়। তাহাতে তীক্ষ্ণতা থাকে না, সীমারেখা থাকে না। চার্বাকেরও ছিল না। অজানা গ্রাম-প্রান্তবর্তী এক প্রান্তরে চার্বাকও জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিল। সুরঙ্গমার কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু সে চিন্তাধারায় যে নূতন সুর বাজিতেছিল তাহা আর কখনও বাজে নাই। তাহার মনে হইতেছিল যুক্তি দ্বারা কি সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করা সম্ভব? সুরঙ্গমা শুধু রূপসী নয়, সে বুদ্ধিমতীও। চার্বাক যে সব যুক্তি তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, একথা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তবু সে অনায়াসে চলিয়া আসিল কেন? সে কি কুমার সুন্দরানন্দের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না? মৃগয়া-অভিযানে যোগদান করিবার তাহার অভিরুচি নাই? যেরূপ তৎপরতার সহিত সাগ্রহে সে চলিয়া গেল তাহাতে এই কথাই মনে হয় যে চার্বাকের যুক্তিগুলি যতই সুচিন্তিত হউক না কেন তাহা সুরঙ্গমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। চতুর্মুখ ব্রহ্মাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং সেই বিকট দানবের প্রতিমূর্তির সম্মুখে একদা সে যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা যে অলঙ্ঘনীয় এ ধারণা তো চার্বাক কিছুতেই অপনোদন করিতে পারে নাই। কেন? যুক্তিতো নির্ভুল, চার্বাকের বাক্‌পটুতাও অসাধারণ, সুরঙ্গমাও বুদ্ধিমতী—তবে—কেন এ অসাফল্য? আর একটা কথাও চার্বাকের মনে হইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সে-ই বা সুরঙ্গমার অনুসরণ করিতেছে কেন! তাহার কুসংস্কার দূর করাই কি উদ্দেশ্য? তাহা তো নয়। তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিজের পৌরুষ চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার নিকট নাস্তিক্য-যুক্তিজাল বিস্তার করার আর কোনই অর্থ ছিল না। সে জালে ধারামতী ধরা দিল, তাহাকে শেষে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, কিন্তু সুরঙ্গমা তো অবলীলাক্রমে তাহা এড়াইয়া গেল! "গেলেই বা"—চার্বাক নিজেকেই প্রশ্ন করিল—"তুমিই বা তাহার জন্য এত উতলা কেন? অঙ্গন-আলিঙ্গনই যদি পৌরুষ হয় তাহা হইলে যে কোনও অঙ্গনাই তো তাহার জন্য যথেষ্ট। একটি বিশেষ অঙ্গনার জন্য তুমি ব্যস্ত কেন? যদি নিছক দৈহিক মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে শবরীকন্যা ধারামতী কি সুরঙ্গমা অপেক্ষা অধিক লোভনীয়া ছিল না? তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুরঙ্গমার ধ্যান করিতেছ কেন? সুরঙ্গমার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য তুমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছ!"

চার্বাক জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের অযৌক্তিক আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চার্বাকের চিন্তাধারা কিন্তু বিস্মিত হইল।

"জেগে আছেন দেখছি। ঘুম হচ্ছে না নাকি? বিদেশে বিভুঁয়ে ঘুম হওয়া কঠিন। আমি এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিলাম, ঘুমের দেখা নেই।"

"শ্রৌণী গ্রামে কতক্ষণে পৌছব আমরা কাল?"

"সন্ধ্যা নাগাদ।"

"সেখান থেকে যজ্ঞস্থল কতদূর?"

"শুনেছি বেশীদূর নয়। হেঁটে যদি যান প্রহর দুই লাগবে। তবে আমার বিশ্বাস হাঁটতে হবে না আপনাকে। হাতী, ঘোড়া, নিদেন গরুর গাড়িও পেয়ে যাবেন একটা। ঘোড়ায় চড়তে পারেন তো?"

"পারি।"

"তবে আর ভাবনা কি, ঘোড়া অনেক থাকবে। আর আপনাকে দেখতে পেলে ওঁরা সাদরে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন। আপনি তো আর যে-সে লোক নন আমাদের মতো। আমি তো আশা করেছিলাম যে, আপনি হোতা বা উদ্গাতা বা ওই রকম কিছু একটা হোমরা-চোমরা গোছের হয়ে যাচ্ছেন, দেশে থাকলে যেতেনও, কুমার সুন্দরানন্দ আপনাকে যেরকম খাতির করেন শুনেছি তাতে মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে একই রথে আপনাকে নিয়ে যেতেন তিনি।"

চার্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। দেখিতে পাইলেন গুণপতির চক্ষুযুগল হইতে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বলিলেন—"মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে একরথে আমার স্থান নেই, হতে পারে না। ওঁরা ব্রাহ্মণ নন, মহর্ষি তো ননই—ওঁরা ক্রীতদাস। আমি স্বাধীন মানুষ, নিজের মতে নিজের পথ চলি। ওঁদের সঙ্গে একাসনে আমার স্থান নেই। ওঁরাও আমাকে সহ্য করতে পারবেন না, আমিও ওঁদের সহ্য করতে পারব না।"

গুণপতির আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—"তাই নাকি! আমরা মূর্খ মানুষ। কিছুই বুঝি না তো। আমরা জানি, আপনিও মহর্ষি। উনি ক্রীতদাস একথা তো জানতাম না! শবরী ভল্লুকীকে নিয়ে একটা কানাঘুসো শুনতাম বটে, কিন্তু উনি ক্রীতদাস? সুন্দরানন্দের পিতার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কেনার ঝোঁক ছিল শুনেছি। আমার পিতামহ ধনপতি তাঁর জন্যে বাহ্লীক থেকে, শ্যাম থেকে, সিংহল থেকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কিনে আনতেন—বাবার মুখে শুনেছি এসব গল্প। আপনি তাহলে অনেক খবরই জানেন। ক্রীতদাস উনি!"

"হ্যাঁ। শুধু সুন্দরানন্দেরই নয় কুসংস্কারেরও। উনি মনে করেন বেদবাক্য

স্বতঃপ্রমাণ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সমস্ত বিধিনিষেধ উনি অভ্রান্ত বলে মনে করেন, ওঁর ধারণা সুর করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে আগুনে ঘি ঢাললেই অন্তরীক্ষবাসী দেবতারা কাম্য ফল দেবেন। উনি অন্ধ, আমি চক্ষুষ্মান। আমি বিচার করি, উনি বিশ্বাস করেন।"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চার্বাকের কথা শুনিতেছিলেন, চার্বাক থামিতেই বলিলেন—"বটে! আমি মূর্খ মানুষ কিছুই বুঝি না। আচ্ছা, মহর্ষি, বেদই বা কি, আর ব্রাহ্মণই বা কি। যখন সুযোগ পেয়েছি তখন জেনেই নি কথাটা।"

"বেদে শুধু মন্ত্র আছে, আর ব্রাহ্মণে আছে সেই মন্ত্রের প্রয়োগবিধি। এসব বাজে কথা জেনে কিছু লাভ নেই। বেদ এবং ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জ্ঞানই যথেষ্ট।"

"সেটি কি।"

"সেটি হচ্ছে এই যে, ওসব ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওসব সরল-বিশ্বাসী গৃহস্থদের ঠকিয়ে জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। যজ্ঞের নামে সারা দেশ জুড়ে যে অপচয় হচ্ছে, যে ভণ্ডামি চলছে, সহজ বুদ্ধিবৃত্তির সুস্থবিকাশের পথে যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তা ভাবলে কষ্ট হয়। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ নেই। সমস্ত দেশকেই অন্ধ করে দিয়েছে ওরা।"

গুণপতি হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিলেন। মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই, কিন্তু এটুকু আমি বলব যে আমি অন্তত অন্ধ হইনি। আমার গৃহিণীর অবশ্য দেব-দ্বিজে প্রবল ভক্তি, কিন্তু আমি যাকে তাকে ভক্তি করতে পারি না—কি রকম যেন পারিই না।"

"তা না পারুন, কিন্তু যজ্ঞের বিরোধিতা করতে আপনি পারবেন কি? পারবেন না। এর সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘি বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গুণপতি নীরবে দন্তগুলি বিকশিত করিয়া চার্বাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা যাবে! উফ, মাথা বটে আপনার। ঠিক বলেছেন। যজ্ঞ বন্ধ হলে ঘিয়ের ব্যবসা তুলেই দিতে হবে আমাকে। তবে একটা কথা আছে মহর্ষি, এরকম ফলাও ব্যবসা আছে বলেই আমরা আপনাদের মতো সজ্জনকে ধারে ঘি খাওয়াতে পারি। তা না হলে কি পারতুম? আপনাদের কাছে দাম দু'চার ছ'মাস পড়ে থাকলেও গায়ে লাগে না আমাদের।"

চার্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনি প্রসঙ্গান্তরে এসে হাজির হলেন। আমাকে ধারে ঘি খাওয়ান—এটা কি যজ্ঞের স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি হল ?"

গুণপতি জিভ কাটিয়া বলিলেন—"ছি ছি, তা কি হয় কখনও! সে কথা আমি বলছি না। মন্দ জিনিসেরও যে একটা ভাল দিক থাকতে পারে সেই কথাটাই আমি বলছি শুধু। সুমন্ত্রও উঠেছে দেখছি—ওহে সুমন্ত্র, এদিকে শোন—মহর্ষি যজ্ঞের খবর জানতে চাইছেন, বল দিকি ওঁকে—সব যা জান"—তাহার পর চার্বাকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সুমন্ত্র অনেক খবর রাখে।"

চার্বাক বুঝিল, চতুর গুণপতি কৌশলে আলোচনাটার মোড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যজ্ঞ-বিরোধী বিপজ্জনক আলোচনায় তিনি আর নিজেকে সম্ভবত লিপ্ত রাখিতে চান না, অথচ সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। যজ্ঞের সংবাদ জানিবার কিছুমাত্র আগ্রহ চার্বাকেরও ছিল না, কিন্তু সে কথা সে-ও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। প্রধান শকট-চালক দীর্ঘকায় সুমন্ত্র নিকটবর্তী হইতেই গুণপতি বলিলেন—"চাঁদের আলোর ধমকে তোমারও ঘুম ভাঙল বুঝি।"

সুমন্ত্র বলিল—"আমি ভাবছি—বেরিয়ে পড়ি চলুন, মাঠে আর সময় নষ্ট করে কি হবে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমার আর আপত্তি কি। আমারও ও-কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি চুপটি করে আছি। আমি বললেই তোমরা ভাববে—লোকটা কি চণ্ডাল, রাত্রে ঘুমাতে পর্যন্ত দেয় না। ঠিক কি না আপনিই বলুন মহর্ষি। ওহে সুমন্ত্র, মহর্ষিকে যজ্ঞের খবর বল তো—যা জান।"

সুমন্ত্রের দেহের আয়তন যে অনুপাতে বিশাল, কণ্ঠস্বর সেই অনুপাতেই উচ্চ। কথা কহিলে মনে হয় ধমক দিতেছে। চার্বাকের দিকে একনজর চাহিয়া বলিল—"আপনি কি নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন ?"

"না।"

"তাহলে আপনাকে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে কি না সন্দেহ আছে।"

"কেন ?"

"লোকচক্ষুর আড়ালেই নাকি এ যজ্ঞ হবে। সেই জন্যেই কুমার গভীর অরণ্যের মাঝখানে যজ্ঞ-ভূমি নির্মাণ করিয়েছেন।"

"এ রকম করার উদ্দেশ্য ?"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে শুনছি !"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে !"

"দিকপাল তো তাই বললে।"

"দিকপাল কে ?"

গুণপতি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দিকপাল হচ্ছে গুপ্তচর। সুমন্ত্রর আপন ভগ্নীপতি। তার কাছ থেকেই সুমন্ত্র খবর যোগাড় করে।"

চার্বাক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"কুমার সুন্দরানন্দকে এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কে প্ররোচিত করলে! এ যে অবিশ্বাস্য, এ যে নরহত্যা—"

"ম্লেচ্ছ পণ্ডিত নীল-চক্ষু মির্মির কুমারকে এই যজ্ঞে উৎসাহিত করেছেন শুনেছি। তিনি শুধু পণ্ডিতই নন, শুনেছি তিনি একজন বড় শিকারীও। নদী-পথে সমুদ্রপথে তিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। নর্মদা তীরে কুমারের সঙ্গে না কি তাঁর প্রথম আলাপ হয়। সেই আলাপ এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে এবং তার ফলেই এই যজ্ঞ হচ্ছে। অবশ্য আমি সুমন্ত্রর মুখে যেমন শুনেছি তেমনি বলছি। এর কতটা ঠিক কতটা বেঠিক—তা সুমন্ত্রই জানে। সুমন্ত্রকে সামনে ডেকে এনে তাই সব কথা আপনাকে ভেঙে বললাম এখন, আগে বলিনি, বলতে সাহস হয়নি।"

গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা হৃষ্ট চতুরতা ঝলমল করিতে লাগিল। ক্ষণ-কাল নীরব থাকিয়া গুণপতি পুনরায় বলিলেন—"সুমন্ত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন এ খবর ঠিক কি না।"

সুমন্ত্র যেন ধমকাইয়া উঠিল, "ঠিক।"

চার্বাক প্রশ্ন করিল—"অনিমন্ত্রিত কোনও লোককে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে না এ সংবাদও কি ঠিক ?"

"ঠিক।"

"যজ্ঞটা হচ্ছে কোথায় ?"

গুণপতি বলিলেন—"শ্রৌণী গ্রামের নিকট কোনও গভীর অরণ্যে, এইটুকু শুধু জানি। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না। জান না কি হে সুমন্ত্র! জান তো মহর্ষিকে বল না খবরটা।"

"জানি না।"

গুণপতি বলিলেন—"আমরা কেউ কিছু জানি না; আমাদের উপর কেবল আদেশ হয়েছে ঘিয়ের কলসীগুলি নিরাপদে শ্রৌণী গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে কুমার সুন্দরানন্দের সেনাপতি সসৈন্যে উপস্থিত থাকবেন। তাঁরই হাতে এই পাঁচ শত কলস ঘি আমাকে দিয়ে আসতে হবে।"

"সেনাপতি মানে কুলিশপাণি ?"

"সম্ভবত। তিনিই তো এখন কুমারের দক্ষিণ হস্ত।"

"মন্ত্রী জিম্‌ভ্রকও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়।"

"থাকা ত উচিত।"

"এ যজ্ঞে কারা ঋত্বিক হয়ে যাচ্ছেন জান ?"

সুমন্ত্র উত্তর দিল, "জানি। ব্রহ্মা হয়েছেন মহর্ষি পর্বত, উদ্গাতা মহর্ষি ডম্বরু, অধ্বর্যু মহর্ষি চন্দ্রচূড়, আর হোতা হচ্ছেন স্বয়ং সুন্দরানন্দ।"

"যে নরটিকে বলি দেওয়া হবে সেটি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ?"

"সে খবর কেউ জানে না। এমন কি দিকপালও না।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্বাক বলিল, "আমাকে তাহলে শ্রৌণী থেকেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, শ্রৌণী পর্যন্ত তো যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে।"

"কুলিশপাণি তো আপনাকে খুব খাতির করেন শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি হয়তো কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

কুলিশপাণির আদেশেই যে চার্বাককে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেকথা তাহার মনে পড়িল। নির্বাক হইয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল—যাহার আশায় আমি এই দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল পথে পা বাড়াইয়াছি তাহার দেখা মিলিবার কোন সম্ভাবনাই তো নাই। সৈন্য-পরিবৃত যজ্ঞস্থলের নিকটবর্তী হইবার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। তবে যাইতেছি কেন ? এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। সহসা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। চার্বাক মনে মনে যেন পাখী হইয়া উড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—পুরাণের গরুড় পক্ষীর মতো বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া সে যেন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বহু উর্ধ্বে উড়িয়া চলিয়াছে।···সুরঙ্গমা যেন অলিন্দে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে এই বিরাট পক্ষীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। বাজ বা চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্রতর পশু-পক্ষীকে তুলিয়া লয়, সে-ও যেন তেমনিভাবে সুরঙ্গমাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। সুরঙ্গমা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠিক ইহার পরই চার্বাকের কল্পনা-বিলাস ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সুরঙ্গমার আর্ত চীৎকার যেন একটা হুঙ্কারের শব্দে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। চার্বাক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—কিছুদূরে গুণপতি মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। দুইটি অঙ্গুলি মুখ-বিবরে ঢুকাইয়া সম্ভবত তিনি জিহ্বা পরিষ্কার করিতেছেন, তাহাতেই হুঙ্কারের শব্দ হইতেছে। সুমন্ত্র বা অন্যান্য শকট-চালক কেহই কাছে নাই। ইহারা কখন যে চলিয়া গিয়াছে, চার্বাক জানিতেও পারে নাই! চার্বাক রীতিমত বিস্মিত

হইল। সজ্ঞানে বসিয়া বসিয়া সে নিজের আজগুবি কল্পনায় এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে ইহারা কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা টেরও পায় নাই! নীলোৎপলার কথা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ যে সুরা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন, সে সুরা-প্রভাবে দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হয়। যে যাহা হইবার কামনা করে কিছুক্ষণের জন্য তাহা সে হইতে পারে। তাহার মনে হইল এখনই সে তো পাখী হইয়া উড়িতে চাহিতেছিল। ওই সকল অসম্ভব হাস্যকর কল্পনাও তাহা হইলে তাহার মনের কোনও স্তরে নিহিত আছে না কি। সুরাপ্রভাবে সে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা কল্পনায় পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তাহার মানসপটে ছায়াছবির ন্যায় সেই সুন্দরী মোহিনী, বিরাটকায় কৌতূহল, বিচিত্র সন্ধানলোক, মায়াবিনী নদী, পাতালনিবাসী কালকূট, বর্ণমালিনীর ক্ষুরধার জিহ্বা-নির্মিত সাঁকো একে একে মূর্ত হইয়া আবার একে একে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল সে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাহার মন আর সচেতন রহিল না। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে তাহার দিশাহারা বুদ্ধি উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। একথাও সে অনুভব করিল যে তাহার মন সম্ভব-অসম্ভবের সূক্ষ্ম বিচার করিতে আর প্রস্তুত নহে। দুই আর দুই যোগ করিয়া পাচ হয় একথাও সে মানিতে প্রস্তুত আছে—যদি তাহা মানিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি কেহ কোন মন্ত্রবলে সত্যই তাহাকে তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুসমন্বিত বিরাট পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারে সে মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করিতে হয়তো সে আর দ্বিধা করিবে না। সহসা তাহার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন সে নিজেকে এত অবনত করিতেছে? কেন? ধীরে ধীরে সুরঙ্গমার মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাস্য-প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি যেন নীরব ভাষায় বলিল, 'আমার জন্য'। অন্তরীক্ষ হইতে যেন এক তরঙ্গিণীর কল্লোলধ্বনি কলস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই মায়া নদী যেন পুনরায় বলিল, "তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্তিত হয়নি চার্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণজালে জড়িত হচ্ছ—!"

চার্বাকের সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল যে ঋণজাল যতই জটিল হোক না কেন, নিত্য নব নব ঘৃত পান করিবার বাসনা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, করিতে পারিবে না, কারণ উহাই তাহার ধর্ম। যত বিপদই হোক, সুরঙ্গমার সহিত দেখা করিতেই হইবে।

গুণপতির সহিত চার্বাক পদব্রজেই পথ অতিবাহন করিতেছিল। শকটের

শ্রেণী আগাইয়া গিয়াছিল। গুণপতির গাড়ীটি কেবল দেখা যাইতেছিল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে গাড়ীতে চড়িবেন এই অভিপ্রায়ে গুণপতি গাড়ীটিকে বেশী আগাইয়া যাইতে দেন নাই। চার্বাক যখন তাঁহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপন একটা পরাপর্শ করতে চাই।" তখন তাঁহাকে বলিতে হইল—

"তাহলে হেঁটেই যাই চলুন কিছুদূর। আমার বিদ্যাধর গাড়োয়ান অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক, তবু কাজ কি, জ্যোৎস্নায় হাঁটতে ভালও লাগবে।"

ঠিক কি ভাবে প্রসঙ্গটার অবতারণা করিবে চার্বাক ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পর গুণপতি বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি।"

"ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে যে আপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে হয়তো অদ্ভুত ঠেকবে।"

"আরম্ভই করুন না শোনা যাক। আমার বিদ্যের দৌড় অবশ্য বেশীদূর নয়, আপনাদের মতো পণ্ডিতদের কথাবার্তা আমার না বুঝতে পারারই কথা, তবু চেষ্টা করি, বলুন আপনি।"

চার্বাক কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন, আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মাত্র আছে। ওই আমার যথাসর্বস্ব, কিন্তু তা-ও আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব—বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটি উপকার করেন।"

"দেখুন মহর্ষি, আমি ব্যবসায়ী লোক তা ঠিক, আপনাদের তুলনায় মূর্খ লোকও বটে, কিন্তু উপকার আমি বিক্রয় করি না। যদি আপনার মতো একজন সদ্ব্রাহ্মণের উপকারে লাগতে পারি তাহলে আমি নিজেকে ধন্যই মনে করব। ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।"

"আমি সুন্দরানন্দের যজ্ঞস্থলে যেতে চাই।"

"যাবেন কি করে! সুমন্ত্রের মুখে তো শুনলেন যে অনিমন্ত্রিত কোন লোককে সেখানে যেতে দেবে না। তবে শ্রেণীতে যদি কুলিশপাণির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তিনি আপনাকে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"আমার নেই। কুলিশপাণির আদেশেই আমাকে কিছুদিন পূর্বে সুন্দরানন্দের রাজত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল।"

"বলেন কি!"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"একথা তো অনেকেই জানে, আপনারও জানার কথা।"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করবার অর্থ কি তাও তো বুঝতে পারছি না।"

"কারণ আমি জ্ঞান-মার্গের পথিক, ওঁরা অন্ধ বিশ্বাসী।"

"বটে!"

উভয়ে আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিলেন। কিছুকাল পরে গুণপতি বলিলেন, "ওঁদের সঙ্গে যখন আপনার মতেরই মিল নেই, তখন ওঁদের যজ্ঞস্থলে যেতেই বা চাইছেন কেন?"

"যে মানুষটিকে ওঁরা যজ্ঞের নামে খুন করতে চাইছেন তাকে বাঁচাতে চাই।"

"বাঁচাতে চান? বলেন কি!"

গুণপতি সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চার্বাকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "পারবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই পারব।"

"কি করতে হবে বলুন।"

"আপনার ঘিয়ের জালাগুলি বেশ বড় বড়। আমি অনায়াসেই একটির মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে পারি।"

"একটা জালার ঘি তাহলে ফেলে দিতে বলছেন?"

"ফেলে দেবার দরকার কি। কাল ভোরে নূতন একটা জালা কোথাও থেকে কিনুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি এবং আপনি তার বাইরে ঘি মাখিয়ে সেটাকে ঘি বলে চালান করে দিন। জালা কি পাওয়া যাবে না?"

"পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায়।"

"পয়সা দিতে তো আমি প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।"

"ব্যাপারটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। ভেবে দেখুন।"

"একটা জঘন্য নরহত্যা নিবারণ করবার জন্যে আমি যে কোন বিপদকে বরণ করতে রাজি আছি।"

গুণপতি মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি তো আছেন, কিন্তু বিপদ যদি হয় তাহলে আমিও যে জড়িয়ে পড়ব। আমরা ছাপোষা লোক, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখুন মহর্ষি।"

"আপনার গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"কি করে?"

"আমি যদি ধরা পড়ি তাহলে আপনার নাম করব না। বলব যে গুণপতি যখন নিদ্রিত ছিল তখন আমি একটি ঘিয়ের জালা সরিয়ে তার স্থানে একটি

খালি জালা রেখেছিলাম এবং সেই জালার ভিতর ঢুকে বসেছিলাম। এর জন্য গুণপতি একেবারেই দায়ী নয়।"

"এত বড় মিথ্যাভাষণটা আপনি করবেন?"

"করব। মিথ্যাভাষণ করে যদি একটা নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচান যায় তাহলে তা করতে আমার আপত্তি নেই। স্বার্থের জন্য মিথ্যাভাষণকে আপনি নিন্দা করতে পারেন কিন্তু পরার্থে মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় নয়।"

"আমি মূর্খ মানুষ, স্বার্থ টাই বুঝি। আমাকে যদি এতে জড়িয়ে না ফেলেন তাহলে আপনার আদেশ পালন করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। বলব?"

"বলুন।"

"আপনি মিথ্যাভাষণ করতে রাজি আছেন তা না হয় মানলাম, কিন্তু আপনার কথা মানা না মানা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। আমরা যে ষড়যন্ত্র করে এ কাণ্ড করতে পারি তা কল্পনা করা কুলিশপাণির পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। লোকটা দেখতে একটু হোঁৎকাগোছের, কিন্তু অবসর পেলেই কবিতা লেখে শুনেছি···।"

"মিথ্যাটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কি করে হবে সেটা।"

"ভেবে দেখি একটু।"

"ভাল করে ভাবুন। জীবন মরণ সমস্যা তো।"

চার্বাক কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে গুণপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি যদি ভয় পান, তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব না আর। সত্যই এটা জীবনমরণ সমস্যা। আমার এই প্রচেষ্টায় যদি আপনার অন্তরের সায় না থাকে তাহলে আপনাকে এতে জড়াতেই চাই না। যজ্ঞের নামে দেশ জুড়ে এই যে অনাচার চলেছে—আমি বরাবর তার প্রতিবাদ করেছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে করব। আমার এই কাজে যদি আপনার আন্তরিক সমর্থন থাকে আসুন আমাকে সাহায্য করুন, যদি না থাকে আপনাকে জোর করব না। আমি নিজেই যেমন করে পারি সেখানে গিয়ে হাজির হব।"

এই কথায় গুণপতি এক মুখ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখুন মহর্ষি, আমি ভীতু মানুষ। আমার অন্তরের কথাও আমি নিজে জানি না ঠিক। সত্যি বলছি, মাত্র দুটি জিনিসই আমাকে চালিত করেছে সারাজীবন। স্বার্থ আর ভয়। আপনি

একজন তপস্বী লোক, আপনাকে চটাতেও ভরসা পাচ্ছি না। ভাবছি কি জানি মহর্ষির অন্তরে কষ্ট দিলে যদি কিছু অনিষ্ট হয়ে যায় শেষকালে! ব্রহ্মশাপে অনেক কিছু হতে পারে।"

"আমি আপনাকে শাপ দেব না, আর দিলেও যে তা ফলবে এ বিশ্বাস আমার নেই।"

"আমার আছে। আমি ছাপোষা লোক পারতপক্ষে ব্রাহ্মণকে চটাতে চাই না। আপনি যদি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর চার্বাক বলিল, "আপনার শকটচালক বিদ্যাধর কি বিশ্বাসী লোক?"

"খুব।"

"আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করে দেবে না তো?"

"না। প্রাণ গেলেও না। ওর সমস্ত পরিবারকে আমি পালন করি, আমার বিপদে ওরও বিপদ যে।"

"বেশ, তাহলে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে শুনুন।"

"কি বলুন।"

"আপনি আপনার প্রধান শকটচালক সুমন্ত্রকে গিয়ে বলুন যে আপনি আরও জালা কিনে আরও ঘি কেনবার জন্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাচ্ছেন বিদ্যাধরকে নিয়ে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আপনি প্রকাণ্ড একটি জালা কিনে তার বাইরেটা ঘৃত সিক্ত করে ফেলুন, আমি তার ভিতর ঢুকে বসে থাকি। তারপর আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করে শুয়ে পড়ুন। বিদ্যাধর আপনার অজ্ঞান দেহটাকে গাড়িতে তুলে ছুটতে ছুটতে এসে বাকী সকলকে খবর দিক যে আমি আপনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে টুঁটি টিপে হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে সফলকাম হইনি—উধ্বর্শ্বাসে পলায়ন করেছি। তারপর আপনার জ্ঞান ফিরে আসুক। আপনি আমাকে নিয়ে শ্রৌণী গ্রামে পৌছে দিয়ে আসুন। তারপর আমি নিজের পথ নিজে ঠিক করে নেব।"

গুণপতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চার্বাকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাথা বটে আপনার। তাহলে তাই করি চলুন। কিছু অর্থ তাহলে দিন আমাকে। ঘি কিনতে হবে, জালা কিনতে হবে, বিদ্যাধরকেও দিতে হবে কিছু। বিদ্যাধর এমনি খুব বিশ্বাসী, তার উপর কিছু পুরস্কার দিলে, বুঝলেন না।"

চার্বাক স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া দিল।

শিংশপা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক বিরাট সরোবরে নীল হংস-মিথুন ভাসিতেছিল। পাশাপাশি ভাসিতেছিল কেবল—এই ভাসাটাকেই তাহারা একাগ্র হইয়া উপভোগ করিতেছিল যেন। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত—শিংশপা বৃক্ষের শাখায় আত্মগোপন করিয়া একটি পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া ডাকিতেছিল। তাহার সহিত মিলিতেছিল ঝিল্লির ঝনৎকার। মনে হইতেছিল যেন কোন অদৃশ্য সেতারী এবং গায়ক এই জ্যোৎস্নালোকে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে।

পিতামহ কথা কহিলেন।

"বাণী, মনে হচ্ছে ভাগ্যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম তাইতো এত আনন্দ পেলাম। ভৃগুটা আমাকে দাম্ভিক বলে উপহাস করেছিল, সে বুঝতে পারেনি আমাকে। আমার আনন্দের প্রকাশকে আমার স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসকে সে দম্ভ বলে ভুল করেছিল, করবেই তো, যত বড় তপস্বীই হোক, মানুষ তো।"

"চুপ করুন।"

"ও, আচ্ছা।"

আবার উভয়ে নীরবে ভাসিতে লাগিলেন।

"একঘেয়ে ভাসতে কিন্তু আর ভাল লাগছে না বাণী। এই বাধাহীন স্বাধীনতায় জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলছি যেন। বন্দী সিংহটাকে আমার হিংসে হচ্ছে।"

বাণীর দৃষ্টিতে চাপা হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"শিখর সেনের গল্পটা বন্ধ থাক তাহলে।"

"চল একটু মুখ বদলে আসা যাক। অনেকক্ষণ হাঁস হয়ে আছি।"

"ক্রমাগতই তো মুখ বদলাচ্ছেন।"

তুমি আমার কল্পনার ভাষা, তুমিও বুঝতে পারছ না কেন বদলাচ্ছি। সৃষ্টি মানেই পরিবর্তনের লীলা যে। ওই লীলার আবেগেই কয়লা হীরে হয়, গাছে ফুল ফোটে, শিশু বড় হয়, বুড়োরা মরে। রূপ থেকে রূপান্তরই সৃষ্টি, চার্বাক থেকে শিখর সেন। শিখর সেনের গল্প অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে, যথাকালে সেটা তোমার কবির মনে সঞ্চারিত করা যাবে। এখন বেচারাকে ঘুমুতে দাও না একটু, পাশের ঘরে ওর বউটা ছটফট করছে।"

"কুমার সুন্দরানন্দ যে সিহংটাকে বন্দী করে রেখেছে আপনি ঠিক সেই রকম সিংহ হতে চান?"

"হ্যাঁ। তোমাকে হতে হবে সেই সিংহের খাঁচা! নিজে কারাগার হয়ে আমাকে বন্দী কর তুমি, আর আমি গর্জন করব তার মধ্যে বসে। চমৎকার হবে! চল।"

"চলুন।"

জ্যোৎস্নালোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া হংসমিথুন উড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে এক নিবিড় অরণ্যের পশু-পক্ষীকে সচকিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল দুর্দান্ত এক সিংহ। পশু-পক্ষীরা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা জানিতে পারিল না যে এ সিংহ বাণী-কারাগারে বন্দী, তাহার বুঝিতে পারিল না যে এ গর্জন নয়, আনন্দিত স্রষ্টার অট্টহাস্য।

শ্রৌণী গ্রামে যথাসময়ে গুণপতির শকটশ্রেণী উপস্থিত হইল। স্বয়ং কুলিশপাণিই ঘৃত-কুম্ভগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। জালার ভিতর বসিয়া চার্বাক অনুমান করিতেছিল যে অনেক অশ্বারোহীও বোধহয় সঙ্গে আসিয়াছে। কারণ অশ্বের হ্রেষা এবং ক্ষুর-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইতেছিল। অনেকগুলি ঘণ্টার শব্দও পাওয়া যাইতেছিল। চার্বাকের মনে হইল ওগুলি সম্ভবত গরুর গলার ঘণ্টা। কুলিশপাণি ঘৃত-কুম্ভগুলিকে লইবার জন্য বোধহয় নূতন শকট আনিয়াছে। সহসা চার্বাক শুনিতে পাইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতি কথা বলিতেছেন। সে যে জালাটির ভিতর বসিয়া আছে ঠিক তাহার পাশে দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন। কথা-বার্তার ধরণে মনে হইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতির হৃদ্যতা আছে। থাকিবারই কথা, গুণপতির মতো উৎকৃষ্ট ঘৃতসরবরাহকারী ও অঞ্চলে আর নাই। ও প্রদেশের সমস্ত যজ্ঞের আজ্য গুণপতিই সরবরাহ করেন। চার্বাকের মনে হইল হয়তো তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই গুণপতি কুলিশপাণিকে এই জালাটির নিকট আনিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। চার্বাক রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। গুণপতি কহিলেন—"আর্য, কুমার সুন্দরানন্দ আরও তো অনেকবার যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু এমন গোপনতার আশ্রয় নিতে তাঁকে তো ইতিপূর্বে দেখিনি। সত্যি বলছি ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড়ই কৌতূহলী হয়েছি।"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, এ যজ্ঞ একটু অসাধারণ যজ্ঞ হ'চ্ছে। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হলে দুর্বল-চিত্ত লোকেদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, তাই কুমার এটার অনুষ্ঠান লোক-চক্ষুর বাইরে করেছেন।"

গুণপতির কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না।

"অসাধারণ যজ্ঞ মানে?"

"এতে নরবলি হবে। ঠিক নর নয়, নারী।"

"বলেন কি!"

"নারীটির নাম শুনলে আপনি আরও চমকে যাবেন।"

"কি রকম ?"

"নারীটি অপর কেউ নয়, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা নর্তকী সুরঙ্গমা।"

জালার মধ্যে চার্বাক শিহরিয়া উঠিল।

॥ ১৮ ॥

কবি পুনরায় লিখিতেছিলেন।

"শিখর সেনের যে ডায়েরিটা আমি চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেয়েছি, যার থেকে দু' একটি অংশ উদ্ধৃতও করেছি ইতিপূর্বে সেই ডায়েরিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে।

১৯-৮-৩৪

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে আজ বকুনি খেয়েছি। বকুনির জন্য তত দুঃখ হয়নি, 'হোম্‌টাস্‌ক' করে না নিয়ে গেলে বকুনি তো খেতেই হবে, আমার দুঃখ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলেছি বলে। আমি টাস্‌ক করতে পারিনি আমার মাথা ধরেছিল বলে নয়, আমি টাস্‌ক করতে পারিনি অবুর জন্যে। আমার পড়ার ঘরের জানালায় ও রোজ আসবে লুকিয়ে—আর খালি বকর বকর করে সময় নষ্ট করে দেবে আমার। আমি কাল বলেছিলাম, তুই এমনভাবে বকর বকর করলে আমি 'হোম্‌টাস্‌ক' করব কি করে। তার উত্তরে ও বললে, 'তোমার জানালার নীচে তো এক দল ছাতারে পাখীও সব সময় কচর-বচর করছে তাতে তো তোমার পড়ার বাধা হয় না। আমি কি ছাতারে পাখীরও অধম না কি! যাও আর আসব না।' ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফের এল একটু পরে। আমি জিগ্যেস করলাম, ফের আবার এলি যে? বললে, 'আমার কান্না পাচ্ছে। বল, তুমি আমার ওপর রাগ করনি।' বলেই ফিক করে হেসে ফেললে। এরকম জালাতন করলে কি হোম্‌টাস্‌ক করা যায়?

এর থেকে মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার আগেই শিখর অবঞ্চনার প্রেমে পড়েছিল। ডায়েরির আরও দু'একটা জায়গা থেকে তা বেশ বোঝা যায়। আলেয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নানাবর্ণে রঙীন হয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে পরিপ্লুত করে রেখেছিল বলে আমি ব্যাপারটা টের পাইনি। অথচ প্রত্যহই তখন ওর সঙ্গে দেখা হত! একটা কথা আমি আবিষ্কার করেছি সম্প্রতি। আমরা যখন চোখ খুলে থাকি তখন যদিও বহুবিধ জিনিস আমাদের

চোখে পড়ে কিন্তু আমাদের অন্তরনিবাসী দ্রষ্টা দর্শন করেন শুধু একটি জিনিসকেই। কারণ তিনি শুধু দর্শনই করেন না তিনি তন্ময়ও হয়ে যান। তিনি যখন যা দেখেন তখন তা তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা যেন অশেষ হয়ে ওঠে, কিছুতেই তার মহিমা শেষ হতে চায় না, নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে, তা যেন অনন্ত রূপের আকর হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিতে। আমি তখন আলেয়ার নিত্য নূতন মহিমা প্রত্যক্ষ করছিলাম, যতটা প্রত্যক্ষ করছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করছিলাম, তাই শিখর সেনের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করতে পারিনি। শিখর সেনের ডায়েরি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে অবন্ধনা ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসেনি। অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও আসেনি। এই ঘটনাটা আমার মনে হিংসার উদ্রেক করেছে মাঝে মাঝে। মনে হয়েছে তার প্রেম আমার প্রেমের চেয়ে পবিত্রতর, আবার বিয়ে করে হয়তো আমি আমার প্রেমের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছি। কিন্তু ক্ষুণ্ণ যে করিনি, তা আমার অন্তর্যামী জানেন। আলেয়াকে ভালবাসার পরও আমি অপর একজনকে বিয়ে করেছিলাম কেন—এ প্রশ্ন আমি নিজেকে করেছি অনেকবার। আগে করেছি, এখন আর করি না। এখন বুঝেছি, কিছু করবার বা না-করবার মালিক আমি নই। যে শক্তি পাহাড়কে সমুদ্রে রূপান্তরিত করে, কুসুমের কোমল হৃদয়ে কীটের সংস্থান করতে ইতস্তত করে না, দেবতাকে পিশাচ এবং পিশাচকে দেবতায় পরিণত করতে যার এতটুকু দ্বিধা নেই, যে শক্তি এক বৃন্তে একটি ফুল ফুটিয়ে রূপ-সৃষ্টি করে, একাধিক ফুল ফুটিয়েও রূপ-সৃষ্টি করে, ফুলকে ফলে উত্তীর্ণ করে বা অকালে ঝরিয়ে দিয়ে যে সমান কৃতিত্ব এবং রসবোধের পরিচয় দেয়—আমি সেই শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তারই প্রেরণায় আমি আলেয়াকে ভালবেসেছি, বিয়েও করেছি, আর একজনকে। দুটো কাজই আমি করেছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছি, তবু কিন্তু কোনটার উপরই আমার হাত ছিল না যেন। গাছের শাখায় কুসুমের সূচনা যে স্রষ্টার খেয়ালে হয়, সেই স্রষ্টাই সেই কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। কুসুমের হয়তো মনে হয় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সজ্ঞানে ফুটছে। শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানীরা যাকে অদৃষ্টবাদী বা ভগবৎবিশ্বাসী বলেন আমি ঠিক সে জাতীয় লোকও নই, কারণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমি নির্ভর করেছি নিজের চেষ্টার এবং বুদ্ধির উপর। নিজের আচরণের স্বপক্ষে ওকালতি করবার জন্যও আমি এসব যুক্তির অবতারণা করছি না—সত্যি সত্যি আমার যা মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। বিয়ে করেছিলাম আমি মায়ের অনুরোধে, মায়ের কথা রাখবার জন্য। বাবা আমার শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন, আমি মানুষ হয়েছিলাম মায়ের

কাছে। সুনন্দার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের আলাপ হয়েছিল কাশীতে এবং আমার বয়স যখন দশ বছর এবং সুনন্দার তিন বছর তখনই মা সেই তীর্থস্থানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সুনন্দাকে পুত্রবধূ করবেন। মায়ের এ প্রতিশ্রুতির উপর আমার কোনও হাত ছিল না, এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা লঙ্ঘন করে শস্তা বিদ্রোহের নিশান ওড়াবার প্রবৃত্তিও আমার হয়নি। আলেয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে বলে মাকে অপমানের কালিমায় লাঞ্ছিত করতে হবে, এ যুক্তি আমার মনে স্থান পায় নি। মাকেও আমি কম ভালবাসতাম না। তাছাড়া আর একটা কথাও তখন মনে হয়েছিল। আলেয়াকে বিয়ে করে কাছে পাবার কোন আশাই আমার ছিল না, সুনন্দাকে বিয়ে না করলে আমাকে মায়ের মনস্তাপের কারণ হয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। সে শক্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম—স্বপ্নলোকের প্রিয়াকে বাস্তবের ধূলিধূমের মধ্যে ঠিক মতো পাওয়া যায় না, স্বপ্নলোকের নিষ্কলুষ বর্ণ-বিচিত্রার মধ্যেই তাকে মানায় ভালো, তার সঙ্গে কল্পনাবিহার করেই তৃপ্তি পেতে হবে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগই থাকবে না—এসব যদি মানতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে বাস্তবের জন্য বাস্তবিক-সঙ্গিনীও একজন চাই। যেমন আমার কোথাও যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সঙ্গতি বা উপায় যদি না থাকে, তাহলে নিজের সঙ্গতি-অনুযায়ী অন্য কোনও শ্রেণীর টিকিট কিনিতে হয়। আমি যে টিকিট কিনেছি তা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। সুনন্দাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না। আমি যদি আলেয়াকে না দেখতাম হয়তো তাকে প্রথম শ্রেণীতেই ফেলতাম। ভেবেছিলাম কোন বিরোধ বাধবে না। কল্পলোকে থাকবে আলেয়া, আর মর্তলোকে সুনন্দা। কেউ কারও আভাসটুকু পর্যন্ত জানতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। আজ এক নূতন দৃষ্টি লাভ করে অনুভব করছি যে মর্তলোক আর কল্পলোক অভিন্ন নয়। শতদল কমলের মূল যেমন আলোকহীন পঙ্কস্তরে, কল্পলোকের মূলও তেমনি মর্তের মৃত্তিকায়। শুধু তাই নয়, এক লোকের বার্তা রহস্যময় বেতার-যোগে বাহিতও হয় অপরলোকে। সুনন্দা কেমন করে জানি না টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমার মন তাকে নিয়েই কৃতার্থ নয়, অন্য কোথাও সে আশ্রয় খুঁজছে। লাটাইটা তার হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘুড়িটা উড়ছে আকাশে। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হত সুতোটা যদি কেটে যায়। তার এই আশঙ্কা বাঙ্ময় হয়ে আমাকেও চঞ্চল করে তুলত। আমি তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারিনি যে তার সন্দেহটা অলীক! তার বাঁকা হাসি, তির্যক চাহনি, তার নানাবিধ কুটিল প্রশ্ন আমাকে

যেন একটা অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিত অহরহ। শেষে একদিন সে আমাকে বললে, "আলেয়া বুঝি মেয়েটির নাম?" আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"তুমি কি করে জানলে!" মুচকি হেসে সুনন্দা বললে, "কাল স্বপ্নে সোহাগ করছিলে যে তাকে। সব শুনেছি আমি!" আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল ভয়ে নয়, আনন্দে। স্বপ্নের কথা আমার মনে ছিল না। স্বপ্নে যে আলেয়াকে আমি কাছে পেয়েছিলাম, আদর করেছিলাম—এর এ অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দিত হয়ে উঠল। সুনন্দাকে বোঝালাম যে আলেয়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, তাই বোধহয় স্বপ্নের ঘোরে এলোমেলো কিছু বলে থাকব। তারপর মুচকি হেসে বললাম, "তোমাকেই বারবার মনে পড়ছিল প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে। তোমার চাল-চলন, ধরণ-ধারণ আলেয়ারই মতন তো। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দাও না!—যদি সোহাগ করে থাকি, তোমাকেই করেছি!" মেয়েরা কত সহজে ভোলে! আমার এই কথায় সুনন্দার চোখে-মুখে হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় পড়েছিলে প্রবন্ধটা আমাকে দেখিও তো।"

"লাইব্রেরিতে। আচ্ছা, নিয়ে আসব আজ।"

কথাটা মিছে নয়। সত্যিই লাইব্রেরিতে একখানা মাসিকপত্র ওলটাতে ওলটাতে 'আলেয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ একটা নজরে পড়েছিল একদিন। 'আলেয়া' নাম দেখে প্রবন্ধটা পড়েও ফেলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। সেই প্রবন্ধটা এনে দেখিয়ে দিলাম সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা এতে উচ্ছ্বসিত হল না, মুচকি হেসে চুপ করে রইল। বুঝতে পারলাম যে এত বড় যোগ্য একটা প্রমাণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না যদিও সে, কিন্তু মনের অবিশ্বাস তার ঘোচেনি। যে প্রমাণ অন্তর্যামীর বিশ্বাসযোগ্য, সে প্রমাণ আমি হাজির করতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। আমি সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে স্বপ্নের ঘোরে আবার কিছু বেফাঁস বলে ফেলি, মনে হচ্ছিল কোনও উপায়ে যদি সুনন্দার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারি তাহলে হয়তো এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ একটা। বাড়িতেই বসেছিলাম এতদিন, কোনও চাকরি কিম্বা ব্যবসাতে ঢুকতে পারিনি। ভাল চাকরি পাওয়ার মতো ডিগ্রি বা মুরুব্বির জোর ছিল না, ব্যবসা করবার মতো টাকাও ছিল না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করা, আর বন্ধু-বান্ধবদের কিছু একটা জোগাড় করে দেবার জন্যে চিঠি লেখা ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্য আর কোন সজ্ঞান চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনও হয়নি, কারণ মোটা ভাত

কাপড়ের সংস্থান ছিল বাড়িতে। হঠাৎ বাল্যবন্ধু চন্দ্রমোহনের চিঠি পেলাম একটা। আমার চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল, 'ভাই কমল-কিশোর, তুমি যদি কোলকাতায় এসে থাক তাহলে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমি নিজে যে ব্যবসাটা বছর কয়েক আগে ফেঁদেছিলাম সেটার উন্নতি হয়েছে কিছু। আমি একা আর সেটাকে সামলাতে পারছি না, আমাকে প্রায়ই বাইরে বেরুতে হয়। কোলকাতার কাজকর্ম দেখবার জন্য আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক খুঁজছি। তুমি যদি এসে সে ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। দেনা-পাওনার কথা সাক্ষাতে আলোচনা করব। তুমি একবার পার ত চলে এস।' আমি অবিলম্বে চলে গেলাম। চন্দ্রমোহন আমাকে মাসিক দেড়শ টাকা বেতন দিয়ে কর্মচারী বাহাল করতে চেয়েছিল। আমি তাতে রাজি হইনি। মনে হল—বন্ধুর অধীনে চাকরি করলে বন্ধুত্বও থাকে না, চাকরিও থাকে না। আমি তাকে বললাম, তোমার ব্যবসা আমি যথাসাধ্য দেখব, কিন্তু তার জন্যে মাইনে নেব না। তুমি যদি আমাকে রোজগারের অন্য কোনও উপায় দেখিয়ে দিতে পার তাহলেই যথেষ্ট হবে। চন্দ্রমোহন তাতেই রাজি হল, তারই সুপারিশে এবং চেষ্টায় অনেক দালালির কাজ পেয়েছি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির ইন্‌সপেক্টার হয়েছি। চন্দ্রমোহনই আমাকে বউবাজারের এই বাসাটা দেখে দিয়েছে। সুনন্দার সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে বিস্মিতও হয়েছি একটু। কোলকাতায় এসেই সুনন্দাকে লিখেছিলাম—"মানুষের প্রতিভাকে যদি সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে এই কোলকাতা শহরকে সেই ব্রহ্মার একটা সেরা সৃষ্টি বলতে হবে। সেই সেরা সৃষ্টির মাঝখানে বসে সেই সৃষ্টিকর্তাকে আমার অন্তরাত্মা যে প্রশ্ন করতে চাইছে তা যদি তোমাকে লিখে জানাই তুমি হেসে ঠিক উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বিশ্বাস কর সত্যিই আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—'আমার সুনন্দা কি রূপে গুণে কোনও নারীর চেয়ে কম? তা যদি না হয় তাহলে তোমার সেরা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী বলে সে অভিনন্দিত হচ্ছে না কেন! কেন সে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে?' সেই সৃষ্টি-কর্তাকে যদি সামনে পেতাম ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করতাম তাকে। এই জন্যেই তার এই সেরা সৃষ্টিটির মধ্যে তাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি অহরহ। আমি উপার্জন করার জন্যে এখানে এসেছি বটে, আপাতদৃষ্টিতে ওইটেই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু আসলে আমি সন্ধান করছি সেই স্রষ্টাকে—যিনি যোগ্যতমকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেননি। দেখা পেলে আমি তাঁর জবাবদিহি চাইব। একটা মুশকিলে পড়েছি কিন্তু। তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে বসেও সৃষ্টির

মর্মলোকে পৌঁছতে পারছি না আমি। একটা অদৃশ্য নদী এসে যেন উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে আমার পথরোধ করছে। আমি কিছুতেই ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে পৌঁছতে পারছি না, যেখানে পৌঁছলে আমার আশা আছে সেই সৃষ্টিকর্তার দেখা পাব। আধুনিক যুগে সৃষ্টিকর্তা কারা জান? আধুনিক যুগের মনীষীরা। পৌরাণিক চতুর্মুখ ব্রহ্মা এ যুগে লক্ষ-মুখ হয়ে বহুধা হয়েছেন। তাই এ যুগের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে যেতে হবে সেই সব মনীষীদের কাছে। কিন্তু আমি যেতে পারছি না। আমার দ্বিধা, আমার সঙ্কোচ, আমার মানসিক দৈন্য, এক কথায় আমার সর্ববিধ দারিদ্র্য এক বিরাট নদীরূপে এসে আমার পথরোধ করছে। আমি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভীষণ নদীর তীরে। জানি না কোন দিন নদী পার হতে পারব কি না···।" যে মনোভাব আমাকে এই চিঠি লিখতে প্রণোদিত করেছিল তা যদি কেউ প্রতারকের মনোভাব বলে মনে করেন আমি আপত্তি করব না। তাঁকে শুধু একটি জিনিষ মনে রাখতে অনুরোধ করব যে পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু ও ভাব যেমন একাধিক উপাদানের সমন্বয়লীলা, আমার এই মনোভাবটিও তেমনি। আমি কথার পরে কথা গেঁথে সুনন্দাকে ঠকাতেই চাইনি কেবল, আমার অন্তরের একটা সত্য উপলব্ধিকেও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। বিচিত্র কোলকাতা শহরের বৃহত্ব আমাকে শুধু অভিভূতই করেনি, কৌতূহলীও করেছে, লজ্জিতও করেছে। কৌতূহলী হয়েছি এ যুগের স্রষ্টাদের—ব্রহ্মাদের—পরিচয় লাভ করবার জন্য। বারম্বার মনে হয়েছে এই শহরের বিশালত্বের মধ্যেই আছেন তাঁরা। আমার সর্ববিধ দারিদ্র্য-জনিত অযোগ্যতাই তফাত করে রেখেছে আমাকে তাঁদের সান্নিধ্য থেকে। আমি যেন একটা দুস্তর নদীর এক তীরে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি অপর তীরের। পার হতে পারছি না। আমার এই সত্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ওই চিঠির ভাষায়। তবে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য যে যদি কোন দিন আমি নদী পার হয়ে স্রষ্টাদের দেখা পাই তাহলে তাদের সুনন্দার কথা জিজ্ঞাসা করব না। আমি জিজ্ঞাসা করব, যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম তাকে পেলাম না কেন? তোমাদের চক্রান্তেই কি এই নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে? এ অন্যায়ের সুবিচার কি কোথাও আছে? আমার আলেয়া কি চিরকালই অন্ধকারের বুক আলো করবে? সত্যের দিবালোকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ কি কোনদিনই সে পাবে না? হে আধুনিক যুগের সৃষ্টিকর্তারা, সত্যিই কি এর কোন প্রতিকার নেই? তোমাদের যদি কোনও ক্ষমতা থাকে, আলেয়াকে আমার কাছে এনে দাও। এর জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে প্রস্তুত আছি আমি···।

বিস্মিত হলাম যখন আমার শ্যালক শণ্টু এসে হাজির হ'ল একদিন। বলল —"দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে এই চিঠিটা আর এই পার্শ্বেলটা দিয়েছেন।"

"পার্শ্বেলে কি আছে?"

মুচকি হেসে শণ্টু বললে—"কোন খাবার-টাবার করে পাঠিয়েছেন বোধ হয়। আমি কোলকাতা থেকে কাশী যাব শুনে বললে তোর জামাইবাবুকে এটা দিয়ে যাস তাহলে। আমি আর দাঁড়াব না। আমার ট্রেন একটু পরেই।"

শণ্টু আর দাঁড়াল না।

চিঠিটা খুলে দেখলাম সুনন্দা লিখেছে—

"শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি লিখেছ, ভাল করে বুঝতে পারিনি সবটা। 'দারিদ্র্য' কথাটা অবশ্য বুঝেছি। আমার সোনার হারটা আর অনন্ত দুটো তাই পাঠালাম শণ্টুর হাতে। ওসব পরবার শখ আমার মিটে গেছে। তোমার যদি উপকার হয় বিক্রি করে দিও···।"

চিঠিটা পড়ে আর গয়নাগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সুনন্দা আমার চেয়ে অনেক বড়। মনে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তার গয়নাগুলো বিক্রি করেছি; সেদিন যে অত টাকা দিয়ে দূরবীণটা কিনে আনলাম তা ওই গয়না বিক্রির টাকাতেই!

কল্পলোকের মানসী দূরবীক্ষণের কাঁচের মধ্যে এসে ধরা দিলে অবশেষে। দূর এবং নিকটের একটা অদ্ভুত সম্মিলন আমাকে দার্শনিক করে তুলল যদি বলি, তাহলে কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার ঠিক বর্ণনা দেওয়া হবে না। কারণ দার্শনিকরা তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যকে যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করেন আমার তা ছিল না। আমি নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করছিলাম, কিন্তু অবিচলিত থাকতে পারছিলাম না। অধীর হয়ে পড়ছিলাম। আলেয়াকে নানারূপে নানা-ভঙ্গীতে সুখ-দুঃখের বেশ-বিন্যাসের নানা আবেষ্টনীতে রোজই দেখতাম, আর রোজই মনে হত দূরবীণের মধ্যে দিয়ে যাকে পাচ্ছি সে তো আলেয়া নয়, সে তো আলেয়ার ছবি মাত্র, সিনেমার ছবির মতো আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত হলেও ওটা ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। একথা মনে হলেই কেমন যেন একটা অতৃপ্তি হত। এই অতৃপ্তিতে হঠাৎ একদিন নূতন রঙ লাগল। মনে হল আমার এই চোখ দুটোও তো দূরবীণের মতই যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্রের মাধ্যমে এতদিন আলেয়ার যে রূপ দেখেছি সেটাও তো ছবি। চক্ষু-দৃষ্ট ছবিটা যদি আমাকে তৃপ্ত করে না থাকে

দূরবীক্ষণদৃষ্ট ছবিটাই বা করবে কেন? হঠাৎ মনে হল সত্যিই কি আলেয়াকে দূর থেকে দেখে তৃপ্ত হয়েছিলাম? হইনি। আমি চেয়েছিলাম···যা চেয়েছিলাম তা এতই আদিম কামনা যে আধুনিক সমাজে তা উচ্চারণ করাও পাপ। দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট আলেয়ার ছবিতে আমার এই কামনার রঙ লেগে, আমার অতৃপ্তির সঙ্গে আমার বাসনা যুক্ত হয়ে—আমার কল্পনা আমাকে যে জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল সেখানে বউবাজার স্ট্রীট ছিল না, ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, ছিল সোনার-কাঠি রূপোর-কাঠি, ছিল স্বর্ণলঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে সীতার জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ, আরও অনেক কিছু ছিল···।

সুতরাং শিখর সেনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কার মুখে যেন শুনেছিলাম যে সে এম. এস. সি. পাশ করেছে। বাল্যবন্ধুদের সম্বন্ধে এই ধরনের টুকরো-টাকরা খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অনেক সময়। শিখরের সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই ছিল না আমার। হঠাৎ চন্দ্রমোহন একদিন এসে বললে, "শিখরকে মনে আছে তোর?"

"আছে বই কি।"

"শুনছি তার মামা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। আমি গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গিয়ে দেখলাম, মোহন মুদির দোকানে কেমিস্ট্রির ভাল ভাল বই সাজানো রয়েছে। অবাক হলাম একটু। জিগ্যেস্ করাতে মোহন মুদিই বলল যে, শিখরবাবুকে তার মামা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বইগুলো এবং আরও অনেক খাতাপত্র সব শিখরবাবুর। তাঁর মামা আমাকে পুরানো কাগজের দরে বিক্রি করে দিয়েছেন এগুলো। শুনে আমার একটু কৌতূহল হল, আমি তার খাতাপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে তার পুরানো ডায়েরি পেলাম একখানা। সেইটে নিয়ে এসেছি।"

"শিখরের মামা তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?"

"এ কেনর উত্তর ওই 'ডায়েরিতেই' পাবে। কাল দিয়ে যাব খাতাগুলো তোমাকে।"

এর পরের অংশটুকু শিখরের জবানীতেই শুনুন।

তার ডায়েরির পাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিকেই আমি জীবন-যাত্রায় বাহন করেছি। পুরানো সেকালে নড়বড়ে কুসংস্কারের গো-শকটে চড়ে যাঁরা অতি-আধুনিক মডেলের মোটরকারকে গাল পাড়েন, তাঁরাই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছেন

আমার জীবনপথের সঙ্গী। তাঁদের গালাগালি স্মিতমুখে আমি সহ্য করে যেতাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেঙে পড়ল। অবন্ধনাকে আমি কেন ভালোবেসেছি এর কোন জবাব নেই। সকালে সূর্য ওঠে কেন, গাছে ফুল ফোটে কেন, সূর্য-ওঠা বা ফুল-ফোটা আমার মায়ের বা কয়েদী গাঙুলীর সম্মতি অনুসারে হচ্ছে না কেন, এসবেরও কোনও জবাব নেই। আশ্চর্যের বিষয়, ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর অনিবার্য আবির্ভাব মা এবং কয়েদী গাঙুলী মেনে নিয়েছেন, আমার সঙ্গে অবন্ধনার প্রণয় ব্যাপারটা তাঁরা মানতে পারলেন না। যে অবন্ধনার সঙ্গে আমি এক সঙ্গে কুলগাছে উঠেছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, খেয়েছি, শুয়েছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি, সেই অবন্ধনাকে আমি যখন বিয়ে করতে চাইলাম তখন আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। জাতের মিল নেই—বিয়ে হবে কি করে। অবন্ধনার অবশ্য বদনামও ছিল অনেক। কোন সুন্দরী মেয়ে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁসা হয়, চটকদার শাড়ি পরে ছিমছাম হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় তাহলে তার আর ক্ষমা নেই। অবন্ধনা সত্যিই কাউকে গ্রাহ্য করে না। অবলীলাক্রমে সে বেড়িয়ে বেড়ায় নবীন দুলের সঙ্গে ঘাটে-মাঠে বনে-বাদাড়ে। আমি যখন ছুটিতে বাড়ি আসি, নিত্য নূতন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায় আমার চোখের সামনে। আমার শোওয়ার ঘরের কাছে যে বেলগাছটা আছে তার উপর চড়ে গভীর রাত্রে আমার শোওয়ার ঘরে চলে আসতেও দ্বিধা করেনি সে কখনও। একদিন কানে দুটো চমৎকার দুল পরে এসে হাজির। হেসে বললে, "দুল পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো।"

"চমৎকার। কে দিলে দুল ?"

"কেউ দেয়নি। আমি পিসিমার দুল জোড়া চুরি করে পরে এসেছি তোমাকে দেখাব বলে। বেশ মানিয়েছে, না ?"

"চমৎকার মানিয়েছে।"

"কাল নবনে পদ্মপাতার পাপড়ি দিয়ে সুন্দর একটা টায়রা করে দিয়েছিল আমাকে। আবার করে দেবে বলেছে, তুমিও এস না কালিন্দীতে, অজস্র পদ্ম ফুটেছে সেখানে, কাল দুপুরে যেও কেমন ?"

"যাব।"

মাকে একদিন বললাম যে, আমি অবন্ধনাকে বিয়ে করতে চাই। সংবাদটা যে তাঁর কর্ণে মধুবর্ষণ করল না, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

বললেন—"ওই ভাবুনে মেয়েকে বিয়ে করবি! বলিহারী তোর পছন্দকে! তা ছাড়া ওরা বামুন—বিয়ে দেবে কেন ওরা!"

"সে আমি ওর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব। তুমি মত দাও।"

মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে যা নীরব ভাষায় ব্যক্ত হল তা এই—এত কষ্ট করে তোকে মানুষ করলাম তুই শেষে আমার বুকে এত বড় শেল হানবি! মায়ের এ দৃষ্টি কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে পারল না। আমি কয়াধুনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। ভাবলাম, ওঁকে যদি রাজি করাতে পারি, মা-ও রাজি হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে কথাটা শুনে কয়াধু বোমার মতো ফেটে পড়বেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না তিনি। আমার সমস্ত কথাগুলি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে আগাগোড়া শুনলেন। তাঁর কটা গোঁফদাড়ির জঙ্গলে সামান্য একটু চাঞ্চল্য জাগল শুধু। তার পর ধীর-কণ্ঠে বললেন—"তোমার মতো সুপাত্রের হাতে ওকে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তুমি অব্রাহ্মণ, অবু কুলীন নীলাম্বর মুকুজ্যের মেয়ে। তোমাদের বিয়ে হওয়া তো সম্ভব নয়।"

বললাম—"আপনি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। শাস্ত্র ঘাঁটালে দেখতে পাবেন শাস্ত্রকাররা যে গান্ধর্ব বিবাহ সমর্থন করেছেন তাতে জাতকুলের বিচার নেই।"

কয়েদী গাঙুলীর গোঁফ-দাড়িতে আর একবার ঢেউ খেলে গেল। বললেন—"আমরা গন্ধর্ব নই, গন্ধর্বলোকে বাসও করছি না, গান্ধর্ব বিবাহের কথা ভাবতেই পারি না আমরা। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের আইন মেনে চলতে হবে আমাদের—শাস্ত্রের এই উপদেশ।"

সবিনয়ে বললাম—"কিন্তু শাস্ত্রের চেয়ে কি মানুষ বড় নয়? আমি যখন অবুকে চাই, আর অবুও যখন আমাকে চায়।"

কয়াধু বাধা দিলেন এইখানে।

বললেন—"তুমি যে অবুকে চাও, তা তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি। কিন্তু অবু যে তোমাকে চায় একথা বুঝব কি করে?"

"অবু আমাকে বলেছে। আপনি তাকে জিগ্যেস্ করে দেখতে পারেন।"

কয়াধুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হল, গোঁফ-দাড়িগুলো নড়ে উঠল আর একবার।

বললেন—"বেশ, ভেবে দেখব। তুমি যাও এখন।"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অবু এসে হাজির আমার শোওয়ার ঘরে। রাত্রি তখন দেড়টা। দেখি তার শাড়ী ছিঁড়ে গেছে, গা ছড়ে গেছে। সম্ভবতঃ বেলের কাঁটায়।

বললাম—"একি!"

"পালাই চল।"

"পালাব? তার মানে!"

"না পালালে পিসেমশাই মেরে ফেলবে আমাকে। এই দেখ।"

পিঠের কাপড় তুলে দেখালে সে। দেখলাম, কালো কালো দাগে সমস্ত পিঠটা ভরতি।

"কি এ?"

"বেত মেরেছে। কাল থেকে আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে বলেছে। পালাই চল।"

"কোথায় পালাব এখন!"

"যেদিকে দু' চোখ যায়। চল, ওঠ, আর দেরী কোরো না।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"দেরী করছ কেন, ওঠ না।"

"এরকম ভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। মানে—"

"আমি তাহলে চললুম।"

পরমুহূর্তেই বেরিয়ে গেল সে। পরদিন সকালে শোনা গেল নবীন ঢুলেও অন্তর্দ্ধান করেছে।

১২-৮-৪০

গ্রামে কলেরা লেগেছে। চারিদিকে লোক মরছে, মানুষ নয় যেন মাছি। নবীন ঢুলের মা বাবা ভাই বোন সব মরে গেল। কায়স্থ পাড়াতেও দু'জনের হয়েছে শুনলাম। আতঙ্কে থম থম করছে চারিদিক। কয়েদী গাঙুলী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন। বিলাসদের চণ্ডীমণ্ডপে অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন শুরু হয়েছে। যেদিন মাকে অবুর সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলাম সেদিন থেকে মা আর বাক্যালাপ করেননি আমার সঙ্গে। কাল থেকে শয্যা নিয়েছেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কেবল বলছেন, 'মা রক্ষা কর,' 'মা রক্ষা কর'। আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। অবু কোথায় গেল? নবীন ঢুলের সঙ্গে পালিয়ে গেল? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে পালিয়ে গিয়ে ভালই করেছে। যা কলেরা লেগেছে চারিদিকে···। কিন্তু গেল কোথায় সে! নবীন ঢুলের সঙ্গে···?

১৪-৮-৪০

কালরাত্রে মা মারা গেলেন। মনে হল, কলেরার হাতে ইচ্ছে করে সঁপে দিলেন

নিজেকে। নিজে হাতে আমি যে খাবার জল রোজ ফুটিয়ে রাখি সে জল একদিনও স্পর্শ করেননি। পুকুরের জল খেতেন। মৃত্যুকালে তাঁর মুখে জল দিতে গেলাম, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য দেশে জন্মেছি। ভালবেসেছি—এই অপরাধে অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। ভালবাসার চেয়ে এখানে জাত বড়, জাতের পাঁচিল মা আর ছেলের মাঝখানেও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। অথচ এই দেশের লোকই আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমে গদগদ। সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে এ দেশে লেখাপড়া শেখা বৃথা, মনে হচ্ছে আমি এদেশের কেউ নই···

২০-৮-৪০

কাল রাত্রে মামা আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে জন্মের মত আমাকে চলে যেতে হবে। তিনি আর আমাকে বাড়িতে স্থান দিতে পারবেন না। বললেন, আমাদের অনাচারেই নাকি গ্রামে এই ভয়ঙ্কর মহামারি সুরু হয়েছে। এ বিধাতার অভিশাপ। অবু গেছে, আমি না গেলে রুষ্ট বিধাতা তুষ্ট হবেন না। আজ একটু পরেই চলে যাব। এখান থেকে কিছুই নিয়ে যাব না। এমন কি এই ডায়েরির খাতাখানা পর্যন্ত নয়। এ খাতা মামার পয়সায় কেনা। একটি জামা, একটি কাপড় এবং জুতো জোড়াটি পরে বেরিয়ে যাব শুধু। স্বোপার্জিত অর্থে নিজের জামা-কাপড়-জুতো যখন কিনতে পারব তখন ওগুলোও ফিরিয়ে দেব মামাকে। কোথায় যাব ? কোলকাতাতেই একমাত্র স্থান, যেখানে রোজগার করবার সম্ভাবনা। অবুকেও খুঁজব। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে। মাপ চাইতে হবে তার কাছে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সে যখন আমার সাহায্য চেয়েছিল আমি তাহাকে সাহায্য করিনি। ধিক্ আমার পৌরুষকে। অবুকে খুঁজে বার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য হবে এখন। ভাবছি—অবুর সন্ধানের সঙ্গে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাকে খাপ খাওয়াব কি করে ? পুলিশে চাকরির চেষ্টা করলে কেমন হয় ! আমার এক সহপাঠীর দাদা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড় চাকরি করেন। ভাবছি তার সঙ্গে গিয়েই দেখা করব।···

এইখানেই শিখরের ডায়েরি শেষ হয়েছে। কলেরার খবরটা জানতাম। কারণ কলেরা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবার কাশীতে চলে যায়। সুনন্দার বাপের বাড়ী কাশীতে। শিখরের খবর কিন্তু আর পাইনি। চেষ্টাও করিনি খবর নেবার। অথচ শিখরের সঙ্গে সত্যিই আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল, 'প্রগাঢ়' বিশেষণ দিয়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর তার সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহটা কেমন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মনের

স্বভাব অতি বিচিত্র। কত তুচ্ছ জিনিস সে নিজের ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে, আবার কত বৃহৎ জিনিসকেও ফেলে দেয়। যে মানদণ্ড দিয়ে সে বাছাই করে তা অতি সূক্ষ্ম। নিজেও সব সময়ে বুঝতে পারি না তার মর্ম। আর একটা জিনিসও জীবনে লক্ষ্য করেছি। যাকে ভুলে গেছি সে অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আবার দেখা দেয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবটা যেন মৌন ব্যঙ্গের সুরে নীরব ভাষায় বলতে থাকে, 'এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল!'···ফুরিয়ে যাওয়াটাই জীবনের ধর্ম। একটা জিনিসকে নিয়ে বেশীক্ষণ সে থাকতে চায় না; কারণ যা সে চায় একটা জিনিসের মধ্যে তাকে পায় না, সে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনুসন্ধান করে বেড়ায় তার কাম্যকে, আমরণ চলে এই অনুসন্ধান, মরণের পরও হয়তো চলে। আলেয়াও ফুরিয়ে যাবে না কি একদিন? মনে হয়, যাবে না। কারণ আমার অনুসন্ধানের নাগালের মধ্যে সে ধরাই দেবে না কখনও। তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল চির-উৎসুক থাকবে, সাধকের যেমন থাকে আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে। শিখরের ডায়েরিটা যেদিন চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেলাম, সেদিন শিখরই যেন নবরূপে আবির্ভূত হল আবার। তার সঙ্গে একটা একাত্মতাও অনুভব করলাম যেন। মনে হল আমরা দু'জনেই একপথের পথিক। একটু লজ্জাও হল। শিখর প্রেমের জন্য গৃহহারা হয়েছে, মায়ের স্নেহ হারিয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে অবন্ধনার খোঁজে···আমি কি করেছি! নিজেকে আমি বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে প্রয়োজন হলে আমি ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম। প্রয়োজন হয়নি, তাই করিনি। কিন্তু আমার যুক্তি আমার কাছেই খেলো মনে হয়েছে বারম্বার। সুনন্দার মুখখানাও মানসপটে ফুটে উঠেছে, তার ভ্রূভঙ্গিতে চোখের চাহনিতে জেগেছে স-বিদ্রূপ প্রশ্ন—"সত্যিই কি পারতে?"···স্বীকার করতে হয়েছে পারতাম না। আমি সুবিধাবাদী; শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখতে চেয়েছি।···আমি শিখর সেনকে এর পর থেকে কিছুদিন যে রূপে কল্পনা করেছি তা সন্ন্যাসীর রূপ। মনে হয়েছে মহাদেবের মতো অদৃশ্যা সতীর শব বহন করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষময়। শোকোন্মত্ত দেবতার বেদনায় ত্রিভুবন কেঁপে উঠেছিল, শিখর সেনের শোক কাউকে বিচলিত করবে না। অন্তর্হিতা সতীর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করেছে একান্ন পীঠস্থান, অসংখ্য পূজারী আজও অর্ঘ বহন করে নিয়ে চলেছে সতীর স্মৃতিপূত পুণ্যতীর্থে, তাদের প্রণয়-কাহিনী আজও ধ্বনিত হচ্ছে সাহিত্যে ধর্মে, তর্পণের বিবিধ মন্ত্রগাথায়। অবন্ধনাকে কিন্তু কেউ মনে করে রাখবে না। বিস্মৃতির অতলে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে, চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। সমাজেও তার স্থান হয়নি, মানুষের

মনেও তার স্থান হবে না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মনে একটা কুৎসিত ঘায়ের মতো সে দগদগ করবে কিছুদিন, লজ্জায় সেটাকে ঢেকে রাখবে সবাই, তারপর তা-ও আর থাকবে না। থাকবে শুধু একটা চিহ্ন, গৌরবের নয়, লজ্জার। শিখর সেনের মনের মন্দিরেই হয়তো তা জ্বলছে পবিত্র হোমশিখার মতো। গৃহহারা শিখর সেন কোথায় এখন···? শিখর সেনকে যতটুকু আমি দেখেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে যতটুকু খবর আমি পেয়েছিলাম ততটুকুই আমার সম্বল ছিল। ওইটুকুকে কেন্দ্র করেই আমার কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল। অপ্রত্যাশিত কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। গুটি থেকে প্রজাপতির আবির্ভাব, বা ফুল থেকে ফলের পরিণতি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হত—যদি না আমরা তা প্রত্যক্ষ করতাম। যে শিখর সেনকে কল্পনায় শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম তার খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা মূর্তি দেখে তাই চমকে গেলাম একদিন। আমার এক পিসতুতো ভাই শৈল পুলিশের চাকরি করত, সেই একদিন পরিচয় করিয়ে দিলে রাস্তায় হঠাৎ। শিখর সেন পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছে। অবন্ধনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না! সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

॥ ১৯ ॥

নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার আর সিংহ গর্জনে কম্পিত হইতেছিল না। যে স্থানে বাণী-কারাগারে সিংহরূপী পিতামহ গর্জন করিতেছিলেন, সে স্থান অসংখ্য খদ্যোত-আলোকে খচিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন স্রষ্টার অন্তরের অনন্ত আকুতি অসংখ্য কিরণ-কণিকায় স্পন্দিত হইতেছে, অনির্বচনীয় বুঝি আলোকের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সহসা সেই আলোক-বিন্দুগুলি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। পিতামহ কহিলেন—"বাণী তোমার অনুরোধ আমি বারবার লঙ্ঘন করে ফেলেছি। আমি কিছুতেই আমার পুরাতন সৃষ্টির প্রতি-মুহূর্তের বিবর্তনকে অনুসরণ করতে পারছি না। আমার কল্পনা কেবলই আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। সুন্দরানন্দ যে সিংহটিকে বন্দী করে রেখেছে তাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বন্দিত্বের বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ, তর্জন-গর্জনের মধ্যে তার প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির যে নিষ্ফল আক্রোশ তা নিজের মধ্যে অনুভব করলে বুঝি অভূতপূর্ব কিছু একটা পাব। কিন্তু কিছুই পেলাম না, মনে হচ্ছে সময় নষ্ট হল খালি। কেন এরকম হল বল তো?"

কেহ কোনও উত্তর দিল না।

"বাণী, তুমি কোথা গেলে ?"

নিবিড় অরণ্যের বনস্পতিকুল যেন জাগিয়া উঠিল। তাহাদের শাখায়-পল্লবে পত্রে-কিশলয়ে মৃদু মর্মরধ্বনিও শোনা গেল। বাণী বাঙ্ময়ী হইলেন।

"কোথাও যাইনি।"

"আমি যা বললাম শুনেছ ?"

"শুনেছি।"

"উত্তরে কিছু বললে না যে !"

"আসল সিংহের নিদারুণ বন্দিত্ব—আর নকল সিংহের বন্দিত্বের অভিনয় কি এক হতে পারে কখনও ! আপনি খেলা করছিলেন। এ খেলার শখ যদি মিটে থাকে, চলুন আর একটা খেলায় মাতা যাক।"

"মনে হচ্ছে চটেছ। কিন্তু আমি বন্দী-সিংহ সাজতে চেয়েছিলাম কেন তা বোধহয় বুঝতে পারনি ! স্বৈরচর সৃষ্টি করবার কল্পনাটা এখনও মাঝে মাঝে উতলা করছে আমাকে। মনে হচ্ছিল ওই সিংহটার যদি মশা হবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি ওকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারে ? সিংহ সেজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম, সত্যি সত্যি কতটা কষ্ট ও ভোগ করছে। কিন্তু কিছুই তো অনুভব করতে পারলাম না। আমার বরং বেশ মজা লাগছিল।"

"তা তো লাগবেই। আপনি যে অভিনয় করছিলেন। তা ছাড়া আপনার মনও কি এখানে ছিল সব সময় ? আপনি শিখর সেনের গল্পটা কেমন লেখা হচ্ছে তা জানবার জন্য বারবার চলে যাচ্ছিলেন যে।"

"তুমি টের পেয়েছ সেটা তাহলে।"

"পাব না ? আমিও যে যাচ্ছিলাম।"

"সত্যি কথা বলব তাহলে ? শুধু কবির মনে নয়, বহু স্থানে গিয়েছিলাম আমি। কিশলয়-কোরকে, ফুলের কুঁড়িতে, ফলের সম্ভাবনায়, শিল্পীর স্বপ্নে—যেখানে যত সৃষ্টির স্বপ্ন মূর্ত হচ্ছে সেখানেই গিয়েছিলাম আমি।"

"সব জানি।"

"তুমি জানবে না ? অথচ ধমকাচ্ছ আমাকে, কি আশ্চর্য !"

অরণ্যের মর্মরধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। অরণ্যের প্রান্তে অন্ধকারের বুকে একটি মনোহর আলেয়া মূর্ত হইল সহসা। অরণ্যপ্রান্ত হইতে ক্রমশ তাহা সরিয়া যাইতে লাগিল। খদ্যোতকুল আকুল হইয়া উঠিল।

"তুমি কোথায় চলেছ বাণী ?"

"চলুন সুন্দরানন্দের আসল সিংহটাকে দেখে আসা যাক। চার্বাকের খবরটাও পাওয়া যাবে।"

"সে তো জালার ভিতরে বসে আছে। জালা থেকে বেরুক আগে।"

"এখনি বেরুবে।"

"চল তাহলে।"

সুন্দরানন্দ যে অরণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন সেখানে কোনও প্রাসাদ তো ছিলই না—সুরক্ষিত কোনও গৃহও ছিল না। প্রথমে অরণ্যের কিছু অংশ পরিষ্কৃত করাইয়া মৃগয়ার জন্য কয়েকটি শিবির ফেলা হইয়াছিল মাত্র। বহুকাল পূর্বে যে বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে নর্মদাতীরে সুন্দরানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, কুম্ভীর শিকারে যাঁহার অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে সিংহের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং পুনরায় যে তাঁহার সহিত দেখা হইয়া যাইবে তাহা সুন্দরানন্দ প্রত্যাশা করেন নাই। গ্রীস দেশের সেই রাজপুত্র যে কিরাতের বেশে একটি হরিণ ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা সত্যই তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিরাতের দলে কিরাতের বেশে মির্মিরকে প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। একটি বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় কিরাতের অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং নীলচক্ষু তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল মাত্র, বিস্মৃতির কুয়াশা কাটে নাই। সহসা মির্মির যখন পালক-নির্মিত উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যখন তাঁহার কুঞ্চিত তাম্রবর্ণ কেশদাম ললাটে স্কন্ধদেশে আলুলায়িত হইয়া পড়িল, সকৌতুক হাসিতে যখন তাঁহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সুন্দরানন্দ মির্মিরকে চিনিতে পারিলেন।

"বিদেশী আপনি এখানে হঠাৎ!"

"হঠাৎ নয়, অনেক দিন হল এসেছি এক সিংহের সন্ধানে।"

"সিংহের সন্ধানে?"

"হ্যাঁ। রাজপুতানার মরুভূমিতে প্রথমে তাকে দেখি, তারপর থেকে তার অনুসরণ করছি, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে—সে যেন আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে।"

"এই অরণ্যে এসেছে সে সিংহ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার লক্ষ্য তো অব্যর্থ। এখনও তাকে আপনি মারতে পারেন নি?"

"আমি তাকে মারতে চাই না, বন্দী করতে চাই।"

"ও।"

সুন্দরানন্দ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ পোষবার সখ আছে নাকি?"

"আমি আর কখনও সিংহ পুষিনি। এই প্রথম সখ হয়েছে পোষবার। শুধু পোষবার নয়, তাকে নিয়ে অবসর বিনোদন করবার। আমার জীবনে অবসর প্রচুর, সে অবসরটাকে আনন্দময় করাটাই আমার জীবনের প্রধান সমস্যা। আগে অনেক কিছু করেছি, এবার নতুন কিছু করে দেখি। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন কুমার। আপনার সাহায্য না পেলে এ সিংহকে আমি ধরতে পারব না।"

"কি করতে হবে বলুন।"

"এই কিরাতদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে বাস করছি। তাদের মুখেই শুনলাম তারা আপনাকে কয়েকটি হরিণ ধরে দিয়েছে। আমার অনুরোধ—অন্তত একটি হরিণ আমাকে দিন।"

"হরিণ নিয়ে কি করবেন?"

"টোপ স্বরূপ ব্যবহার করব।"

"বেশ তো, সে আর বেশী কথা কি। আজই নেবেন। আর একটা কথা, আমি যখন এসে গেছি তখন আপনি আর কিরাতদের মধ্যেই বা থাকবেন কেন, আমারই আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"কিরাতদের মধ্যে আমি আনন্দেই আছি কুমার। তবে আপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার স্পর্ধা আমার নেই।"

মির্মির সেইদিনই আসিয়া কুমার সুন্দরানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারের শিকার-শিবিরে সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিল না, সুতরাং সুরঙ্গমার সহিত মির্মিরের আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না। আলাপটা কুমারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করাইয়া দিয়াছিলেন।

"ইনি আমার অবসর বিনোদনের উপলক্ষ। মানুষের রুচি বিভিন্ন, আপনার পছন্দ সিংহ, আমার পছন্দ অপ্সরী।"

"আমারও অপ্সরী ছিল কুমার। এখনও সে আছে, কিন্তু বাইরে নেই। ইন্দ্রিয়লোক থেকে তাকে আমি বিসর্জন দিয়েছি।"

"বিসর্জন দিয়েছেন? মানে?"

"ত্যাগ করেছি।"

"ও।"

সুরঙ্গমার নয়নে একটি অর্থপূর্ণ হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। সুন্দরানন্দের অধরেও মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। যে সুবিদিত কারণে নারীকে পুরুষেরা সাধারণতঃ ত্যাগ করে তাহাই উভয়ের চিত্তকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া মির্মির কহিলেন —"আমার অপ্সরীকে আমি কেন ত্যাগ করেছি তার ইতিহাস আপনাদের আর একদিন শোনাব। এখন নয়। একদিন গভীর রাত্রে সে কথা বলব। গভীর রাত্রেই আমরা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারি। দিবসের দৃশ্যমান জগৎ তাকে আবৃত করে রাখে, দিবালোকে নিখিলের মর্মবাণী আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে, তখন আমাদের মনে হয় যে আহরণই বুঝি পরমার্থ, আমরা তখন ভুলে যাই যে ত্যাগ মানেই আহরণ। তাই এখন সে কথা বলব না, বলব গভীর রাত্রে।"

মির্মিরের জ্ঞান-গম্ভীর কথা শুনিয়া সুরঙ্গমা ও সুন্দরানন্দ শুধু বিস্মিত নয়, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"বেশ তাই হবে। এখন আপনার সিংহ ধরবার জন্য কি কি আয়োজন করতে হবে বলুন।"

"সিংহটা কোন্ অঞ্চলে আছে তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে।"

"তা তো ঠিকই। কি করে নির্ণয় হবে সেটা?"

"গর্জন শুনে।"

"আমরা তো কোনও গর্জন শুনিনি কোনও দিন।"

"আমি শুনেছি। গভীর রাত্রে মেঘ গর্জনের মতো সে গর্জন। একদিন মাত্র শুনেছিলাম, তাই কোন অঞ্চলে সে আছে ঠিক করতে পারিনি। ঠিক করতে দেরী হবে না। ফাঁদটা আর খাঁচাটা আগে তৈরী হয়ে যাক, তারপর তাকে ডেকে আনব এখানে।"

"ডেকে আনবেন?"

"হ্যাঁ। সিংহের ডাক ডাকতে পারি আমি। সিংহিনীর ডাক ডাকতে হবে, তাহলেই সে ছুটে আসবে।"

মির্মিরের মুখমণ্ডল হাস্যমণ্ডিত হইয়া গেল।

সুরঙ্গমা সলজ্জ দৃষ্টিতে সুন্দরানন্দের দিকে চাহিতেই সুন্দরানন্দ বলিলেন— "মানুষই প্রিয়ার ডাকে আসে জানি, সিংহও আসে না কি?"

"সিংহই আসে, মানুষই বরং না আসতে পারে। সিংহের না এসে উপায় নেই, তাকে আসতেই হবে।"

"কেন?"

"কারণ সে পশু। স্বাধীনভাবে চলবার তার শক্তি নেই। ভয়ঙ্কর কিছু দেখলে তাকে ভয় পেতেই হবে, ক্ষুধিত হলে সে খাদ্য অন্বেষণ করবেই, ঘুমোবার সময় তাকে ঘুমোতেই হবে, জাগবার সময় তাকে জাগতেই হবে, সিংহিনীর প্রণয়-আহ্বান শুনলে তাকে আসতেই হবে ছুটে। মানুষের মতো যা খুশী করবার ক্ষমতা নেই তার। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তো তফাত।"

সুরঙ্গমা বলিলেন—"মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে বলছেন ?"

"কেউ যুক্তি মেনে চলে, কেউ আবার খেয়াল অনুসারেও চলে। পশুর মতো বাঁধাধরা একই পথে সবাই চলে না।"

"চলে বই কি। তা না হলে সমাজ টিকে আছে কি করে। সবাই নিজের মতে চললে কি সমাজ টিকত ?"

"এটা ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু তবু আপনাকে মানতে হবে যে মানুষই যা-খুশী করতে পারে, পশু পারে না। মানুষের সামাজিক নিয়মও বদলাচ্ছে বারবার, কারণ নিয়ম বদলাবার ক্ষমতা মানুষেরই আছে, পশুর নেই।"

"কিন্তু সে ক্ষমতার ব্যবহার কি মানুষ করে ? আমি—যা-খুশী—করছি, এই ধারণার মোহই তাকে অন্ধ করে ফেলে না কি ?"

মির্মির মুগ্ধদৃষ্টিতে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সুন্দরানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইনি শুধু দেহে নন, মনেও রূপসী। অনেক ফুলের রূপ থাকে কিন্তু সুগন্ধ থাকে না, আবার রূপ নেই সৌরভ আছে এমন ফুলও বিরল নয়। কিন্তু রূপে গুণে সমান এমন ফুল দুর্লভ। দেবতার নির্মাল্য হবার উপযুক্ত এ ফুল। কুমার সুন্দরানন্দ আপনি ভাগ্যবান।"

কুমার সুন্দরানন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন ক্ষণকাল, তাহার পর বলিলেন —"নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে করছি আপনার মতো একজন রসিকের সান্নিধ্যলাভ করে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার 'মির্মির' নামটা কি আপনার স্বদেশী নাম ?"

"না। আমার স্বদেশী নাম হেরোডোটাস। মির্মির নামটা আমি নিজে গ্রহণ করেছি সব দেশে ঘুরে বেড়াবার সুবিধা হবে বলে।"

"ওটা কি সংস্কৃত শব্দ ?"

"কোনও ভাষা থেকে শব্দটা আমি বাছিনি। হয়তো ওর কোন মানেই নেই। কথাটা নিজেই আমি বানিয়েছি।"

"হঠাৎ আমার নামের কথাটা আপনার মনে জাগল কেন কুমার ?"

"শব্দটার কোনও অর্থবোধ হচ্ছিল না বলে মনে হল, হয়তো ওটা বিদেশী শব্দ।"

মির্মির হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—'না, ওটা কোন ভাষারই শব্দ নয়। ও শব্দ আমারই সৃষ্টি এবং ওর অর্থ আমি। কিন্তু বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। ফাঁদটা তৈরী করবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলম্ব হলে সিংহ পালাবে।"

"কি করব বলুন—"

"প্রকাণ্ড গভীর একটা গর্ত খুঁড়তে হবে। আর সেই গর্তটাকে ঘিরতে হবে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে, বেশ মজবুত করে। তারপর সেটার উপর লতা-পাতা খড় দিয়ে চাল তৈরী করতে হবে একটা। দরজাও থাকবে। অর্থাৎ দূর থেকে মনে হবে যেন একটা ঘর। ঘরই হবে সেটা, কেবল তার মেঝেটা হবে প্রকাণ্ড গহ্বর। আর সেই গহ্বরের তলায় থাকবে মোটা দড়ির তৈরী জাল একটা। জালের খুঁটগুলো থাকবে উপরে অর্থাৎ আমাদের আয়ত্তাধীন। হরিণটাকে ঘরের ভিতরে একটা দেওয়ালে এমন ভাবে আমরা বাঁধব যেন মনে হবে সেটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শিং, পা আর পিঠ সবই বাঁধতে হবে দেওয়ালের সঙ্গে। এমন জায়গায় বাঁধতে হবে যেন হরিণটাকে দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় বাইরে থেকে। দরজার একটা কপাটও থাকবে, আর সেটা ঝুলে থাকবে ওপর থেকে, যে দড়ি থেকে ঝুলে থাকবে সেটাও থাকবে বাইরে অর্থাৎ আমাদের নাগালের মধ্যে। সিংহ ঘরের ভিতর ঢুকলেই দড়িটা কেটে দেব আমরা—আর কপাটটা বন্ধ হয়ে যাবে!"

"সিংহটা ঢুকবে হরিণের লোভে?"

"নিশ্চয়। আর আসবে সিংহিনীর ডাক শুনে। অর্থাৎ লোভ আর কাম এই দুই রিপুই তাকে বন্দী করবে, আমরা উপলক্ষ মাত্র।"

মির্মিরের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে দৃষ্টি তিনি সুরঙ্গমার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

সুন্দরানন্দ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"বেশ, কাল থেকেই লোক লাগাচ্ছি। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ফাঁদ তৈরী হয়ে যাবে।"

কুমার সুন্দরানন্দের আদেশে এবং মির্মিরের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিনের মধ্যেই সিংহের ফাঁদ প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার পর প্রায় প্রতি রাত্রেই মির্মির গভীর রাত্রে বাহির হইয়া যাইতেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া সিংহিনীর ডাক ডাকিতেন। সত্যই মনে হইত যেন একটা আকুল কামনা নিবিড়

অরণ্যের অন্ধকারে গভীর নিশীথিনীর বুক চিরিয়া আর্তনাদ করিতেছে। সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া প্রতি রাত্রেই মির্মির ফিরিয়া আসিতেন এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেন, প্রত্যুত্তরে সিংহের ডাক শোনা যায় কি না। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি কিছুই শোনা গেল না।

সেদিন গভীর রাত্রে মির্মির উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন। সমস্ত অরণ্য মুখরিত করিয়া ঝিল্লী ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মাঝে মাঝে বন্য-পেচকের কর্কশ চীৎকার, আকাশচারী দ্রুতগামী হংসদলের সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত কলকণ্ঠ নিনাদ, জম্বুকঠের ক্ষণস্থায়ী ঐক্যতান ঝিল্লী ঝঙ্কারকে মাঝে মাঝে বিঘ্নিত করিতেছিল বটে, কিন্তু বিঘ্নিত করিয়াই যেন তাহাকে আরও স্পষ্ট আরও জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল, উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহা যেন আরও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। এই ঝিল্লী ঝঙ্কারের সহিত মিশিতেছিল মৃদু বীণার ঝঙ্কার। পাশের ঘরে বসিয়া সুরঙ্গমা মালকোষ আলাপ করিতেছিল। মির্মির মনে মনে উৎকর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া তাহা মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। কুমার সুন্দরানন্দ সকৌতুকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কুমার মির্মির, আপনি কি সিংহ গর্জন শোনবার জন্যই অতটা একাগ্র হয়েছেন ?"

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—"না। সিংহ গর্জন এত স্থূল যে তা শোনবার জন্য একাগ্র হতে হয় না। সে গর্জন বিরাট হাতুড়ির মতো এসে চেতনার উপর আঘাত করবে। আমি ঝঙ্কারময়ী নিশীথিনীর অন্তরের ভাষা শুনছিলাম।"

"ও! কি রকম সে ভাষা! আমি একটু জানতে পারি কি ?"

"আত্মসমর্পণের ভাষা। সমস্ত পৃথিবী থেকে অহোরাত্র এই ভাষা উঠছে আকাশের দিকে। দিনের বেলা সেটা ভাল বুঝতে পারি না। গভীর রাত্রিতে একটু চেষ্টা করলে সেটা বোঝা যায়।"

"ও, আপনি একদিন বলেছিলেন বটে এই ধরনের একটা কথা। আপনার অপ্সরীকে কোথায় কেন ত্যাগ করেছিলেন সে কাহিনীও শোনাবেন বলেছিলেন একদিন গভীর নিশীথে। শোনাবেন না কি এখন ?"

"তা শোনাতে পারি। কিন্তু তার আগে মনটাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। না নিলে এর মাধুর্য এর মহিমা ঠিক বোঝা যাবে না।"

"আপনিই মনটাকে প্রস্তুত করে দিন। সুরঙ্গমাকে ডাকব ?"

"ডাকুন।"

বীণাহস্তে সুরঙ্গমা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিতেই মির্মির বলিলেন—"আপনি কুমারের পাশে বসে বীণায় মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিন। তাহলে আমার বক্তব্যের পটভূমিকাটা আরও মনোরম হবে।"

কুমার সুন্দরানন্দের মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হইল, সুরঙ্গমাও হাসিমুখে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

মির্মির বলিতেছিলেন—"তাঁর নাম ছিল তানে। আমার ভৃত্য আবাস তাকে কিনে এনেছিল সিরিয়ার হাট থেকে। আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা থিওনি মারা যাবার পর একটি পরিচারিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, আবাসকে তাই সিরিয়ার হাটে পাঠিয়েছিলাম। পঞ্চদশী তানেকে কিনে নিয়ে এল সে। রজনীগন্ধার শুভ্রতা, সৌরভ আর তনিমার সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মদিরতা মেশালে যা হয় তানে তাই ছিল। দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম, মনে হল ওলিম্পাসের কোনও দেবী বুঝি ছলনা করতে এসেছেন আমাকে, হয়তো আফ্রোদিতে নিজেই এসেছেন। আবাসকে বললাম—তোমার রসবোধের উপর আমার আস্থা ছিল, তুমি যে ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য রজনীগন্ধার ডাল নিয়ে আসবে তা কল্পনা করিনি। আবাস বললে—ওকে দেখে ভাল লাগল তাই নিয়ে এসেছি। কাফ্রী ওথাকেও এনেছি, সেই পরিচারিকার কাজ করবে। প্রশ্ন করলাম—তানে করবে কি? আবাস মৃদু হেসে বললে—ও বিশেষ কিছু করবে না, ও আশে-পাশে থাকবে খালি, যদি আদেশ করেন গান করতে পারে মাঝে মাঝে। তানের রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, গান শুনে আত্মহারা হলাম। তারপর একবছর, দু'বছর, তিন বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল স্বপ্নের মতো। মনে হল ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ, হারিয়ে ফেলছি নিজেকে, তারপর আবার সহসা একদিন অনুভব করলাম অবসাদ এসেছে। আবিষ্কার করলাম, তানের পদশব্দ শোনবার জন্যে আর আমি উৎকর্ণ নই, তার তন্বী দেহকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধবার আগ্রহ আর আমার নেই। অপস্রিয়মান রঙীন মেঘের মতো তানে ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তানেও সেটা অনুভব করেছিল সম্ভবত। সে একদিন বললে এসে—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই। মাকে অনেকদিন দেখিনি, দেখে আসি। তানের মা-বাবা আছেন কিনা, কোথায় তাঁদের বাড়ি, যে মেয়েকে তাঁরা হাটে বিক্রি করে দিয়েছেন তার প্রতি তাঁদের স্নেহ অটুট আছে কি নেই—এসব কোনও প্রশ্নই আমি করলাম না। তাকে ছুটি দিলাম। সে যখন চলে গেল তখনই যেন তাকে আবার পেলাম, তার স্বপ্ন, তার অভাব, তার অনবদ্য রূপের শত সহস্র প্রকাশ আমার চিত্তকে আকুল করে তুলল। মনে হত লাগল সে যখন কাছে ছিল তখন তাকে এমনভাবে

পাইনি। সেই সময় ঠিক আর একটা জিনিসও আমার চোখে পড়ল। চোখের সামনে সেটা চিরকালই ঘটছিল, কিন্তু দেখতে পাইনি··· ।"

মির্মির নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, মনে হইল তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা নবদৃষ্টিলাভ করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যেন মনে মনে তাহাই আবার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্ধকার অরণ্যের ঝিল্লীকুল আকুল ঝঙ্কারে যেন সেই দর্শনের পটভূমিকা সৃজন করিতেছে।

কৌতূহলী সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল—"কি চোখে পড়ল আপনার ?"

"শেফালী ফুলের গাছ একটা। আমি যে ঘরে বসতাম সেই ঘরের জানালা দিয়ে সম্পূর্ণ গাছটা দেখা যেত। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম গাছের তলায় অজস্র ফুল পড়ে রয়েছে। রোজই পড়ে থাকে, কিন্তু সেদিন তাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম। মনে হল ওই শেফালী তরুটি যে ফুলগুলিকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত শত শত বৃন্ত বন্ধনে সাগ্রহে বেঁধে রেখেছিল সেগুলিকে কত সহজে ত্যাগ করেছে। এই যে ওর এতগুলি সন্ততির শবদেহ ওর পদপ্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এর জন্য ওকে তো শোকাকুল মনে হচ্ছে না, ওর শাখাপত্রগুলি তো অবনমিত হয়নি। বাতাসের হিল্লোলে ও আগেও যেমন আনন্দিত ছিল, এখনও তেমনি আছে। তারপরই লক্ষ্য করলাম ওর শাখায় শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি রয়েছে, একটু পরেই সেগুলি ফুল হয়ে ফুটবে। মনে হল রহস্যটা যেন বুঝলাম একটু। ত্যাগ করতে পারে বলেই গাছ নূতন ফুলের স্বপ্নে আকুল হতে পারে। পুরাতন ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে পারত না। যে ফুলগুলোকে ও ত্যাগ করতে পেরেছে তারাই আবার ফিরে আসছে ওর নবমুকুলের স্বপ্নে, নবকুসুমের বিকাশে। পুরোনো ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে এসব হত কি ? বিচ্ছেদ না থাকলে কি মিলন মধুর হয় ? ত্যাগ না করলে কি ভোগের আনন্দ পাওয়া যায় ! শেফালী তরুর ভিতর আমি সেদিন যে সত্যের ইঙ্গিত পেলাম তা নিজের মধ্যেই আমি স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করছিলাম তানের বিরহ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে। বুঝতে পারছিলাম তানে দূরে চলে গেছে বলেই আরও নিকটে পেয়েছি তাকে।···"

পুনরায় মির্মির নীরব হইলেন। ঝিল্লী-ঝনৎকার সহসা যেন বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল অন্ধকারের নিবিড়তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একদল উন্মত্ত সুর আকুলভাবে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে, যাহা খুঁজিতেছে তাহা না পাইলে বুঝি তাহাদের জীবনান্ত ঘটিবে। সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, মির্মিরের নয়ন দুইটি ক্রমশ নিমীলিত হইতেছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিমীলিত নয়নে তিনিও

আকুল ঝিল্লীঝঙ্কারের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা সোৎসুকে মির্মিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মির্মির অবশেষে অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, "সেদিনকার রাত্রিও এমনি ঝিল্লী-মুখরিত ছিল।..."

"কি ঘটেছিল সে রাত্রে"—সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"একবাহু ঋষির দেখা পেয়েছিলাম। গোড়া থেকে ঘটনাটা বলতে হবে। তানের বিচ্ছেদে যখন আমি অধীর হয়ে উঠেছি তখন সে হঠাৎ ফিরে এল একদিন, আরও মনোহারিণী হয়ে ফিরে এল। মনে হতে লাগল অপূর্ব স্ফটিক পাত্রটি এতকাল শূন্য ছিল এবার পূর্ণ হয়েছে, সুরায় না অমৃতে, তা প্রথমে বুঝতে পারি নি। প্রথমে মনে হয়েছিল সুরায়, কিন্তু পরে সে ভুল ভেঙেছিল। পরে বুঝেছিলাম তানে মানবী নয়, দেবী। তার উৎফুল্ল যৌবন যে মাধুর্যরসে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল তা মদিরা নয়, অমৃত। তানে আসবার কিছুদিন পরেই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম তাকে নিয়ে।

বাল্যকাল থেকেই দেশভ্রমণ করা আমার নেশা। আর তোমাদের দেশ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে আমাকে বাল্যকাল থেকে। অশ্ববাহিত রথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা দু'জনে। স্থলপথ শেষ হয়ে গেল, সুরু হল জলপথ। সমুদ্রতীরে কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর অর্ণবপোত পাওয়া গেল একটা। শুনলাম সেটা সিরিয়া যাবে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। তাতেই চড়ে বসলাম। তানে বললে, সিরিয়া থেকে একটা স্থলপথ পারস্য অভিমুখে গেছে। সে পথে ইচ্ছা করলে আমরা পারস্যে যেতে পারি। পারস্য থেকে গান্ধার হয়ে আর্যাবর্তে যাওয়া যাবে। তাই হল। পথে যে কত কি দেখলাম, কত কি অনুভব করলাম, কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে আর তানেকে আবিষ্কার করলাম তার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই আমার। সে চেষ্টাও করব না, কারণ আমার মানস-কাননে যে সব স্মৃতি অপূর্ব ফুলের মতো ফুটে আছে সেখান থেকে তাদের তুলে এনে বাইরে ঘাঁটাঘাঁটি করবার প্রবৃত্তি নেই। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, কখনও পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও শকটে, কখনও দোলায়, কখনও উষ্ট্রবাহিত হয়ে, কখনও নৌকায়, পথে-প্রান্তরে-মরুভূমিতে, অরণ্যে-কাননে নদীতে-সমুদ্রে আমরা দু'জনে যে অমৃত অন্বেষণ করেছিলাম তার ভাণ্ডার আজও অক্ষয় হয়ে আছে, কখনও নিঃশেষ হবে না। শেফালী গাছের শাখায় শাখায় রূপের স্বপ্ন যেমন নিঃশেষ হয় না... ।"

মির্মির আবার নীরব হইলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"অবশেষে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলাম আমরা। হিমালয়ের এক উপত্যকাতেই শবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। তখন থেকেই আমি ভালবেসেছি এই বন্য ব্যাধদের। তাদের সরল সাহস, অকপট আতিথেয়তায় আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। এখানে এসে তাই ওদেরই আতিথ্যগ্রহণ করেছিলাম। হিমালয়ের বনাকীর্ণ উপত্যকায় পশু চর্মে আর পাখীর পালকে দেহ আবৃত করে ধনুর্বাণ দিয়ে পশুপক্ষী শিকার করে পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করে, শিখর থেকে শিখরান্তরে ভ্রমণ করে আমি আর তানে যে উদ্দাম বন্যজীবন যাপন করছিলাম তাতে সহসা একদিন ছেদ পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা বাঘের সন্ধান করছিলাম, আমরা—আমি আর তানে। আমার হাতে ছিল ভল্ল, তানের হাতে ছিল ধনুর্বাণ! তানেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেবী আরটেমিস সশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

"আরটেমিস কি ধরনের দেবী?"—উৎসুককণ্ঠে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"আরটেমিস? ঠিক ও ধরনের দেবী আপনাদের মধ্যে আছে কিনা জানি না। আরটেমিস জীব হনন করেন, জীব পালনও করেন। তিনি রূপসী, তাঁকে দেখে তাঁর প্রণয়ে পড়ে অনেকে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও প্রণয়-পাশে বাঁধা পড়েননি। কেউ কেউ বলে—তিনি ঘুমন্ত এনডিমিয়নকে ভালবেসে-ছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আমারও মনে হয় ওটা ঠিক নয়। আরটেমিস চিরযৌবনা, চিরকুমারী, চিরপ্রদীপ্তা, কানন কান্তারের বিজয়িনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এইরূপেই তাঁকে কল্পনা করতে ভাল লাগে। তানেকে দেখে আমার মাঝে মাঝে আরটেমিসের কথা মনে হত। কিন্তু সেটা আমার ভুল, তানে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল আমার কাছে।…"

পুনরায় মির্মির নীরব হইলেন। সুন্দরানন্দ কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে দিলেন না।

"তারপর কি হল। বাঘের অনুসরণ করতে করতে কোথায় গিয়ে পড়লেন আপনারা?"

"অনুসরণ ঠিক নয়, সন্ধান করছিলাম আমরা বাঘটার। একটা ঝরণার ধারে একটা বিরাট বন্য মহিষকে মেরেছিল বাঘটা। আমরা আশা করেছিলাম সে আশে-পাশে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমরা দু'জনে কাছাকাছি এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম যেখান থেকে মৃত মহিষটাকে দেখা যাবে। কিছুদূরে একটা টিলার শীর্ষদেশে সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ দেখতে পেলাম, সেইটার উপরই চড়ে বাঘের প্রতীক্ষা করব এই ঠিক করে সেই দিকেই এগিয়ে গিয়ে তার উপরই আরোহণ

করলাম আমরা। জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল, গাছের উপর থেকেও মৃত মহিষটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু গাছের উপর চড়ে এমন আর একটা জিনিস দেখতে পেলাম যা শুধু বিস্ময়কর নয়, আতঙ্ক-জনকও।…"

মির্মির চুপ করিলেন।

"কি দেখলেন ?"

"দেখলাম যা, তা অদ্ভুত। আমরা যে ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরে বৃক্ষশাখায় বসেছিলাম ঠিক তার অপর পার্শ্বে ছিল আর একটা উপত্যকা। সেই উপত্যকার অন্তপ্রান্ত থেকে আবার পর্বতশ্রেণী উঠেছিল। উপত্যকাটি ছোট, তাই আমরা দেখতে পেলাম একটি গুহার সম্মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর তার সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক দীর্ঘকায় পুরুষ বসে আছেন। তাঁর একটি বাহু নেই, অবশিষ্ট বাহুটিও তিনি আগুনের শিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন, যে ভাবে আমরা উনুনে কাঠ দিই। সেই ভাবে ! মাঝে মাঝে আবার বার করেও নিচ্ছেন হাতটা। আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আবার সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে। তানে বললে, লোকটা হয়তো পাগল, কিম্বা কোনও তান্ত্রিক যাদুকর। চল দেখে আসি ব্যাপারটা কি। গেলাম দু'জনে। কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটি সত্যই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গোঁফ দাড়ি আর অবিন্যস্ত কেশভারে মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। চোখ দুটি অঙ্গারের মতো জ্বলছে। কিন্তু সে দীপ্তিতে দাহ নেই, প্রশান্তির স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন বিকীর্ণ হচ্ছে তার থেকে। আমাদের দিকে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তারপর একটু হেসে সংস্কৃত ভাষায় বললেন—স্বাগতম্। আমি আর তানে একটু একটু সংস্কৃত শিখেছিলাম, আলাপ করতে খুব বেশী অসুবিধা হল না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি করছেন আপনি। তিনি বললেন, যজ্ঞ করছি। আর্যাবর্তে খুব যজ্ঞ হয় একথা শুনেছিলাম, কিন্তু তা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা কল্পনা করিনি। আমাদের দেশেও দেবতার উদ্দেশ্যে একরকম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাতে পশুমাংস অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হত। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি আর একটু হেসে বললেন—যজ্ঞ মানে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক। আমার প্রিয়তম ছিল হাত দুটি, সেই দুটিই দেবতাকে দেব। একটি দিয়েছি, আর একটি দিচ্ছি। আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। আমাদের দিকে আরও ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি বললেন—আপনাদের দৃষ্টি থেকে অনুকম্পা ক্ষরিত হচ্ছে। অনুকম্পার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও

আনন্দিত হোন। তানে বললে—হাত দুটিই আপনার সবচেয়ে প্রিয়? ঋষি উত্তর দিলেন—সবচেয়ে প্রিয়। এই হাত দিয়ে আমি না করেছি কি? শিকার করেছি, বীণা বাজিয়েছি, ফুল তুলেছি, মূর্তি গড়েছি, ছবি এঁকেছি, কবিতা লিখেছি, দেবতার জন্য নির্মাল্য রচনা করেছি। আমার হাতের কিছু কীর্তি এখনও আমার গুহার মধ্যে সঞ্চিত আছে। যদি কৌতূহল হয়, কাল সকালে এসে দেখে যাবেন। এখন আপনারা যান। আপনারা থাকলে আমার আরাধনা বিঘ্নিত হবে। কাল সকালে আসবেন ওই গুহায় আমি থাকব। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে আমরা দু'জনে সেই দেবদারু বৃক্ষশীর্ষে পাশাপাশি বসে রইলাম। কারও মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না। পারিপার্শ্বিক আর পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম না কেউ। একদিকে সেই বন্য মহিষের শবটা পড়েছিল, আর একদিকে দেখা যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই যাজ্ঞিককে, মাঝে মাঝে হাতটা তুলে অগ্নিশিখার ভিতর দিচ্ছেন আবার বার করে নিচ্ছেন। চতুর্দিকে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা, উদ্দাম ঝিল্লীধ্বনি মন্থর হয়ে এসেছে অরণ্যের জটিলতায়, নিষ্ঠুর শার্দূলের আগমন প্রতীক্ষায় থম থম করছে চারিদিক, আকাশের জ্যোৎস্নাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের সানুদেশে, উপত্যকার নৈশ রহস্য ঘনতর হচ্ছে। আমরাও দু'জনে ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তানে বসেছিল আমার বাম উরুর উপর, আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে। সে কি ভাবছিল তখন আমি জানতে পারিনি, পরে জেনেছিলাম। আমি ভাবছিলাম ওই অদ্ভুত যাজ্ঞিকের কথা। 'দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক···আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন···!'—তাঁর এই কথাগুলো আমার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কেবল, সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করছিল এক অভূতপূর্ব অনুভূতির অদ্ভুত রসে। সেই শেফালী গাছটার ছবি ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছিল চোখের সামনে···অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে আর ঝরাচ্ছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই ওর সাধনা। আমি কি করছি? আমার চোখের ঠিক সামনেই দেবদারুর একটা বক্র শাখা ছিল, সেটা মৃদু হাওয়ায় দুলতে লাগল, আমার মনে হল আমার প্রশ্নটাই বুঝি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে ওই কুটিল কৃষ্ণ শাখায়, যেন দুলে দুলে আমাকে প্রশ্ন করছে, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ...হঠাৎ তানে বললে—মহিষটা তো আর দেখতে পাচ্ছি না। দেখলাম সত্যিই মহিষটা নেই। বাঘ যে কখন নিঃশব্দে এসে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা আমরা টের পাইনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করমাম—পূর্বাকাশ উষা-

রাগরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হল এবার গাছ থেকে নেমে শবর-পল্লীতে ফিরে যাওয়াই উচিত। মন্ত্রচালিতবৎ নামলাম, যন্ত্রচালিতবৎ চলতে লাগলাম। কারও মুখ দিয়ে কথা বেরুল না একটিও, অথচ···ঠিক আপনারাও বুঝতে পারছেন কি না জানি না—আমার সমস্ত সত্তা তখন এক অনির্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ, সে ভাবের ঘোরে আমি এমনি বিভোর যে তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলাম না, করলেও ভাষা খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। পোষাক পরিবর্তন করে শবর-পল্লী থেকে যখন ফিরছি তখন তানে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে!"

"তুমি।"

কথাটা শুনে নীরব হয়ে গেল সে। তার দিকে চেয়ে দেখলাম অপূর্ব একটা জ্যোতি ঝলমল করছে তার চোখের দৃষ্টিতে। আমিও আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। নীরবে একটা খাড়াই অতিক্রম করতে লাগলাম দু'জনে। খাড়াইটার পর ছিল একটা উৎরাই—তারপর উপত্যকা, উপত্যকার অপর প্রান্তে আবার পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাড়ে সন্ন্যাসীর গুহা। গুহায় পৌঁছে দেখলাম, সন্ন্যাসী তাঁর অর্ধদগ্ধ বাহুতে পনীর মাখাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন—আপনারা দু'জনেই কি কাল রাত্রিতে এসেছিলেন? উত্তর দিলাম, হাঁ, কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার আচরণে এবং আলাপে যা পেয়েছি তাতে কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। সন্ন্যাসী কিছু না বলে দগ্ধ ক্ষতস্থানগুলিতে পনীর লেপন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর একটু হেসে বললেন—'গুহার ভিতর প্রবেশ করে আমার দক্ষিণ হস্তের কীর্তিগুলি যদি দেখেন তাহলে আরও আশ্চর্য হবেন।' গুহায় প্রবেশ করলাম। সত্যিই বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কনের এমন নিদর্শন আর কখনও দেখিনি। বেরিয়ে আসতেই সন্ন্যাসী বললেন—'ওগুলো সৃষ্টি করেছিলাম আনন্দের প্রেরণায়, এখন যে প্রেরণায় হাত দুটোকে বিসর্জন দিচ্ছি তা আরও মহৎ, আরও সূক্ষ্ম—' তাঁর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সসম্ভ্রমে চুপ করে রইলাম, প্রশ্ন করতে সাহস হল না। আমার মনের কথা কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—'আমার হাত দুটো আমার প্রিয় ছিল, কারণ আমার অহঙ্কারকে ওরা তৃপ্ত করত। এরকম অহঙ্কারে একটা আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু মাদকতাও আছে। সমস্ত মাদক জিনিসের মতো এই অহঙ্কারের আনন্দও মনকে অবশেষে অবসন্ন করে। নূতন খোরাক না পাওয়া পর্যন্ত অবসন্ন হয়েই থাকে সমস্ত চিত্ত। আর নিত্য নূতন খোরাকের সন্ধান করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। কারণ খোরাকের সন্ধান করাটাই

মুখ্য হয়ে পড়ে, তখন আনন্দটা হয়ে যায় গৌণ। একদিন গভীর রাত্রে এই সত্যের উপলব্ধি হল। বুঝলাম কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করলেই দুঃখ। কারণ চিরকাল কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকা যায় না। জরা মরণ কাউকে খাতির করে না। নিজের প্রিয় বস্তুকে স্বেচ্ছায় দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করলেই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ দেব-চরণে সমর্পিত বস্তু অমরত্ব লাভ করে কল্পলোকে, নব নব রূপে তা বিকশিত হয় অবস্তু লোকের অমরায়, জরা মরণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মনে পড়ল উপনিষদের বাণী—যতশ্চোদতি সূর্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি—যাঁর ভিতর থেকে সূর্য উদিত হয়, যাঁর ভিতরে আবার সূর্য অস্ত যায় তাঁর মধ্যেই আমার প্রিয় বস্তুকে সমর্পণ করলে তা নিরাপদ থাকবে কারণ সেই স্থানই জরা-মরণবিহীন স্থান। এই উপলব্ধি হবার পর থেকে আমি যজ্ঞের আয়োজন করে আমার হাত দুটিকে দেবতার চরণে সমর্পণ করছি।"

প্রশ্ন করলাম—"কে আপনার দেবতা ?"

"চরাচরে প্রত্যক্ষ-কল্পনায় যিনি প্রকট, তিনিই আমার দেবতা। তিনি সত্য-অসত্য সুখ-অসুখ জ্ঞান-অজ্ঞান বাস্তব-অবাস্তব সবই। কোনও একটি সংজ্ঞায় তাঁকে বোঝান যাবে না। তিনি নানারূপে প্রকাশিত, নানা আলোকে প্রদীপ্ত। অগ্নি তাঁর হুতবহ।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার প্রশ্ন করলাম—বস্তুত প্রশ্ন করা ছাড়া আর কিই বা করবার ছিল আমার। প্রশ্ন করলাম—"ক্ষতস্থানে পনীর লেপন করেছেন কেন ? জ্বালা করছে ?"

তিনি উত্তর দিলেন—"জ্বালা অবশ্যই করছে। কিন্তু সেটাকে আমি আমোল দিচ্ছি না। আমি এতে পনীর লাগাচ্ছি, পনীর অগ্নির প্রিয় খাদ্য বলে। আমার এই হাত শুষ্ক মাংসমেদহীন, বিস্বাদ, পনীর লাগিয়ে সেটাকে একটু সুস্বাদু করবার চেষ্টা করছি।"

তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে গেল।

আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, ইচ্ছে করলে যে কোনও লোকই কি যজ্ঞ করতে পারে ?"

"প্রত্যেক লোকই যজ্ঞ করছে, কিন্তু সে কথা তারা জানে না। দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ মানেই যজ্ঞ, তার সদ্য ফল আনন্দ। প্রত্যেক মানুষই আনন্দলাভের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ করছে। কারণ ত্যাগ না করলে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায় না। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—কথাটা মিথ্যে নয়। আপনারা সবাই যজ্ঞ

করছেন, কিন্তু জানেন না সে কথা”—তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—“আপনিও করছেন। কিন্তু খুব ভালভাবে করছেন না। মন যেদিন বৃহৎ আনন্দের দাবী করবে, ভূমা যখন সীমার প্রান্ত-রেখার পরপারে আভাসিত হবে, তখন আপনিও তার মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, প্রিয়তমকে যজ্ঞের বলি করতে আপনি তখন আর ইতস্তত করবেন না, বুঝতে পারবেন যে প্রিয়তমকে চিরন্তন করতে হলে তাকে ত্যাগ করতে হয়”—আর একটু থেমে তানের দিকে চেয়ে বললেন—“ইনি আপনার কে হন?”

“আমার প্রিয়তমা।”

“হয়তো এঁকেই তা হলে যজ্ঞের বলি হতে হবে একদিন।”

আমি আর তানে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মির্মির পুনরায় নীরব হইয়া গেলেন। আরণ্য-স্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া অসংখ্য প্রকার ধ্বনি অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহসা সুন্দরানন্দের কর্ণে বেদমন্ত্রের মতো ধ্বনিত হইল। মনে হইল অসংখ্য অদৃশ্য উদ্গাতা যেন সামবেদ গান করিতেছেন। তিনি একাধিকবার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ অনুভূতি তাঁহার আর কখনও হয় নাই। তাঁহার এই অনুভূতি রহস্যময়-মির্মিরের অন্তরেও সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন—“শুনছেন কুমার, বসুন্ধরার আত্মনিবেদনের ভাষা? সমস্ত নিখিল বিশ্ব জুড়ে যজ্ঞ চলছে, সবাই দিতে চাইছে, সবাই ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের ক্ষণিক খোলস ছেড়ে শাশ্বত লোকে যেতে চাইছে। তানেও চেয়েছিল। সবাইকে চাইতে হবে একদিন।”

“তানের কি হল তারপর?” সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

“তানে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে উঠে আমাকে বললে, শুনছ হেরোডোটাস? শুনতে পাচ্ছ কিছু?”

সেদিন এমনি ঝিল্লীধ্বনি দিগদিগন্ত ঝঙ্কৃত করছিল। ঝিল্লীধ্বনি ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে কথা বললাম তাকে।

তানে বললে—“কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?”

“কই না।”

“ভাল করে শোন।”

শুনতে পেলাম না কিছু।

তখন তানে বললে—“কচি ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা?”

“কচি ছেলের কান্না? কই না।”

“আমি পাচ্ছি।”

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে নিজেও কাঁদতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কিছু, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেঁদে তানে বললে—"একটা কথা তোমাকে এতদিন বলিনি, আজ বলছি। তোমার কাছে আসবার আগে আমার একটি ছেলে হয়েছিল। সে কিন্তু বেশী দিন বাঁচেনি। তারই কান্না আজ ক'দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে কোথাও যেন আছে, কোথাও যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। দেহের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি বলে যেতে পারছি না আমি তার কাছে। খাঁচাটা আমার ভেঙে দাও তুমি।" শুধু সেদিন নয়, প্রতি রাত্রেই সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসত, উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনত খানিকক্ষণ, তারপর বলত—"ওই সন্ন্যাসীর মতো তুমিও যজ্ঞের আয়োজন কর, আর সে যজ্ঞে বলি দাও আমাকে। আমিই তো তোমার প্রিয়তমা, আমাকেই উপহার দাও, দেবতার উদ্দেশে আমাকেই উৎসর্গ কর অগ্নিমুখে…।"

মির্মির চুপ করিলেন।

"তারপর ?"

"তাই করতে হল অবশেষে।…"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-গর্জনে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মির্মির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে গিয়া অনুরূপ আর একটা গর্জন করিলেন। নিবিড় অন্ধকার হইতে সিংহের প্রত্যুত্তর আসিল। মির্মির তাহার উত্তরে এমন একটা শব্দ করিলেন—যাহা আদেশ, অনুনয় এবং গর্জনের অদ্ভুত সমন্বয়—তাহা যেন ক্ষুধার বাঙ্ময়ী রূপ…। পরমুহূর্তেই খুব কাছেই সিংহটা আবার গর্জন করিয়া উঠিল। মির্মির ভিতরে আসিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন-করত সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গর্জন।

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ বন্দী হল।"

তারপর সহসা সুন্দরানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কুমার, আপনি একটা যজ্ঞের আয়োজন করুন। যে পশু-শক্তির উন্মাদনায় আমরা অহঙ্কৃত, অথচ যে শক্তি সামান্য কামের বা সামান্য লোভের ছলনায় তুচ্ছ হয়ে যায়—সেই পশু-শক্তির প্রতীক এই পশুরাজকে সেই যজ্ঞে বলি দিন।"

সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন—"আপনিই তো এখনি বললেন যা প্রিয়তম, তাই দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হয়। সিংহ আমার প্রিয়তম নয়। আপনার তানের মতো আমার যদি কেউ থাকত তাহলে করতাম।"

"আপনারও তো আছে।"

মিমির স্ুরঙ্গমার দিকে চাহিলেন।

সুন্দরানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তানের মতো স্ুরঙ্গমা কি আত্ম-বিসর্জন দিতে রাজি হবে! ওর এখন ভরা যৌবন।"

অপ্রত্যাশিতভাবে স্ুরঙ্গমা বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় রাজি হব, করুন আপনি যজ্ঞের আয়োজন। জীবনে অনেক ভোগ করেছি, এখন আর মরতে আপত্তি নেই। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে ডুবে যাওয়াই তো ভাল, দুঃখ কখন কি মূর্তিতে দেখা দেবে জানি না তো। আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন। আমি সানন্দে সেই যজ্ঞের বলি হব।"

"চমৎকার—চমৎকার।"

মিমির সহর্ষে হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

কুমার সুন্দরানন্দের মুখভাবে যদিও বিষাদের ছায়া পড়িল কিন্তু তাঁহাকে বলিতে হইল—"বেশ তো!"

বিদেশী মিমিরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া কি চলে? সুন্দরানন্দের মনে হইল নিজের দুর্বলতার জন্য আর্যাবর্তের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। সত্য সত্যই যজ্ঞের আয়োজন শুরু হইয়া গেল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইহা যেন পুরাতন চাঁদ নয়। মনে হইতেছিল বিধাতার গোপন শিল্প-নিকেতন হইতে ইহা যেন সদ্য বাহির হইয়া আসিয়াছে, বিনিদ্র নিশাচর নিশাচরীদের নয়নে নূতন স্বপ্ন সৃজন করিবে বলিয়া। নিস্তব্ধ গভীর রজনীর মর্মলোকে সত্যই নূতন স্বপ্ন অপরূপ মহিমায় মূর্ত হইতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত নিবিয়া গেল। দুই দিক হইতে দুইটি কালো মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল।

প্রথম মেঘ অধীরভাবে বলিল—"ভাল করে একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে চাই, তাই আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকার না হলে ভাবা যায় না ভাল করে।"

দ্বিতীয় মেঘ প্রশ্ন করিল—"কি ভাবিতে চান?"

"ভাবতে চাই যে আমরা দুজনে সেই অনাদিকাল থেকে করছি কি।"

"খেলা।"

"খেলাটাও কি সত্য? না ওটাও ছলনা!"

"কাকে আমরা ছলনা করব বলুন।"

"নিজেদের।"

"নিজেদের ছলনা করতে যাব কেন।"

"আমরা যে কিছু করছি না এই সত্যটাকে নিজেদের কাছ থেকেই যথাসম্ভব সরিয়ে রাখবার জন্য।"

"তাই বা করবার দরকার কি আমাদের।"

"সত্যটা যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমি কিছু করছি না এই ধারণাটা কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায় বল। তোমার কি বিশ্বাস আমরা সত্যি খেলাই করছি?"

"আমি যা উত্তর দেব, তা তো আপনার মনেই আছে। ভাষায় সেটা শুনতে চান?"

প্রথম মেঘের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হইল। পরমুহূর্তে বজ্রগর্জনে ধ্বনিত হইল—"চাই। আমার মনের অতলে কি যে আছে তা জানি না। তাকে ভাষা দাও—"

"আপনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেকেই খুঁজছেন।"

"অন্ধকারটাই বা কি, আমিই বা কে।"

"অন্ধকার অনিশ্চয়তা, আপনি জিজ্ঞাসা। অন্ধকার পতিত ভূমি, আপনি হলায়ুধ কৃষক। আপনি যাচাই করছেন নিজের শক্তিকে, রূপ দিতে চাইছেন অনন্ত কল্পনাকে। সংক্ষেপে নিজেকেই খুঁজছেন আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে।"

"চার্বাকদের বিরুদ্ধে আমার রাগটা তাহলে মেকি বল!"

"আপনার রাগ অনুরাগ বিরাগ কিছু নেই। আপনি নির্বিকার স্রষ্টা। নিজেকে নিয়ে খেলাই করছেন কেবল অনাদিকাল থেকে। খেলনাগুলো আপনার খেলার উপলক্ষমাত্র, কখনও সেগুলো সাজাচ্ছেন, কখনও আবার অবহেলাভরে ফেলে দিচ্ছেন। কখনও গড়ছেন, কখনও ভাঙছেন।"

"কিন্তু সত্যই কি কিছু গড়ে উঠছে, না ওটাও আমার কল্পনার ফাঁকি?"

"কোনটা ফাঁকি, কোনটা ফাঁকি নয়—কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব তা নিয়ে মাথা ঘামাক অ-কবিরা। আপনি যা করছেন তাই করুন।"

যে মেঘ কিছুক্ষণ পূর্বে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎগর্ভ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা জ্যোৎস্না-মণ্ডিত মনোহর হইয়া উঠিল। ক্রমশ তাহারা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইল। অনাবৃত চন্দ্র-কিরণে যখন দিগদিগন্ত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে তখন দেখা গেল দুইটি পক্ষী দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালন করিয়া দিগ্বলয়ের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা উচ্চ-কাকলীতে যাহা বলিতেছিল তাহা পক্ষী-ভাষায় হয়তো অন্য অর্থ বহন করে, কিন্তু মনে হইতেছিল যেন তাহারা বলিতেছে—'তাই-করি-চল, তাই-করি-চল, তাই-করি-চল'।

জালার ভিতর হইতে চার্বাক যখন সন্তর্পণে বাহির হইল তখনও চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন। চার্বাকের সমস্ত অন্তরও স্বপ্নাচ্ছন্ন। নীলোৎপলার সুরা-পান

করিয়া সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহাই যেন নূতনরূপে তাহাকে অভিভূত করিল। স্বপ্নে যে সুন্দরীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া যে রূপকথালোকে প্রবেশ করিয়াছিল সে সুন্দরী সুরঙ্গমারূপে যেন তাহার নব-স্বপ্নলোকে আসিয়া তাহাকে বলিতেছিল—"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মতো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়।" তাহার নাস্তিক্যবুদ্ধি তর্ক করিতে উদ্যত হইলে সুরঙ্গমা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে তাহাকে শাসন করিতেছিল। বলিতেছিল, "তুমিই ভণ্ড কালকূট। বর্ণমালিনী তোমারই চাকচিক্যময়ী প্রতিভা, তাহার ভয়ে তুমি ত্রস্ত, তাহাকে তুমি তুষ্ট রাখিতে চাও। অথচ তাহারই সহায়তায় তুমি লাভ করিতে চাও অসম্ভবা মেঘমালতীকে, মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে যে মূর্ত হয়ে আছে কবির কল্পনালোকে, তোমার নাগালের বাইরে। তাকেই পাবার জন্যে তুমি উদ্বাহু হয়ে আছ। তোমার কামনা নদীরূপ ধারণ করে তোমাকে যা বলেছিল তাই তোমার সত্য পরিচয়। তুমি যুক্তিবাদী, কিন্তু কামনার প্ররোচনায় তুমি তোমার যুক্তিকেও লঙ্ঘন করতে ইতস্তত কর না। যুক্তিবাদ তোমার জীবন-দর্শন নয় তোমার কামনা-উপভোগের একটা ওজুহাত মাত্র, প্রয়োজন হলে এ ওজুহাত পরিত্যাগ করিতে তোমার আপত্তি নেই।" কল্পনায় সুরঙ্গমার ভ্রূভঙ্গী-মনোহর মুখের দিকে চার্বাক চাহিয়াছিল, সিংহগর্জনে সহসা চমকাইয়া উঠিল। কিসের গর্জন এ? এদিক ওদিক চাহিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর কিছুদূরে বিরাট পিঞ্জরটা তাহার চোখে পড়িল। ভীত-বিস্মিত-চিত্তে গাছের ছায়ায় ছায়ায় সেদিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। গহ্বর হইতে জালবদ্ধ সিংহকে তুলিয়া মির্মির তাহাকে একটি সুদৃঢ় লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়াছিলেন। চার্বাক সেই পিঞ্জরের সমীপবর্তী হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যই বিরাটকায় একটা সিংহ পিঞ্জরের মধ্যে পদচারণ করিতেছে! সহসা সিংহটা পিঞ্জরের অন্ধকার দিকটায় গর্জন করিয়া আগাইয়া গেল এবং সেইখানেই থাবা গাড়িয়া বসিল। একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া সে দিকটা অন্ধকার হইয়াছিল তবু কিন্তু চার্বাক দেখিতে পাইল, সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মতো কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। চার্বাকের ভয় হইল। যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চার্বাক সরিয়া যাইতেছিল কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাতে তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। ছায়ামূর্তি মধুরকণ্ঠে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। মনে হইল সিংহকে গান শোনাইবার জন্যই যেন সে এই গভীর রাত্রে গভীর অন্ধকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চার্বাক উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার

পর আর সন্দেহ রহিল না। ওই ছায়ামূর্তি সুরঙ্গমা ছাড়া আর কেহ নয়। অমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কি আর কাহারও হইতে পারে? চার্বাক ছায়ামূর্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"সুরঙ্গমা।"

"কে?"

"আমি চার্বাক।"

"মহর্ষি চার্বাক! আপনি এখানে!"

"তোমার জন্য এসেছি।"

"আমার জন্য? কেন!"

চার্বাকের ইচ্ছা হইল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করে, কিন্তু পারিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সংযতকণ্ঠে বলিল—"তোমাকে বাঁচাতে। সুন্দরানন্দের যজ্ঞের কথা আমি শুনেছি। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমি হতে দেব না।"

সিংহটা গর্জন করিয়া উঠিল।

"এ সিংহ কোথা থেকে এল!"

"আমরা ফাঁদ পেতে ধরেছি।"

"কেন?"

"সুন্দরানন্দের একজন বন্ধু এসেছেন, তাঁর সখ হয়েছে সিংহ ধরার।"

ক্ষণকাল নীরবতার পর সুরঙ্গমা বলিল—"আপনি কি করে এখানে এলেন?"

"লুকিয়ে।"

"লুকিয়েই চলে যান তাহলে। আপনার এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

"কেন?"

"মহর্ষি পর্বতের সঙ্গে তাঁর কন্যা ধারামতী এখানে এসেছে। সে অন্তঃসত্ত্বা। ধারামতী সুন্দরানন্দের কাছে যা ব্যক্ত করেছে তা আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয়। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে বন্দী করে আনতে। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে আপনার কঠোর শাস্তি হবে। মহর্ষি পর্বতের কন্যার সতীত্ব নষ্ট করা সামান্য অপরাধ নয়। আপনি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি আপনার আগমন বার্তা কারো কাছে প্রকাশ করব না।"

"কিন্তু আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। কতকগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত পশু যে যজ্ঞের নামে তোমাকে হত্যা করবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না।"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি ফুটিল।

"কি করবেন আপনি ? ওরা আপনার চেয়ে বেশী শক্তিমান। ওদের সঙ্গে কি পারবেন !"

"ওরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিমান হতে পারে, কিন্তু বেশী বুদ্ধিমান নয়। বলে না পারি, ছলে বা কৌশলে আমি তোমাকে উদ্ধার করব এ বিশ্বাস আছে বলেই এত কষ্ট করে এখানে এসেছি।"

এমন সময় অরণ্যের অন্ধকারে একটা খস খস শব্দ পাওয়া গেল।

"কেউ আসছে এদিকে। আপনি সরে যান এখন এখান থেকে।"

"আমি এই অরণ্যেই লুকিয়ে থাকব। কাল রাত্রে আবার আসব, তোমার দেখা যেন পাই।"

"আচ্ছা।"

চার্বাক অরণ্যের অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দও থামিয়া গেল। সুরঙ্গমা কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে-ও চলিয়া গেল। সিংহটা থাবা পাতিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল এইবার সে গর গরর্, গর গরর্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল আবার, মনে হইল তাহার হৃদয় বুঝি শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিদীর্ণ হইবারই কথা, কারণ তাহার খাঁচার ঠিক বাহিরেই এক শশক-দম্পতি আসিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল এবং স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পশুরাজের পক্ষে এ ধৃষ্টতা সহ্য করা অসম্ভব।

সুরঙ্গমা অরণ্যের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া মির্মিরের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মির্মির চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন, সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই চক্ষু উন্মীলিত হইল, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"গান শুনে সিংহ শান্ত হল—একটু—?"

"হচ্ছিল, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না ওখানে, বড় মশা আর দুর্গন্ধ।"

"গান সাপকে মুগ্ধ করে জানি, সিংহকেও করে কি না জানবার কৌতূহল ছিল···আচ্ছা, কাল আবার একবার চেষ্টা করবেন। ঘুমুবেন না কি এখনই।"

"ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু···।"

সুরঙ্গমা ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা আজ রাতটা যদি আপনার শয়নকক্ষে কাটাই আপনি আপত্তি করবেন ?"

মির্মির হাসিয়া বলিলেন—"ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, যদি কুমারের আপত্তি না থাকে।"

"আপনারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুমার আমাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ

করেছেন। যে মুহূর্তে স্থির হয়ে গেছে যে আমি যজ্ঞে বলি হব, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন। আপনি তো জানেন তিনি আমার গানও আর শোনেননি, আমাকে আর নৃত্য করতেও আদেশ দেননি। আপনিই অনেকদিন পরে আজ বললেন সিংহকে গান শোনাতে। সেটাও আপনার এক বিশেষ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। আপনারা দুজনেই আমাকে ব্যবহার করে নিজ নিজ তৃপ্তি সন্ধান করছেন, করুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। পুরুষদের খেয়ালের স্রোতে গা ভাসিয়েই সারাটা জীবন কেটেছে আমার। নিজেরও নানা-রকম খেয়াল নানারকম কৌতূহল জীবনে মিটিয়েছি আমি। এখন হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছে মরবার আগে আপনার স্বরূপটা ভাল করে দেখে যাব। আপনি অনুমতি দেন আজ আপনার সঙ্গেই রাতটা কাটাই।"

মির্মির হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি আমার স্বরূপ জানতে পারবে?"

সুরঙ্গমার নয়নের দৃষ্টিতে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে মধুর হাসিয়া সে বলিল—"পারব। পুরুষের স্বরূপ জানতে মেয়েদের দেরী হয় না।"

"অধিকাংশ পুরুষের বললে কথাটা ঠিক হত হয়তো। যে পথ দিয়ে তোমরা সাধারণত পুরুষের স্বরূপ সন্ধান কর আমার সে পথ আমি তানের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছি। তানের দেহ যখন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল আমিও তখন উপবেশন করেছিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের উপর। পৌরুষের শারীরিক চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেছে আমার।

সুরঙ্গমার নয়ন আনত হইল। অধরে চাপা একটি হাসি স্ফুরণোন্মুখ হইয়া উঠিল। মির্মিরের দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া সে বলিল—"আপনার শরীর সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, আমার আগ্রহ আপনার মনের স্বরূপ জানবার।"

"আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি তা জানতে পারবে?"

"বিশ্বাস আছে পারব। আপনিই তো সেদিন বলছিলেন রাত্রির নিবিড়তায় এমন অনেক সত্য জানা যায় যা দিনের আলোয় জানা সম্ভব নয়।"

মির্মিরের নয়নদ্বয় আবার নিমীলিত হইল। মনে হইল অন্তরের অন্তঃস্তলে তিনি কি যেন সন্ধান করিতেছেন। সহসা চক্ষু খুলিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, তানে মানা করছে।"

"তানে? সে কোথায়!"

"এইখানে।"

র্মিমির নিজের বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"তাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছি বলেই সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি।"

স্বরঙ্গমা মুহূর্তকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া মন স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল—"কুমারও বোধহয় তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন সম্পূর্ণরূপে পাবেন বলে? আহা, আমারও যদি উপায় থাকত।"

"উপায় আছে বই কি।"

"আমি সামান্যা নর্তকী। আমাকে কুমার অনায়াসে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করে ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু আমি কি কুমারকে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করবার কথা ভাবতেও পারি।"

"ইচ্ছে করলে তুমি কুমারকে এই মুহূর্তে চিরকালের মতো ত্যাগ করে যেতে পার। সে স্বাধীনতা তোমার আছে বই কি।"

"কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছায় কথা দিয়েছি যে কুমারের যজ্ঞে আত্মবলি দেব। সামান্যা নর্তকী হলেও আমার কথার মূল্য আছে।"

"মহর্ষি পর্বত কাল বলছিলেন শাস্ত্রে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তোমার বদলে আর কাউকে বলি দিলে শাস্ত্রমতে কোনও অন্যায় হবে না। কুমার পশু না দিয়ে মানুষও যদি দিতে চান তাও কিনতে পাওয়া যাবে।"

"মহর্ষি পর্বত এ নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"তোমার সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে লক্ষ্য করেছি। তিনি বলছিলেন স্বরঙ্গমার মতো অমন একজন অনবদ্যা রূপসীকে পুড়িয়ে মারার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে অন্য মানুষ দিলেও চলে।"

"কুমার শুনেছেন?"

"শুনেছেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।"

স্বরঙ্গমা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর র্মিমিরের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিংহের পিঞ্জরের সম্মুখে যে শশকদম্পতী উবু হইয়া বসিয়া সম্মুখের পদযুগল দ্বারা গুম্ফ পরিচর্যায় নিরত ছিল সহসা তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

প্রথম শশক দ্বিতীয় শশককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"খুব জমেছে, কি বল।"

"খুব।"

"স্বরঙ্গমা কি করবে বলতো?"

"তা তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন।"

"জানি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। ওরা মানুষ কি না, ওদের একটা স্বাধীন বুদ্ধি দিয়েছি, ওদের সেই স্বাধীন বুদ্ধি যে কখন কি করে বসে বলা শক্ত! সেই-জন্যেই তো স্বৈরচর করবার কল্পনা আপাতত ত্যাগ করেছি। মানুষ স্বৈরচর হলে তচনচ করে ফেলবে সব। মানে নিজেরই কল্পনাসমুদ্রে নিজেকেই তখন হাবুডুবু খেতে হবে, নাকানি চোকানির আর শেষ থাকবে না। কথা বলছ না যে।"

শশকী গোঁফ-চোমরানো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া বলিল—"বলবার কিছু নেই বলেই চুপ করে আছি। তাছাড়া আমার মনটা পড়ে আছে কবির কলমের ডগায়।"

"কোন কবির?"

"যিনি শিখর সেনের কাহিনী লিখছেন।"

"কেমন লাগছে গল্পটা।"

শশকী পুনরায় গোঁফে মন দিল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে।"

"আমি কি উত্তর দেব! আপনিই বরং বলুন আপনার সৃষ্টিকে আমি ঠিক ভাষা দিতে পারছি কি না।"

পুনরায় গোঁফে মন দিল।

সিংহ-গর্জনে আর একবার চতুর্দিক প্রকম্পিত হইল। "ভারী হাল্লা করছে সিংহটা। চল কবির কাছেই যাওয়া যাক। তার বাতির উপরকার ঢাকনাটি চমৎকার। সেইখানেই বসি চল খানিকক্ষণ। এদের গল্পটা ততক্ষণ জমুক খানিকটা—।

শশক দম্পতী অন্তর্হিত হইল। ক্ষণকাল পরে দুইটি ছোট ছোট পতঙ্গ আসিয়া কবির কক্ষে বিদ্যুৎ বর্তিকার নীল আবরণের উপর বসিল। কবির মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

॥ ২০ ॥

কবি সত্যই তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"পুলিশের কর্মচারী শিখরের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমার চোখের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় অশোভন রূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চোখের দিকে চেয়ে শিখর মৃদু হেসে বললে—"অমন করে দেখছিস কি?"

"তোকে ! তুই যে শেষটা পুলিশের লোক হয়ে উঠবি তা ভাবতেই পারিনি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে সত্যি।"

শিখর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। সেই কয়েক সেকেণ্ডেই আমি তাকে আবার ফিরে পেলাম যেন, সেই কিশোর শিখরকে, যার চোখের চাহনিতে অবাক বিস্ময় আভাসিত হত মাঝে মাছে, মর্তলোক ছেড়ে সহসা স্বপ্নলোকে পাড়ি দিতে পারত যে এক নিমেষে। আবার ফিরে আসত, মুখে অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠত, মুচকি হেসে আড়চোখে চেয়ে দেখত তার এই আকস্মিক স্বপ্ন-প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করেছি কি না।

আমার কথার উত্তরে সে হেসে বললে—"বাইরে হয়তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আমি বদলাইনি। যা ছিলাম ঠিক তাই আছি।"

"আমাদের কারবার বাইরেটা নিয়েই। সেইটে বদলেছে বলেই অদ্ভুত লাগছে। তোর ভিতরের একটা খবর অবশ্য পেয়েছিলাম।"

কথাটা শেষ করলাম মুচকি হেসে।

"সে খবরটাও অবশ্য খবর কিন্তু আসল খবর নয়।"

"আসল খবরটা কি তাহলে।"

"আসল খবর আমি উৎসুক, আমি কৌতূহলী !—"

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল সে।

"ওরে বাবা, ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠেছিস্ দেখছি। পুলিশের কোন ডিপার্টমেন্টে তুই আছিস ?"

"আই. বি.।"

"আমাদের অঞ্চলে আগমন কোনও ফেরারীর উদ্দেশ্যে নাকি ?"

"একটা কালোবাজারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

আমার বাসার সামনে যে বিরাট বোর্ডিং হাউসটা ছিল সেইটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—"আমার পরিচয় কিন্তু কাউকে বোলো না যেন। আমাকে যে চেন তা-ও প্রকাশ কোরো না কারো কাছে। ওই বোর্ডিংয়ের তিনতলায় একটা রুম নিয়ে আমি থাকব ভাবছি। এখানে আমার নাম হবে—এস. কে. দাস, হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট। যদি আমাকে কোনও কারণে প্রয়োজন হয় ওই নামেই আমার খোঁজ কোরো। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায়"—কত সামান্য কারণে মানুষের মনে আঘাত লাগে। শিখরের এই কথায় কেমন যেন আহত হলাম একটু। মনে হল যেন ওর কথায় একটা পুলিশী মনোভাব ব্যক্ত হল, একটা আদেশ যেন অনুরোধের

ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যাপারটা ভাল করে, বিশ্লেষণ করে, এখন বুঝছি ওটা মজ্জাগত ঈর্ষ্যারই একটা ছদ্মবেশ। শিখর যে জীবনে উন্নতি করেছে সহসা সেটা আবিষ্কার করে আমার অনুন্নত সত্তাটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেদনাতুর করেছিল মনকে, শিখরের ব্যবহারে কোন দোষ ছিল না।

…দিন কয়েক পরেই দেখলাম ত্রিতলের একটি ঘরে শিখর এসে আড্ডা গেড়েছে। শিখরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না আমার, দূর থেকেই আমি তার গতিবিধির সব খবর রাখতাম। আমার কাছে দূরবীণ ছিল।…

·· ভক্ত যেমন নিয়মিতভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করে, আমি ঠিক তেমনি ভাবে রোজ দেখতাম আলেয়াকে। ওটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখনই হাতে কাজ থাকত না তখনই আমি দূরবীণটি নিয়ে জানলার কাছে বসতাম। এমন ভাবে বসতাম যাতে আশেপাশের বাড়িতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে। আমি যে দূরবীণ নিয়ে জানলার ধারে বসে আছি তা দেখতেই পেত না কেউ বাইরে থেকে। জানলার কপাট দুটো প্রায় বন্ধ থাকত, সামান্য একটু ফাঁক রাখতাম দূরবীণটির জন্য শুধু। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিচ্ছু। আলেয়াকে অবশ্য রোজ দেখতে পেতাম না। এমন অনেক দিন গেছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দেখতে পাইনি। এর ফাঁকে ফাঁকে শিখর সেনকেও দেখতাম। দিনের বেলা প্রায়ই দেখা যেত না তাকে। প্রায়ই চোখে পড়ত তালা ঝুলছে তার ঘরের সামনে। একদিন দেখতে পেলাম দোতলার একটা কোণের ঘর থেকে ছিমছাম ফিটফাট একটি মেয়ে বেরুচ্ছে। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, তার চোখে মুখে এমন একটা সাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পরদাপ্রথা উঠে গেছে আজকাল। পথে ঘাটে আজকাল অনেক রূপসী দেখা যায়, মনে হয় চেষ্টা করলে তাদের নাগালও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় ও যেন উল্কা, ওকে কোনও দিন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গটগট করে নেবে এল দেখলাম। তারপরই দেখতে পেলাম বেশ দামী একটা মোটর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে এসে চড়তেই গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরুল সেই ঘরের বন্ধদ্বারের উপর দূরবীক্ষণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তার পর। দেখলাম দ্বারের পাশেই একটা নাম লেখা প্লেট, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিস এ মুখার্জি নার্স। এই এ. মুখার্জি যে অবন্ধনা মুখার্জি তা কল্পনা করতে পারি নি। পারলে যে আনন্দ আমি সে কদিন উপভোগ করেছিলাম তার তীব্রতাটা

যে অনেক কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, শিখর মেয়েটির সঙ্গে বেশ মেলামেশা শুরু করেছে। রাত্রে প্রায় ওর ঘরে গিয়ে বসে, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে দু'জনে। দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। একনিষ্ঠ প্রেমিক শিখরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে মনে মনে বড় কুণ্ঠিত ছিলাম আমি। মনে হত বিয়ে করে আমি যেন অনেক নেমে গেছি, আলেয়ার প্রতি অবিচার করেছি। প্রেমের জন্য গৃহত্যাগী শিখরের একনিষ্ঠতার কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করত, পীড়িতও করত। সেই শিখরকে এখন নিজের দলে দেখে ভারী আনন্দ হল সত্যি। মিস এ. মুখার্জি যে অবন্ধনা এ খবর পেলে আমার আনন্দ অনেকটা কমে যেত। অবন্ধনাকে আমি চিনতে পারিনি, কারণ তাকে আমি দেখিনি কখনও। এই বোর্ডিংএ শিখরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটা আমি জেনেছি অনেক পরে। তার ডায়েরি থেকে। চন্দ্রমোহন যে ডায়েরি দিয়েছিল, সে ডায়েরি থেকে নয়। এই দ্বিতীয় ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম উমেশ মামার কাছ থেকে। উমেশ মামা শিখর সেনের সহকর্মী, তিনিই তার জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই ডায়েরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ডায়েরি থেকে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি।

"দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে আমাদের দেশের দার্শনিক সমাজে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন অমোঘ দৈবের কাছে পুরুষকার নিষ্প্রভ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়, শত চেষ্টা করেও মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। আর একদলের মতে যা আমরা দৈব বলে মনে করি তা আমাদের কল্পনা বিলাস মাত্র, পুরুষকার দ্বারাই মানুষ নিজের ভাগ্য গঠন করে। আমরা যে অপ্রত্যাশিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি তার কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না সত্য। কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, এর জন্যে একটা কাল্পনিক দৈবশক্তিকে খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার সুখদুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার পুরুষকারেরও ফলাফল নয়, আরও অনেকের কর্মধারা আমার সুখদুঃখকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ আরও অনেক লোকের পুরুষকার আমার পুরুষকারকে কখনও আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার অজ্ঞাতসারে সফল বা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের অপ্রত্যাশিত সুখদুঃখের এ-ও একটা কারণ। এর জন্য দৈব নামক একটা অযৌক্তিক ব্যাপারকে আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তৃতীয় আর একদল বলেন পুরুষকারই সব! এজন্যে

যেটা আমরা দৈব বলে মনে করছি সেটা পূর্বজন্মের পুরুষকারের ফল। বীজ বপন করবামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফলফুল শোভিত গাছ জন্মে না তেমনি কোনও সুকর্ম বা দুষ্কর্ম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরজন্ম পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এইটেকেই আমরা দৈব বলে মনে করি।

উপরোক্ত তত্ত্ব আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে বিস্ময়ে কল্পনায় অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনাকে আমি ভালো বেসেছিলাম, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে, কিন্তু সে ভালবাসার যথার্থ মূল্য দেবার শক্তি ছিল না আমার। নির্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল আমি সভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। বীর্যবান প্রেমিকের মতো তাকে বলতে পারিনি—ভয় নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তুমি। তাই সে চলে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার ভীরুতার ফলভোগ করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আগুনে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আমি যে তাকে চেয়েছিলাম, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম—তার ফল কি এতদিনে ফলল? যেটাকে দৈবাৎ বলে মনে হচ্ছে সেটা কি আমার পুরুষকারেরই ফল!

গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘুষ খেয়ে অনেক অন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা তাঁকে ঘুষ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন না কি এই বোর্ডিংয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। তাঁরই গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি আমি। এখানে অবন্ধনার দেখা পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল। তিনতলায় একটা ঘরে আছি আমি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে দোতলার একটা ঘরে অবন্ধনা আছে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে। আমি নাবছিলাম, সে উঠছিল। আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। সেই দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে।

"শিখরদা! তুমি এখানে হঠাৎ?"

"অবু?"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যে অবন্ধনাকে চিনতাম এ ঠিক সে নয়। এর শাড়ির পারিপাট্যে, ফাঁপানো চুলের কায়দায়, এর গালের রঙে, চোখের কাজলে, এর ভ্যানিটি ব্যাগে আর সৌখীন স্যাণ্ডালে যে পরিচয় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত দামাল সেই কিশোরী অবন্ধনার কোনও মিল নেই। কিন্তু অমিলটাই আমাকে যেন পুলকিত করে তুলেছিল ক্ষণিকের জন্য। মনে হয়েছিল সেই পাড়া-

গাঁয়ে দুরন্ত মেয়েটা আমার নাগালের বাইরে ছিল, এই কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব হবে না। ওর পোষাক-পরিচ্ছদে, ওর প্রসাধনে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ আভাসিত হচ্ছে যেন! তখন বুঝতে পারিনি যে অবন্ধনা চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার প্রশ্নে একটা শাণিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবন্ধনার চোখে। "হ্যাঁ, আমি অবু। ঠিক অবু নই, মিস. এ. মুখার্জি।"

"কি রকম ?"

"তুমি এখানে এলে কি করে !"

"আমি তেতলার একটা ঘরে থাকি যে।"

অবন্ধনা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল ক্ষণকাল।

"এই বোর্ডিংয়ের তেতলার ঘরে ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন নম্বরে ?"

"বাইশ। সমস্ত ঘরটাই আমি নিয়েছি।"

"কোলকাতায় কি করছ ?"

"চাকরি। তুমি কি করছ এখানে ?"

"আমিও এখানে থাকি। দোতলায় সাত নম্বরে। একেবারে কোণের ঘরটা।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি এখানে কেন ?"

"আমি নার্স হয়েছি। মিডওয়াইফারিতে প্র্যাকটিস করি।"

"ও। তা এই বোর্ডিংএ কেন ?"

"অন্য কোথাও ভাল বাসা পাইনি। এখানে ভালই আছি। তুমি ক'দিন এসেছ এখানে ?"

"পরশু।"

"কি করছ এখানে ?"

"চাকরি।"

"কি চাকরি ?"

আমি যে পুলিশের লোক তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। বললাম—"মার্চেন্ট আপিসে কেরাণীগিরি করি।"

"আমার ঘরে যাবে ? এস না।"

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল এখন ওর সঙ্গে ওর ঘরে গেলে ছদ্ম আবরণটা খুলে পড়বে। নিজেকে সামলাতে পারব না হয়তো।

"একটু দরকারি কাজে বেরুচ্ছি। পরে আসব এখন। দোতলায় সাত নম্বর তো ?"

"সন্ধের পর এস তাহলে।"

"আচ্ছা।"

সেই বোর্ডিংএ শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম রোজ! বস্তুত রাত্রি দশটার পর ওই আমার একমাত্র কাজ ছিল। শিখরেরও বোধহয় একমাত্র কাজ ছিল, রাত্রি দশটার পর ওর ঘরে গিয়ে গল্প করা। গল্পটা যে নিছক প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছু নয় এই মনে করে আমি পুলকিত হতাম। আগেই বলেছি মেয়েটি অবন্ধনা জানলে পুলকের বদলে আমার মনে ঈর্ষাই জাগত। কিন্তু ওদের আলাপের সুর যে ঠিক কি ছিল তা আগে টের পাইনি, এখন পাচ্ছি শিখরের ডায়েরি থেকে।

শিখর লিখছে—"এতদিন পরে অবন্ধনাকে যে আবার ফিরে পাব সত্যিই তা আমার কল্পনাতীত ছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই দিনই রাত্রে গেলাম তার ঘরে। গিয়ে দেখি সে খুব ডগমগে একটা নাইট গাউন পরে নিবিষ্টচিত্তে একটা বিলিতি সিনেমা-মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের টেবিলে একটা 'অ্যাশ ট্রে'তে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা। তাকে নার্সের বেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এই বেশে দেখে বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করল। খানিকক্ষণ আমি কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।"

"খুব অবাক লাগছে, না ? সত্যি আমি অনেক বদলে গেছি শিখরদা।"

"সত্যি বদলেছ। তুমি নিজেকে পরিচয় না দিলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না বোধহয়, এত বদলেছ।"

"আমার মুখটাও খুব বদলেছে কি ! দেখ তো ভাল করে। আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। দেখ তো—"

মুখটা উঁচু করে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখলাম মুখটা সত্যি বেশী বদলায়নি। অনেক দিন পরে চিবুকের পাশের ছোট কালো তিলটি চোখে পড়ল আবার। আর একটা কথাও মনে হল, মুখের গড়নটা বদলায়নি বটে কিন্তু রূপটা

বদলেছে। তরলমতি কিশোরী সে আর নেই, পরিণতি লাভ করেছে আত্মসচেতন যুবতীতে।

"না, মুখটা বেশী বদলায়নি। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে চিনতে পারতাম।"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

চেয়ারটা টেনে বসলাম। অ্যাশ ট্রেটা দেখিয়ে বললাম, "সিগারেট খায় কে। তোমার বন্ধুরা বুঝি ?"

"আমিই খাই। বন্ধুদের মধ্যেও খায় দু'একজন। খাবে তুমি ?"

দামী কাজকরা একটা রূপোর সিগারেট কেস সে এগিয়ে ধরল আমার দিকে। স্প্রিংটা টিপতেই ডালাটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল একটা সাপ ফণা তুলল যেন।

"তুমি সিগারেট খাও ?" মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমার।

"আমি এখন অনেক কিছুই করি। ওই দেখ।"

ঘরের যে অংশটি তার প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হত সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে সে। প্রকাণ্ড একটা দামী আয়নার আশে-পাশে ছোট বড় কয়েকটা শেলফে নানা আকৃতির সুদৃশ্য শিশি আর কৌটো সাজানো রয়েছে দেখলাম।

"কি ওগুলো ?"

"স্নো, পাউডার, লোশন, লিপস্টিক, কাজল, ডেপিলেটরি, এসেন্স, আতর—কত কি। যে অবু আমগাছে উঠত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত, তোমার পড়ার ঘরে জানলার ধারে উঁকি দিত সে মরেছে। তার দেহটার ভিতর বাস করছে এখন অন্য লোক, একে চিনতে তোমার দেরী হবে। হয়ত পারবেই না।"

ভিতরের আসল মানুষটা বদলায় না অত সহজে।"

বিদ্বান লোকেরা তাই বলে শুনেছি। কিন্তু বাইরের পোষাক পরিচ্ছদে মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করে যে তাকে আর খুঁজেও পাওয়া যায় না।"

অবন্ধনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একজন পাকা দার্শনিকও বোধহয় এমন করে গুছিয়ে মানুষের আপাত-পরিবর্তনের রহস্য বর্ণনা করতে পারত না। একথা অবশ্য বললাম না তাকে।

বললাম—তোমাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করতে পারব। সে ভরসা আমার আছে।"

'আমার নেই।"

অবন্ধনার চোখে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল

সে। গম্ভীরভাবে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে নিপুণভাবে ধরালে সেটা।

"নেই ? কেন !"

"পিসেমশায়ের হাতে নির্যাতিত হয়ে যখন তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, যখন আমার বাইরের সব আবরণ ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারনি। তার মানে আমার আসল মানুষটাকে তুমি চিনতে পারনি, পারলে নিশ্চয়ই দিতে।"

অবঞ্চনার কথার বাঁধুনি দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

"চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার বাধা ছিল অনেক। তাই একটু ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার তর সইল না। নবীন ভুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেলে। আচ্ছা, নবীন ভুলের সঙ্গে গেলে কেন ?"

"কারণ ওই ঠিক আমাকে চিনেছিল।"

নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললে—"নবীন ভুলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে খুব কুৎসা রটিয়েছ বোধহয় তোমরা।"

"কুৎসা তো রটবেই।"

"তোমার কি মনে হয়েছিল ?"

চুপ করে রইলাম। বড় কঠিন প্রশ্ন। অবঞ্চনার চোখের পাতা পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে আমার উত্তরটা শোনবার জন্য।

"আমার ? নবীন ভুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেছ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হল।"

"বিশ্বাস করলে আমি নবীন ভুলের প্রণয়িনী হয়েছি ?"

চুপ করে রইলাম। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল অবঞ্চনা।

"আশ্চর্য তোমাদের বুদ্ধি। আমি বিপদে পড়ে যদি একা একটা নৌকো করে নদী পার হয়ে যেতাম, তাহলেও তোমরা বোধহয় ভাবতে যে নৌকোটার সঙ্গেই আমার নিশ্চয় কিছু ঘটেছে গোপনে গোপনে !"

আমি চুপ করেই রইলাম। অবঞ্চনার হাসিটাও থেমে গেল হঠাৎ। তার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সহসা অন্য কথা পাড়লে সে।

"একটু চা খাবে ?"

"দোকানের চা ?"

"না, আমি নিজে করে দেব। সব ব্যবস্থা আছে আমার।"

ঘরের আর এক কোণে দেখলাম ছোট একটি টেবিলে সত্যিই সব ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি ছোট একটি ইলেকট্রিক স্টোভ পর্যন্ত।

অবন্ধনা চা করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর উঠে তার বিছানার ধারে যে বইয়ের শেল্‌ফটা ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ইংরেজি বইই বেশী।

"ইংরেজি পড়তে শিখেছ নাকি।"

"আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি।"

"ও। এত সব করলে কোথায়?"

"বম্বেতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে বুঝলাম যে স্বাধীনভাবে নিজের ভরণ-পোষণ করবার যোগ্যতা না হলে আত্মসম্মান থাকে না, এমন কি বিয়ে করেও না। সেদিন ভাগ্যিস তুমি আমাকে আশ্রয় দাওনি শিখরদা। দিলে পরের মুখ-ঝাম্‌টা খেতে খেতেই সারা জীবনটা কাটত।"

আমি শেলফের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নাবিয়ে নাবিয়ে দেখছিলাম—কি ধরনের বই অবন্ধনা পড়ে। দেখলাম শস্তা প্রেমের উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পই বেশী রয়েছে। নার্সিংয়ের বইও আছে দু-একখানা। বইগুলোর পিছন থেকে ছোট একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। লেবেলে লেখা রয়েছে দেখলাম—পোটেশিয়াম সায়ানাইড। ভীষণ বিষ! এ জিনিস এখানে কেন!

"পোটেশিয়াম সায়ানাইড রেখেছ কেন!"

"ওটা বার করলে কোথা থেকে?"

"এই বইগুলোর পিছনে ছিল।"

"একজন রোগীর জন্য দরকার ওটা। বাজারে পায়নি সে, তাই আনিয়ে রেখেছি আমি।"

"রোগীর জন্যে? এ তো ভয়ানক বিষ। কোন অসুখে লাগে সায়ানাইড?"

"ডাক্তার হলে বুঝতে। ডক্টর সেন প্রেসক্রাইব করেছেন একটা ক্যানসার রোগীর জন্যে। দাও।"

আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশিটা। রোগীর কথাটা যে মিথ্যে তা তার চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম শিশিটা নিয়ে আবার বইগুলোর পিছনেই রেখে দিলে সেটা। সায়ানাইড রেখেছে কেন? প্রশ্নটা কাঁটার মত বিঁধে রইল মনে। কিন্তু তখন তা নিয়ে আর আলোচনা করা হল না, আলোচনা করবার অবসরই দিলে না অবন্ধনা।

"চা'টা খেয়ে দেখ দিকি কেমন হল। আমি কড়া চা পছন্দ করি। তুমি ?"

"আমিও।"

"তাহলে ভালই লাগবে বোধ হয়। চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না দেখ।"

এক চুমুক খেয়ে বললাম—"চমৎকার হয়েছে।"

সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। অবন্ধনা নিজের জন্যও বানিয়েছিল এক পেয়ালা। একটা ছোট টুলে বসে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল সে। চোখ দুটি থেকে অদ্ভুত একটা হাসি উপ্‌চে পড়তে লাগল।

"শিখরদা, কোথায় কি চাকরি কর তুমি ?"

"আমি দালালি করি। ঠিক চাকরি নয়, সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম।"

"কিসের দালালি ?"

"নানারকম জিনিসের। বাড়ি গাড়ি থেকে আরম্ভ করে দেশলাই ছুঁচ পর্যন্ত।"

মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে বলে গেলাম। আমি যে পুলিশের গুপ্তচর এ কথাটা অবন্ধনার কাছে বলতে পারলাম না। মনে হল কথাটা শুনলে আমার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আসবে একটা। 'স্পাই'কে সবাই ঘৃণা করে, এটা কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

"দালালিতে রোজকার হয় বেশ ?"

"চলে যাচ্ছে।"

"বিয়ে করেছ ?"

"না।"

"করবে না ?"

"একদিন ঠিক করেছিলাম করব না। কিন্তু এখন ভাবছি করলেও হয়।"

অবন্ধনার চোখ থেকে যে হাসির আলোটা উপ্‌চে পড়ছিল সেটা নিবে গেল হঠাৎ।

"কনে ঠিক হয়ে আছে না কি ?"

"অনেক আগে থেকেই।"

"কেমন মেয়েটি, কোথায় বাড়ি ?"

"দেখতে ইচ্ছে করছে না কি।"

"করবে না ?"

"আয়নার সামনে দাঁড়াও গিয়ে তাহলে।"

অবন্ধনার চোখের আলো নিবে গিয়েছিল, মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল আবার। কিন্তু জোর করে হেসে সে বললে।—

"তা আর হয় না শিখরদা।"

"কি হয় না?"

"আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারি না।"

"কেন?"

"লগ্ন বয়ে গেছে।"

"পাঁজিতে বিয়ের লগ্ন কি একটাই থাকে?"

"পাঁজিতে যত লগ্নই থাক, আমার বিয়ের লগ্ন একবারই এসেছিল—আর আসবে না।"

"কবে এসেছিল?"

"মনে নেই? বহুদিন আগে রাত দুপুরে? তুমি তো তখন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমার সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন তোমার পিসেমশাই। এসব কারণেই আমি চট্ করে মত দিতে পারিনি তখন।"

"আমি তা জানি। আমি রাগও করছি না, কিন্তু লগ্ন বয়ে গেছে। তখন যা হতে পারত এখন তা আর হয় না।"

"হয় না কেন। তুমি আমি দুজনেই এখন স্বাধীন, আমাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই তো।"

"আছে বই কি।"

"কে?"

"আমার বিবেক।"

কথাটা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম ক্ষণকালের জন্য। নবীন দুলের ঘটনাটা পরমুহূর্তে মনে পড়ল।

বললাম—"নবীন দুলের সঙ্গে তোমার কি ঘটেছিল জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস কর তার জন্যে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই।"

"তোমাকেও একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। করবে কি?"

সিংহিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"কি বল।"

"আজ পর্যন্ত যত পুরুষের সংস্রবে এসেছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মল

নিষ্পাপ চরিত্র মাত্র একটি লোককেই দেখেছি সে হচ্ছে ওই নবীন ঢুলে। সে ইচ্ছে করলে আমাকে নষ্ট করতে পারত কিন্তু করেনি। তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"বিশ্বাস করলাম। নবীন ঢুলে কোথা এখন ?"

"জাহাজের খালাসী হয়ে সে চলে গেছে।"

"কবে ?"

"আমরা যখন বম্বে পৌঁছলাম তার মাসখানেক পরে।"

"তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল !"

"আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে গেল।"

"কোথায় ?"

"এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।"

"কি করতে সেখানে ?"

"দাসীবৃত্তি।"

"তারপর ?"

"তারপর ডাক্তারবাবুর সুনজরে পড়লাম। তিনি আবিষ্কার করলেন একদিন যে 'নহি আমি সামান্যা রমণী'। তাঁরই অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলাম, নার্সগিরি শিখলাম।"

অবঞ্চনার চোখে মুখে অদৃশ্য একটা আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠল যেন।

"লেখাপড়া তিনিই শেখালেন ?"

"একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে দিলেন। অনেক কিছু করেছিলেন ভদ্রলোক আমার জন্যে। আমাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হতে পারলুম না।"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত ছিলেন না কি ?"

"স্ত্রী তাঁর আত্মহত্যা করেছিলেন।"

"কেন ?"

"আমারই জন্য।"

মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল যেন নিজের একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমার প্রশংসা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"তবু বিয়ে করলে না ভদ্রলোককে !"

"সেই জন্যেই করলাম না। আমাকে যত বোকা তোমরা ভেবেছ তত বোকা আমি নই। ততটা হৃদয়হীনও নই।"

"আমি তোমাকে কোনদিনই বোকা ভাবিনি। তবে তুমি হৃদয়হীন কি না তা জানতে বাকী আছে এখনও আমার। তারপর কি হল। তোমার জীবন-কাহিনী বেশ লাগছে।"

"বেশ লাগছে ? খেলো উপন্যাসের মতো ?"

"ভাল উপন্যাসের মতো।"

"আশ্চর্য তো !"

"আশ্চর্য হবার কি আছে।"

"উপন্যাসে যা তোমাদের ভাল লাগে, বাস্তব জীবনে তা কি তোমরা সইতে পার ? কুন্দনন্দিনী, কিরণময়ীদের তোমরা তো দূর করে দিয়েছ। তারা হয় মরেছে না হয় আশ্রয় নিয়েছে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। আজকাল অবশ্য সিনেমা-আকাশে তারকা হয়ে জ্বলছে অনেকে। আমিও হয়তো জ্বলতাম, ঠিক দামটা দিতে পারলাম না।"

"কিসের দাম ?"

"তারকা হতে হলে যে দাম দিতে হয়।"

আবার চুপ করে গেল সে। মুচকি হেসে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে-ই কথা কইলে আবার।

"আচ্ছা, শিখরদা, তুমি বরাবর সৎপথে চলে ঠিক আগেকার মতো ভালো ছেলে আছ ?"

উত্তরে আমিও মুচকি হেসে চাইলাম তার দিকে। তারপর বললাম—"নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করতে নেই। আমার জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমি প্রতীক্ষা করছি।"

"কার ?"

"তোমার।"

অবন্ধনা একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'এই সিগারেট-খোর মেয়েটার ? মিছে কথা বলো না শিখরদা। তোমাকে সত্যবাদী বলে শ্রদ্ধা করে এসেছি বরাবর।"

"সিগারেট খেয়ে বা রং মেখে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে এটা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে চেননি তুমি।"

হঠাৎ অবন্ধনা খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সিগারেটটা পড়ে গেল তার ঠোঁট থেকে।

"চিনিনি ? পুরুষদের চিনতে বাকী থাকে নাকি কোন মেয়ের ?"

সিগারেটটা তুলে আবার টানতে লাগল।

অনেক রাত পর্যন্ত অবন্ধনার সঙ্গে গল্প করলাম। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিল না সে। 'প্রহেলিকা' কথাটা দিয়েও ঠিক বর্ণনা করা যায় না তাকে। তাকে যে আমি বুঝতে পারছিলাম না একথা ঠিক নয়। সে যে ভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল আমি সে ভাবে বুঝতে চাইছিলাম না। সেদিন তার কাছ থেকে এসে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে হল অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে। কোনও অতি-পরিচিত লোকের নাম মনে না পড়লে যে ধরনের অস্বস্তি হয় এ অনেকটা সেই ধরনের অস্বস্তি। অবন্ধনাকে আমি চিনেও চিনতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম সে বদলেছে, নীতিবিদরা যা অধঃপতন বলে অভিহিত করেন তা-ও হয়তো তার ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তবু তার সম্বন্ধে আমি মোহ-মুক্ত হতে পারছি না কেন। তাকে কলঙ্কিত বলে সন্দেহ হচ্ছে, তার আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা মোটেই ভদ্র নয় কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে সে সত্যিই মন্দ। মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারলে শুধু যে সুখী হব তা নয় কৃতার্থ হয়ে যাব। এই অনুভূতি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার বিবাহের প্রস্তাব অবন্ধনা বারম্বার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু আমার অন্তরের অন্তস্থলে আমি উপলব্ধি করছি অবন্ধনা আমাকে চায়। তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক, নিগূঢ় অভিমানের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অনুভব করছি সে আমাকে চায় বলেই না-চাওয়ার ভান করছে। ওটা ভান মাত্র। কিন্তু এ ভান কেন? নারীর ছলনা? কিন্তু যে সত্য নির্ণয় করবার জন্যে নারীরা সাধারণত ছলনার আশ্রয় নেয় সে সত্য কি এখনও অজ্ঞাত আছে অবন্ধনার? সে কি জানে না যে আমি তাকেই সারাজীবন চেয়েছি, তাকেই সারাজীবন চাইব? না, কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে। অবন্ধনাকে চিনতে পারছি না···।"

শিখর সেনের ডায়েরির খানিকটা অংশ লিখিয়া কবি লেখনী-সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবার কি লিখিবেন।

ছোট ছোট পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে উড়িয়া গেল। কিছুদূর উড়িয়া গিয়া তাহারা যুবক যুবতীতে রূপান্তরিত হইল; একেবারে আধুনিক যুগের যুবতী। যুবতীর দিকে চাহিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে বাণী! আমাকে?"

"বেশ, চমৎকার।"

"চল একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক। একটা সমস্যা উদয় হয়েছে মনে।"

"চলুন। নদী এখান থেকে কতদূরে?"

"ঠিক জানি না। খুঁজে দেখি চল। আছেই নিশ্চয় কাছে পিঠে কোনও নদী।"

উভয়ে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। তাহাদের ঘিরিয়া নৈশ অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। ঘন কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নক্ষত্রকুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, সঞ্চরমান শ্বাপদকুল গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে এই যুগলযাত্রীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ঝিল্লীকণ্ঠে নূতন রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, পেচকদম্পতী বিস্রম্ভালাপ স্থগিত রাখিয়া বিস্ফারিত-নয়নে এই সহসা আবির্ভূত অপরূপ মানবদম্পতীকে কি ভাষায় অভিনন্দিত করিবে ভাবিতে লাগিল।

অনেক দূর হাঁটিয়াও কিন্তু নদীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

"কই নদী তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।"

"সামনে ওটা কি।"

"প্রকাণ্ড মাঠ একটা।"

"মাঠ? ঠিক দেখতে পাচ্ছ তুমি? বড্ড অন্ধকার, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

যুবক ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিল। মধ্যগগনে বীণা-মণ্ডলে অভিজিৎ নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। পিতামহের দৃষ্টিপাতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। জ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত এক আলোক-রেখা অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া প্রান্তরকে আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই অম্বরাগত দিব্য নক্ষত্র-আলোকে দেখা গেল প্রান্তরের অপর-প্রান্তে এক খরস্রোতা কল্লোলিনী প্রবাহিত হইতেছে।

"ওই তো নদী! চল ওরই পাড়ে গিয়ে বসা যাক।"

বাণী হাসিয়া বলিল—"এত কাছে যে নদী ছিল তা তো বুঝতে পারিনি।"

"মনুষ্যের রূপ ধারণ করেছি কি না, বুদ্ধিটা তাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে আলো না এলে অধিকাংশ ব্যাপারই বোঝা যাবে না এখন।"

"ওই নদীটা এখানে ছিল অথচ আমরা বুঝতে পারিনি?"

"ছিল কি ছিল না এ সবই আপেক্ষিক কাণ্ড। ওর মধ্যে ঢুকো না। যখন নদী পাওয়া গেছে, চল ওর পাড়ে গিয়ে বসা যাক, আর যে কথাটা মনে হয়েছে তাই নিয়ে একটু সময় কাটানো যাক। আমরা অমর, আমাদের কাছে সময় কাটানোটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে কি না।"

পিতামহ ও বাণী নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল নদীতীরে একটি সুদৃশ্য মর্মর-বেদীও রহিয়াছে। বেদীর উপর উভয়ে উপবেশন করিলেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নদীর তরঙ্গমালায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাণী প্রশ্ন করিলেন—"কি আলোচনা করবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন।"

"যে কাণ্ডটা করলাম সেটা তোমার ভাল লাগল কিনা।"

"লাগল বই কি।"

"এটা কিন্তু সেকেলে রূপকথার কাণ্ড। এর তুলনায় ভবিষ্যযুগের কবি যা লিখে যাচ্ছে সেটা খুব খেলো হচ্ছে না?"

"আপনিই তো তাকে লেখাচ্ছেন।"

"তা লেখাচ্ছি কিন্তু লিখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি না। সত্যি সত্যি যা ঘটে সেইটেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কি? দুটো ছোঁড়া প্রেমে পড়ে ছটফট করে মরছে আর কাতরাচ্ছে এই ঘটনটা হুবহু নকল করে দেওয়াটা কি সৃষ্টির পর্যায়ে যাবে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আমি যখন কেঁচো কৃমি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলাম তখনও তাতে অনন্যতা ছিল, ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাতে। আমার কালকূটের কল্পনাটাও নিতান্ত খারাপ হয়নি। নিজের স্ত্রীর জিবের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা প্রণয়িনীর সন্ধানে—অ্যাঁ কি বল!"

বাণী মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"এরাও অনন্য। এদের জোড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকায় দূরবীণ কিনে আলেয়াকে দেখছে যে কমল-কিশোর সে-ও কম নয়।"

পিতামহ সহসা খুশী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি ঝলমল করিতে লাগিল।

"তোমার ভাল লেগেছে কমল-কিশোরকে?"

"লেগেছে। শিখর সেনকেও লেগেছে। তবে ওকে পুলিসের গুপ্তচর করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যযুগের চার্বাক আঁকবার কথা ছিল।"

"আমার মনে হল সন্দিগ্ধচিত্ত চার্বাকরাই ভবিষ্যৎ যুগে পুলিসের গুপ্তচর হবে।"

"ও তাই বুঝি।"

"দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা। কিন্তু সে যাই হোক, গল্পটা তোমার ভাল লাগছে কি না বল। আমার নিজের কেমন পানসে পানসে ঠেকছে। এটার চেয়ে চার্বাকের গল্পটা যেন বেশী জমাট হয়েছে।"

"কেন ওতে বনজঙ্গল, সিংহ এই সব আছে বলে ? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি শিখর সেনের চারদিকেও বনজঙ্গল, সিংহ আমদানী করেছেন। জঙ্গলটা অবশ্য সমাজের আর সিংহটাও মনুষ্যরূপী সিংহ।"

"বাঃ ঠিক ধরে ফেলেছ তো।"

সহসা যুবক-রূপী পিতামহ যুবতী বাণীকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। নদীর তরঙ্গকুলও নাচিতে লাগিল। বাণী লক্ষ্য করিলেন অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরী আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নয়নে মাণিক্য-দ্যুতি, গ্রীবাদেশে নীলার সৌন্দর্য, পক্ষদ্বয়ে মুক্তা-মালা এবং প্রসারিত পুচ্ছমণ্ডলে অসংখ্য পান্না প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত পক্ষী বাণী আর কখনও দেখেন নাই।

"ময়ূর তো রাত্রে নাচে না! এমন ময়ূরও তো দেখিনি কখনও।"

একটি ময়ূরই উত্তর দিল—"আমরা রাতের ময়ূর, রাতেই নাচি।"

"কোথায় থাক তোমরা ?"

"কোথায় থাকি জানি না ঠিক। হয়তো তোমার মনেই আছি।"

"কবিতায় কথা কও না কি তোমরা।"

ময়রের দল ইহার কোন উত্তর দিল না, মুচকি হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বাণীও নৃত্যপরা হইলেন। চরাচর নৃত্যময় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন—"চল একবার কবির কাছে যাওয়া যাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছে।"

আবার দুইটি পতঙ্গ কবির বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত ইলেকট্রিক বাতির সুদক্ষ ডোমের উপর উপবেশন করিল। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দুইটির আগমন বা নির্গমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। পতঙ্গ দুইটি আসিয়া বসিবার পর পুনরায় তাঁহার মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, পুনরায় তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"শিখর সেনের সঙ্গে অবঞ্চনার এরকম লুকোচুরি কতদিন চলেছিল তা বলা শক্ত। কারণ শিখর সেনের ডায়েরিতে অবঞ্চনার কথা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ নেই। আছে সেই কালোবাজারীটার কথা যার খোঁজে এই বোর্ডিংএ এসে সে বাসা বেঁধেছিল। একদিনের ডায়েরিতে দেখছি এই বিশেষ বোর্ডিংটাতে কালোবাজারীটার আকর্ষণ কোথায় তা সে আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।"

শিখর লিখছে—"এমন একটা ঘটনা ঘটেছে আজ আমার জীবনে যা হয়তো আমার জীবনের গতিকেই পরিবর্তিত করে দেবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা আর কখনও এমনভাবে বিচলিত হয় নি। যে লোকটার জন্যে এই বোর্ডিংএ এসে বাসা বেঁধেছি সে লোকটাকে এই বোর্ডিংএ ঢুকতে এবং বেরুতে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কেন সে আসে এখানে তা নির্ণয় করতে পারিনি। এ বিষয়ে কাউকেও প্রশ্ন করতে ভরসা পাইনি, পাছে কেউ আমাকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করে। দোতালার একটা ঘরে গণেশবাবু নামে একজন দালাল আছেন আমার সন্দেহ ছিল তার সঙ্গেই হয়ত কোনরকম যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু স্বচক্ষে কোনও দিন তার ঘর থেকে তাকে বেরুতে দেখিনি, তার ঘরে ঢুকতেও দেখিনি। এইটে স্বচক্ষে দেখবার জন্যে অনেক সময় আমি সমস্ত দিন কোথাও যাইনি, কিন্তু সেদিন সে আসেই নি বোর্ডিংএ। এইভাবেই চলছিল। আশা ছিল একদিন না একদিন তাকে হাতে-নাতে ধরবই। আজ সন্ধের একটু আগেই সিঁড়িদিয়ে নাবছি এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সেই লোকটারই সঙ্গে। সে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া নিয়ে উপরে উঠছিল। আমি তাকে দেখিয়ে গট গট করে নেবে গেলাম বটে কিন্তু সে উঠে যেতেই তৎক্ষণাৎ ফিরলাম। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন ঘরে সে ঢুকছে। যা দেখলাম তাতে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। দেখলাম লোকটা অবন্ধনার ঘরে ঢুকল। ফুলের তোড়া নিয়ে অবন্ধনার ঘরে ঢোকার মানে ? কি করব ভাবছি এমন সময় অবন্ধনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

"কোথা যাচ্ছ এমন অসময়ে ?"—জিজ্ঞাসা করতে হল।

"কলে বেরুচ্ছি। আমাদের আবার সময়-অসময় আছে নাকি।"

মুচকি হেসে সপ্রতিভ ভাবে নেমে গেল।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দামী একটা মোটরকারও দাঁড়িয়ে আছে নীচে! অবন্ধনাকে নিয়ে লোকটা মোটরে চড়ল।

আমিও দ্রুতবেগে নেমে এলাম নীচে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিটাকে বললাম ওই মোটরটাকে অনুসরণ করতে।

···অবন্ধনা সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেছি তা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তা লিখতেও ভয় করছে। অবন্ধনা না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তাহলে আজই তাকে এ্যারেস্ট করতাম। যে সব পদস্থ গভর্ণমেন্ট অফিসার অর্থের বশীভূত নয় কামের বশীভূত, ওই কালোবাজারীটা অবন্ধনাকে কাজে লাগাচ্ছে

তাদের ভোলাবার জন্তে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, অথচ আমি বেঁচে আছি।"

এইভাবে আরও কয়েক পাতা লিখেছে শিখর। অবান্তর বোধে সুরটা আর উদ্ধৃত করলাম না। ঠিক এর পরের তারিখে কিন্তু আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে শিখর যা এ কাহিনীর পক্ষে মোটেই অবান্তর নয়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

শিখর লিখছে—"ছেলেবেলায় আমি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতাম। উঠে বেড়িয়ে বেড়াতাম বাড়ির সামনের বাগানটায়। রাত্রে কুঁড়ি কি করে ফুল হয় তা জানবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার। আশ্চর্য লাগত সন্ধ্যাবেলার ছোট্ট কুঁড়ি কয়েক ঘণ্টায় কি করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে যায়! ঘুমের ঘোরে উঠে দেখতে যেতাম তাই। আমার মা অনেকদিন আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায়। অনেক সময় খাটের সঙ্গে হাত-পাও বেঁধে দিতেন। ডাক্তাররা বলেন ওটা নাকি একপ্রকার অসুখ। অনেকদিন এরকম আর হয়নি। বোর্ডিংয়ের চাকরটা কিন্তু কাল রাত্রে সিঁড়ি থেকে আমাকে ধরে এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল, আমি নাকি ঘুমের ঘোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলাম। অন্তর-নিহিত প্রবল কৌতূহল ছেলেবেলায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত। কাল কোন কৌতূহলের টানে উঠেছিলাম? সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছিলাম? অবন্ধনার ঘরের দিকে নাকি—!"

ডায়েরির এই অংশটা পড়ে মনে হচ্ছে আহা শিখরের মতো আমারও যদি ওই অসুখটা থাকত। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে সত্যিই যদি যেতে পারতাম আলেয়ার কাছে। আজ বিকেলে আলেয়া জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। কি ভাবছিল? মনে করতে ইচ্ছে করে যে আমার কথাই ভাবছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সত্যটা কি করে জানি না প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ও আমার কথা ভাবছিল না।

প্রথম পতঙ্গ চুপি চুপি দ্বিতীয় পতঙ্গকে বলিল—"চল, চার্বাক-সুরঙ্গমার খবরটা নেওয়া যাক এবার। এদের ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগছে না আর—।"

"চলুন।"

পুনরায় পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল

অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে চার্বাক আশ্রয় লইয়াছিল। বিশাল বিশাল বনস্পতি-বেষ্টিত যে নির্জন স্থানটি সে নির্বাচন করিয়াছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা-মুখ ছিল। চার্বাক স্থির করিয়াছিল—যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। স্বরঙ্গমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সমস্ত রাত্রি সে একটি বৃক্ষের উপরই যাপন করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নূতন আশ্রয়টি সে আবিষ্কার করিয়াছে। কতদিন যে অরণ্যবাস করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, স্বরঙ্গমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই, সুতরাং গুহার ভিতরটা নিরাপদ কিনা তাহা দিবালোকেই স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য সে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া উহার ভিতর সেগুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল কোন জন্তু বা সর্প বাহির হইয়া আসে কি না। সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পরও যখন কোনও প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না; চার্বাক তখন চিন্তা করিতে লাগিল এইবার গুহার ভিতর প্রবেশ করা সমীচীন হইবে কি না। ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল, হইবে না। অগ্নি সংযোগ করিবার পরও যদি কোনও প্রাণী বাহির না হয় তাহা হইলেই ওই অন্ধকার অপরিচিত গুহায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু অগ্নি কোথায় পাওয়া যাইবে? অরণ্যের মধ্যে শবর-পল্লী থাকা সম্ভব, সেখানে গেলে শুধু অগ্নি নয়, হয়তো আশ্রয়ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শবর-পল্লীতে যাওয়াও কি সমীচীন? কুমার সুন্দরানন্দের সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তাহারা রাজভক্তির আতিশয্য-বশত তাহাকে ধরাইয়াও দিতে পারে। সুতরাং শবর-পল্লীতে গমন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। সহসা মনে হইল এই অরণ্যে সন্ধান করিলে অরণি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। কিছু ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। চার্বাক উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, সে ঠিক করিয়া ফেলিল এই গভীর অরণ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইবে। আকাশ-চুম্বী বনস্পতি শ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে হাসিয়া ফেলিল। মনে হইল গুরুগম্ভীর ধর্মগ্রন্থগুলির আপাত-পবিত্রতার মধ্যে সে যেমন ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই; স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইলে এই গম্ভীরা বনভূমিও তেমনি শেষে হাস্যকর নগণ্য কিছুতে পরিণত হইয়া যাইবে না তো। কিন্তু পরমুহূর্তে তাহার মনে হইল, না হইবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার দর্শন, যে দর্শন কখনই নগণ্য হইতে পারে না, তাহাই একমাত্র সত্য। চার্বাক গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

॥ ২২ ॥

যজ্ঞের জন্য আজ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ত্রিবেদজ্ঞ মহর্ষি পর্বত ব্রহ্ম-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কুমার সুন্দরানন্দ। মহর্ষি পর্বত কুমারকে বলিলেন, "দেখুন, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার কেমন যেন মন খুঁতখুঁত করছে। মনে হচ্ছে সুরঙ্গমাকে বলি দেওয়া চলবে না।"

"কেন ?"

"প্রথমত, কোন নারী-পশুকে বলি দেওয়ার বিধি কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, বলির পশুটি যতদূর সম্ভব হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। নর্তকী সুরঙ্গমা পেলব লতার মতো, তন্বী। ওর শরীরে কিছু নেই। তৃতীয়ত, বলির মাংস খেতে হয়। সুরঙ্গমার মাংস কি খেতে পারবেন ? সুতরাং যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে নির্বাচন করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে। সুরঙ্গমার মতো একজন রূপসী শিল্পীর এমনভাবে জীবনাবসান হবে, এটাও কি শোভন ? সুরঙ্গমার মতো নর্তকী দুর্লভ। তাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে কেন চাইছেন ?—"

"দুর্লভ বলেই চাইছি। আমি যতদূর বুঝেছি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করতে পারলেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুরঙ্গমাকে ভাল করে পাব বলেই তাকে ত্যাগ করতে চাই। সে নিজেও তাতে রাজি আছে। সে যদি অসম্মত হত, তাহলে আমি এ যজ্ঞের আয়োজন করতাম না।"

মহর্ষি পর্বত ক্ষণকাল কুমার সুন্দরানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ মির্মির আপনাকে যা বুঝিয়েছে তাই আপনি বুঝেছেন। নর-বলির প্রথা এককালে এদেশেও প্রচলিত ছিল। শুনঃশেফের গল্প নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই। বলি দেওয়ার কথা ছিল রোহিতকে, কিন্তু শুনঃশেফকে তার বদলে কিনে আনা হল। সেই শুনঃশেফকেও শেষকালে দেবতারা ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে যা ইঙ্গিত আছে তাতো স্পষ্ট।"

কুমার সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "মহর্ষি আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার অবাধ্য হওয়ারও কল্পনা আমি করতে পারি না। একটি বিষয়ে শুধু আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নর-বলির সঙ্কল্প নিয়েই আমি এই গভীর বনে যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমার এ সঙ্কল্প দেবতার অগোচর নেই। এখন যদি আমি প্রতিশ্রুত বলি অগ্নিমুখে সমর্পণ না করি, দেবতা

কি অপ্রসন্ন হবেন না ? আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, সমস্ত দায়িত্ব আপনারই—আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করব।"

মহর্ষি পর্বত কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহলে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। সুরঙ্গমার বদলে আর কাউকে বলি দেওয়া হোক।"

"সুরঙ্গমা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল। আর কেউ কি রাজি হবে ?

"চেষ্টা করলে হয়তো হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে নিষাদ-পল্লী বা শবর-পল্লী থেকে কোনও বালক পাওয়া অসম্ভব নয়।"

"কিন্তু সে বালক কি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজি হবে ? কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই আমার মহর্ষি।"

"সুরঙ্গমাও কি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে ?"

"হয়েছে।"

'আপনি তাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন কুমার। নারী-চরিত্র বড় বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।"

"বেশ, আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

॥ ২৩ ॥

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুমার সুন্দরানন্দ কিন্তু সুরঙ্গমার সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুরঙ্গমার দাস-দাসীরা বলিল, "কাল রাত্রে তিনি আহারাদির পর বললেন, 'আমি কিছুক্ষণ একা একা বনে বনে ভ্রমণ করতে চাই, তোমরা সবাই শুয়ে পড়, আমার অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই।' এখনও পর্যন্ত তো তিনি ফেরেন নি।"

কুমারের নয়ন যুগল হইতে ক্রোধ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। দাস-দাসীদের ভৎর্সনা করিবার উপায় ছিল না; তিনি নিজেই তাদের আদেশ দিয়াছিলেন সুরঙ্গমার কোন আচরণে যেন তাহারা বাধা না দেয়।

মির্মিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মির্মির একটি অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ এক শুক-দম্পতীকে তিনি ফলাহার করাইতেছিলেন। সুন্দরানন্দ এরূপ অদ্ভুত শুক আর কখনও দেখেন নাই। তাদের পক্ষদ্বয়ে মরকত, বৈদূর্য, নীলা ও মুক্তার বর্ণ-দ্যুতি যে অপূর্ব সমন্বয়ে রূপায়িত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তাহাদের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত মাণিক্যের মতো জ্বলিতেছিল।

"এমন অদ্ভুত শুকপক্ষী আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ?"

"এরা নিজেই এসেছে। আজ সকালে উঠে দেখি আমার বাতায়নের ধারে

পাশাপাশি বসে আছে দু'জনে। ধরতে গেলাম, ধরা দিলে না। কিন্তু পালিয়েও গেল না। সরে সরে বসছে। ফল দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছি, আমার জন্মে প্রচুর ফল আপনি কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা দু'জনে প্রায় তা নিঃশেষ করেছে। বাকী আছে এই আঙুরগুলি।"

মির্মিরের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি শুক ঘাড় নাড়িয়া সুমিষ্ট স্বরে কি যেন কহিল। পক্ষী-ভাষায় কি তাহার তাৎপর্য তাহা মির্মির সম্যক বুঝিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অবশিষ্ট আঙুরগুলি শুক-দম্পতীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারাও ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মির্মির কহিলেন, "সুরঙ্গমাকে ডেকে আনুন। এদের দেখলে তিনি খুশী হবেন।"

"তাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি এখানে এসেছিল?"

"আজ তো আসেনি। কাল রাত্রে এসেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এসেই চলে গেল।"

"কোনদিকে গেল···?"

"তা তো লক্ষ্য করিনি।"

"কোথায় গেল সে তাহলে। দেখি।"

শুকদম্পতীর দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমার সুন্দরানন্দ বাহির হইয়া গেলেন। সুরঙ্গমার অন্তর্ধানে তিনি কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়তো প্রাণভয়ে সুরঙ্গমা পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিয়াছে? মহর্ষি পর্বতের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"নারী চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।··" কুমারের মুখ সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি বেশ্যাপল্লীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া রাজরাণীর মর্যাদা দান করিয়াছেন সে তাহাকে এভাবে প্রতারণা করিবে? মির্মিরের নিকট হইতে বাহির হইয়া কুমার গেলেন কুলিশপাণির কাছে।

"কুলিশ সুরঙ্গমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে খোঁজ। তাকে না পাওয়া গেলে যজ্ঞই পণ্ড হয়ে যাবে।"

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া রাজাদেশ গ্রহণ করিলেন।

সুরঙ্গমা পলায়ন করে নাই। শাখা-পত্র-বহুল এক বিরাট মহীরুহে আরোহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সে আত্ম-বিশ্লেষণে নিরত ছিল। একটি কথাই বিশেষভাবে সে চিন্তা করিতেছিল। এই যজ্ঞে সে আত্মাহুতি দিতে সম্মত হইল কেন? মিমিরের কথায় সত্যই কি সে বিশ্বাস করিয়াছিল কুমার তাহাকে যজ্ঞে বলিদান দিয়া তাহারই ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি সত্যই কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবেন বলিয়াই এমনভাবে ত্যাগ করিতেছেন? মিমির তানেকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন কিনা, পাইয়া নারী-লোভ মুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে মিমিরের সহিত রাত্রিবাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত অতিশয় ধূর্ত, কৌশলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মিমির তানেকে যজ্ঞে ত্যাগ করিয়াই সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন কুমারও কি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইবেন? কুমারের বলিষ্ঠ যৌবন, প্রবুদ্ধ কল্পনা, অগাধ ঐশ্বর্য, কি কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবে? সহসা তাহার নিরালার কথা মনে পড়িল। সুরঙ্গমা আসিবার পূর্বে নিরালাই ছিল রাজনর্তকী। সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নিরালার অপরূপ নৃত্য-নৈপুণ্য অপূর্ব কণ্ঠ-সঙ্গীত কুমারকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কুমার তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, 'ছন্দ-কিন্নরী। পুরাতন পরিচারিকা শারী তাহাকে বলিয়াছিল নিরালা তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার যেদিন বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন সেই দিনই সে মরিল। সুরঙ্গমার মনে হইল সে-ও যদি মরে কুমার কি তাহাকে মনে রাখিবেন? ছন্দ-কিন্নরীকে কি তিনি মনে রাখিয়াছেন! কই তাহার কথা একদিনও তো সে কুমারের মুখে শোনে নাই। কুমারের আচরণে তাঁহার পূর্ব-প্রণয়ের কথা একবারও তো আভাসিত হয় নাই; পুরুষ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সুরঙ্গমার কি আজও ভ্রান্তি আছে? সে কি জানে না যে পুরুষ মাত্রেই শিশু প্রকৃতির নূতন ক্রীড়নক পাইলেই পুরাতনের কথা বিস্মৃত হয়? তবে সে এমন করিয়া আত্মবিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কেন! সত্যই কি যজ্ঞে তাহার আস্থা আছে? সত্যই কি সে বিশ্বাস করে সে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বিদেহী আত্মা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে? যদি করেই, তাহাতেই বা কি! যে দেহটা লইয়া তাহার কারবার সেই দেহই যদি না থাকে স্বর্গের প্রয়োজন কি! চার্বাকের কথা সহসা মনে হইল। কিছুদিন পূর্বে ব্রহ্মা-প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন চার্বাক যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল। চার্বাকের প্রফুল্ল

প্রদীপ্ত নয়নযুগল তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফুটিয়া উঠিল যেন। চার্বাকের কথাগুলি আবার যেন সে শুনিতে পাইল—"তুমি যদি সাধারণ কোন নারী হতে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে মনে হচ্ছে তা নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছ এই ধারণাটা।…" সেদিন সুরঙ্গমা চার্বাককে বলিয়াছিল, "আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি…।" সত্যই কি সে করে? সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে সেও ইহলোক ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না, কখনও করে নাই। তবে সে চার্বাকের কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল কেন! করিয়াছিল চার্বাককে নিরস্ত করিয়া আরও উতলা করিবার জন্য। ইশারায় ইঙ্গিতে এই কথাই সে বলিতে চাহিয়াছিল—'তুমি ভাবিয়াছ তোমার বুদ্ধির দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসাইয়া দিবে? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে যুক্তির জাল দিয়া ধরা যায় না। প্রেম-ডোর ছাড়া অন্য কোনও ডোরে আমাকে বাঁধা সম্ভব নয়। কুমারের প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়াই তাহার কাছে আছি, তাহার চতুরানন বিগ্রহকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তোমার প্রেমে যদি পড়িতাম তাহা হইলে তোমার নাস্তিক্য-বাদকেও মানিয়া লইতাম। আমার কাছে যুক্তি আস্ফালন বৃথা। আমি জলের মতো। যখন যে পাত্রে থাকি সেই পাত্রের আকার ধারণ করি।' সহসা তাহার নজরে পড়িল যূপকাষ্ঠটা পোতা হইতেছে। মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ যেন বহিয়া গেল। ওই যূপকাষ্ঠমূলে সুরঙ্গমা শেষ হইয়া যাইবে? হায়, হায়, কেন সে এই সর্বনাশা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে রাজি হইয়াছিল! কেন? নিগূঢ় কারণটা হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল। সে আশা করিয়াছিল কুমার প্রতিবাদ করিবে, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কুমার কিছুতেই এ নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দিবে না। কিন্তু কুমার তো কিছু করিল না। যজ্ঞের আয়োজন তো মহাসমারোহে চলিতেছে। ওই সিংহটা যেমন কামের প্ররোচনায় বন্দী হইয়াছে সে-ও তেমনি অহঙ্কারের প্ররোচনায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের কি কোনও ভিত্তি নাই? কুমার কি সত্যই তাহাকে বলিদান দিবেন? মনে হইল পুরুষদের চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈরাগ্য সে লক্ষ্য করিয়াছে যাহা দুর্ভেদ্য, যাহা দুর্বোধ্য, যাহা রহস্যময়, আতঙ্কজনক। অন্যমনস্ক সুন্দরানন্দকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য

করিয়াছে। যেন কোন সীমাহীন সাগরে তাহার মন ছিন্ন-বন্ধন তরীর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে তাহার দেহটা, সে নাই। রাজ্য, ঐশ্বর্য, সুরঙ্গমা সকলকে পিছনে ফেলিয়া তাহার মন পাড়ি দিয়াছে অজানার উদ্দেশ্যে। আর একটা কথাও তাহার মনে হইল, পুরুষদের অহঙ্কারও কম নয়। নিজেদের কথার মর্যাদা রাখিবার জন্য তাহারা অপরের সর্বনাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। মনে পড়িল রামের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা। রাম কি সীতাকে কম ভালবাসিত? তবু বিসর্জন দিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র কি শৈব্যাকে কম ভালবাসিত? তবু তাহাকে ভিখারিণী করিতে ইতস্তত করে নাই। পুরুষরা সব পারে। শিবি নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, দধীচি অস্থিদান করিয়াছিল। পুরুষদের অসাধ্য কিছু নাই। সহসা চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া বন্দী সিংহটা গর্জন করিয়া উঠিল। পৌরুষের দম্ভ সিংহগর্জনে যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিকই বলিয়াছ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও পৌরুষ নিজের মহিমা ঘোষণা করে। জাগ্রত পৌরুষকে কোন মায়া অভিভূত করে না, কোন বন্ধনই বাঁধে না। কোনও বাধা তাহার কাছে দুস্তর নয়, কোনও বিপদ ভয়ঙ্কর নয়। যে পৌরুষ নিজেকে জানিয়াছে সে নির্ভীক, সে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে, পিছন ফিরিয়া চায় না। সুন্দরানন্দের কি এই পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছে? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে সুরঙ্গমার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথ ধরিল। সুন্দরানন্দের এই পৌরুষকেই তো সে ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ সেই পৌরুষের আর একটা রূপ দেখিয়া ভয় পাইতেছে কেন! কিন্তু ভয় তাহার করিতেছিল। প্রোথিত যূপকাষ্ঠটার দিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল। নির্বিকার, শুষ্ক প্রাণহীন কাষ্ঠ—মানুষ, মহিষ, ছাগ-শিশু তাহার কাছে সব সমান! সহসা সুরঙ্গমা চমকাইয়া উঠিল। শাখা-পত্রের মধ্যে কথা কহিতেছে কে! উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

"বাণী, বৃহদারণ্যক বলে একটা উপনিষদ আছে জান?"

"জানি। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশই বৃহদারণ্যক, কেন—"

"তাতে একটা মজার কথা আছে। কোন এক ঋষি তাতে আমাকে ক্ষুধা বলে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন ক্ষুধা মানে মৃত্যু—এই মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ আমি। তাই বোধহয় এত ক্ষিদে পাচ্ছে আজ। ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মির্মিরের সমস্ত ফলগুলো নিঃশেষ করেছি, তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে ফেলি। সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাক, নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হবে তারপর। চুপ করে আছ যে—।"

"তাই করুন।"

"চার্বাক আর শিখর সেনের ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। করতেই হবে একটা কিছু। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে মনে, মৃত্যুরূপী ক্ষুধা অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরাতনকে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে।"

"এবার স্বৈরচর সৃষ্টিতে মন দেবেন?"

"কি করব জানি না। উপাদান আর ইচ্ছা দুইই আমার মনের ভিতর আছে : দুটোর সমন্বয়ে কি যে গড়ে উঠবে তা আমিও জানি না। বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথমে ছিলাম ক্ষুধা, তারপর হলাম জল, তারপর পৃথিবী, তারপর সূর্যনক্ষত্র, তারপর কাল। আমার প্রেরণা যে কি রূপ নেবে তা আমিও জানি না। এখন এই গল্প দুটো শেষ করা যাক। এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু বাণী, কি খাই বল তো। পক্ষীরূপ তো বড় সাংঘাতিক রূপ, সর্বদাই মনে হচ্ছে কি খাই কি খাই।"

"বনে অনেক ফল আছে, চলুন খুঁজে দেখা যাক।"

"তাই চল।"

সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে দেখিল বৃক্ষ শিখর হইতে দুইটি অপরূপ শুকপক্ষী উড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে সে তাহাদের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল অতি শৈশবে মাতামহীর নিকট সে এক রূপকথা শুনিয়াছিল, সে রূপকথায় এক পক্ষীদম্পতী মনুষ্য-ভাষায় কথা কহিত। ইহারাই কি তাহারা? কি বলিল কিছু বোঝা গেল না তো! বৃহদারণ্যক কি? বাণীই বা কে। একটি কথা কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সেই কথাটাই তাহার কানে বাজিতে লাগিল—এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই।" কোন মেয়েটার কথা বলিল উহারা! তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল কি? সিংহটা আবার গর্জন করিয়া উঠিল সহসা। সুরঙ্গমা চাহিয়া দেখিল সিংহটা ঊর্ধ্বমুখে তাহাকেই দেখিতেছে। মনে হইল সে-ও যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে বসিয়া পড়িল এবং সামনের থাবায় মুখটা রাখিয়া ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ—অমন নাগালের বাহিরে বসিয়া আছ কেন। আর একটু নামিয়া এস না। সুরঙ্গমা মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার আমন্ত্রণের উত্তর দিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। খাঁচার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সিংহটাও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উন্মুখ আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, আর গর্জন করিল না, কেবল তাহার কণ্ঠ-স্বর হইতে সম্ভবত তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা গর-গর-গর-গর শব্দ

বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মাংস খাবার ইচ্ছে না কি? আমি কি ভেড়া হরিণের মতো সাধারণ পশু? কাল রাত্রে তো গান শুনেছ। আজ নাচ দেখবে? দেখ—" সুরঙ্গমা সিংহের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার কেশ আলুলায়িত হইল, বেশবাস বিস্রস্ত হইল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে নাচিয়া চলিল। উন্মাদিনীর মতো নাচিতে লাগিল।

সহসা তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল শুধু সিংহ নয়, স্বয়ং কুমারও একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিতেছেন। কুমারকে দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল এতক্ষণ সে যাহা ভাবিতেছিল তাহা ভুল, কুমারের চোখের দৃষ্টি হইতে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে ঔদাসীন্যের কোনও চিহ্ন নাই—তাহা অনুরাগপূর্ণ। কুমার আগাইয়া আসিলেন।

"সুরঙ্গমা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি চারিদিকে।"

"ভয় হয়েছিল না কি যে আমি পালিয়ে যাব? আমি ছাগল বা ভেড়ার মতো সাধারণ পশু নই কুমার, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি পালিয়েও যাব না, আপনার সুখের জন্যে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও ইতস্তত করব না।"

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার পুষ্পিত দেহ-লতার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগলে কৌতুকদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম চারিদিকে। মরবার আগে পৃথিবীটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম একবার।"

"সিংহটার সামনে নাচছিলে দেখলাম।"

"ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে চাইছে। কিন্তু আমার দেহটা তো দেবতার উদ্দেশ্যে আগেই নিবেদন করেছি, তাই ওকে নাচই দেখাচ্ছিলাম শুধু। গানও শুনিয়েছি কাল রাত্রে।"

সুন্দরানন্দের চোখের দৃষ্টি আরও কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"একটা হিংস্র পশুর প্রতি এ পক্ষপাত কেন বুঝতে পারছি না ঠিক।"

মুচকি হাসিয়া সুরঙ্গমা বলিল—"সম্ভবত ও নিছক পশু বলেই। চলুন, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক এবার। যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে?"

"কাল।"

"আজ কি আমাকে উপবাস করে থাকতে হবে?"

"আমি ঠিক জানি না। মহর্ষি পর্বত কিন্তু তোমাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে চাইছেন না।"

"কেন ?"

"তিনি বলছেন নারী-পশু যজ্ঞে বলিদান দেওয়ার রীতি নেই। তিনি বলছেন নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে।"

"নিষ্ক্রয় ব্যাপারটা কি ?"

"তোমার বদলে আর একটি মানুষ বলি দিতে। মহর্ষি বলছেন যথোচিত মূল্য দিলে মানুষ পাওয়া যাবে।"

"আপনি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছেন ?"

"এখনও হইনি। কাউকে টাকার জোরে বশীভূত করে তারপর তাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলে বলেই এ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। তোমারি অনুরোধে করেছিলাম। মির্মিরের কথার উত্তরে তুমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলে—যজ্ঞের আয়োজন করুন আমিই তাতে আত্মাহুতি দেব ! জানিনা এ কথা কেন বলেছিলে তুমি।"

"কেন বলেছিলাম তা যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বুঝিয়ে বলবার দরকারও নেই। ঠিক বোঝানও যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি আত্মাহুতি দিতে এখনও আমি রাজি আছি, আমার মত এতটুকু বদলায়নি। তবে মহর্ষি পর্বত যদি আমাকে অমনোনীত করেন সে আলাদা কথা।"

"তুমি যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চাইছ কেন ?"

"আপনাকে ভালবাসি বলে। ওই ম্লেচ্ছ মির্মির যে তার তানেকে বিসর্জন দিতে পেরেছে বলে আপনার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাঁকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমিও তাঁর তানের চেয়ে কিছু কম নই। আর আপনিও তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নন।"

"কিন্তু আমি ভাবছি—।"

কুমার সুন্দরানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেলেন।

"কি ভাবছেন ?"

সুরঙ্গমা সোৎসুকে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভাবছি মির্মিরের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তোমাকে চিরকালের মতো হারানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?"

"ম্লেচ্ছ মির্মির কিন্তু তানেকে হারিয়েই চিরকালের মতো পেয়েছে আপনিও হয়তো পাবেন আমাকে, সেই ভরসাতেই যজ্ঞের আয়োজন করেননি কি ?"

"না। আমি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম আমার দেশের মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু এখন ভাবছি ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিছুক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।"

সুরঙ্গমার কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরানন্দ বলিতে লাগিলেন—"তাছাড়া, স্পর্ধা করে কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। তার বৈশিষ্ট্য বিনয়ে, নীরব সাধনায়, নম্রতায়। তোমাকে যজ্ঞে যদি আহুতি দিতেই হয় তা তোমার এবং আমার প্রয়োজনের জন্যে দেব। তার সঙ্গে মির্মিরের সম্পর্ক কি। তুমি ভেবে বল তোমার অভিপ্রায় কি। তুমি যা বলবে তাই হবে।"

সুরঙ্গমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি যদি এখন আত্মাহুতি দিতে রাজি না হই, আপনি কি যজ্ঞ বন্ধ করে দেবেন? এত আয়োজন করেছেন।"

"যজ্ঞ বন্ধ করব না। মহর্ষি পর্বত যা ব্যবস্থা করবেন তাই করব। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, তাঁর আদেশই পালন করতে হবে। শুধু একটি অনুরোধ তাঁকে করব টাকা দিয়ে কিনে এনে তিনি জোর করে কাউকে যেন বধ না করেন।"

"কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ কি প্রাণ দিতে রাজি হবে! কোনও উপায়ে তাকে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই।"

"তুমি তো স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি হয়েছিলে।"

"আমি তো অনেক আগেই আপনার বশীভূত হয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখন আমি আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।"

"না আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, চল, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।"

সিংহটা আর একবার গর্জন করিয়া উঠিল।

"ও বেচারীর আর একটু নাচ দেখবার ইচ্ছে আছে। আপনি ওই পাথরটার উপর বসুন না, ওকে আর একটু নাচ দেখাই।"

সুন্দরানন্দ সহসা সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তাহার পর প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়া বসিয়া বলিলেন, "নাচবার আগে মাথায় কিছু ফুল পরে নাও। ওই যে লতায় থোকো থোকো ফুল ফুটে রয়েছে, দাঁড়াও পেড়ে দিই আমি।"

নিকটেই একটা বন্যলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছিল, সুন্দরানন্দ উঠিয়া গিয়া কিছু ফুল পাড়িয়া আনিলেন এবং সুরঙ্গমাকে সাজাইতে লাগিলেন। ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া সুরঙ্গমা নাচিতে লাগিল। মনে হইল কোনও অপ্সরী বুঝি নাচিতেছে।

॥ ২৪ ॥

রাত্রির ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহটা সহসা গর্জন করিয়া উঠিল। যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব অন্ধকারকে শব্দ-খচিত করিয়া একটা অদৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল প্রচণ্ড গর্জনে তাহা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন। সেই নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, পাখা ঝটপট করিয়া এক্দল বাদুড় উড়িয়া গেল। একটি বৃক্ষতলে চার্বাক নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল। অরণ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত দিন যে দুরূহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে তাহার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামিয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল সে। সিংহের প্রচণ্ড-গর্জনে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কি আকাশ-লোকে বসিয়া আছে? চতুর্দিকে এত নক্ষত্র কেন! শব্দটা কি বজ্রের? কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তাহার এ ভ্রম ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিল জোনাকীপরিবৃত হইয়া সে বসিয়া আছে, গর্জনটা সিংহের, বজ্রের নয়। সুরঙ্গমা কখন আসিবে? আসিবে কিনা? সিংহটা সহসা গর্জন করিয়া উঠিল কেন? কাছাকাছি কেহ আসিয়াছে কি? গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করা সমীচীন হইবে কিনা, এই ধরনের চিন্তা তাহার মনে পর পর জাগিতে লাগিল। কিন্তু একটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, চার্বাক গাছের তলায় ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ভাবিল সুরঙ্গমা যদি সত্যই আসে, কোন না কোন সঙ্কেত দ্বারা সে নিশ্চয়ই আপনার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু চার্বাক বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্তী একটা ঝোপের ভিতর হইতে কোঁক্ কোঁক্ শব্দ হইতে লাগিল। চার্বাকের মনে হইল সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বিষধর সর্পের এত নিকটে বসিয়া থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। গাছের নীচে অন্ধকার সূচীভেদ্য ছিল, বাহিরে আসিয়া চার্বাক অনুভব করিল—আকাশের অগণিত নক্ষত্র অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিয়াছে। স্বল্পালোকিত অন্ধকারে সিংহের

খাঁচাটা দেখা যাইতেছে। জমাট অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চার্বাকের ব্যক্তিত্বও যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল বটে, কিন্তু অতঃপর কি করা কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্বস্তিও ভোগ করিতে লাগিল। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে সে? অপেক্ষা করাও কঠিন। রাত্রি যত বাড়িতেছে, গভীর অরণ্য তত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। তাছাড়া অসংখ্য মশা। কোথাও সুস্থির হইয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার উপায় নাই। এত কষ্ট সত্ত্বেও কিন্তু চার্বাক অবিচলিত ছিল। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা তাহার একবারও হয় নাই। বরং কষ্ট যতই বাড়িতেছিল ততই তাহার সমস্ত হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিবার আগ্রহ তো তাহার ছিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল এই বেদ-পন্থী ভণ্ডদের যজ্ঞটা পণ্ড করিয়া দিবার। সুরঙ্গমাকে সে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া আগ্রহটা হয়তো তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল কিন্তু সুরঙ্গমা না হইয়া অন্য কোন নর বা নারী যদি যজ্ঞীয় পশুরূপে মনোনীত হইত তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যও চার্বাক অনুরূপ কষ্ট-স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। শুধু প্রেমের জন্য নহে, একটা বিশেষ আদর্শের জন্য কষ্ট সহ্য করিতেছিল বলিয়া চার্বাকের আনন্দও হইতেছিল। সিংহটা পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল। চার্বাক পুনরায় ঘনতর অন্ধকারে আত্মগোপন করিবার জন্য গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় গাছের উপর হইতে সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"মহর্ষি, আপনি এসেছেন নাকি। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কোথায় তুমি?"

"গাছের উপর।"

"নেমে এস।"

সিংহ পুনরায় গর্জন করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"অনেকক্ষণ।"

"আমিও অনেকক্ষণ এসেছি।"

"সিংহটা কি তোমাকে দেখেই গর্জন করছে?"

"হ্যাঁ। ও, আমার নাচ দেখতে চায়। চলুন, এখান থেকে সরে যাওয়া যাক।"

"কোথায় যাওয়া যায় বলতো। এই জঙ্গলে তো সুস্থির হ'য়ে কোথাও বসবার বা দাঁড়াবার উপায় নেই।"

"আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে এক জায়গায় নিতে যেতে পারি আপনাকে।"

"আমার সাহসের অভাব নেই। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারি।"

"মৃত্যুর মুখেই যেতে হবে, যদি যান।"

"কোথা যেতে হবে বল।"

"যজ্ঞের জন্য অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে অনেক ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সব ঘরগুলো কাজে লাগেনি। পশ্চিমদিকে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়ার বিপদ আছে, যদি কেউ এসে আপনাকে হঠাৎ চিনে ফেলে তাহলে আপনাকে বন্দী করবে। আপনার অপরাধ প্রমাণ করা শক্ত হবে না, ধারামতী মহর্ষি পর্বতের সঙ্গেই এসেছে এ কথাতো আগেই জানিয়েছি আপনাকে।"

"তার চেয়ে চল না এখনই এ অরণ্য ত্যাগ করি। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে, রাত্রির অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।"

"মাপ করবেন মহর্ষি, তা আমি পারব না। আমি সামান্যা নর্তকী হতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ আমি করব না। কুমারকে না জানিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পালাতে পারব না। তবে আপনার বক্তব্য আমি শুনব।"

"কিন্তু তা শুনে লাভ কি—যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে বসে থাক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এইটেই হল আমার বক্তব্যের মূল কথা।"

"আপনার বক্তব্য শুনে যদি মনে হয় যে আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু কুমারকে বলে যাব। লুকিয়ে পালিয়ে যাব না।"

"কিন্তু কুমার কি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবেন?"

"তিনি তো চিরকালের মতোই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এ যজ্ঞে তো আমাকেই বলিদান দেওয়া হবে। কুমার তো আপত্তি করেননি। আমি যদি চলে যেতে চাই, তাহলেও আপত্তি করবেন না।"

"তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কি তোমাকে বলিদান দেওয়া হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার এরকম ইচ্ছে করার মানে?"

"মানে একটা আছে বই কি। সব কথা শুনতে যদি চান তাহলে চলুন পশ্চিম

দিকের একটা খালি ঘরে গিয়েই ঢোকা যাক। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।"

"চল।"

অরণ্যের অন্ধকারে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিংহটা পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল।

বিচিত্র-পক্ষ শুকপক্ষীদ্বয় সেই অরণ্য মধ্যে বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় পাশাপাশি বসিয়াছিল।

প্রথম শুকপক্ষী দ্বিতীয় শুকপক্ষীকে বলিল, "মানুষের ভাষায় এখন কথা কইব না। এ গাছে অনেক পাখী আছে, তারা ভয় পাবে। তুমি শুকের ভাষায় উত্তর দিও। আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে খুব। সরলভাবে উত্তর দিও। তোমার কি আনন্দ হচ্ছে ?"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"হচ্ছে। আপনার আনন্দ হলে আমার হবে না ?"

"আমার আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি সেটা ?"

"পারছি বই কি।"

"সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি চিরকাল, কত কোটি কল্পনা এল আর গেল, এ আনন্দের আর শেষ নাই। সৃষ্টির আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। জানি না পালন করে বিষ্ণু এ আনন্দ পাচ্ছে কি না। পাচ্ছে নিশ্চয়। ধ্বংস করে মহেশও কি আনন্দ পাচ্ছে ?"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর কি আলাদা ?"

"আলাদা নয়, কিন্তু আলাদা করে ভাবতে ভাল লাগছে! যে-আমি সৃষ্টি করছি, সেই-আমি আবার অন্যরূপে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছি, একথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ওই চার্বাক-সুরঙ্গমা শিখর-অবন্ধনা কেউ থাকবে না জানি, কিন্তু আমি নিজেই ওদের ছবি এঁকে আবার নিজেই ছবি মুছে ফেলছি—ভাবতে কি রকম লাগছে। নিজেকে এতটা ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না বাণী।"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"তা না দিতে পারি। কিন্তু আসলে আপনি একটি খামখেয়ালী শিশু।"

"সত্যি ?"

কথাটা বলিয়া প্রথম শুক শুকপক্ষীদের ধরণে থুক্ থুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

॥ ২৫ ॥

কবি তন্ময় হইয়া শিখরের গল্প লিখিতেছিলেন।

"সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। যে আলেয়াকে আমি স্বর্গের দেবী ভেবেছিলাম, যাকে কল্পনা-কাননের অপ্সরীরূপে চিত্রিত করেছিলাম মানসপটে, সেই আলেয়াই আমার সমস্ত স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে সেদিন। একটা তাজমহল যেন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল, রূপান্তরিত হয়ে গেল ইট-চুন-সুরকির স্তূপে। ঘটনাটা ঘটল যখন, তখন আমি বিচলিত হইনি, এমন কি বিস্মিতও হইনি। আমার মনের মধ্যে যে নির্বিকার দ্রষ্টা আছেন তিনিই বোধহয় দেখছিলেন তাকে তখন, নিতান্ত প্রকাশিত ঘটনারূপেই দেখছিলেন। মনের মধ্যে এই দ্রষ্টার অস্তিত্ব সব সময়ে টের পাই না আমরা, জীবনে বৃহৎ বিপর্যয় যখন আসে তখনই আত্মপ্রকাশ করেন তিনি, সত্তার যে অংশটা সুখদুঃখে বিচলিত হয় সেটাকে আড়াল করে ফেলেন কিছুক্ষণের জন্য। সার্জনরা বড় বড় অপারেশন করবার সময় ক্লোরোফর্ম দেয় যেমন, অনেকটা তেমনি। ক্লোরোফর্ম কিন্তু চৈতন্যকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে না, নির্বিকারও বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারি না। পরে আমি বিচলিতও হয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম, আলেয়ার সান্নিধ্য লাভ করবার একটা পথ পেয়ে পুলকিতও কম হইনি। কিন্তু স্বর্গের দেবী মানবীতে রূপান্তরিত হওয়াতে এখন কেমন যেন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি; মনে হচ্ছে আমি নিজেই যেন কোন স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছি, নাগালের বাইরে দূরবীণের ভিতর দিয়ে যে আলেয়াকে দেখতাম সে আলেয়া যেন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, আর তাকে পাব না।

শিখরের ডায়েরিতে শিখরের জীবনের যে মর্মান্তিক পরিণতি দেখছি আমার জীবনেও তেমনি কিছু ঘটবে না কি! আশা এবং আশঙ্কার দোলায় দুলছে মনটা। লোভ হচ্ছে, ভয়ও হচ্ছে। শিখর অবন্ধনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে যেমন কাছে পেয়ে গিয়েছিল, আলেয়াকে আমিও তেমনি পেয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আলেয়া যে আমার কপাটে করাঘাত করে আমার ঘরে এসে হাজির হবে একথা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু হাজির হল যখন—তখন আমি বিস্মিত হইনি, আমার সপ্রতিভতা আলেয়াকে বিস্মিত করেছিল কি না কে জানে। কপাট খুলেই যখন দেখলাম আলেয়া দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সাজসজ্জা করে তখন খুব সপ্রতিভভাবেই আমি বলেছিলাম—"ও, তুমি। তারপর, কি খবর?"

এমনভাবে বললাম যেন আমার ঘরে তার আগমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার একটা। আলেয়া হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

"আমার ভয় হচ্ছিল আপনি হয়তো আমাকে চিনতেই পারবেন না।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে মৃদু হেসে বললাম—"না, তোমাকে ভুলিনি। কোনও দরকারে এসেছ না কি? না, এমনি দেখা করতে। বস।"

আমার ইজিচেয়ারটায় বসল আলেয়া, যে ইজিচেয়ারে বসে জানালার ফাঁক দিয়ে দূরবীণ-সহযোগে রোজ আমি তাকে দেখতাম, সেই ইজিচেয়ারটাতেই বসল সে। মনে হল অসম্ভব সম্ভব হল, দূর নিকটে এল, অসীমা ধরা দিতে বুঝি সীমার মধ্যে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটা ভাঙল।

আলেয়া বললে—"আপনি যে এত কাছে আছেন তা জানতাম না। জানলে আগেই আসতাম আপনার কাছে। কাল হঠাৎ দেখতে পেলাম আপনি ফুটপাথ থেকে এই বাড়িটাতে ঢুকছেন। খবর নিয়ে জানলাম এই বোর্ডিংএ-ই আছেন আপনি অনেক দিন থেকে।"

"দরকার আছে কোন?"

"আছে বই কি। প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করছি কিছু মনে করবেন না—আপনি কি লাইফ ইনশিওরেন্স করিয়েছেন?"

"না।"

"তাহলে আমার কোম্পানিতে কিছু করুন। অন্তত দশ-হাজার।"

এইবার আমি একটু অবাক হলাম।

"তোমার কোম্পানিতে, মানে?"

"আমি আজকাল ইনশিওরেন্সের দালালী করছি যে।"

বলেই চক্ষু আনত করে শাড়ীর একটা খুঁট পাকাতে লাগল, তারপর আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি হাসলে একটি।

"নিরুপমবাবু কোথা?"

"তিনি এলাহাবাদেই আছেন।"

আলেয়ার মুখভাব কঠিন হয়ে গেল সহসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। আলেয়া তাড়াতাড়ি জানালার কাছে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে,—"আসছি এখুনি। এক মিনিট—" তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "ফর্ম নিয়ে আসব ওবেলা? শুধু নিজে ইনশিওর করলেই হবে না, আমাকে সাহায্যও করতে হবে একটু! আপনার তো অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা।"

কণ্ঠস্বরে আবদারের সুর বাজল একটু। চোখের দৃষ্টিতে চকমক করে উঠল বিদ্যুৎ—যদিও মিনতির বিদ্যুৎ, নিঃশব্দে বজ্রপাতও হল যেন একটা।

"বললাম, আচ্ছা।"

'চলি তাহলে।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম।

দেখলাম বোর্ডিংএর সামনে বেশ দামী বড় মোটর দাঁড়িয়ে আছে একখানা। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন তাতে বলিষ্ঠ একটি ভদ্রলোক। মোটর চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল না। আশ্চর্য!

এ ঘটনার পর দূরবীণের প্রয়োজনটা আরও বেড়ে গেল। কাজ থেকে ফিরে এসে সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি জানালার ফোকরে চোখ লাগিয়ে বসে থাকতাম। আলেয়াকে দেখবার জন্যে নয়; তার সঙ্গীটিকে দেখবার জন্যে। এই সময় শিখর সেনকেও লক্ষ্য করেছিলাম তার অজ্ঞাতসারে। লক্ষ্য করে যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না বোধহয়। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারিনি। যা দেখেছিলাম তা শিখরকেই বলেছিলাম একদিন রহস্যভরে। সে রহস্যের এ পরিণাম যে হবে তা কে জানত!

শিখর সেনের ডায়েরি থেকে এবার উদ্ধৃত করছি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে তাহলে।

"নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনার সম্বন্ধে যে সব ভয়ানক খবর সংগ্রহ করেছি, সে সবের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আর কারো সম্বন্ধে যদি এ খবর পেতাম তাহলে সে এতক্ষণ জেলের বাইরে থাকত না, নিশ্চয়ই থাকত না। অবন্ধনা কিন্তু আছে। পুলিশ অফিসার হিসাবে নির্মম হয়ে আমি এতদিন কর্তব্য পালন করে এসেছি, আইনের সীমাকে এতটুকু লঙ্ঘন করিনি, ভিক্টর হুগো'র অমর চরিত্র জ্যাভার্টাই এতদিন আমার আদর্শ ছিল, কিন্তু এখন আমি সে আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছি। অবন্ধনাকে আইন-সিংহের কবলে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছি। গীতা পড়েছি। একবার নয় অনেকবার। শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বলেছিলেন, "নির্বিকার অবিচলিত থেকে তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, তুমি ভাবছ আত্মীয়স্বজনকে বধ করব কি করে? ওটা তোমার অহঙ্কার। তুমি কাউকে বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। এই দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা আগে থাকতেই ম'রে আছেন…।" এসব শ্লোক কণ্ঠস্থ আছে আমার। কিন্তু কার্যকালে কেমন যেন

মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অবন্ধনা পাপীয়সী, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার ফাঁসি হবে। আমার বিবেকের একটা অংশ বলছে তার ফাঁসি হওয়াই উচিত, কিন্তু আর একটা অংশ বলছে যে সমাজ তাকে পাপীয়সী করে তুলেছে সেই সমাজেরই ফাঁসি হওয়া উচিত, ওর কোন দোষ নেই, সমাজের বিধি-ব্যবস্থার দোষেই ওই অম্লান কুসুমের গায়ে ধূলো-কাদা লেগেছে। ধূলো-কাদা পরিষ্কার করে দিলেই আবার ও অম্লান হবে। তাই কর। এই দ্বিধাবিভক্ত বিবেক নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। কি করি? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলাম তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করব, যদিও বিবেকের জ্যাভার্ট-ভক্ত অংশটি বারবার বলতে লাগল, অন্যায় করছ।

…বোর্ডিংয়ের বাৎসরিক সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। চুনকাম হয়ে গেছে, রং লাগানো হচ্ছে দরজা-জানালায়। এসব না করলেও নয়, অথচ কি বিরক্তিকর।

অবন্ধনার কাছে সেদিন সন্ধ্যার পর যখন গেলাম, দেখলাম সে বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কইছে।

'আমার ঘরে কাল হাত দেবেন বলছেন? বেশ, আমি জিনিস-পত্তর সরিয়ে রাখব। আর একটা কাজও কিন্তু করতে হবে।"

"কি বলুন।"

"দেখছেন না, ঘরে ঢোকবার দরজাটার সামনে কি হয়ে আছে! মেঝেটা ফেটে সুরকি বেরিয়ে পড়েছে একেবারে। ওটা ঠিক করিয়ে দিন।"

"দেব। ভাল করে সিমেণ্ট করিয়ে দেব।"

ম্যানেজার আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চলে গেলেন। অবন্ধনার সম্বন্ধে ম্যানেজারের হৃদয়েও একটু 'কোমল কোণ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'সফ্‌ট্‌ কর্ণার', আছে বলে সন্দেহ হল। ম্যানেজার চলে যাবার পর অবন্ধনার চেহারা বদলে গেল যেন। নূতন লোক হয়ে গেল সে। হেসে বললে, "তোমার উপর রাগ করেছি।"

"কেন?"

"কাল পরশু দু'দিন আসনি কেন?"

"কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

"রাত্রেও ফেরনি?"

"ফিরেছিলাম অনেক রাত্রে। তখন আর তোমার ঘরে আসাটা উচিত মনে হল না। ঘুমিয়েও পড়েছিলে হয়তো।"

আমার দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে অবন্ধনা বললে—"তোমার উচিত-অনুচিত বোধটা এখনও বেশ টনটনে আছে দেখছি। আশ্চর্য মানুষ তুমি।"

সিগারেট কেস থেকে বার করে একটি সিগারেট বেশ নিপুণভাবে ধরালে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বললে—"আমাকে খুব ঘেন্না কর, নয় ?"

তার চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল একটা। মনে হল সত্য উত্তরটা শোনবার জন্য সে কৌতূহলী, অথচ তার সঙ্গে স্পর্ধার ভাবও রয়েছে একটা—"তুমি ঘেন্না করলে বয়েই গেল আমার।"—এই গোছের একটা ভাব।

বললাম, "ঘেন্না করলে তোমার কাছে আসতাম না।"

"আস ভদ্রতার খাতিরে। ছেলে-বেলার কথা মনে করে। তাছাড়া আমি সত্যিই তো তোমার শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্তও নই।"

তারপর হঠাৎ হেসে বললে—"বুঝি গো বুঝি, সব বুঝতে পারি আমি। আমাকে যতটা বোকা তুমি মনে কর, ততটা বোকা আমি নই।"

তার হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম একটু। মনের অবচেতনলোকে হয়তো ভাবছিলাম—ওই কালোবাজারীটা একে ইন্ধন করে কত লোকের কত কামনার আগুনই না জানি জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে !

বললাম, "বোকা তুমি মোটেই নও, বরং একটু বেশী চালাক, আর সেই জন্যেই বোধহয় মাত্রা ঠিক রাখতে পারছ না। অতি-বুদ্ধিটা বিপজ্জনক।"

"মানে !"

তার মুখের হাসি নিবে গেল হঠাৎ।

খানিকক্ষণ আমাদের দু'জনের কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না। আমার মনে হল এইবার কথাটা পাড়াই ভাল। বললাম—"তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনছি।"

"কি শুনছ ?"

বললাম সব। শুনে আবার সে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ক্রমশ তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আগুন। কিন্তু সে কোনও উত্তর দিলে না। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শেলফ্ থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে তার বিছানার শিয়রের দিকে যে টেবিলটা ছিল তারই উপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বইগুলোর পিছন দিকে সায়ানাইডের যে শিশিটা লুকানো ছিল সেটাও বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে একটা বইয়ের আড়ালে রেখে দিলে সেটা। তারপর চাকরটা ঢুকল একগ্লাস জল হাতে করে।

"কোথা রাখব মা এটা—ওখানে বই রাখলেন যে।"

"এরই একপাশে রেখে দে।"

চাকরটা জলের গ্লাস টেবিলে রেখে একটি বই দিয়ে জল ঢাকা দিয়ে চলে গেল। অবন্ধনা রোজ রাত্রে উঠে জল খায়। টেবিলের উপর প্রত্যহ একগ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে। আমি হাত-ঘড়িটা দেখলাম। প্রায় দশটা বাজে। অবন্ধনার দিকে চাইলাম, দেখলাম সে একটা বই খুলে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি বইগুলো শেলফ্ থেকে নামিয়েছে। এগুলো না নামালেও চলত, নিজের নামাবারও দরকার ছিল না চাকর যখন রয়েছে।

বললাম—"আমার কথার কোন উত্তর দিলে না তো। তোমার সম্বন্ধে যা যা শুনেছি, তা কি সত্যি ?"

বইয়ের পাতা ওলটালে খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললে—"সত্যি।"

"সত্যি হলে তো ভয়ানক কথা! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। এ রকম করার মানে ?"

"না করে উপায় নেই।"

"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর পরিণতি এর তা জান ?"

"জানি।"

"সব জেনেও এরকম করা কি উচিত ?"

অবন্ধনার মুখে একটা হাসি ফুটল। অদ্ভুত হাসি।

"একটা বলকে ঢালুর মুখে গড়িয়ে দিয়ে তারপর সেটাকে থামতে বললে যে রকম শোনায়, তোমার উপদেশটাও সেইরকম শোনাচ্ছে!"

উপমাটা ভাল লাগল।

বললাম, "বল হয়তো থামতে পারে না, কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে পারে। বলকে কেউ যদি থামিয়ে দেয় তাহলে বলও আর গড়াতে পারে না।"

"আমাকে থামিয়ে দেবে এমন কেউ নেই, এক মৃত্যু ছাড়া।"

বইটা মুড়ে রেখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বললাম—"আমি আছি। আমি তোমাকে থামিয়ে দিতে পারি, থামিয়ে দিতে চাই।"

"কি করে ?"

"বিয়ে করে।"

"বলেছি তো, তা আর হয় না!"

দুজনেই চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর সে হেসে বললে—"আমার বিষয়ে এত সব শোনবার পরও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তোমার?"

"হয় বই কি। আমার সোনার হাত-ঘড়িটা হঠাৎ সেদিন নালীতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করছি। এই দেখ, একটুও কাদা লেগে নেই আর।"

"আমি হাত-ঘড়ি নই, মানুষ। আমাকে অত সহজে পরিষ্কার করা যাবে না।"

"নিশ্চয় যাবে। হাত-ঘড়িকে জল দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তোমাকে পরিষ্কার করব ভালবাসা দিয়ে।"

"আমাকে এখনও ভালবাস তুমি? আশ্চর্য!"

"রাজি হও তুমি অবু। চল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি।"

"না, সে হয় না।"

"কেন হয় না?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল সে আমার দিকে।

"আমি যতই খারাপ হই, আমি হিন্দুর মেয়ে, উচ্ছিষ্ট জিনিস দিয়ে দেবতার ভোগ সাজাতে পারি না।"

"কি যে পাগলের মতো বকছ তুমি। মানুষ দেবতাও হ'তে পারে না, উচ্ছিষ্টও হ'তে পারে না।"

"পারে।"

"কি করে বুঝলে সেটা?"

"স্বচক্ষে দেখছি।"

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পেয়ে দুজনেই ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম ম্যানেজার এসেছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

"মিস্ মুখার্জি, কাল রাজমিস্ত্রি লাগাতে পারব না। কাল তাদের কি পরব আছে, আসতে রাজী হচ্ছে না। পরশুদিন আসবে। কাল চুনকামটা হয়ে যাক।"

"বেশ।"

ম্যানেজার চলে গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম, সুরটা কেমন যেন কেটে গেল।

'চলি তবে আজ। পাগলামি কোরো না, যা বলছি শোন সেটা। তোমার ভালর জন্যেই বলছি।"

"আমার ভাল করবার ক্ষমতা তোমারই ছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সে ক্ষমতা তুমি ব্যবহার করনি। গোড়া কেটে গেছে, এখন আগায় জল ঢেলে কোন লাভ নেই। যাও শোওগে যাও, অনেক রাত হল। আমাকে এখুনি একটা 'কলে' বেরুতে হবে হয়তো।"

"কি 'কল' ?"

"একটা লেবার কেস।"

কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। বারান্দাতেই দেখা হল সেই কালোবাজারীটার সঙ্গে। হাতে ফুলের তোড়া, বগলে হুইস্কির বোতল। নিঃশব্দে নেমে গেলাম। একবার মনে হ'ল লোকটাকে আজই হাজতে পুরে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হয়নি, সুতরাং এ ইচ্ছাকে দমন করতে হল। হাজতে পুরেই বা লাভ কি? অবিলম্বে জামিনে খালাস পেয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াবে আবার, জজসাহেবরা হয়তো রায় দেবেন লোকটা নির্দোষ। আমার ঘাড়েই উলটো চাপ পড়বে শেষে!

·· একটু পরেই লক্ষ্য করলাম লোকটার সঙ্গে অবন্ধনাও নেমে গেল, নেমে গিয়ে চড়ল সেই মোটরকারটায়। আমিও আবার তাদের অনুসরণ করলাম একটা ট্যাক্সিতে।"

দেওয়ালের উপর যে দুইটি প্রজাপতি নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিল। প্রথমে একটি প্রজাপতির পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। সে কম্পন ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। মনে হইল কম্পনের ভাষায় সে যেন দ্বিতীয় প্রজাপতিটিকে কিছু বলিতেছে। কম্পনের ভাষায় দ্বিতীয় প্রজাপতিও উত্তর দিল, তাহারও পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কম্পনের ভাষাকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিলে নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়।

প্রথম প্রজাপতি বলিতেছিল, "পিতামহ, মনে হচ্ছে আপনার এই নবতম কাহিনী দুটিও আপনার প্রাচীনতম কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি হবে। মহেশ্বরকে মুখে আপনি যতই গাল দিন, মনে মনে তাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন মনে হচ্ছে।"

দ্বিতীয় প্রজাপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি করে বুঝলে।"

'আপনার সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের তো তাঁর হাতেই সমর্পণ করেছেন।"

"করছি তো। করবও চিরকাল। মহেশ্বর আর আমি আলাদা না কি। কতকগুলো কুঁদুলে বামুন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করেছে তোমাদের মনে।"

"যাই বলুন, সব নায়ক-নায়িকাদের এমনভাবে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে ভাল লাগে না।"

"কিন্তু ওইটেই তো খেলা। মৃত্যুতেই খেলার পরিণতি। পঞ্চভূতের কাছ থেকে মালমশলা ছিনিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি জীব দেহধারণ করেছে, পঞ্চভূত সেই অপহৃত জিনিসগুলি পুনরধিকার করতে চাইছে—জীবরা তা ফিরে দিতে চাইছে না। যুদ্ধের খেলা জমেছে সুতরাং। পঞ্চভূত শেষ পর্যন্ত জিতবেই, কারণ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, একটা জীব-দেহে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারে না, ওরা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবেই। জীবেদের ইচ্ছে অন্যরকম। তারা ওদের দেহ-পিঞ্জরে চিরকাল আটকে রাখতে চায়। কিন্তু তা কি পারে কখনও ?"

"আপনার কৃতিত্ব তাহলে কোথায় ?"

"এই একরঙা গল্পটাকে নানা রঙে রঞ্জিত করে নানা রসে রসিয়ে ফুটিয়ে তোলা। রাবণের মৃত্যুবাণ তার নিজের হাতে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার বুদ্ধিতে এমন একটি পাক লাগিয়ে দিলাম যে, সেই বাণটি সে একটি স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দিলে। তারপর সীতা হরণ করে বসল। ফলে হনুমান ছদ্মবেশে এল, মৃত্যুবাণটি মন্দোদরীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ল, রাবণের মৃত্যু হল। হিরণ্যকশিপুকে মহর্ষি কশ্যপের ছেলে করে সৃষ্টি করলুম। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বর দিলুম যে সে জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হবে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিনে বা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তবু তাকে মরতে হল। তাকে মারবার জন্য স্তম্ভ ভেদ করে বার করতে হল নর-সিংহকে, সে তাকে জানুর উপরে রেখে দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে নখ দিয়ে চিরে ফেললে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। মারতে হবেই। জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে ছন্দ যোজনা করাই তো কবির কাজ। এই দ্বন্দ্বের অসংখ্য রূপ, অসংখ্য সম্ভাবনা, ছন্দও নানারকম।"

"এসব কথা আমিই তো বলেছিলাম আপনাকে একদিন।"

"বলেছিলে না কি ? তা হবে। তোমার কথা আমি চুরি করছি, আবার আমার কথা তুমি প্রকাশ করছ। এই চলছে চিরকাল। চলবেও, সূর্যের আলো পড়বে কুঁড়ির ওপর, ফুল ফুটবে, পড়বে চাঁদের উপর, জ্যোৎস্না হাসবে, পড়বে মরুভূমির উপর, মরীচিকা জাগবে। এই হচ্ছে—"

"চলুন, এই কবিতার ভাবে তন্ময় হয়ে ঘুরে আসি একটু।"

"চল।"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়াই রূপান্তরিত হইল খদ্যোতে। তাহার পর পেচক-দম্পতীরূপে তাহারা অন্ধকারকে মুখরিত করিয়া চলিল। তাহার পর সহসা মহাশূন্যে উড়িয়া গেল। একটু পরে দেখা গেল দুইটি উল্কা অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

॥ ২৬ ॥

সুরঙ্গমা বলিল— দেখুন, দেখুন, কি আশ্চর্য দু'টি উল্কা।"

চার্বাক আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। সত্যই উল্কা হইলে বিস্ময়কর। পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে।

বলিল—"সম্ভবত উল্কা নয়, ফানুস।"

"ফানুস ? তা হতে পারে। কিন্তু এরকম ফানুসও দেখিনি কখনও। ঠিক পাশাপাশি উড়ে চলেছে, যেন দু'টি আলোর পাখী।"

"চল, বাইরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, বিপদে পড়ে যেতে হবে।"

"চলুন। আপনার প্রাণের ভয় বড্ড বেশী দেখছি।"

"বেশী নয়, যতটুকু স্বাভাবিক, ততটুকু। তোমাদের উপনিষদের ঋষিও বলেছেন ভয়ের তাড়নাতেই সমস্ত পৃথিবী চলেছে। সূর্য তাপ দান করছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ইন্দ্র নিজ কর্তব্য করছে. এমনকি মৃত্যুও ভয়ে ধাবমান।"

"কার ভয়ে ?"

"ওঁরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, যিনি উদ্যত বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর।"

"আপনার ব্রহ্মে বিশ্বাস নেই বুঝি।"

চার্বাক হাসিয়া বলিল—"তুমি যদি ব্রহ্মের প্রকাশ হও তাহলে বিশ্বাস আছে। কিন্তু অনাদি অনন্ত অখণ্ড অজ্ঞাত অমৃত অব্রণ, অকায় এই সব বিশেষণবিশিষ্ট যে আজগুবি ধাঁধার সৃষ্টি করে ওঁরা বোকা লোকদের ভোলাচ্ছেন তাতে বিশ্বাস নেই।"

সুরঙ্গমার চোখের কোণে চাপা হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"চলুন তাহলে ঘরের ভিতরই ঢোকা যাক।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় গাদা করা রহিয়াছে। চার্বাক ইহা দেখিয়া খুশী হইল।

"চল, ওর উপর উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসা যাক।"

"আপনি বসুন।"

"তুমি ?"

"আমি দুয়ারের কাছে বসছি। যদি কেউ এদিকে আসে, আপনাকে সাবধান করতে পারব।"

"তুমি ভিতরে এসে কপাটে খিল বন্ধ করে দাও।"

"তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ধরা পড়লে দু'জনেই মারা যাব।"

"ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে কি ?"

"আছে বই কি। কুলিশপাণি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

"বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে কাছে পেলে আমার বক্তব্যের যুক্তিটা আরও জোরালো হ'ত।"

সুরঙ্গমার নয়নে আবার হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক তুলিল। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল—"যুক্তি যদি কিছু থাকে, কম জোরাল হলেও তা আমি মানব। বলুন, কি বলবেন।"

চার্বাক খড়ের গাদার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বলিল—"আমার বক্তব্য তো আগেই বলেছি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।"

"কেন ?"

"এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য।"

"মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে! মৃত্যুই তো আমাদের স্বাভাবিক পরিণাম।"

"কিন্তু অকাল মৃত্যু কি স্বাভাবিক ?"

"অকাল মৃত্যুও তো ঘটে। কত শিশু শৈশবেই মারা যায়, তা কি শোনেননি।"

"সে সব অকাল মৃত্যুও স্বাভাবিক। তা কারও ইচ্ছাকৃত নয়। তুমি যে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছ তা হত্যার নামান্তর!"

"আত্মহত্যা বলতে পারেন, কিন্তু হত্যা নয়। কেউ জোর করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মারবার চেষ্টা করেনি। আমি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

"কেন ?"

"কুমার সুন্দরানন্দের মান বাঁচাবার জন্যে।"

"তোমার মৃত্যু হলে তাঁর মান বাঁচবে কি করে ?"

সুরঙ্গমা তখন মির্মিরের কাহিনী বিবৃত করিল। করিয়া বলিল—"তানে যদি মির্মিরের পারমার্থিক আনন্দের জন্য আত্মবলিদান দিতে পারে, তাহলে কুমারের

জন্য আমিও পারি। তাছাড়া এও আমার মনে হল দেহটা যজ্ঞের আগুনে ছাই করে দিয়ে তানে যদি মির্মিরের অন্তরে চিরস্থায়িনী হয়ে থাকে, আমিই বা কুমারের অন্তরে হব না কেন? আমিই কুমারকে তাই যজ্ঞের আয়োজন করতে উৎসাহিত করেছি। কুমার আমাকে জোর করে বধ করছেন—আপনার এ ধারণাটা ভুল।"

চার্বাক চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার যুক্তি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, ভাবিয়া পাইল না কি উপায়ে সে এই স্বেচ্ছাচারিণীর গতি-রোধ অথবা মতি-পরিবর্তন করিবে। তাহার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত শক্তি কিন্তু একাগ্র হইয়া উঠিল, যেমন করিয়া হোক ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। শেষে শিশু যে সুরে আব্‌দার করে সেই সুরে সে সুরঙ্গমাকে বলিল—"আমার ধারণা হয়তো ভুল। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তুমি আর থাকবে না, তোমাকে আর কখনও দেখতে পাব না—এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।"

সুরঙ্গমা হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনার ব্যক্তিগত সুখের জন্যই তাহলে আমাকে বাঁচতে বলছেন, এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আপনার আর কিছু নেই?"

"আমি চাই এর চেয়ে জোরালো যুক্তি পৃথিবীতে আর আছে কি? আমাকে আর আমার চাওয়াকে কেন্দ্র করেই তো সংসার।"

সুরঙ্গমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল। তাহার পর বলিল—'মাপ করবেন মহর্ষি, যা বলছি তা হয়তো রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তা না বলেও পারছি না। হয়তো চাওয়াটাই সংসারে বড় যুক্তি, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? দাম না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি একজন সামান্যা নটী, আমাকেও কুমার অনেক দাম দিয়ে তবে পেয়েছেন! আপনি আমাকে চাইছেন, কি দাম দেবেন বলুন।"

ব্যাপারটা দর-দস্তুরের স্তরে নামিয়া আসিবে চার্বাক তাহা কল্পনা করে নাই। একটু বিব্রত হইয়া সে বলিল—"অর্থের দিক দিয়ে সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না তা আমিও জানি, তুমিও জান। তাই কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ? এটা কি তুমি জান না যে আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গানের মতো তুমিও অমূল্য? ধনীরা অর্থ ব্যয় করে আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গান উপভোগ করেন, কিন্তু দরিদ্ররা কি তা বলে বঞ্চিত হয়?"

সুরঙ্গমা পুনরায় হাসিমুখে উত্তর দিল—'আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গানের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ওরা স্বাধীন, আমি পরাধীন, সীমাবদ্ধ। বাজারের

পণ্য আমি, ক্রেতাই আমার ভাগ্য নির্ণয় করে। যে মহত্ত্বের আমি অধিকারী নই, তা আমার উপর আরোপ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না মহর্ষি।"

চার্বাক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল—"কত অর্থের বিনিময়ে তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? দেখি চেষ্টা করে সংগ্রহ করতে পারি কি না। অবন্তীনগরের রাজপুত্র আমার অনুরাগী, সে হয়তো আমায় সাহায্য করবে।"

"আমি অর্থ চাই না। কুমার আমাকে এত অর্থ, এত মণি-মুক্তা অলঙ্কারাদি দিয়েছেন যে ও সবের সম্বন্ধে আমার আর মোহ নেই। আপনার যদি প্রয়োজন থাকে আমার কাছ থেকেই নিতে পারেন কিছু। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, যদি অভয় দেন বলি।"

"বল।"

"রাগ করবেন না তো?"

"তোমার কোনও কথাতেই রাগ করব না। তোমার উপর রাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী, ঢের বেশী গুণবতী নারী অনেক আছে। যে অবন্তীনগরের আপনি নাম করলেন সেই অবন্তীনগরেই অপূর্বা নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে-ও নটী। প্রচুর অর্থ পেলে সে আপনার কাছে এসে থাকবে। কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতের প্রণয়িনী হবার আকাঙ্ক্ষা তার অনেকদিন থেকে। আমি আপনাকে অর্থ দিচ্ছি, একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। তার কাছেই যান আপনি।"

চার্বাক স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি তোমাকেই চাই।"

"আমার প্রতি এ পক্ষপাত কেন?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বদলে অন্য কারও কথা চিন্তা করতে পারি না আমি।"

ঠিক এই সময়ে দূরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুরঙ্গমা নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি ওই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। আমি উঠে গিয়ে দেখি কে আসছে।"

সুরঙ্গমাকে বেশীদূর যাইতে হইল না। একটু দূর গিয়াই সে কুলিশপাণিকে দেখিতে পাইল। কুলিশপাণিও আগাইয়া আসিয়া অভিবাদন করিল।

"আপনি এখানে! অথচ আপনার সন্ধানে আমি সমস্ত বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি।"

"কেন ?"

"কুমারের আদেশে। তিনি আপনাকে খুঁজে না পেয়ে অধীর হয়ে উঠেছেন। কোথা গিয়েছিলেন আপনি ?"

"কাছাকাছিই ছিলাম—কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।"

"দেখা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলেই তো মুশকিল।"

কুলিশপাণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

"কিসের মুশকিল।"

"আপনি অন্তর্ধান করুন এইটেই আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আপনাকে খুঁজছিলাম বটে কিন্তু এতক্ষণ আপনাকে না পেয়ে—একটুও দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ফাঁদের কবল থেকে হরিণী সত্যই বুঝি পালাল।"

এই পর্যন্ত বলিয়া কুলিশপাণি সহসা থামিয়া গেল, আড়চোখে একবার স্বরঙ্গমার দিকে চাহিয়া, পুনরায় গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করিল। স্বরঙ্গমার নয়নের মোহিনী দৃষ্টি কুলিশপাণির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আরও মোহিনী হইয়া উঠিল।

"আমি দুর্বলা নারী, আপনাদের কবল থেকে পালাবার শক্তি কি আমার আছে ? তাই আত্মসমর্পণ করেছি।"

কুলিশপাণি নির্নিমেষ নয়নে স্বরঙ্গমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনি দুর্বলা নন। আপনি শক্তির উৎস। কুমার সুন্দরানন্দের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তাই তিনি এই নৃশংস যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারি।"

"কি করে ?"

"এখনি চলুন আপনি আমার সঙ্গে। কাছেই গাছতলায় আমার ঘোড়া বাঁধা আছে। আপনাকে অবিলম্বে আমি স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারি। মহেশপুর গ্রামে আমার পরিচিত পরিবার আছে একটি, সেখানে আপাতত আপনি থাকতে পারেন। যাবেন ? আসুন তাহলে।"

স্বরঙ্গমা আনতনয়নে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"ইতস্তত করছেন কেন ? আমি আশ্বাস দিচ্ছি ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

"আমি আমার ভয়ের কথা ভাবছি না। আমি তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই

হয়ে আছি। আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনি কেন এত বড় দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন ? আপনার স্বার্থ কি !"

কুলিশপাণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বার্থ তুমি। 'আপনি' সম্বোধন করে তোমাকে আমার সম্বন্ধে আর ভুল ধারণা করবার সুযোগ দেব না। তোমাকে আমি ভালবাসি সুরঙ্গমা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকেই ভালবেসেছি। এতদিন একথা তোমাকে বলবার সাহস হয়নি, কারণ জানতাম তুমি কুমারের প্রিয়তমা। এখন সে ভুল ধারণা ভেঙেছে। এখন দেখছি সামান্য পশুর মতো কুমার তোমাকে বলিদান দিতেও ইতস্তত করছেন না। তোমাকে দূর থেকে দেখেও এতদিন যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দও আর পাব না। তাই তুমি পালিয়েছ শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। কুমারের আদেশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ঠিক করেছিলাম তোমার নাগাল পেলে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব তোমাকে।"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি কম্পিত হইতে লাগিল। নয়ন যুগলে যে কৌতুক-ছটা বিকীর্ণ হইল তাহা অপরূপ।

"আপনার অদম্য সাহস, অসীম শক্তি যে আমার মতো সামান্যা একজন নর্তকীর জন্য উদ্যত হয়েছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যাব না। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনার মতো মহানুভব বীরকে বিপন্ন করতে চাই না।"

"আমি বিপন্ন হব কেন। আমি কুমার সুন্দরানন্দ হয়তো নই, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার আছে। আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও রাজপুত্র। কুমারের অধীনে সেনানায়কত্ব করছি অভাবের তাড়নায় নয়, শিক্ষার জন্য। আমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার বানপ্রস্থে যেতে চান। কিছুদিন পরে আমাকে গিয়ে রাজ্যভার নিতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তোমার মর্যাদার কোনও হানি হবে না। আমার দেহ মন সম্পত্তি সমস্তই তোমার সুখ-সম্পাদনে সর্বদা উৎসুক থাকবে।"

"কোন দেশে আপনার বাড়ি ? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"আমি পৌণ্ড্র রাজকুমার। কুলিশপাণি আমার স্বয়ং-গৃহীত নাম। আমাদের দেশে চল, আমার পূর্ণ পরিচয় পাবে।"

"কুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কলহের সম্ভাবনা কি নেই ? আমাকে কেন্দ্র করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ বাধুক এ আমি চাই না। আমি ভাগ্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছি, যা হবার তাই হোক।"

"কলহের কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমি যে তোমাকে নিয়ে গেছি এ কথা

কুমার জানবে কি করে? কুমার জানুক তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছ। তারপর কিছুদিন কেটে গেলে তোমার সম্বন্ধে কুমারের সম্ভবত ঔৎসুক্যই আর থাকবে না। তুমি যেমন এসে নিরালার স্থান অধিকার করেছ, আর কেউ এসে তেমনি তোমার স্থান অধিকার করবে।···কুমার হৃদয়হীন। দেখছ না, তোমাকে যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করছেন? আমি তোমাকে মাথায় করে সসম্মানে রাখব। সুরঙ্গমা, তুমি চল আমার সঙ্গে।" সুরঙ্গমার নয়নের কৌতুক-ছটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"কথা বলছ না যে?"

"আমাকে ভাববার একটু সময় দিন।"

"দেবার মতো সময় তো আর নেই।

"আপনি এখন যান। আমি যদি আপনার সঙ্গে যাওয়া স্থির করি তাহলে শেষ রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে যাব। শয়নকক্ষের দ্বারটি খুলে রাখবেন।"

কুলিশপাণির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

"এখন আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে?"

"আছে। কুমারকে আমি কথা দিয়ে এসেছি না ব'লে কোথাও যাব না।"

"যিনি যজ্ঞের নামে তোমাকে পশুর মতো বধ করতে চাইছেন—।"

"ওটা ভুল ধারণা। তিনি আমাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে চান না। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন।"

"পরে শোনবার ধৈর্য্য আমার নেই। আমি তোমাকে চাই সুরঙ্গমা। আমার আশা সফল হবে কিনা তা আমি এখনই শুনতে চাই।"

"আমার দেহটা পেলেই আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তা এখুনি পেতে পারেন, সামান্যা নর্তকীর দেহটাকে অনেকেই নেড়ে চেড়ে দেখেছেন কিছুদিন, কুমারও একথা জেনেই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, এখনও যদি তিনি শোনেন যে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেনাপতি কুলিশপাণি আমার দেহটা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন তাহলে তিনি রাগ করবেন না। একটু কৌতুকবোধ করতে পারেন হয়তো। কিন্তু আপনি আমাকে যদি চান, যে আমি আমার দেহ থেকে স্বতন্ত্র, তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

কুলিশপাণি নীরবে কিছুক্ষণ গুম্ফ প্রান্ত পাকাইল।

তাহার পর বলিল—"অপেক্ষাই করব। কবে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে?"

"আজই শেষ-রাত্রে।"

"আমার শয়নকক্ষের দ্বার খুলে রাখব?"

"রাখবেন।"

কুলিশপাণি চলিয়া গেল।

সুরঙ্গমাও পুনরায় চার্বাকের ঘরে প্রবেশ করিল।

সুরঙ্গমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল চার্বাক খড়ের গাদার উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

"নেমে পড়লেন কেন?"

"তোমরা কি কথা বলছ তা শোনবার জন্যে। কুলিশপাণি এসেছিল, না?"

"হ্যাঁ। ওর প্রস্তাব শুনলেন তো?"

"শুনেছি।"

"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বক্তব্যটাও শুনব।"

চার্বাক নীরবে তবু দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোনও কথা জোগাইল না।

"আমার বক্তব্য তো তোমাকে বলেছি। আমি তোমাকে চাই।"

"আমাকে অনেকেই চেয়েছে, এখনও অনেকেই চায়। তাই আমি ঠিক করেছি—সর্বোচ্চ মূল্য যে দেবে তার কাছেই যাব আমি।"

"কুলিশপাণি তোমাকে যে মূল্য দিতে চাইছে তা কি তোমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না?"

"তার আগে একটা প্রশ্ন আপনাকে করি। আমি যদি কুলিশপাণির সঙ্গে চলে যাই তাহলে কি আপনি খুশী হবেন?"

"না।"

"কেন, হওয়া তো উচিত। কুলিশপাণিও আমাকে বাঁচাতে চাইছেন। আমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য তাঁর আছে। আপনিও তো বললেন—আমাকে এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আপনি এসেছেন এখানে। কিন্তু ওঁর মতো সামর্থ্য আপনার নেই। আমাকে বাঁচানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কুলিশপাণির সঙ্গে যেতে দিতে আপত্তি কি?"

সুরঙ্গমার নয়নে অধরে যে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল অন্ধকারে চার্বাক তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে যে হাসির তরঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাতে চার্বাক বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমা ব্যঙ্গ করিতেছে।

"আপত্তি কি তা কি বুঝতে পারনি এখনও? আমি অসহায়, আমাকে ব্যঙ্গ কোরো না সুরঙ্গমা।"

"আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে ব্যঙ্গ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই মহর্ষি।

আপনি নিজেকে অসহায় বলে বর্ণনা করছেন কেন। আপনার অসহায় অবস্থা কি আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল ?"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আপনি কি অনুকম্পা চান ? অসহায় মানুষকে দেখে লোকের মনে অনুকম্পা জাগে, প্রেম জাগে না।"

"প্রেমই আমাকে অসহায় করেছে সুরঙ্গমা।"

"আমি যতটুকু বুঝি—প্রেম মানুষকে অসহায় করে না, শক্তিমান করে। প্রেমে পড়লে মানুষ সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন কি জীবনকেও। আমি সুন্দরানন্দকে ভালবাসি বলেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আপনি অসহায় এ বোধ সত্যিই যদি আপনার মনে জেগে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আপনি প্রেম নয়—অন্য কোন কিছুর প্রকোপে পড়েছেন।"

"আমি তোমার প্রেমেই পড়েছি সুরঙ্গমা। কিন্তু বুঝতে পারছি না—কি করে সেটা প্রমাণ করব তোমার কাছে, তাই অসহায় বোধ করছি।"

"মহর্ষি আপনার মতো পণ্ডিতের নিশ্চয়ই একথা জানা আছে যে একটিমাত্র কষ্টিপাথরেই প্রেমের যাচাই হ'তে পারে এবং তা সকলেরই আয়ত্তাধীন।"

"কি সে কষ্টিপাথর ?"

"ত্যাগ।"

"কিন্তু ত্যাগ করবার মতো আমার তো কিছুই নেই। সুন্দরানন্দ বা কুলিশ-পাণির ত্যাগ করবার মতো অর্থ আছে, কিন্তু আমি দরিদ্র।"

"কিন্তু যে জিনিস সকলেরই আছে তা আপনারও আছে, তার তুলনায় অর্থ অকিঞ্চিৎকর।"

"কি সে জিনিস ?"

"আপনার প্রাণ, আপনার জীবন।"

"আমাকে প্রাণ-ত্যাগ করতে বলছ ? আমি ম'রে গেলে তোমাকে পাব কি করে ? মরে গেলে তো সব শেষ হয়ে গেল।"

"আমাদের এই ধারণা আছে বলেই তো প্রাণত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ।"

চার্বাক কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমাকে ভুল বুঝো না সুরঙ্গমা। আমি প্রাণত্যাগ করতে ভীত নই, প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই আমি তোমার সন্ধানে এসেছি। কিন্তু আমি ইহলোককেই বিশ্বাস করি, পরলোকে আমার আস্থা নেই। আমি ইহজীবনেই তোমাকে পেতে উৎসুক, প্রাণত্যাগ করেও তোমাকে ইহ-

জীবনে পাবার সম্ভাবনা যদি থাকত, মানে—এ অসম্ভব যদি সম্ভব হ'ত, তাহলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করতাম। তোমাকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখানে এসেছি।"

"কিন্তু আমাকে পেতে হলে এখানে এলেই শুধু হবে না, মূল্য দিতে হবে।"

"যে মূল্য আমার কাছে তুমি দাবী করছ, কুমার সুন্দরানন্দের কাছে তা কি দাবী করেছ কখনও ?"

"দাবী করবার দরকার হয়নি। আমার সুখের জন্য আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় অনেকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। এই সেদিনই তিনি আমাকে জীবন্ত কস্তুরী-মৃগ স্বহস্তে ধ'রে দেবেন ব'লে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি আছে জেনেও প্রবেশ করেছিলেন, যে কোনও মুহূর্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে এ আশঙ্কা তাঁকে নিবৃত্ত করেনি।"

"আমারও তো যে কোনও মুহূর্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে তবু আমি তোমার জন্যে এসেছি।"

'আপনি এসেছেন নিজের স্বার্থে। আমার সুখের জন্য নয়, নিজের সুখের আশায়।"

"তুমি যদি একান্তভাবে আমার হও তাহলে আমিও বারম্বার তোমার জন্য জীবন বিপন্ন করে কৃতার্থ হব। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, চল আমার সঙ্গে—পরীক্ষা করে দেখ।"

"ক্ষমা করবেন মহর্ষি, মূল্য না পেলে আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু যে মূল্য তুমি চাইছ, তা আমি দেবই বা কি করে ? আত্মহত্যা করব ?"

"আপনি আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ পেলেই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হব।"

চাবাক চুপ করিয়া রহিল।

সুরঙ্গমা বলিল — প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেই সব সময় প্রাণ যায় না। যুদ্ধে সব সৈন্যই মরে না। আপনিও হয়তো বেঁচে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ চাই।"

"আমার মুখের কথায় তোমার সংশয় যদি না ঘোচে কি করে ঘুচবে, বল।"

এই যজ্ঞে আপনি আত্মাহুতি দিতে রাজী আছেন ? যদি রাজী থাকেন, আমি বেঁচে যেতে পারি ! মহর্ষি পর্বত না কি বলেছেন আমার বদলে অন্য কেউ যদি আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয় আমাকে তিনি ছেড়ে দেবেন।'

"কিন্তু তুমি তো বলছ স্বেচ্ছায় তুমি যজ্ঞের বলি হয়েছ।"

"হয়েছি। কিন্তু মহর্ষি পর্বত যদি আমাকে মনোনীত না করেন, তাহলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা।"

'মহর্ষি পর্বত আমাকে মনোনীত করবেন?"

'না-ও করতে পারেন। যদি না করেন আপনি বেঁচে যাবেন।"

"যদি বেঁচে যাই তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে?'

'আসব।"

"কুমার তোমাকে ছেড়ে দেবেন?"

"দেবেন। তিনি আমার কোন কাজেই বাধা দেন না কখনও।"

চার্বাক কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। তাহার মনে হইল যজ্ঞীয় পশুর যে সব খুঁত থাকিলে তাহা যজ্ঞীয় পশু রূপে নির্বাচিত হয় না, সে সব খুঁত তাহার শরীরে আছে। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহর্ষি পর্বত যজ্ঞের বলি হিসাবে তাহাকে নির্বাচন করিবে না। কিন্তু মুশকিল হইবে ধারামতীর ব্যাপারটার জন্যে।

"তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছি। এ সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কেবল তোমার জন্যে আমি এতে রাজী হচ্ছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি গোপনে দেখা করতে চাই একবার, ধারামতীর সম্পর্কে আমার নামে যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব একটু। আমার বিশ্বাস, সব শুনলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল।

"কুমারকে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। কুমারকে যা বলতে চান তা আমাকেও বলতে পারেন, আমি কুমারকে গিয়ে তা এখনই জানিয়েও দিতে পারি।"

"আমি কুমারকে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ধারামতী নিজে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। কিছুদিন পরে অনিবার্যভাবে যা ঘটল তার জন্যে আমি তাকে বিবাহও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে সে রাজি হয়নি। এর জন্য কুমার আমাকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাঁর সে আদেশ আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। আমি কেবল জানতে চাই আর কতকাল আমাকে অপরাধী ব'লে গণ্য করা হবে? সারাজীবন কি রাজরোষ থেকে আমি অব্যাহতি পাব না?"

"মহর্ষি পর্বত যদি যজ্ঞীয় বলি হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করেন তাহলে কুমারের সঙ্গে এ সব আলোচনা কি নিরর্থক নয়?"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন একথাটা না জানলে মরেও আমার শান্তি হবে না।"

"আপনার মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো সব শেষ হয়ে যায়। তখন তো শান্তি-অশান্তি কিছুই থাকবার কথা নয়।"

চার্বাক পুনরায় অনুভব করিল, সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর লাগিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল—"আমার মত তাই বটে। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা জানি না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ধারামতী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যটা কুমারকে আমি জানিয়ে দিতে চাই। ক্ষমা করা না করা অবশ্য তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কথাটা তাঁকে বলতে পারলে আমি তৃপ্তি পাব। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু যে পরলোকে বিশ্বাস করে না, তার কাছে ওই কিছুক্ষণেরই মূল্য অনেক।"

"বেশ আমি যাচ্ছি তাহলে। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করবেন কি ?"

"আর কোথায় যাব।"

"কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন তাহলে।"

চার্বাক ভিতর হইতে কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলেন। সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে ?"

সুরঙ্গমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"অভিসারে। আমি আশা করিনি যে এত রাত্রে আপনি আসবেন।"

কুমারের গম্ভীর মুখও হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ জানতে পারি কি ?"

"আপনি যদি জানতে চান, নিশ্চয় জানাব। কিন্তু একটি অনুরোধ আছে।"

"বল, তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"তাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"তুমি যাকে কৃপা করেছ আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি! নিশ্চয় ক্ষমা করব। কে তিনি।"

"মহর্ষি চার্বাক।"

"বল কি! তিনি এখানে এলেন কি করে ?"

সুরঙ্গমা তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া সুন্দরানন্দ অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"মহর্ষি পর্বতের

কন্যা ধারামতীও তো এখানে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখা কি উচিত নয়—চার্বাক যা বলেছেন তা সত্য কিনা।"

"তাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহর্ষি চার্বাক যা বলেছেন তা সত্য। মহর্ষি চার্বাক সত্যিই ধারামতীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, ধারামতীও মহর্ষি চার্বাককে এখনও ভালবাসে।"

"তাহলে বিবাহ না হওয়ার কারণ কি?"

"কারণ আমি। ধারামতীকে মহর্ষি চার্বাক অপকটে বলেছিলেন যে তাকে বিবাহ করতে চাইছেন কর্তব্যবোধে, কিন্তু তিনি ভালবাসেন আমাকে।"

"সত্যিই তিনি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী?"

"সত্যিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন। অবশ্য মহর্ষি পর্বত যদি তাকে নির্বাচন করেন।"

"মহর্ষি পর্বত বলি দেবার জন্য শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটি সুলক্ষণ বন্য বালককে কিনে এনেছেন। সে বালক এবং তার পিতামাতা এতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে। তাদের সঙ্গে একটু আগে আমি নিজে কথাবার্তা বলেছি। এই খবরটা তোমাকে দেবার জন্যেই এত রাত্রে এসেছি তোমার কাছে। ব্যাপারটা বেশ সরল হয়ে এসেছিল, মহর্ষি চার্বাক আসাতে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আবার। মহর্ষি চার্বাক তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হতে পারেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার মনের অবস্থাটা কি—তুমিও কি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী?"

সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"আপনার কি মনে হয়?"

"নারী-চরিত্রের জটিলতা ভেদ করবার সামর্থ্য আমার নেই। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—কবির এ কথা আমি মানি। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তোমার স্মৃতিটুকু নিয়েই ধন্য হয়ে থাকব। তোমাকে বোঝাবার চেষ্টাও করব না, তোমাকে বাধাও দেব না। প্রহেলিকাকে প্রহেলিকা বলে স্বীকার করাই ভালো।"

সুরঙ্গমা সহসা সুন্দরানন্দের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—"না আপনি আমাকে বাধা দিন, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। আমি প্রহেলিকা নই—সুরঙ্গমা, আপনারই সুরঙ্গমা।"

আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চার্বাকের মুণ্ডপাত করবার ব্যবস্থা করি তাহলে? তুমি যা চাও তাই হবে।"

"আমি আমার কথা রাখতে চাই। উনি আমাকে বাঁচাবার জন্য যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, আমি দেখতে চাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ওঁর এ মনোভাব বদলায় কি না। সম্ভবত মহর্ষি পর্বত ওঁকে মনোনীত করবেন না, কিন্তু আমি দেখতে চাই উনি ওঁর প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন কি না।"

"ধর যদি থাকেন।"

"তাহলে আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাব!"

"তার পর?"

"তার পর ফিরে আসব আবার। কিছুক্ষণ পরেই উনি বুঝতে পারবেন আমাকে সঙ্গিনীরূপে পাবার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই কিছুক্ষণ ছুটি দিতে হবে আমাকে।"

"গোড়াতেই তো বলেছি, তুমি যা চাও তাই হবে। তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন হঠাৎ।"

সুরঙ্গমা মুচকি হাসিয়া বলিল—"শক্ত সমর্থ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগে। মির্মির সিংহকে ফাঁদে ফেলে যে মজা দেখছেন, মানুষকে সেই রকম ফাঁদে ফেলে আমি ঠিক সেই রকম মজা দেখতে চাই। আপনি আমাকে মৃগ, পারাবত, শুক অনেক উপহার দিয়েছেন। কিন্তু শক্ত সমর্থ বিদ্বান প্রেমিক পুরুষ উপহার দেননি কখনও। সেই উপহার আমি নিজেই জোগাড় করেছি আজ। আপনি অনুমতি দিন তাকে নিয়ে খেলা করি একটু।"

সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বহুবার চুম্বন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"অনুমতি দিলাম। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।"

যে উল্কা দুইটি পাশাপাশি দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বলিল—"চার্বাক এইবার সম্পূর্ণ বিগলিত হয়েছে। চল, এইবার দেখা যাক, ওর বিশ্বাস অটল আছে কি না।"

দ্বিতীয় উল্কা বলিল—"কি বিশ্বাস?"

"চতুরাননবিশিষ্ট কোনও দেবতা নেই—এই বিশ্বাস। বুদ্ধির প্রাখর্য আস্ফালন করে ও সুরঙ্গমাকে ভোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি সুরঙ্গমাই ওকে ভুলিয়েছে। যজ্ঞের হাড়কাঠে ও গলা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে। এখন চল দেখা যাক—চতুরানন দেবতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসটার অবস্থা কি রকম।"

"কি করে দেখবেন সেটা।"

"তুমি কৃপা করলেই হয়। তুমি সুরঙ্গমা সেজে চল ওর কাছে। আমি অদৃশ্যরূপে তোমার সঙ্গে থাকি।"

"কিন্তু আসল সুরঙ্গমা যদি এসে পড়ে?"

"সে এখন আসবে না। সুন্দরানন্দের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে সে এখন সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। তার পরে সেখান থেকে নেবে সে যাবে কুলিশপাণির ঘরে। কুলিশপাণি দরজা খুলে বসে আছে।"

"বেশ চলুন।"

উল্কা দুইটি বনভূমি লক্ষ্য করিয়া নামিতে লাগিল।

চার্বাক অন্ধকারে একা বসিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সুরঙ্গমাকে যদি জীবনের মূল্যেই কিনিতে হয়, তাহাকে পাইবার পরেই যদি জীবনাবসান ঘটে তাহা হইলে মৃত্যু-নামক যে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাহাকে অচিরাৎ উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহার স্বরূপ কি প্রকার হওয়া সম্ভব। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের দেহ নির্মিত—ইহা ছাড়া আর কিছু নাই, এতকাল ইহাই সে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর দৈহিক পঞ্চভূতের সমন্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকৃতির বিরাট পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এই ধারণার স্বপক্ষেই সে এতকাল নানা যুক্তি আহরণ করিয়া আসিয়াছে, এই যুক্তিরই নির্দেশে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করাই জীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই পুরুষকার, এই ধর্ম আচরণই স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভের উপায়। এই মর্তেই স্বর্গ নরক বর্তমান। কামনার পরিতৃপ্তিই স্বর্গ। অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা-কামনার যন্ত্রণাই নরক। যেমন করিয়াই হোক ক্ষুধা ও কামনাকে তৃপ্ত করিতে হইবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা অবিধেয় নহে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া এতকাল সে চলিয়াছে। এই পথে চলিতে চলিতেই সে আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া আজ সহসা যেন বলিতেছে, আমরা বিভিন্ন নহি, আমরা পরস্পরের পরিপূরক, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করিবার জন্ম মৃত্যুকেই বরণ করিতে হয়, সুরঙ্গমা মায়াবিনী রাক্ষসী নহে, সে তোমার প্রেয়সীও নহে, সে তোমার গুরু। তুমি এতকাল জীবনকেই একমাত্র সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলে, সুরঙ্গমা আজ তোমার এই মহাভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছে, সে তোমাকে আজ অর্ধ সত্য হইতে পূর্ণ সত্যে উত্তীর্ণ

করিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ জীবন ত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে হয়, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর। সুরঙ্গমা আনন্দ-স্বরূপ। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তাই সে তোমাকে মৃত্যুর অনির্দিষ্ট বৃহত্বে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহাকে বাধা দিও না।

চার্বাক ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া ভাবিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। সুরঙ্গমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে তাহার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনে পড়িল। অদ্ভুত সুরা-পান করিয়া সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, গুণপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ, জালার ভিতর প্রবেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন, অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান, বন্দী সিংহ, অসংখ্য মশক·· একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে জীবন সে যাপন করিয়াছে তাহাকে কোনমতেই সুস্থ জীবন বলা চলে না। তবে কি সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? প্রেমকে অনেক কবি ব্যাধি আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রেম-ব্যাধিই কি তাহার চিন্তাশক্তিকে হরণ করিয়া তাহার দুর্বল কল্পনায় প্রলাপের মোহ সৃজন করিতেছে? সুরঙ্গমা বলিয়াছিল সে সুন্দরানন্দের কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাহার এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করিবার জন্য যে যুক্তি-জাল সে বিস্তার করিয়াছিল সে জালে সুরঙ্গমা ধরা পড়ে নাই, সে নিজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রিত চেতনা যে বিচিত্র স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রভাব সে যেন কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছে, স্বপ্নে জাগরণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব যে একেবারে অসম্ভব একথা বলিবার মতো মনের জোর তাহার যেন আর নাই। সুরঙ্গমার মতো রূপসী রসিকা প্রণয়ের প্রতিদানে তাহাকে যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলিদান দিতে চাহিতেছে—ইহার অপেক্ষা চতুর্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব কি বেশী অসম্ভব? সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। যুক্তি, চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা সব যেন জট পাকাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। কেবল একটি কথাই মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—যেমন করিয়া হোক, যে মূল্যেই হোক, সুরঙ্গমাকে পাইতেই হইবে।

চার্বাক যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সেই বন্ধদ্বারের বাহিরে নিঃশব্দ চরণে একটি পরম রূপবান যুবক ও পরম রূপবতী যুবতী আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাহিরে তখন গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে।

যুবক বলিলেন—"বাণী সূক্ষ্মদেহ ধারণ কর। আমি তোমার মধ্যে ঢুকি।"

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উভয়েই স্বচ্ছ আলোক-শিখায় রূপান্তরিত হইলেন। একটি আলোক-শিখা আর একটি আলোক-শিখায় মিশিয়া গেল। মিলিত আলোক-শিখাটি পুনরায় মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করিল। সুরঙ্গমার মূর্তি।

দ্বারে করাঘাত শুনিয়া চার্বাক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কে ?"

"কপাট খুলুন। আমি এসেছি।"

"কে, সুরঙ্গমা ?"

"কপাট খুললেই দেখতে পাবেন। দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি খুলুন।"

চার্বাকের মনে হইল সুরঙ্গমাই আসিয়াছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সেই রকমই মনে হইতেছে। তবু দ্বিধা হইল।

"সুন্দরানন্দ কি বললেন ?"

"তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু একটি সর্ত আছে।"

"কি সর্ত ?"

"কপাট খুলুন, বলছি।"

চার্বাকের আর সন্দেহ রহিল না। সে কপাট খুলিয়া দিল। যে মানবী মূর্তিটি প্রবেশ করিল সে যে সুরঙ্গমা নয় এ সংশয় তাহার মনে জাগিল না। জাগিলেও সংশয় নিরসনের উপায় ছিল না, কারণ ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করে নাই। অন্য কোনও আলোও ছিল না।

"কি সর্তে কুমার সুন্দরানন্দ আমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছেন ?"

"আপনাকে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর কুলদেবতা চতুরানন ব্রহ্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন।"

চার্বাক কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"শুধু মুখে ওই কথা বললেই হবে ?"

"শুধু মুখে বললেই হবে না। চতুরানন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আপনাকে বিশ্বাসও করতে হবে।"

"কিন্তু আমি যদি মিছে কথা বলি তিনি তা টের পাবেন কি করে ? প্রাণভয়ে অনেকেই যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় একথা নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত নেই।"

"নিশ্চয়ই নেই। আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেই কিন্তু তিনি জানতে পারবেন। একজন ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, তিনি এখানেই আছেন। তাঁর গণনা অভ্রান্ত। তিনি বলে দিতে পারবেন আপনি সত্য কথা

বলছেন কিনা। তিনি যদি বলেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভল্লের আঘাতে আপনার মস্তক বিদীর্ণ হবে। সুন্দরানন্দ এই আদেশ দিয়েছেন।"

চার্বাক পুনরায় কয়েক মুহূর্তের জন্ত নীরব হইয়া গেল। তাহার পর বলিল— "হঠাৎ কোন কিছুকে বিশ্বাস করবার শক্তি তো আমার নেই। যে দেবতাকে কখনও দেখিনি, যার অস্তিত্বের কল্পনা মনে হাস্যোদ্রেক ছাড়া আর কোনও ভাবের উদ্রেক করেনি, তাকে হঠাৎ সত্য বলে মেনে নিই কি করে? আমাকে মানিয়ে সুন্দরানন্দের লাভই বা কি হবে তা বুঝতে পারছি না।"

"আপনি কি জ্যোতিষ গণনায় বিশ্বাস করেন?"

"না।"

"তাহলে তো ওই ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর গণনাকে আপনি নির্ভয়ে তুচ্ছ করতে পারেন। আপনি মুখেই তাহলে বলুন—আপনি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, আমি সেই খবর নিয়ে যাই, ফলাফল কি হয় দেখা যাক।"

"আমি যদি বলি ব্রহ্মার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, তাহলে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?"

"না। তাঁর মতে যারা নাস্তিক তারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই উচিত।"

চার্বাক চুপ করিয়া রহিল।

"কি ঠিক করলেন?"

"কিছু ঠিক করতে পারছি না।"

"আপনি সত্যই কি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না? ভাল করে ভেবে দেখুন, চেয়ে দেখুন মনের গহনে।"

"যা চোখে দেখিনি, যুক্তি দিয়ে যার অস্তিত্বের কল্পনাও করতে পারি না, তাকে বিশ্বাস করি বলব কি করে।"

"চোখে দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন?"

"করব। প্রত্যক্ষ দর্শনকেই বিশ্বাস করে এসেছি চিরদিন।"

"দেখুন তাহলে।"

এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেই অন্ধকার ঘর এক দিব্য আলোকে আলোকিত হইল। চার্বাক সবিস্ময়ে দেখিল তাহার সম্মুখে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে সত্যই চতুরানন, তাঁহার সর্বাঙ্গ দ্যুতিময়, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের আভায় সমস্ত ঘর রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। চার্বাক ভয় পাইয়া গেল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

"সুরঙ্গমা, তুমি কোথা গেলে? ইনি সত্যই কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, না তুমি আমাকে কোন ভোজবাজী দেখাচ্ছ?"

সুরঙ্গমার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অষ্টনয়নের হাস্যময় দৃষ্টি নীরবে যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—অবিশ্বাস করিও না আমি আছি। মানব মাত্রেই অসহায়, প্রেম ও বিশ্বাসই তাহার একমাত্র আশ্রয়। সুরঙ্গমার প্রেম যদি লাভ করিতে চাও, বিশ্বাস কর। একমুখ বিষ্ণু, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ মহেশ্বর কেহই অলীক নহে। তোমার অন্তরলোকে তাহারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তুমি কেবল বিশ্বাস কর।

চার্বাক মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই জীবন্ত বিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহের মধুর হাস্য, স্নিগ্ধ প্রশান্তি, দিব্য জ্যোতি তাহাকে ক্রমশ সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া হাত জোড় করিয়া এই বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সম্মুখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া পড়িল। পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন।

চার্বাক তথাপি বসিয়া রহিল।

কুলিশপাণি সুরঙ্গমার অপেক্ষায় দ্বার খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহার ধৈর্য্য যখন সীমা অতিক্রম করিতেছে তখন দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শোনা গেল। কুলিশপাণি সাগ্রহে উঠিয়া আগাইয়া আসিল, কিন্তু দ্বারপ্রান্তে সুরঙ্গমাকে দেখিতে পাইল না। পাইল কিরাতবেশী দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ব্যক্তিকে, তাহার পর তাহার নজরে পড়িল ছায়ার অন্ধকারে একটি নারীমূর্তিও রহিয়াছে।

"কে আপনারা?"

পুরুষটি উত্তর দিলেন।

"আমরা নাগদম্পতী। আমার নাম চিত্রক, ইনি চিত্রিকা। আপনার নাম কি কুলিশপাণি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাকে একটি সংবাদ দিতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন নিবেদন করি। আপনার হিতার্থেই এসেছি আমরা। আপনারা রাজা-রাজড়া লোক, তাই সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার করছি। সহজ চলতি ভাষাতেই আমরা অভ্যস্ত।"

"সহজ চলতি ভাষাতেই বলুন। কি সংবাদ?"

"আপনি কি সুরঙ্গমাকে নিয়ে ভাগতে চান?"

প্রশ্ন শুনিয়া কুলিশপাণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর একবার ভাল করিয়া সেই কিরাতবেশী বিরাট পুরুষের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। ইহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু এই অপরিচিত লোকটি তাহার এই গোপন কথাটি জানিল কি করিয়া? সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য কেহ তো একথা জানে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটির কাছে সত্য-স্বীকার করা সমীচীনও নহে। সুন্দরানন্দের কানে গেলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্থির করিল অকপটে উত্তর দেওয়া উচিত হইবে না। বলিল—"আপনার সংবাদটি অদ্ভুত। কোথা থেকে শুনলেন?"

"আপনারই মুখ থেকে।"

"আমার মুখ থেকে! কি রকম?"

"কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরঙ্গমাকে বলছিলেন—কাছেই আমার ঘোড়া বাঁধা আছে চল তোমাকে নিয়ে পালাই—তখন চিত্রিকা আপনার খুব কাছেই ছিল। স্বকর্ণে সে আপনার কথাগুলি শুনেছে।"

কুলিশপাণি চিত্রিকার দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ সে ভাল করিয়া তাহাকে দেখে নাই; চিত্রিকাকে দেখিয়া খানিকক্ষণের জন্য বিস্ময়ে সে নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল মানবীতে এত রূপ সম্ভবে না। চিত্রিকা আনত নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কুলিশপাণির সন্দেহ হইল মেয়েটি যেন তাহার মনের কথা টের পাইয়াছে। তাই একটু জবাবদিহির সুরেই বলিল—"সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!"

পুরুষটিই পুনরায় উত্তর দিলেন।

"না, দেখেননি। যে রূপে আমাদের দেখছেন নিজেদের সে রূপ আমরাও কখনও দেখিনি। সেকথা যাক। যা বলছিলাম, চিত্রিকা স্বকর্ণে আপনার কথাগুলি শুনেছে। আপনি যখন সুরঙ্গমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ও যদিও আপনার খুব কাছেই ছিল, তবু দেখেননি, কারণ দেখা সম্ভব ছিল না। ও তখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় একটা গর্তে ঢুকেছিল।"

কুলিশপাণির দেহে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে বিস্ফারিত নয়নে চিত্রিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সত্যই মনে হইতে লাগিল যে বসনে চিত্রিকার দেহ আবৃত রহিয়াছে তাহা যেন সর্পচর্মের মতোই চিক্কণ ও চিত্র-বিচিত্র।

পুরুষটি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"গোড়াতেই তো বলেছি আমরা নাগদম্পতী। মহাদেবের বরে আমরা যে কোনও রূপ ধারণ করতে সমর্থ। এই

মনুষ্যবেশে আপনার কাছে এসেছি। আমরা আপনার হিতৈষী। আপনি অকপটে আমাদের সব কথা বলতে পারেন। আপনার যাতে অনিষ্ট হয় সেরকম কাজ কখনও আমরা করব না।"

কুলিশপাণি জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া পড়িল।

"মহাদেব আমার কুলদেবতা। আপনারা যখন তাঁর বলে বলীয়ান তখন আপনাদের অবিদিত কিছু নেই। আমার মনের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এ অবস্থায় কি করব উপদেশ দিন।"

পুরুষটি হাসিয়া বলিলেন—"সেই জন্যই তো এসেছি। চিত্রিকা যখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় গর্তে ঢুকেছিল, আমি তখন অন্যত্র একটা গেছো-ব্যাঙের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সময় কানে এল সুরঙ্গমা চার্বাকের সঙ্গে পালাবে পরামর্শ করছে।"

"চার্বাকের সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ। যে চার্বাক পর্বতকন্যা ধারামতীর সর্বনাশ করেছে সেই সুরঙ্গমাকে নিয়ে পালাবার তালে আছে !"

"চার্বাক কোথায় ?"

"এই বনেই আছে কোথাও নিশ্চয়। এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না।"

"আপনি এ খবর শুনলেন কোথা ?"

"আমি যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার কানে এল সুরঙ্গমা চার্বাককে বলছে—আপনি যদি আমাকে আমার সর্বোচ্চ মূল্য দেন, আমি আপনার কাছেই যাব। চার্বাক দেখলাম তাতেই রাজি। তার কিছুক্ষণ পরে চিত্রিকার সঙ্গে দেখা হল, চিত্রিকা বললে তুমিও নাকি সুরঙ্গমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সরে পড়তে চাও। সুরঙ্গমাও নিমরাজি-গোছ হয়েছে। তখন আমাদের মনে হল চার্বাকের খবরটা তোমাকে বলে যাওয়া উচিত। তুমি যখন শিব-ভক্ত, তখন তুমি আমাদের নিজেদের লোক। খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম, এখন তুমি যা ব্যবস্থা করবার কর।"

কুলিশপাণি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কটিনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—"চার্বাক যদি এ বনে কোথাও থাকে তাহলে আগামী-কল্য তাকে আর সূর্যোদয় দেখতে হবে না। আজ রাত্রিই তার জীবনের শেষ রাত্রি। নাগদম্পতি, আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না জীবনে। আশীর্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

কুলিশপাণি পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল—"সত্যই আশীর্বাদ করুন আমাকে। সুরঙ্গমাকে না পেলে জীবন আমার মরুভূমি হয়ে যাবে।"

পুরুষটি স্মিতমুখে কুলিশপাণির দিকে চাহিলেন। বলিলেন—"আমি আশীর্বাদ করি না কাউকে।"

"কেন?"

"ফলে না।"

কুলিশপাণি এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। বলিল—"কি ফলে তাহলে?"

"তা-ও জানি না।"

"কিছু উপদেশ দিন অন্ততঃ। তাতেও আমার অনেক উপকার হবে। আপনারা শিবের বর পেয়েছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন।"

"ওটা ভুল ধারণা। কেউ অসাধ্য সাধন করতে পারে না। আগে উপদেশ দিতাম, কিন্তু এখন তা-ও আর দিই না।"

"কেন?"

"দিলে কেউ শোনে না।"

"আমি শুনব।"

"শুনবে?"

"শুনব।"

"তাহলে একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। হোঁৎকামি কোরো না। করলে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় না কোনও।"

বাহিরে একটা পেচক কর্কশশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুরুষটি বলিল—"ডাক এসেছে। এবার আমরা চললাম!"

"কার ডাক?"

কুলিশপাণি এ প্রশ্নের উত্তর পাইল না। কারণ নাগদম্পতী সহসা অন্তর্ধান করিয়াছিল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরঙ্গমার জন্য অপেক্ষা করিবে, না চার্বাকের সন্ধানে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবে—তাহা স্থির করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় লাগিল। অবশেষে সুরঙ্গমার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করাই তাহার সঙ্গত মনে হইল। একটি বেত্রাসন বাহির করিয়া বাহিরে বারান্দায় সে উপবেশন করিয়া কিরাতবেশী নাগদম্পতীর রহস্যময় আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। দেব-দেবী মাহাত্ম্যে কুলিশপাণির অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাদেবের কৃপা হইলে সর্প যে ইচ্ছানুসারে যে কোনও মূর্তি পরিগ্রহ

করিতে পারে ইহা তাহার নিকট মোটেই বিস্ময়জনক মনে হয় নাই। সে ভাবিতেছিল এই নাগদম্পতী এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া যে উপদেশ তাচ্ছিল্য-ভরে তাহাকে দিয়া গেলেন সে উপদেশের তাৎপর্য কি! চার্বাককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবার যে বাসনা তাহার মনে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি অন্যায়, না অসঙ্গত? ওই ধূর্ত লোকটার ওই তো উচিত শাস্তি। আবার তাহার মনে হইল ব্রহ্মহত্যা করাটা উচিত হইবে কি! ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু এই মহাপাপের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। প্রথমত তাহার মনে হইল ওই বিবেকহীন ব্যভিচারী লোকটা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ও চণ্ডালেরও অধম। দ্বিতীয়ত মনে হইল—সে তো হত্যা করিবে না, দণ্ডবিধান করিবে। সুন্দরানন্দের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে অধিকার তাহার আছে। দুষ্টের দমন তাহার কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও সে কিন্তু মনে মনে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ওই সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত পুরুষ তাচ্ছিল্যভরে চলিত ভাষায় তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গেল তাহার কি অর্থ হইতে পারে! চার্বাককে হত্যা করিলে কি দেব-রোষে পতিত হইতে হইবে? কিন্তু ··সহসা তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। একটি সঞ্চরমাণ বর্তিকা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আর সন্দেহ রহিল না, কুলিশপাণি বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমাই আসিতেছে। সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরও একটু পরে শোনা গেল।

"আপনি জেগে আছেন নাকি?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ। শুধু জেগে নেই, অধীর আগ্রহে জেগে আছি। তারপর কি ঠিক করলে, বল। যাবে আমার সঙ্গে?"

"যাওয়ার আর দরকার হবে না। মহর্ষি পর্বত আমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করতে চাইছেন না। সুতরাং আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে আর নিজেকে বিপন্ন করতে হবে না। আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। আপনি যে আমার মতো একজন সামান্যা নর্তকীর জন্য এতটা করতে রাজি হয়েছিলেন, এর জন্য আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।"··

সুরঙ্গমা বর্তিকাটি বারান্দায় রাখিয়াছিল। বর্তিকালোকে কুলিশপাণি সুরঙ্গমার পূর্ণ শ্রী দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ অন্ধকারের পটভূমিকায় এই তন্বী রূপসীকে পুনরায় সে যে মহিমায় অলঙ্কৃত দেখিল তাহাতে তাহার বিবেক আবার নব-মোহে আচ্ছন্ন হইল, শুভাশুভ জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া গেল, তাহার সমস্ত

চেতনায় একটি বাসনাই শিখার মতো উন্মুখ হইয়া উঠিল—সুরঙ্গমাকে চাই। কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখে কোনও কথা সরিল না। যখন সরিল তখন সে বলিল—"আমি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা চাইনি সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম।"

সুরঙ্গমা হাসিয়া বলিল—"এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি। আমার দেহটা হয়তো আপনাকে দিতে পারি—তা-ও সুন্দরানন্দের অনুমতি নিয়ে তা দিতে হবে, কারণ আমার এই দেহটা তাঁরই সম্পত্তি—কিন্তু আপনি যা চাইছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নিজেরও নেই। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দাতা এবং গ্রহীতার অনেকদিনের মেলা-মেশার ফলে হয়। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার কথা।"

কুলিশপাণি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া কেবল উষ্ণশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সে বর্তিকাটি তুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

"তুমি যা যুক্তিযুক্ত তাই সহজভাবে বলেছ। তোমার বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তা বলতে পারছি না, তা যুক্তি-যুক্তও নয়। আমার অব্যক্ত কথা তুমি বুঝতে পারবে কি না জানি না। আমি একটি কথা কেবল জানতে চাই, আশা করি সত্য উত্তর পাব।"

"বলুন।"

"চার্বাক কি এখানে এসেছেন ?"

"এসেছেন।"

"কোথায় আছেন ?"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"তা জানতে চাইছেন কেন ?"

"কর্তব্যের জন্য। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন তাকে বন্দী করতে।"

"বন্দী করবার দরকার হবে না আর। সুন্দরানন্দ সব কথা শোনার পর ক্ষমা করেছেন তাঁকে। আপনি সম্ভবত একটু পরেই কুমারের নূতন আদেশ পাবেন।"

কুলিশপাণি যেন আকাশ হইতে পড়িল।

"চার্বাককে কুমার ক্ষমা করেছেন ? তুমি এ কথা শুনলে কোথা থেকে !"

"কুমারেরই মুখ থেকে।"

"চার্বাকের কথা উঠল কি প্রসঙ্গে ?"

"প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। চার্বাক আমারই মাধ্যমে ক্ষমার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।"

"তোমার সঙ্গে চার্বাকের দেখা হয়েছে তাহলে।"

"হয়েছে বই কি।"

"চার্বাক কোথায় আছে ?"

সুরঙ্গমা পুনরায় মৌন হইয়া গেল। তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন সেনাপতি। আমি মহর্ষি চার্বাককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাঁর অবস্থান গোপন রাখব।"

"এ রকম অন্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থ ?" কুলিশপাণির কণ্ঠস্বরে কঠোরতার আভাস পাইয়া সুরঙ্গমার মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"পুরুষদের সকল প্রকার দুর্বলতাকে চিরকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। ওটা আমার দুর্বলতা। অনেক বড় বড় রথী-মহারথীরা আমার এ দুর্বলতাকে ক্ষমা করেছেন। আশা করি আপনিও করবেন।"

সুরঙ্গমার এই তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি শুনিয়া কুলিশপাণি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল সুরঙ্গমার এ দুর্বলতা না থাকিলে তাহার অবস্থা কি হইত ? যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া সে উত্তর দিল :

"তোমার মতো রূপসীদের চিরকালই সাত খুন মাপ। এ নিয়ে আমি মাথাই ঘামাতাম না, কিন্তু একটু আগে যে সাংঘাতিক সংবাদটি আমি শুনেছি তাতে সত্যিই একটু বিচলিত হয়েছি।"

"কি সংবাদ ?"

"সংবাদটি বলবার আগে আমি একটি অনুরোধ করব। অকপটে বোলো সংবাদটি সত্য কি না।"

"এ অনুরোধ করবার দরকার ছিল না সেনাপতি। রূঢ় সত্যের উপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাই আমি মিথ্যাচরণ করতে পারি না। করলেও সে মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। বলুন, আপনি কি সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়েছেন ?"

"শুনলাম তুমি চার্বাককে নাকি বলেছ 'আপনি যদি আমাকে আমার সর্বোচ্চ মূল্য দেন তাহলে আমি আপনার কাছে যাব'। আর চার্বাক তাতে না কি রাজিও হয়েছে।"

সুরঙ্গমা একটু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে-মুখে সে বিস্ময় প্রতিভাত হইল না। সহজভাবে হাসিয়া সে বলিল "যা শুনেছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, সংবাদটি আপনি পেলেন কি করে।"

"তোমরা যখন আলাপ করছিলে তখন যিনি তা আড়াল থেকে শুনেছিলেন তিনিই আমাকে বলে গেলেন।"

সুরঙ্গমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ঠিকই বলে গেছেন তিনি।"

"জানতে পারি কি—চার্বাক তোমাকে কি মূল্য দিতে চান?"

"আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবেন।"

"সত্যি?"

"বলেছেন দেবেন। শেষ পর্যন্ত দেবেন কি না জানি না।"

কুলিশপাণি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! সহসা সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে সে সম্বিত ফিরিয়া পাইল।

"ভোর হয়ে এল বোধহয়। এবার আমি যাই।"

"কোথা যাচ্ছ?"

"নিজের ঘরে। ঘুমোব এখন।"

সুরঙ্গমা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে কুলিশপাণি চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বর্তিকালোক যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল তখন সে-ও ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহারও ঘুম পাইয়াছিল।

নাগ-দম্পতী পেচক-দম্পতীতে রূপান্তরিত হইয়া একটি সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের শাখায় তৃতীয় একটি পেচকের ভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল।

তৃতীয় পেচক শুদ্ধ ভাষায় বলিতেছিল—"হে পিতামহ, তুমি আর বাণী নিজেদের আনন্দে মত্ত হইয়া সৃষ্টির পর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। সে সৃষ্টি বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের এই সুমহতী সৃষ্টিকে বিধৃত করিবার জন্য আমিও নিজেকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে, তোমাদের সৃষ্টিও রূপ হইতে রূপান্তরে বিবর্তিত হইতেছে। মানব-কবিরা অনন্ত বিশেষণে ভূষিত করিয়া সে সৃষ্টিকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতার সীমা-রেখা পার করিয়া দিয়াছেন। তোমাদেরও খেয়াল নাই, তোমরা সৃষ্টির আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমার মনে হয় এইবার তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি আর নিজেকে কত প্রসারিত করিব।"

তৃতীয় পেচক নীরব হইল। নীরব হইবামাত্র একটা অদ্ভুত নীরবতায়

চতুর্দিক যেন নিমজ্জিত হইয়া গেল। মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে সৃষ্টি সত্যই অবলুপ্ত হইয়া গেল বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্তেই বহুবিধ আরণ্য শব্দ—ঝিল্লীধ্বনি, বৃক্ষমর্মর, শ্বাপদের চীৎকার—সে নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। কোটি কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

প্রথম পেচক বলিল—"মহাকাল, শুদ্ধ ভাষায় উচ্চারিত তোমার বক্তব্য শুনলাম, এইবার আমার বক্তব্য শোন। নূতন সৃষ্টি বহুকাল পূর্বেই থেমে গেছে। কিন্তু সেই পুরাতন সৃষ্টির যে সব ফাঁকড়া বেরিয়েছে, আর শ্রীমতী বাণী তা যেমনভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে আমারই তাক লেগে যাচ্ছে। চার্বাক যে শিখর সেন হয়ে যাবে, কালকূট যে কুলিশপাণি বা কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হবে এতো কল্পনা করিনি আমি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখছি—হচ্ছে, অবিশ্বাস করবারও উপায় নেই। তুমি আর একটু বাড়—।"

তৃতীয় পেচক। আমি অসমর্থ।

প্রথম পেচক। চেষ্টা কর—ওই তো—।

তৃতীয় পেচকের দেহায়তন ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা বিশাল মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল প্রাবৃটের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ জলধরকে বিদীর্ণ করিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎমালা মুহুর্মুহুঃ অন্ধকারকে শিহরিত করিয়া তুলিল। বজ্রগর্জনে দশদিক চমকিত হইল।

প্রথম পেচক। [দ্বিতীয় পেচককে] ময়শার কাণ্ডটা দেখেছ! ও ভেবেছিল আমাকে হকচকিয়ে দেবে। কিন্তু ওর ধাপ্পায় ভোলবার ছেলে নই আমি। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল—আমার সৃষ্টিকে তুমি বিধৃত করনি—ধ্বংস করেছ, কল্পনায় বিষ্ণুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে কথা বলেওছিলাম একদিন—কিন্তু—

দ্বিতীয় পেচক। কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৃথক নন। একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ওঁরা।

প্রথম পেচক। ঠিকই শুনেছ প্রেয়সি।

দ্বিতীয় পেচক। তাহলে আবার ওদের গাল দিচ্ছেন কেন! ওতে তো নিজেকেই গাল দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম পেচক। নিজেকে গাল দিতেও বেশ লাগে মাঝে মাঝে। ওকে যখন ভাল লাগে, যখন মনে হয় যে ও আমারই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ, তখন ওকে মহেশ্বর, পঞ্চানন বলে সুখ পাই, আবার ওকে যখন শত্রু মনে করি তখন ওকে ময়শা, পেঁচো বলতেও মন্দ লাগে না। দুটো ব্যাপারেই বেশ রস আছে! রসই

আসল। বাস্তবেও রস আছে, স্বপ্নেও রস আছে। যেখান থেকেই হোক রসাস্বাদন করাই হ'ল লক্ষ্য, তাতেই আনন্দ। ময়শাকে মনের আনন্দে বেশ গাল দিচ্ছিলাম হঠাৎ তুমি রস-ভঙ্গ করে দিলে—এখন কি করা যায় বল তো।—

দ্বিতীয় পেচক। [হাসিয়া] তা কি আর আমাকে বলে দিতে হবে ?

প্রথম পেচক। তোমার থ্যাবড়া মুখে বাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসিটি মন্দ লাগছে না। এদিকে একটু সরে বসলেই তো ভাল হয়।

পেচকদম্পতী পরস্পরের চঞ্চুচুম্বনে রত হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে আকাশে যে ভয়ঙ্কর ঘনঘটা চরাচরকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইল, জ্যোৎস্না-কিরণে কানন-কান্তার পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

প্রথম পেচক। [সহসা] একটা খবর জান ?

দ্বিতীয় পেচক। কি ?

প্রথম পেচক। কুলিশপাণিকে আমরা ভুলিয়াছি, কিন্তু চার্বাককে পারিনি। ও চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখে হতভম্ব হয়েছিল, কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি। ওই দেখ, ঘর থেকে বেরিয়ে ও চলে যাচ্ছে—! লোকটা খাঁটি লোক।

সেই পর্ণকুটীরে চতুরাননের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব চার্বাককে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিদারুণ ভয়ের আঘাতেই তাহার মোহগ্রস্ত মন প্রকৃতিস্থও হইল। সে বুঝিতে পারিল কত নীচে সে নামিয়াছে। কি আশ্চর্য, একটা নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া সে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল! ওই নর্তকী একটু আগে ভোজবাজীর সহায়তায় তাহাকে যে ব্রহ্মামূর্তি দর্শন করাইল, আর একটু হইলে সে তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপনও করিত। ছি, ছি, ছি—দার্শনিক চার্বাকের এ কি শোচনীয় অধঃপতন! একটা ভোজ-বাজিকে সে সত্য বলিয়া মনে করিল! ভয় পাইয়া মূর্ছা গেল! নীলোৎপলা তাহাকে অদ্ভুত একটা সুরাপান করাইয়া অদ্ভুত স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছিল। সুরঙ্গমা এ কি করিল। তাহার সমস্ত যুক্তিকে মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া তাহার শবদেহের উপর নৃত্য করিবে এই অস্বাভাবিক বাসনা তাহাকে পাইয়া বসিল কেন, আর সে-ই বাসনাকে প্রশ্রয় দিল কোন বুদ্ধিতে!

··অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার পর স্থির করিল—মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে হইবে। রূপসী সুরঙ্গমাকে লাভ করিতে পারিলে তাহার পৌরুষ সার্থক হইত, কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল্যে সে সার্থকতা লাভ করা অর্থহীন। সে সুরঙ্গমাকে জয় করিতে চাহিয়াছিল; কিছুতেই তাহা যখন সম্ভব হইল না,

তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুটীর ত্যাগ করিল। স্থির করিল, যত শীঘ্র সম্ভব সে এই বনস্থলী ত্যাগ করিবে। অন্ধকারে অরণ্যপথে তাহার গতি দ্রুত হইল না, কিন্তু তথাপি ত্বরিত চরণেই সে পথ অতিবাহন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে তাহাকে অরণ্যেই রাত্রিবাস করিতে হইবে। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নহে। সম্মুখেই শাখাপত্রবহুল একটি বৃক্ষ ছিল। তাহাতেই সে আরোহণ করিল।

প্রথম পেচক। নাটক আর একটু পরে জমবে।

দ্বিতীয় পেচক। সুরঙ্গমা আসছে বুঝি?

প্রথম পেচক। ওই যে। শুধু আসছে না, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে ও আকুল হয়ে উঠেছে। ঘোরতর কিছু একটা ঘটবে।

দ্বিতীয় পেচক। ওদিকে শিখর আর অবঞ্চনার ব্যাপারও ঘোরতর হয়ে উঠছে নিশ্চয়।

প্রথম পেচক। নিশ্চয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এই হচ্ছে। প্রথমে ফিকে, তারপর ঘোর, তারপর ঘোরতর। চল ওদের খবর নিয়ে আসা যাক, সুরঙ্গমা চার্বাককে খুঁজে বার করুক ততক্ষণ।

পেচক-দম্পতী উড়িয়া গেল।

একটু পরেই দেখা গেল, সুরঙ্গমা বর্তিকা হস্তে চার্বাককে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার প্রদীপ্ত-নয়নে স্ফুরিত-অধরে দোদুল্যমান কৃষ্ণবেণীর নিবিড়তায় চিরন্তনী নারীর কৌতূহল মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুরঙ্গমা বর্তিকাহস্তে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে চার্বাককেই সন্ধান করিতেছিল। জালবদ্ধ শিকার জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিলে ব্যাধের যে মনোভাব হয় সুরঙ্গমার সেরূপ মনোভাব হয় নাই। চার্বাক চলিয়া যাক ইহাই সে মনে মনে কামনা করিতেছিল। যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া এই জ্ঞানী পণ্ডিতের জীবন-নাশ করিবার বাসনাও তাহার ছিল না, সে কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহার জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কিনা। অর্থাৎ দার্শনিকের অনমনীয় বিবেকের সহিত কামনার দ্বন্দ্বে কামনাই জয়ী হয় কিনা। তাহার পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। যিনি যজ্ঞবিরোধী, যিনি পরলোকে বিশ্বাস করেন না, ইহলোকের সুখ-ভোগই যাঁহার একমাত্র কাম্য, তিনি একজন নটীর মোহে পড়িয়া যজ্ঞে

জীবনাহুতি দিতেই সম্মত হইয়াছিলেন শেষে। তাঁহার অসহায় মুখচ্ছবিটা সুরঙ্গমার মানসপটে বারম্বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। বিজয়িনীর আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ হইয়া সে এই মানব-পশুটাকে লইয়া একটু খেলা করিবে ভাবিয়াছিল, খেলা করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এ কি হইল! লোকটা সহসা অন্তর্ধান করিল কেন? কোথায় গেল! কুলিশপাণির কবলে পড়িল নাকি! চার্বাকের যতটুকু পরিচয় সুরঙ্গমা পাইয়াছিল তাহাতে তিনি যে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন একথা সুরঙ্গমা ভাবিতেই পারিতেছিল না। একবার প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলে সহজে আত্মস্থ হওয়া যায় না—ইহাই সুরঙ্গমার অভিজ্ঞতা। তবে একথাও সত্য যে চার্বাকের মতো কোনও মহর্ষি ইতিপূর্বে তাহার প্রেমে পড়ে নাই। তাহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া যে ব্যক্তি এত সহজে পলায়ন করিতে পারে সে নিঃসন্দেহে অসাধারণ ব্যক্তি। এ সম্ভাবনা সুরঙ্গমাকে আরও কৌতুহলী করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যটা কি জানিবার জন্য তাই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে। একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলে নিজেই সে বুঝিতে পারিত তাহার এ কৌতূহলের মূলে আছে তাহার অহঙ্কার। তাহাকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবে এমন পুরুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা অসম্ভব তাহার পক্ষে। মহর্ষি চার্বাকের মধ্যে সে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য তাহার আকুলতা, তাই সে বর্তিকাহস্তে অন্ধকারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়াও কিন্তু সে চার্বাকের দেখা পাইল না। হতাশ চিত্তেই ফিরিতেছিল এমন সময় দেখিতে পাইল চার্বাক একটি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে। সুরঙ্গমা দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া চার্বাক তাহারই দিকে দ্রুতপদে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

"ও, সুরঙ্গমা তুমি! আমি ভাবছিলাম বুঝি আর কেউ।"

"আপনি কোথা গিয়েছিলেন! আমি আপনাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

সুরঙ্গমা বর্তিকাটি ভূমিতে স্থাপন করিল।

"আমি তোমার আশা ত্যাগ করে চলে যাব ঠিক করেছি। ওই গাছের উপর উঠেছিলাম—অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে। ঠিক করেছিলাম ভোরেই বন ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। মনে হল এমন ভাবে যদি পালিয়ে যাই তোমার ধারণা হবে আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছি। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে দিতে চাই না। তাই ঠিক করেছি কুমার সুন্দরানন্দের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা বলে আত্মসমর্পণ করব। তা ছাড়া আমি সত্যাশ্রয়ী, চিরকাল সত্যকেই সন্ধান করবার চেষ্টা করছি, প্রাণভয়ে সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হব না। আমাকে সুন্দরানন্দের কাছে নিয়ে চল।"

"কুমার তো আপনাকে ক্ষমা করেছেন।"

"আমি তাঁর কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না একথা জানবার পরও ক্ষমা করেছেন?"

"আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করবেন কেন তিনি!"

"কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলে গেলে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। ভোজবাজির সহায়তায় চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে মূর্ত করে তুললে তুমি আমার মনে। ক্ষণিকের জন্য আমি বিহ্বলও হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে ঘোর কেটে যেতে দেরি হয়নি আমার।"

"এ সব কি বলছেন আপনি! আমি তো আপনার কাছে আসিনি।"

"তুমি সুন্দরী, ছলনাই তোমার ভূষণ। আমি তোমার উপর রাগ করছি না। কিন্তু আমি যা প্রত্যক্ষ করছি তা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই!"

"আপনি ভুল করছেন মহর্ষি। সত্যই আমি আপনার কাছে আসিনি। আমার অপেক্ষায় বসে বসে আপনি হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেই তন্দ্রার ঘোরে সম্ভবত স্বপ্ন দেখেছেন আপনি।"

"তুমি যখন বলছ তখন তাই ঠিক। আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা আমি জেগেই ছিলাম। যাক, এখন ওসব আলোচনা করে লাভই বা কি! কুমার সুন্দরানন্দের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তিনি আমার সম্বন্ধে যা ঠিক করবেন তাই আমি মেনে নেব।"

"আপনি আশা করি, যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে এখনও প্রস্তুত আছেন?"

"না। স্বেচ্ছায় আমি যূপকাষ্ঠে আর গলা বাড়িয়ে দেব না। তবে কুমার যদি জোর করে আমাকে বধ করেন সে আলাদা কথা।"

"কিন্তু একটু আগে তো আপনি প্রস্তুত ছিলেন।"

"সেজন্য আমি লজ্জিত। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছিল।"

চার্বাক ও সুরঙ্গমা কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

চার্বাক সহসা বলিল—"আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি সুরঙ্গমা। এখনও চাই তোমাকে।"

"কিন্তু।"

সুরঙ্গমা আর কিছু বলতে পারিল না। অঞ্চলপ্রান্ত তুলিয়া নয়ন দুইটি আবৃত করিল।

"কাঁদছ নাকি!"

সুরঙ্গমা মুখ হইতে অঞ্চলপ্রান্ত সরাইয়া দিল। চার্বাক লক্ষ্য করিল সত্যই তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র।

"কাঁদছ কেন সুরঙ্গমা হঠাৎ।"

"হঠাৎ নয়, চিরকালই কাঁদছি। কান্নার উপর হাসির যে মুখোশটা পরে থাকি সেটা মাঝে মাঝে সরে যায়। এখন গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে প্রকৃত প্রেমিকের দর্শন পেয়েছি, কারণ আমাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আপনি, কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যা, সব ভুল।"

চার্বাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিকই ধরেছ, সব মিথ্যা, সব ভুল। আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখ বুঝতে পারবে, সব সত্য সব ঠিক। সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন।"

"বুঝতে পারছি না আপনার কথা। আমি মূর্খ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

"আমি তোমার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম—মহর্ষি পর্বত আমাকে যজ্ঞীয় বলি রূপে মনোনীত করবেন না, আমার শরীরে অনেক খুঁত আছে। এখন অকপটে স্বীকার করছি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করতে পারব, হয়তো তোমাকে নিয়ে চলে যেতেও পারব এ দুরাশা আমার হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও মনে হয়েছিল মহর্ষি পর্বত যজ্ঞীয় বলিরূপে আমাকে মনোনীত না করলেও তাঁর কন্যার প্রণয়ীরূপে আমার জীবনান্ত ঘটাতে পারেন। তাই তোমাকে সুন্দরানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলাম জানতে যে তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা। আমার এ বিশ্বাসও ছিল তুমি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু তুমি যখন ফিরে এসে বললে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না, অদ্ভুত ভোজবাজি দেখিয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেও তুমি যখন হাজির করলে আমার সামনে—"

সুরঙ্গমা আবার প্রতিবাদ করল।

"বিশ্বাস করুন মহর্ষি, আমি ওসব কিছুই করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ওটা। কুমার আপনাকে ক্ষমা করেছেন এই কথাটা বলবার জন্য আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছে?"

"হ্যাঁ। আর একটি সুসংবাদও আছে—মহর্ষি পর্বত আমাকে বলির পশুরূপে নির্বাচন করেন নি। যজ্ঞের জন্য একটি কিরাত বালককে কিনে আনা হয়েছে।"

"ও।"

চার্বাক কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার তাহলে তো আর কুমারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, গোপনতারও প্রয়োজন নেই। কোথাও রাতটা কাটিয়ে সকালেই ফিরে যাব।"

সুরঙ্গমার মুখটা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"আমাকে ফেলে চলে যাবেন?"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে? যদি যাও আমি কৃতার্থ হব।"

"রাজনর্তকীকে এমন ভাবে হরণ করে নিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ?"

"তোমার জন্য বিপদ বরণ করতেও আমি প্রস্তুত।"

"চলুন তাহলে ভেবে দেখি।"

"কোথা যাব?"

"আমার সঙ্গে আসুন।"

"কোথা নিয়ে যাচ্ছে আগে বল।"

"আমার শয়নকক্ষে।"

"সেখানে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো?"

"বিপদ বরণ করতে তো আপনি প্রস্তুত!"

"কুমার কোথা আছেন?"

"তিনি নিজের ঘরে আছেন। আমার ঘরে তিনি যদি এসেও পড়েন আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।"

"চল।"

সুরঙ্গমা ভূমি হইতে বর্তিকাটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। চার্বাক তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নেই।

হঠাৎ সুরঙ্গমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সিংহটা গর্জন করিতেছে। একটু থামিয়া পুনরায় গর্জন করিল। গর্জনের পর গর্জন হইতে লাগিল। তাহার পর চতুর্দিক নীরব হইয়া গেল। সুরঙ্গমা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চার্বাক অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। সিংহের প্রচণ্ড গর্জনে চতুর্দিক পুনরায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গর্জন হইল, মনে হইল যেন দুইটা সিংহ ডাকিতেছে। পর পর দুইটা ডাক দুই রকম।

সুরঙ্গমার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মির্মির সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া ওই পুরুষ-সিংহকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন, সিংহিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া ওই প্রবল প্রতাপে বলিষ্ঠ পশুরাজ বন্দী হইয়াছিল। মির্মির কি পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে? সুরঙ্গমা দ্রুতপদে মির্মিরের গৃহের দিকে আগাইয়া গেল। দেখিল তাহার ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। পুনরায় গর্জন হইল। পর পর দুইবার—একটা আহ্বান আর একটা উত্তর। সুরঙ্গমা বাহির হইয়াছিল কুমারের সন্ধানে। যে নূতন ক্রীড়নকটি লইয়া খেলা করিতে তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন সেটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল। নিদ্রামগ্ন দুর্ধর্ষ চার্বাককে দূর হইতে দেখাইবার জন্য সে কুমারকে ডাকিতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সিংহের গর্জনে সে ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মির্মির লোকটা পাগল না কি! মির্মিরের শূন্যকক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুরঙ্গমা আবার বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া সুন্দরানন্দের গৃহের উদ্দেশেই আবার পদচালনা করিল সে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। কাননের পক্ষীকুল সহসা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। তাহার পর আবার থামিয়া গেল।

···কুমার সুন্দরানন্দের গৃহের সম্মুখে একটি শিবিকা দেখিয়া সুরঙ্গমা বিস্মিত হইল। শিবিকায় কে আসিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরঙ্গমা আরও বিস্মিত হইল। দেখিল একটি বিগত-যৌবনা রমণী কুমারের সহিত আলাপ করিতেছে। তাহার নয়নে অশ্রু। সুরঙ্গমাকে দেখিয়া সে নীরব হইল এবং অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

কুমার হাসিয়া বলিলেন— এই যে সুরঙ্গমাও এসে পড়েছ দেখছি। ভাল সময়েই এসেছ, বস।

সুরঙ্গমা একটি আসনে উপবেশন করিয়া নবাগতার দিকে কয়েকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুমার তাহার পরিচয় দিলেন।

"এই ভদ্রমহিলা জানি না কি করে খবর পেয়েছেন যে আমি যজ্ঞে জোর করে একটি নারী বলিদান দিচ্ছি। উনি এ খবরও পেয়েছেন যদি অন্য কোনও নারী আমার এ যজ্ঞে স্বেচ্ছায় আত্ম-বিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে প্রথম নারীটি অব্যাহতি পাবে। সেজন্য উনি নিজেকে যূপকাষ্ঠে সমর্পণ করতে এসেছেন এবং আমাকে অনুরোধ করছেন প্রথমা নারীটিকে মুক্তি দিতে।"

সুরঙ্গমা নির্বাক বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কুমার সুরঙ্গমাকে দেখিয়া বলিলেন—"ইনিই সেই নারী যিনি যজ্ঞে আত্মাহুতি

দিতে চাইছিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্বত এঁকে মনোনীত করেন নি। কোনও নারীকেই তিনি নির্বাচন করবেন না। অন্য ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আপনি পথশ্রান্ত হয়েছেন নিশ্চয়, একটু বিশ্রাম করুন। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার দ্বারা আপনার যদি কোনও উপকার হয় তা আমি নিশ্চয় করব।"

এইবার মহিলাটি সুন্দরানন্দের মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি মহৎ নই, আমি অতি নগণ্য, সামান্য রূপজীবী মাত্র। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার যজ্ঞের কথা শুনলাম। তখন মনে হল আমার এই তুচ্ছ জীবন যজ্ঞে সমর্পণ করলে যদি কোনও নিরীহ রমণীর প্রাণরক্ষা হয় তাহলে তাই করা উচিত। সেইজন্যই আমি এসেছি। আমার জীবনে সুখের লেশমাত্র নেই, অনেক সন্ধান করেও সুখের নাগাল আমি পাইনি, তাই আমি জীবন-বিসর্জন করতে চাই, আমাকে মহৎ বলে মহত্ত্বের অপমান করবেন না। আমি মহৎ নই, হতভাগিনী।"

কুমার একথায় বিচলিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"হর্ষ-নীড় থেকে।"

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কি?"

"নীলোৎপলা।"

কুমার বলিলেন, "বেশ, আপনি যতদিন খুশী আমার কাছে থাকুন। আপনি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।"

যে ভৃত্যটি বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল সুন্দরানন্দ তাহাকে আদেশ দিলেন নীলোৎপলার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। প্রণাম করিয়া নীলোৎপলা ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেল।

কুমার সুরঙ্গমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন— "তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবাই প্রাণ বিসর্জন করতে চায়। কেবল চার্বাক নয়, নীলোৎপলাও। মহর্ষি কোথায় এখন?"

"আমার শয়নকক্ষে, দেখবেন চলুন।"

"সেখানে কি করছেন তিনি? প্রাণ-বিসর্জন দেবার মহড়া দিচ্ছেন না কি?"

"না, ঘুমুচ্ছেন। উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি ঘুম হয়নি মহর্ষির।"

"সত্যি কি তোমার জন্য প্রাণ-বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন উনি?"

"হয়েছিলেন, এখন কিন্তু মত পরিবর্তন করেছেন। বলছেন মোহগ্রস্ত হয়ে উনি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন বলে লজ্জিত।"

“এখন মোহমুক্ত হয়েছেন বুঝি।”

“না, মোহমুক্ত হবার বাসনাই ওঁর নেই। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ উনি আর করবেন না। আমি সুলভ নই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উনি বিষণ্ন অন্তঃকরণে ফিরে যেতে চাইছিলেন, আমি জোর করে ওঁকে ফিরিয়ে এনেছি।”

“কেন?”

“আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। এতক্ষণে লোকটিকে ভাল লেগেছে।”

কুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, “কেন লেগেছে বুঝেছি।”

“কেন বলুন তো?”

সুরঙ্গমার নয়নে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

“তুমি যে দুর্লভ—এই সত্যটা ওঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে বলে।”

“আমি দুর্লভ একথা আপনিও বলবেন?”

“সত্যি কথা বললে তাই বলতে নয়। আমি সত্যই তোমাকে লাভ করেছি কি না ঠিক জানি না এখনও।”

সুরঙ্গমা উঠিয়া আসিয়া সুন্দরানন্দের কণ্ঠলগ্না হইল।

“জানেন, নিশ্চয় জানেন। বলুন জানেন।”

সুন্দরানন্দের অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই হাসিকে সুরঙ্গমার বড় ভয়। এই হাসি নীরব ভাষায় যেন বলে—আমাকে চেন না? আমি পুরুষ। আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছি, যে কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারি।

“বলুন।”

“যা অনেকদিন থেকে জান, তা আবার নতুন করে শুনতে চাইছ কেন। তার চেয়ে চল, তোমার নূতন প্রণয়ীটির সঙ্গে আলাপ করে আসি।”

“প্রণয়ী বলছেন কেন। খেলনা বলুন। আপনিই তো দিয়েছেন।”

“বেশ খেলনাই। চল আলাপ করি। একটু কিন্তু ভয় ভয় করছে।”

“কেন?”

“লোকটি শুনেছি অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিত লোকের কাছে কি বলতে কি বলে ফেলব।”

“আপনি কুমার সুন্দরানন্দ। আপনি যা বলবেন তাই সুন্দর, যা করবেন তাই আনন্দজনক।”

সুরঙ্গমা আবেগভরে তাঁহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। তাহার পর উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া কুমার দেখিলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী জিমভ্রক

দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। গতিরোধ করিতে হইল। মন্ত্রী মহাশয় প্রায় ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কুমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সিংহটা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। ঝিমির কাছের একটা ঝোপে ছিলেন। সিংহের কবলে পড়েছেন তিনি। সিংহটা তাঁকে এতক্ষণ নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমাদের ভয় হচ্ছে আর কিছু না করে। অনেকে এ খবর জানেই না। বিশ্বনাথ নামে কর্মচারীটি ছুটে এসে খবরটি দিলে আমাকে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার।"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি তীক্ষ্ণমুখ ছোরা এবং ধনুর্বাণ সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সুরঙ্গমার হস্তে ধনুর্বাণ দিয়া বলিলেন—"তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। সাহসও আছে। তুমিই চল আমার সঙ্গে। মন্ত্রীমহাশয় আপনি এখানে থাকুন।"

"কোথা যাচ্ছেন আপনারা? হঠকারিতা করবেন না। মনে রাখবেন এ কস্তুরী মৃগ নয়, সিংহ।"

কুমারের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিল।

বলিলেন—"রাখব।"

সিংহের খাঁচার নিকট গিয়া দেখা গেল খাঁচাটি সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছে, একটা গাছের গুঁড়ি হেলিয়া পড়িয়াছে।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি বলিল—"একটু আগে উনি সিংহটাকে সেই রকম শব্দ করে উত্তেজিত করছিলেন, আমি নিজে শুনেছি।"

নিকটে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল।

"সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চল এইটেতে ওঠা যাক। দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়।"

গাছে উঠিয়াই বীভৎস দৃশ্যটি সুন্দরানন্দ দেখিতে পাইলেন। গাছের নীচেই একটি ঝোপের ধারে বসিয়া সিংহটি ঝিমিরকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, "আমি তীর ছুঁড়ব?"

"না, দরকার হলে পরে ছুঁড়ো।"

এই কথা বলিয়া কুমার বৃক্ষশিখর হইতে বিদ্যুৎবেগে লম্ফ দিয়া সিংহের উপর গিয়া পড়িলেন এবং প্রকাণ্ড ছোরাটি তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বসাইয়া দিলেন। সিংহের গর্জনের সহিত সুরঙ্গমার চীৎকারও মিশিল, কারণ সুরঙ্গমাও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সুন্দরানন্দ লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন সিংহের পিঠের উপর, সুরঙ্গমা পড়িল তাহার ব্যাদিত মুখের সম্মুখে। সুন্দরানন্দ যদি ত্বরিত গতিতে

লাফাইয়া উঠিয়া সুরঙ্গমাকে সরাইয়া না লইতেন সুরঙ্গমারও সেদিন মৃত্যু হইত। ছোরার আঘাতে সিংহের মেরুদণ্ড এবং হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে গর্জন করিতেছিল বটে কিন্তু উঠিতে পারিতেছিল না। কুমার সুরঙ্গমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইলেন, সুরঙ্গমার মৃণাল বাহু কুমারের বলিষ্ঠ গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। সুরঙ্গমা কাঁপিতেছিল। কুমার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"কাঁদছ নাকি?"

"না।"

সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের বুকে মুখ লুকাইয়াছিল।

"কই দেখি।"

সুরঙ্গমা কুমারের মুখের দিকে চাহিল। দেখিলেন তাহার নয়নপল্লব আর্দ্র, কিন্তু মুখে হাসি। সিংহ পুনরায় একটা গর্জন করিয়া নীরব হইল।

কুমার বলিলেন, "চল এইবার তোমার নূতন খেলাটা দেখে আসি। তারপর মির্মিরের শেষকৃত্য করা যাবে।"

॥ ২৭ ॥

প্রজাপতিযুগল কবির ঘরে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। কবি তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন না, কারণ তাহারা এবার টেবিল-বাতির শেডের উপর বসে নাই, কবির ঠিক মাথার উপর ছাতে বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল পাশাপাশি যেন দুইটি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র আঁকা আছে। কবি কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"যে আলেয়াকে কেন্দ্র করে আমার স্বপ্নজীবনে ও বাস্তবজীবনে সত্য-মিথ্যার বিচিত্র লীলা মূর্ত হয়েছে, দূরবীণের পরকলার ভিতর দিয়ে যার কাছে দৃষ্টির দূত পাঠিয়েছি দিনের প্রখর আলোকে, রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেও—সেই আলেয়া দেখতে দেখতে সামান্য কেরোসিনের ডিবে হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, আমার ঘরের ভিতরে এসে দুর্গন্ধ এবং ধূমও বিকীরণ করতে লাগল সে যখন তখন। নিঃসংশয়ে বুঝলাম সে তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছে, আত্মদান করেছে ওই নিত্য-নূতন-মোটর-বিহারী লোকটার কাছে, প্রেমের জন্য নয়, অর্থের জন্য। আলেয়ার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি ভাবি, কিন্তু দেখি কিছু সংশয় থেকেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর মধ্যে এমন একটা কি আছে যা আমি এখনও ধরতে পারিনি—যা···অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে মোহ গিয়েও

যেন থেকে যাচ্ছে। আমি নিজে লাইফ ইনশিওরেন্সের দালাল, ওকে আমার কোম্পানীর এজেণ্ট করে নিয়েছি, যা কাজ পাই তার অর্ধেক ওকেই দিই। প্রায় রোজই আসে ও আমার কাছে, ওর জন্যে অপেক্ষাই করি রোজ, কিন্তু সুখ পাই না, নাগালের মধ্যে পেয়েও মনে হয় পাইনি, নীচে সেই বলিষ্ঠ ছোকরা স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকে, কখনও হিলম্যান, কখনও ফোর্ড, কখনও বা অস্টিন। মনে মনে ভাবি ছিছি আলেয়া কতখানি নেবে গেছে! কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারি না। আলেয়া সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কৃতার্থ হয়ে গেছি। শেষে একদিন আমাকেও নাবতে হল। যা এতদিন আভাসে-ইঙ্গিতে ঠারে ঠোরে বলবার চেষ্টা করছিলাম তা স্পষ্ট করে বলে ফেললাম একদিন।

"আলেয়া তুমি একদিন ট্যাক্সি করে একা এস। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দেব। ও লোকটাকে সঙ্গে করে এনো না!"

আলেয়া মুখ টিপে একটু হেসে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—"হঠাৎ এ অনুরোধ?"

"তোমাকে আমি চাই। নীচে একজন পাহারাদার বসে থাকলে তোমাকে পেয়েও যেন পাই না।"

আলেয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে চাইলে একবার, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার মুখের মৃদু হাসিটা নিবে গেল।

"আসবে?"

আমার দিকে ফিরে আবার কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মনে হল মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"কথা বলছ না কেন! আসবে? আজই রাত্রে এস, এগারটার পর অপেক্ষা করে থাকব।"

"আপনার কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি।"

একটা রূঢ় সুর ধ্বনিত হল তাহার কণ্ঠস্বরে।

"আমি বহুকাল ধরে তোমাকে চাইছি। তোমার বিয়ের আগে থেকে। তোমার যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন—।"

আবেগভরে সমস্ত কথা বললাম, মনে হল বললাম, কিন্তু কি যে বললাম তা মনে নেই। সমস্ত শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল আলেয়া।

"আসবে? এস, বুঝলে?"

"ভেবে দেখব।"

উঠে দাঁড়াল সে।

"তোমার জন্ত অপেক্ষা করব আজ রাত্রে।"

কোন উত্তর না দিয়ে নেবে গেল। একটু পরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেলাম, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড দামী মোটরখানা চলে যাচ্ছে।

সেদিন সত্যিই অপেক্ষা করছিলাম তার জন্তে। দূরবীণ হাতে নিয়ে বসেছিলাম জানালার কাছে। হঠাৎ কি মনে হল দূরবীণ দিয়ে অবন্ধনার ঘরটাও দেখতে লাগলাম। অবন্ধনার ঘর প্রায়ই দেখতাম রাত্রে বসে, যতক্ষণ না আলো নিবে যেত। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত শিখর সেন আসার পর থেকে। বারান্দার আলোটা জলছিল সেদিন কেন জানি না। রাজমিস্ত্রি এসে অবন্ধনার দরজার সামনে কি যেন করছিল দিনের বেলা। কাঁচা সিমেণ্টে পাছে কেউ পা দিয়ে দেয় তাই বোধহয় আলোটা জেলে রেখেছে···অবন্ধনার ঘরের কপাট খোলা·· ঘরে আলো জলছে না। তারপরই তাকে দেখতে পেলাম যে অবন্ধনাকে খুন করছে···চুপি চুপি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। তখন ভাবতেই পারিনি যে ও অবন্ধনাকে খুন করবার জন্তে ঘরে ঢুকছে। অবন্ধনা যে মারা গেছে তা-ও আমি জেনেছিলাম অনেক পরে, কারণ একটু পরেই আমাকে কোলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ···টং করে ঘড়িতে একটা বাজল। মনে হ'ল আলেয়া আর আসবে না, শোওয়ার জোগাড় করছি এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল আমার বাসার সামনে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। আলেয়াই এসে ঘরে ঢুকল। দেখলাম সে-ও কাঁপছে!

"আমাকে বাঁচান আপনি।"

আমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি তুলে সোফায় বসালাম।

"কেন, কি হয়েছে।"

"উনি এসেছেন।"

"উনি মানে?"

"আমার স্বামী। এলাহাবাদ থেকে সোজা চলে এসেছেন মোটরে।"

"কে নিরুপমবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর? বিক্রমবাবু কোথা?"

"তিনি নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে আসব বলে। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছিলাম এমন সময়ে কে যেন হুড়মুড় করে বিক্রমবাবুর ঘরে ঢুকল। কপাটের

ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি। আমি আর দাঁড়ালাম না, সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। আপনি বাঁচান আমাকে।

"নিশ্চয় বাঁচাব, ভয় কি?"

"আমাকে কোলকাতার বাইরে নিয়ে চলুন। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। উনি হয়তো খোঁজ পেয়ে এখানেও চলে আসবেন।"

"এলেই বা। এটা কি মগের মুলুক। অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"ওঁর হাতে একটা বন্দুক দেখলুম। না, না, কমলবাবু, বড্ড ভয় করছে আমার। চলুন, পালাই এখান থেকে। এখুনি চলুন।"

"এখুনি? কোথায় যাব। কোলকাতার বাইরে গিয়ে থাকব কোথায়? হোটেলে থাকাটা কি ভাল দেখাবে?"

"বিক্রমবাবুর মধুপুরে বাড়ি আছে একটা। সেখানকার মালী চেনে আমাকে, একবার গিয়েছিলাম। সেইখানে যাই চলুন।"

'আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আবার কিছু বলবে না তো?"

"কে কি বলবে। চলুন, এই ট্যাক্সিতেই বেরিয়ে পড়ি।"

একটু ইতস্তত করছিলাম তবু।

আলেয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে অনুনয় করতে লাগল, "চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।"

যেতে হল। অবঞ্চনার খবর রাখবার অবসরই পেলাম না।

·

ফিরলাম এক মাসেরও পরে। আলেয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফিরলাম। আলেয়া একটা ইঁদারার ভিতর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। এসে শুনলাম অবঞ্চনাও মারা গেছে। হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল সব। রাত্রি প্রভাত হ'ল, না দিবস রাত্রিতে উত্তীর্ণ হ'ল, স্বপ্ন বাস্তব হ'ল, না বাস্তব স্বপ্নে হারিয়ে গেল—তা জানি না। সব বদলে গেল কিন্তু। মনও। দূরবীণটা বিক্রি করে দিলাম। নূতন একটা দূরবীণ পেলাম নিজের অন্তরে। সে দূরবীণ দিয়ে দেখতে লাগলাম আলেয়াকে নয় সুনন্দাকে। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম অবঞ্চনার রহস্যময় মৃত্যুর কারণটা পুলিশ এখনও নাকি আবিষ্কার করতে পারেনি। অনুসন্ধানের ভার পড়েছে নাকি শিখর সেনের উপর। প্রথমটা বিস্মিত হলাম, তারপর মনে একটু কৌতুক জাগল। শিখর সেন? মনের অবস্থা যদি পূর্বের মতো থাকত তাহলে হয়তো চেষ্টা করে শিখর সেনের সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু মনের সে অবস্থা ছিল না, শিখর সেনের সঙ্গে পথেও যদি দেখা হ'ত

তাহলেও হয়তো বলতাম, কিন্তু যোগাযোগ হ'ল না। তখন শিখর সেনের মানসিক অবস্থা কি ছিল তা জানতে পারছি তার ডায়েরী থেকে। শিখর সেন লিখছে— সমস্ত দিন দ্বন্দ্ব করেছি নিজের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মনের মধ্যে যে নির্মম বিচারক বসে আছেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে চান না। তাঁর সিদ্ধান্ত অবন্ধনার মৃত্যু হওয়া উচিত। ওই পাপীয়সীকে মৃত্যু দণ্ড না দিলে অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে ও। ব্যক্তিগত মায়া-মমতার স্থান নেই কোন বিচারে। তিনি যেন সমস্তক্ষণ আমার কানে কানে বলছেন—শিখর সেন, বিচলিত হয়ো না। সমাজের রক্ষক তুমি, যারা অসহায়, যারা অন্যায়ভাবে পীড়িত, তারা তোমার উপর বিশ্বাস করে আছে, তুমি বিশ্বাস-ঘাতক হবে? এর জন্যেই কি মাইনে খাচ্ছ তুমি? এই নির্মম বিচারকের সঙ্গে তর্ক করছিল আমারই মনের আর একটা অংশ। ঠিক তর্ক করছিল না, দর্শনের উচ্চ শিখরে বসে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিল। সে বলছিল, তুমিও কত দোষে দুষ্ট মানুষ, বিচার করবার কি অধিকার আছে তোমার? মানুষ কেন পাপের পথে পা বাড়ায় তা কি তুমি জান না? সে জ্ঞান তোমার যদি হয়ে থাকে তাহলে কি তুমি শাস্তি দিতে পার? তুমি ভালবাসতে পার, ক্ষমা করতে পার—শাস্তি দিতে পার না. অবন্ধনা নিজেই হয়তো নিজেকে শাস্তি দেবে একদিন। সায়ানাইডের শিশিটা কি দেখনি সেদিন? নির্মম বিচারক বললেন, ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই আমার। আমার কর্তব্য আইন অমান্যকারীকে আদালতে হাজির করে দেওয়া। নিতান্তই তা যদি না পারি এমন ব্যবস্থা করা যাতে ও আর বে-আইনি কাজ না করতে পারে। ব্যক্তিগত মায়া-মমতার স্থান নেই এতে। ব্যক্তিগত ঘৃণা-ভালবাসার প্রকোপে যে মানুষ কর্তব্য থেকে বিচলিত হয় সে মানুষ নয়, অমানুষ. নির্বিকার কর্তব্যপরায়ণ মানুষই মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।··সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি··চোখের সামনে সেই সায়ানাইডের শিশিটাও মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার, আর মাথার শিয়রে টেবিলের উপর রাখা সেই জলের গ্লাসটা। সমস্ত দিন পরে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন ফিরছিলাম তখন ভাবতে ভাবতে আসছিলাম অবন্ধনাকে আবার একবার বোঝাব ভাল করে। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। নীচে দেখলাম সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে· অবন্ধনা নেবে এল, আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।··বোর্ডিংয়ের জানলা কপাটে রং দিচ্ছে, সিঁড়ির রেলিঙেও রং দিয়েছে··উঠতে গিয়ে হাতে রং লেগে গেল। অবন্ধনার মুচকি হাসিটা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, রাতে কিছু খেলামও

না, খাবার প্রবৃত্তিও হল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে চাকরটা দেখলাম জাগাচ্ছে আমাকে। সাধারণত কেউ আমাকে জাগায় না, একটু অস্বাভাবিক মনে হল। বিরক্তও হলাম।

"কিরে, ডাকছিস কেন ?"

"ওপরে যে নার্স মাইজি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন ? বলিস কি ?"

উঠে বসলাম তড়াক করে। চাকরটা বললে—"ওঁর ঘরের কপাট তো খোলাই থাকে, আমি রোজ ভোরে গিয়ে ওঁকে চা করে দিয়ে আসি। আজও চা করে ওঁকে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পেলাম না, কি করব ভাবছি, একটা দমকা হাওয়ায় ওঁর মুখের পাতলা চাদরটা উড়ে গেল, মুখ দেখে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি গেলেন, গিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—"মারা গেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন। ম্যানেজারবাবু হাউ হাউ করে কাঁদছেন বসে। চলুন আপনি।"

গিয়ে দেখলাম অবু সত্যিই মারা গেছে। কি রকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সঞ্চারিত হল। নির্মম বিচারক বললেন—আপদ গেছে। কিন্তু আমার আর এক 'আমি' হায় হায় করতে লাগল! অবু, আমার অবু, আর তাকে দেখতে পাব না ? আর সে কথা কইবে না ?

আমার আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে গেল তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। অবঞ্চনার মাথার কাছে যে জলের গ্লাসটা আছে সেটার ঢাকা খোলা, তাতে আধ-গেলাস মাত্র জল রয়েছে, গ্লাসের গায়ে সবুজ রঙের দাগ—যে সবুজ রং বোর্ডিংয়ের চতুর্দিকে লাগানো হচ্ছে সেই রং। পাশেই সায়ানাইডের শিশিটা খোলা, তাতেও রং। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপও উঠেছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট পায়ের দাগ। অবঞ্চনার ঘরের চৌকাঠের সামনে খানিকটা জায়গায় কাল বিকেলে সিমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই সিমেণ্টের উপর পায়ের স্পষ্ট দাগ রয়েছে।

অবঞ্চনার মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত করবার ভার আমিই পেয়েছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে সায়ানাইড খেয়েই ওর মৃত্যু হয়েছে। ও কি নিজে ইচ্ছে করে সায়ানাইড খেয়েছে ? তাহলে সে কথাটা কি ও লিখে যেত

না ? কাচের গ্লাসের গায়ে কার আঙুলের ছাপ রয়েছে ? অবন্ধনার ডান হাতে সামান্য একটু রং ছিল বটে, কিন্তু ওর আঙুলের ছাপের সঙ্গে গ্লাসে যে ছাপ পাওয়া যাচ্ছে তার কিছুমাত্র মিল নেই। তাছাড়া ওই পায়ের দাগটাই বা কার ? বোর্ডিংয়ের অনেকেরই আঙুলের ছাপ আর পায়ের ছাপ নিয়ে পাঠিয়েছি বিশেষজ্ঞের কাছে, যারা যারা অবন্ধনার ঘরে আসত সকলেরই—ম্যানেজারের, চাকরটার, আরও তিনজনের, সেই কালোবাজারীটাকে অ্যারেষ্ট করেছি, তারও আঙুলের ছাপ পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছে······

রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ লিখছেন—যে পায়ের ছাপ সিমেণ্টের উপর পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে একজনেরও পায়ের ছাপ মেলেনি। আঙুলের ছাপও নয়।

আশ্চর্য, কার ছাপ তাহলে ওগুলো! একটা লোক না একাধিক লোক ছিল ? রহস্যের সমাধান কিন্তু করতেই হবে। অবন্ধনা আত্মহত্যা করেনি। ওর খাবার জলের সঙ্গে কেউ সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। কে সে ? কেনই বা দিলে ? ঘর থেকে একটি জিনিস তো চুরি যায়নি। প্রণয়-ঘটিত ঈর্ষা ? প্রতিহিংসা ? হতে পারে। অবন্ধনা যে সমাজে ঘুরে বেড়াত সে সমাজ ভদ্র সমাজ নয়। লোকটাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করবই··।"

শিখর সেন যে আমারই সহায়তায় শেষকালে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ডায়েরীর যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত করেছি ঠিক তার পরেই আমার সঙ্গে শিখরের দেখা হয়ে গেল রাস্তায়।

"তার পর, কি খবর, অনেকদিন দেখা হয়নি তোর সঙ্গে।"

শিখর দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ তার চোখের দিকে তাকাই নি, তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। অমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখিনি। আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, অনেকক্ষণ কোন কথাই বলল না।

"কি করছিস আজকাল ?"

"আমি ? কি আবার করব !" একটু হেসে উত্তর দিলে সে—"চাকরি করছি। না, আজকাল চাকরির চেয়ে বেশী কিছু করছি ! অবন্ধনা মারা গেছে শুনেছিস তো ? সেই যে নার্স একটি তেতালার ঘরে থাকত—সে কে জানিস ? অবু।"

"জানি, সব শুনেছি। যে রাত্রে সে মারা যায় সেই রাত্রেই আমি কোলকাতার বাইরে চলে যাই। তার মৃত্যুর একটু আগেই বোধহয় তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, না ?"

"আমি ? না, সেদিন ওর ঘরে আমি যাইনি তো। এসেই শুয়ে পড়েছিলাম।"

"কিন্তু সেদিন রাত এগারোটার পর আমি আমার ঘরের জানালায় দূরবীণটা নিয়ে বসেছিলাম। দেখলাম তুই অবন্ধনার ঘরে ঢুকছিস। স্পষ্ট দেখলাম।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল শিখর সেনের মুখটা। তারপর সামলে নিয়ে বললে— "ভুল দেখেছিস। আমি সেদিন তেতালায় উঠিইনি।"

তারপর হেসে বললে, "পাগল না কি! রাত্রি এগারোটার পর ওর ঘরে ঢুকতে যাব কেন!"

বলেই ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, মনে হল যেন নূতন একটা আলোকপাত হল ওর মনে। তারপর হন হন করে চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইলে না আর।

এর দিন সাতেক পরে দেখা হল উমেশ-মামার সঙ্গে। উমেশ-মামাও পুলিসে চাকরি করতেন। তিনি যা বললেন—তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। সেদিন যখন শিখর হন হন করে চলে গেল তখন আমি মনে করলাম আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে বেচারা, আর হয়তো জীবনে আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু উমেশ-মামা বললেন, ও না কি নিজে গিয়ে ধরা দিয়েছে। নিজের পায়ের ছাপ আর আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের কাছে নিজেই পাঠিয়ে ছিল, সিমেণ্টের ওপর আর গ্লাসের ওপর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে না কি হুবহু মিলে গেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"শিখর আছে কোথায় এখন ?"

"হাজতে, পুলিশের হেপাজতে। ও নিজেই ইচ্ছে করে না কি জেলে গিয়ে ঢুকেছে। বলেছে আমার মানসিক অবস্থা এমন যে, যে কোনও মুহূর্তে আমি আবার খুন করতে পারি। আমাকে জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়।"

আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ হ'তে লাগল। একটা কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও নিজেই যদি অবন্ধনার জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে থাকে তাহলে ও অন্য লোকের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ নিয়ে বেড়াচ্ছিল কেন ? লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ? নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত ডাইরীতে এ সব লেখার কি দরকার ছিল তাহলে ? লোকের চোখে ধুলো দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে কি সে নিজেই নিজের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করাতো ? আমার যা মনে হচ্ছিল তা উমেশ-মামাকে বললাম।

উমেশ মামা বললেন—"ও বলছে, 'আমি যা করেছি তা ঘুমের ঘোরে করেছি। সজ্ঞানে করিনি।' ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে ও আগেও না কি উঠে

যেত। ওটা একটা অসুখ, সম্‌নাম্‌বুলিজ্‌ম্‌, না কি একটা বিদঘুটে নাম ও অসুখের।"

আমি নির্বাক হ'য়ে রইলাম।

মাস দুই পরে খবর পেলাম শিখরের ফাঁসী হয়ে গেছে। শিখর নিজের স্বপক্ষে কোনও উকিল নিযুক্ত করেনি। সে কেবল বলেছিল— অবন্ধনার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। ওর অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্য আমি ওর মৃত্যুকামনা করেছিলাম। সজ্ঞানে ওকে মারবার সাহস বা ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই ঘুমের ঘোরে আমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।"···

চুপ করে বসে বসে ভাবছিলাম। শিখরের কথা নয়, আলেয়ার কথা। আলেয়ার মৃত্যুর জন্যও কি আমি দায়ী নই? বাগান-বাড়ির পিছনে সেই প্রকাণ্ড ইঁদারাটা কি আমিই তাকে দেখিয়ে দিইনি? আমি কি তাকে বলিনি— 'অপমানে জর্জরিতা হয়ে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক যুগের সীতাদের যদি পাতাল-প্রবেশ করতে হয় তাহলে ইঁদারায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, জননী বসুন্ধরা তাকে নেবার জন্যে পাতাল থেকে সিংহাসন পাঠাবেন না।" বলেছিলাম অবশ্য রসিকতা করে। স্বপ্নেও ভাবিনি সে রসিকতা এমন মর্মান্তিক সত্য হয়ে উঠবে।··· কল্পনা করছিলাম দূর আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে, বিক্রমবাবু পাইলট্‌, আলেয়া যাত্রিণী, আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে··· ।

হঠাৎ দুয়ারের কড়া নড়ল। উঠে কপাট খুলে দিলাম। দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন।

"আপনার নাম কি কমল-কিশোরবাবু?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছি। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। মধুপুরে আপনি কি আলেয়া দেবীর সঙ্গে ছিলেন?"

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল কেবল।

গল্প লেখা শেষ করিয়া কবি বাতায়নের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কেমন যেন দুঃখ হইতেছিল। যে চরিত্রগুলি এতক্ষণ তাঁহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। নিজেই তিনি সব শেষ করিয়া দিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, দুইটি অপূর্ব

প্রজাপতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্বেই তাহারা বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

॥ ২৮ ॥

মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি পর্বতের তত্ত্বাবধানে সামান্যতম ত্রুটি ঘটিবারও অবকাশ ছিল না। অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা এবং মৈত্রী-বরুণ এই ছয়জন ঋত্বিক অভিনিবেশ সহকারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আহবনীয় অগ্নির পূর্বদিকে যথারীতি পাশুক বেদি এবং পাশুক বেদির উপর উত্তর বেদি নির্মিত হইয়াছিল। অধ্বর্যু উত্তর বেদির নাভিতে নূতন আহবনীয় অগ্নি স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। পুরাতন আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রক্ষিত হইয়াছিল, দুইজন মন্ত্রপাঠ করিয়া অরণি ঘর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পশু বন্ধনের জন্য অষ্ট-কোণ কাষ্ঠ-নির্মিত যূপ ইতিপূর্বেই প্রোথিত হইয়াছিল, যূপের মস্তকে চষাল নামক মুকুটটি শোভা পাইতেছিল, যূপকাষ্ঠকে ঘৃতলিপ্ত করিয়া যূপাঞ্জন-কর্মও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। যে বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে মহর্ষি পর্বত মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সে কখনও নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিল, কখনও বা সরবে ক্রন্দন করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করিতেছিলেন না। সুন্দরানন্দের ধর্মপত্নী সর্বশুক্লা দেবী যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি না আসিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হইত। সুন্দরানন্দ ও সর্বশুক্লা যথাস্থানে বসিয়া ঋত্বিকগণের আদেশ পালন করিতেছিলেন। যজ্ঞের কর্ম যথাবিধি চলিতেছিল। বালকের রোদন, মন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি, উদার সামগান যজ্ঞমণ্ডপে এক অদ্ভুত বাঙ্ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘৃতাহুতির ধূমে যজ্ঞাগ্নির শিখায়, বিবিধ উপচারসম্ভারে ঋত্বিকগণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে যেন যুগপৎ আশা ও আশঙ্কা সূচিত হইতেছিল। একটা অসম্ভব কিছু এখনই বুঝি সম্ভব হইবে।

সর্বশুক্লা দেবী প্রথমে শুনিয়াছিলেন এই যজ্ঞে নর্তকী সুরঙ্গমাকে না কি আহুতি দেওয়া হইবে। সংবাদটি তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রোণীগ্রামে তাঁহার শিবিকা যখন প্রবেশ করিল তখন কুলিশপাণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কুলিশপাণি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে তিনি শুনিলেন মহর্ষি পর্বত সুরঙ্গমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করেন নাই। এক অসহায় শবর-বালককে সেজন্য না কি কিনিয়া আনা হইয়াছে। কুলিশপাণির সহিত এ বিষয় তাঁহার কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। এ সংবাদে

তাঁহার মনের ভিতর কি হইতেছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না, তাঁহার মুখভাবেও কোন পরিবর্তন কেহ লক্ষ্য করেন নাই। রাজকুলবধূর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীর পার্শ্বে যজ্ঞস্থলে তিনি শান্তমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সীমান্তের সিন্দূররাগ তাঁহার ক্ষৌম বসনের দ্যুতি, তাঁহার অনবদ্য গম্ভীর সৌন্দর্য যজ্ঞস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

একাদশ দেবতার উদ্দেশ্যে একাদশটি প্রযাজ দিতে হয়। প্রথম দশটি প্রযাজে আহুতির উপকরণ আজ্য অর্থাৎ ঘৃত। একাদশ প্রযাজে আহুতির উপকরণ নিহত পশুর বপা অর্থাৎ উদরের অভ্যন্তরস্থিত চর্বি। দশম দেবতা বনস্পতির উদ্দেশ্যে হোতা যখন আপ্রী পাঠ করিতেছিলেন তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাহিরে পশুবধের আয়োজন চলিতেছিল। শমিতা (পশুঘাতক) মশাল হস্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। এমন সময় অতিশয় দ্রুতবেগে, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে কুলিশপাণি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন—"কুমার কোথায় ?"

"যজ্ঞস্থলে আছেন। বনস্পতির আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এইবার হোতা আমাকে এসে পশুবধে নিয়োগ করবেন। কুমারও সঙ্গে থাকবেন। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি ?"

"অতিশয় শোকাবহ। কুমারের সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অধ্বর্যু, অগ্নীৎ, মহর্ষি পর্বত এবং কুমার যজ্ঞস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কুমার, একটি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

"দুঃসংবাদ ? কি দুঃসংবাদ !"

"নর্তকী সুরঙ্গমা মারা গেছে।"

"সুরঙ্গমা মারা গেছে ? কি করে ?"

কুলিশপাণি বলিলেন—"আপনারা যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন, আমি বনের উত্তর-পূর্ব কোণে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। খবর পেয়েছিলাম শবর-পল্লী থেকে কিছু শবর-যুবক এসে এই যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ঝোপের অন্তরালে কি যেন নড়ছে। আশঙ্কা হল হয়তো কেউ লুকিয়ে আছে। কাছে একটা গাছ ছিল। লক্ষ্য করবার সুবিধা হবে বলে সেই গাছে

উঠলাম। উঠে দেখলাম—যা দেখলাম তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। বিশেষত এ সময়ে।"

কুলিশপাণি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কুমার বলিলেন—"নষ্ট করবার মতো সময় হাতে নেই। যা বলতে চাও অবিলম্বে বলে ফেল।"

"দেখলাম স্বরঙ্গমা চার্বাকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আর চার্বাক মাঝে মাঝে তাকে চুম্বন করছে। চার্বাককে জীবিত বা মৃত ধরে আনবার আদেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আমার সঙ্গে খুব তীক্ষ্ণ একটা ছোরা ছিল। চার্বাককে লক্ষ্য করে সেটা নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু সেটা লাগল গিয়ে স্বরঙ্গমার বুকে। স্বরঙ্গমা আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। লাফিয়ে পড়বামাত্র চার্বাক ব্যাঘ্র-বিক্রমে এসে আমাকে আক্রমণ করলে। সুতরাং তাকেও হত্যা করতে হল।"

মহর্ষি পর্বত বলিলেন—"বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও।" সর্বশুক্লাও স্বামীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার অধরে ও নয়নে ক্ষণিকের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কুলিশপাণি আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কেবল সুন্দরানন্দের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, তিনি প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

॥ ২৯ ॥

এক নির্জন ঊষর প্রান্তর প্রখর সূর্যালোকে দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন এক ক্ষুধার্ত দীপ্তি চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই, কোমলতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, দুঃসহ উজ্জ্বলতা ছাড়া আর কিছুই যেন নাই। আকাশে বাতাসে সেই নির্মম স্বর্ণ-দীপ্তির সমুজ্জ্বল প্রদাহ যেন নিঃশব্দ জ্বালা রূপে জ্বলিতেছিল।

ধীরে ধীরে আকাশ হইতে যুগল দেবতা অবতীর্ণ হইলেন। একজন রূপবান পুরুষ, আর একজন রূপবতী নারী। মনে হইল মণি আর কাঞ্চন যেন মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। তাঁহাদের চরণস্পর্শে সেই ঊষর প্রান্তর ধীরে ধীরে শ্যামল হইয়া উঠিল।

পুরুষটি তখন বলিলেন—"বাণী, ঊষর প্রান্তরের মৃত্যু হল, জাগল শ্যামলতা, জন্ম নিল নূতন লোক। এই ঊষরতার তৃষিত মর্মলোকে বসে তুমি এতদিন যে আবির্ভাব কামনা করেছিলে তাই হয়তো মূর্ত হল। হল কি?"

বাণীর নয়নের দৃষ্টি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। মণি হইতে যেন আলোক বিচ্ছুরিত হইল।

"হল না?"

"জানি হল না। কোন দিন হবেও না বোধহয়। তাই এই শ্যামল প্রান্তরকে মরতে হবে আবার, জন্ম নিতে হবে আবার নূতন লোকে।"

"যাদের নিয়ে আমরা এতক্ষণ ছিলাম তাদের কি হল?"

"ওরাও নব-জন্মলাভ করতে চলেছে নূতন লোকে, নূতন পথে। ওই দেখ।"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"সূর্যটাকে নিবিয়ে দিই তাহলে খানিকক্ষণের জন্য।"

পিতামহ একমুষ্টি ধূলি তুলিয়া লইয়া সূর্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল।

পিতামহ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওই দেখ, ওরা সব চলেছে ছায়াপথ ধরে। ওই নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল একক নক্ষত্রটি চার্বাক, আর তাকে ঘিরে আছে যে নীহারিকা-পুঞ্জ তা হচ্ছে ওর স্বপ্ন, ওর কৌতূহল, ওর নাস্তিকতা, ওর অবচেতন মানসের কামনারাশি। বাঁদিকে যে নক্ষত্রগুচ্ছটি দেখতে পাচ্ছ, ওরা কে জান? মেঘমালতী, বর্ণমালিনী, স্বরঙ্গমা, ধারামতী, নীলোৎপলা, তানে, অবন্ধনা আর আলেয়া। ওরা পরস্পর কেউ কাউকে চেনে না, একজনের কাছ থেকে আর একজনের দূরত্ব বহুকোটি যোজন, কিন্তু ওদের লক্ষ্য এক, তাই ওরা একগুচ্ছে ধরা পড়েছে। ওই দেখ সপ্তর্ষির নীচে কদ্রু, বিনতা আর গরুড়কে। কদ্রুর সর্প সন্তানরাও নব-রূপ ধরেছে ওই দেখ। ওদের ডান দিকে একটু নীচেই শুরু হয়েছে নূতন আকাশ-গঙ্গা, তার তরঙ্গে ভেসে চলেছে সুন্দরানন্দ, কুলিশপাণি, কালকূট, কমল-কিশোর, শিখর সেন আর বিক্রম। আর একটু দূরে ওই দেখ নিরুপম, মহাশকুন্ত আর গুণপতি। ওরা গঙ্গার স্রোতে ভাসেনি, ভাসতে পারেনি, তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে শুধু। আর একটু দূরে ওই ছোট নক্ষত্রটিকে চিনতে পারছ? শিখরের মামা কয়াধুনাথ তার পাশে দপ দপ করে জ্বলছে আগামী যুগের কবি। সব আছে, কেউ হারায় নি, কেউ হারায় না। ওদের নূতন জীবন-নাটকের নূতন দৃশ্য আবার রচনা করতে হবে আমাদের। চল—।"

সহসা তাঁহারা দুইটি অপরূপ বিহঙ্গমে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশের দিকে পক্ষ-বিস্তার করিলেন। তাঁহাদের মিলিত কণ্ঠে আনন্দিত কাকলী ধ্বনিত হইল। সে কাকলী যেন বলিতে লাগিল—শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।…

নিরঞ্জনা

উৎসর্গ

অনুজ শ্রীমান ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

নিবেদন

আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত উপন্যাস 'Thais' অবলম্বনে 'নিরঞ্জনা' রচিত হইয়াছে। ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

বনফুল

পুরাকালে হিমালয়ের পাদদেশে অতি বিস্তৃত এক অরণ্যে বহু গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বসবাস করিতেন। সংসারবিরাগী হইয়া পরমার্থের সন্ধানে কৃচ্ছ্রসাধন করাই তখন বহু ভদ্রসন্তানের জীবনাদর্শ ছিল। এই উদ্দেশ্যে কেহ অরণ্যে, কেহ পর্বতগুহায়, কেহ বা মরুভূমিতে গিয়া বাস করিতেন। যে অরণ্যের কথা বলিতেছি, সে অরণ্যে সন্ন্যাসীদের একটা সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছিল। অরণ্যে স্থানাভাব ছিল না, সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহারা নির্জনতাসুখ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেন, আবার বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্যও করিতে পারিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যজ্ঞকুণ্ড ছিল ; তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়া ফল-লাভের প্রত্যাশা করিতেন। কেহ কেহ আবার যজ্ঞে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা গভীর অরণ্যমধ্যে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া নির্জন তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইতেন।

শুধু সংযত নয়, অতিশয় কঠোর জীবন যাপন করিতেন ইঁহারা। অনেকেই সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর সামান্য কিছু ফলমূল সেবন করিতেন, শয়ন করিতেন ভূমিশয্যায় অথবা খর্জুরপত্রনির্মিত মাদুরের উপর। অনেকেই উপাধান ব্যবহার করিতেন না, যাঁহারা করিতেন প্রস্তরখণ্ডই তাঁহাদের উপাধান হইত। গৈরিক বহির্বাস এবং উত্তরীয় ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন আবরণ থাকিত না। কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াও থাকিতেন। সাধনমার্গে যাঁহারা বেশি অগ্রসর, তাঁহারা ভূমিতে গভীর গর্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

তপস্যাই ছিল তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন যাহা সাধারণ মানুষ করিতে পারে না। তাঁহারা বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করিয়া নৈশ অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিতেন, কখনও রুদ্ধশ্বাসে দুরূহ আসনে বসিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, কখনও শারীরিক কামনা-বাসনাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দমন করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুত দেহকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া তাঁহারা এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া লজ্জাকর ছিল তাঁহাদের চক্ষে। কোন-প্রকার প্রসাধনে

তাঁহাদের রুচি তো ছিলই না, প্রত্যহ স্নান করাটাও অনেকে প্রয়োজন মনে করিতেন না। অনেকের চর্মরোগ হইত। ইহাতে চিন্তিত বা লজ্জিত না হইয়া তাঁহারা বরং আনন্দিতই হইতেন। ভাবিতেন, দেহটা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় মাত্র, পীড়া তাহাকে ন্যায্য শাস্তিই দিতেছে।

সকলেই যে সর্বদা আত্মার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন—এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সাধারণ সাংসারিক কর্মের প্রতিও অনেকের আকর্ষণ ছিল। অনেকে বাসগৃহ-সংলগ্ন ভূখণ্ডে কৃষিকর্ম করিতেন, অনেকে খর্জুরপত্র সংগ্রহ করিয়া মাদুর বুনিতেন, অন্নসংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে গিয়া কেহ কেহ ভিক্ষাও করিতেন, কেহ কেহ বা মজুরের কাজও করিতেন। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থগণের হৃদয়ে যদিও তাঁহাদের শ্রদ্ধার আসনই প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু নাস্তিক প্রকৃতির এমন কয়েকজন দুষ্ট লোকও ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কটূক্তিও করিতেন ; অনেকে বলিতেন, গ্রামে যে সব ছোটখাটো চুরি ডাকাতি হয় তাহা এই সন্ন্যাসীদেরই কাজ। বলা বাহুল্য, এ সব অভিযোগ মিথ্যা। এই সব সন্ন্যাসী পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে সত্যই বীতরাগ ছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পরলোকের দিকে, ইহলোকের দিকে নয়।

মধ্যে মধ্যে এই অরণ্যে অলৌকিক অসম্ভব কাণ্ড ঘটিত। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কখনও দেবতা কখনও বা দানব নাকি এই সন্ন্যাসীদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন। দেবতারা দিব্যকান্তি ধরিয়া দেখা দিতেন, আর দানবেরা আসিতেন কখনও বর্বরের বেশে, কখনও বা পশুর রূপ ধরিয়া। প্রভাতে দূরবর্তী ঝরনায় জল আনিতে গিয়া তাঁহারা বালুকার উপর নানারূপ অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের মনে হইত হয়তো কোনও দুষ্ট দানব অদ্ভুতাকৃতি পশুর রূপ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল। মনে হইত তাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া এই অরণ্যভূমিতে দেব-দানবের একটা যুদ্ধ চলিতেছে—কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা অদৃশ্যভাবে। দেবতারা মোক্ষলিপ্সু ভক্তগণকে সৎপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন আর দানবেরা চেষ্টা করিতেছে তাঁহাদের সে পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে অরণ্যভূমি দেব-দানবের যুদ্ধভূমি হইয়া উঠিত।

দানবদের এই হীন প্রচেষ্টা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তপস্বীরা নানারূপ প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করিতেন। কখনও উপবাস, কখনও ব্রত, কখনও অনুতাপ করিয়া তাঁহারা দেবতাগণের কৃপালাভ করিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইয়া যাইত, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, দানবদের

হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেন। কিন্তু হায়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও ষড়রিপু—বিশেষ করিয়া কাম—তাঁহাদের মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিত। তখন তাঁহারা তার-স্বরে রোদন করিতেন। মনে হইত, অরণ্যের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত হায়েনার দল বুঝি চীৎকার করিতেছে! তাঁহাদের এই কামাতুর অবস্থায় দানবেরা মায়াবলে রূপসী যুবতীর বেশে মাঝে মাঝে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইত। শুধু তাহাই নয়, নানাবিধ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাঁহাদের অভিভূত করিবার চেষ্টাও করিত। তখন তাপসগণ যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া দার্শনিক চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। ভাবিতেন, "যত সুন্দরীই হোক না কেন, উহার দেহ মাংসপিণ্ড মাত্র, দুর্গন্ধচর্মজড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত। উহা মৃত্যুর দ্বার, ওই মুখপদ্ম একদা দন্তসর্বস্ব করোটিতে পরিণত হইবে ...।" এই ধরনের বিশুদ্ধ চিন্তার ফলে দানবদের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া পড়িত, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ছাড়া তখন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। বস্তুত অনেক সময় ঊষাকালে অনেকে দেখিতে পাইত যে, কোনও রোরুদ্যমানা যুবতী তাপস-পল্লী হইতে ত্বরিতপদে পলায়ন করিতেছে। প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিত—"একজন তাপস আমাকে লাঠিপেটা ক'রে ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই আমি কাঁদছি।"

এই সব জ্ঞানবৃদ্ধ তাপসগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। শুধু তাহাই নয়। পাপীদের সৎপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা সে শক্তি প্রয়োগ করিতেও ইতস্তত করিতেন না। অনেক সময় কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহাদের অভিশাপকে সকলে ভয় করিত। সকলেরই ধারণা ছিল, ইঁহাদের ক্রোধ উদ্রিক্ত করিলে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিবেই। মৃত্যুর পর অনন্ত নরকবাসও ঘটিতে পারে। সুতরাং সকলেই তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলিত, বিশেষ করিয়া নট-নটীরা, নর্তক-নর্তকীরা এবং রূপজীবীরা। অনেকের এ ধারণাও ছিল যে, বনের পশুরাও নাকি এই সকল তপোবল-সম্পন্ন ঋষিদের সহায়ক। ঋষিদের আয়ু নিঃশেষ হইয়া গেলে বন্য ব্যাঘ্র ও সিংহ তাঁহাদের প্রাণহীন দেহটাকে মুখে করিয়া তুলিয়া কোনও পুণ্যতোয়া নদী-স্রোতে লইয়া গিয়া নাকি তাঁহাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিত।

কিছুকাল পূর্বে মহর্ষি কারণ্ডব তাঁহার দুই প্রিয় শিষ্য হংসপক্ষ এবং কল্কধীমানকে লইয়া কৈলাশ ও মানসসরোবর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আর ফিরেন নাই। তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের পর সেই অরণ্য-ঋষি-সমাজে মাগধী ঋষি সার্বর্ণিই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার তপোবল অনন্যসাধারণ ছিল। মহর্ষি উপলচরিতের অনেক শিষ্য ছিল বটে, মহর্ষি বনস্পতিরও খ্যাতি কম ছিল না, কিন্তু উপবাস এবং কৃচ্ছ্রসাধনে মহর্ষি সার্বর্ণিই অগ্রণী ছিলেন। দিনের পর দিন তিনি নিরম্বু উপবাস করিতে পারিতেন, কর্কশ-রোম-নির্মিত একটি কম্বল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও দেহাবরণেরও প্রয়োজন হইত না। দৈহিক এবং মানসিক কামনাকে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিজ অঙ্গে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি ধূলিতে উপুড় হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সাষ্টাঙ্গে যেন কোনও অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করিতেছেন।

তাঁহার চব্বিশটি শিষ্য ছিল। শিষ্যেরা গুরুদেবের কুটীরের আশে-পাশে ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং গুরুর মহান আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইতেন। মহর্ষি সার্বর্ণি তাঁহাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্নেহে আসক্তির লেশমাত্র ছিল না। শিষ্যদের যে উপদেশ তিনি দিতেন তাহার মূল কথা—বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হও। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকের বিগত জীবনে পাপের প্রাধান্যও ছিল। এমন লোকও ছিল যাহারা পূর্বে ডাকাতি করিত। মহর্ষি সার্বর্ণির চারিত্রিক আদর্শ ও অমূল্য উপদেশে অনেক রত্নাকরই বাল্মীকিত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহাদের জীবন এত পবিত্র হইয়াছিল যে, তাহাদের সাহচর্য লাভ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণও নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। মধ্যপ্রদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এক পাচক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। দীক্ষার পর তাহার অনুতাপ এমন প্রবল হইল যে, সে সর্বদাই অশ্রুবিসর্জন করিত। আর একজন শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি পণ্ডিত তো ছিলেনই, বক্তাও ছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাবর্ণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন বোধ হয় বাঞ্ছারাম নামক কৃষকটি। তাঁহার সরলতার জন্য সকলে তাঁহাকে বালক বাঞ্ছা নামে ডাকিত। তাঁহার অতি সরলতার জন্য অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে উপহাস করিত বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাই মাঝে মাঝে বিস্ময়কর দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন।

ইঁহাদের লইয়া মহর্ষি সার্বর্ণির সময় ভালই কাটিতেছিল। কখনও তপস্যায়, কখনও অধ্যাপনায়, কখনও বা শাস্ত্রপাঠে তিনি মগ্ন থাকিতেন। শাস্ত্রের জটিল রূপক ও দুরূহ শব্দার্থ তাঁহাকে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিত। তিনি বয়সে

তরুণ ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্ত যে সব দানব অন্ত সন্ন্যাসীদের বিব্রত করিয়া তুলিত, সার্বণির নিকট তাহারা আসিতে সাহস পাইত না। রাত্রিকালে প্রায়ই দেখা যাইত, সাতটি শৃগাল তাঁহার কুটীরের অনতিদূরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন শুনিতেছে। অন্তান্ত সন্ন্যাসীদের ধারণা জন্মিয়াছিল, তপস্থাপ্রভাবে সার্বণি দানবকে শৃগালে রূপান্তরিত করিয়া ভৃত্যের মত কুটীরের সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়াছেন।

পাটলীপুত্র নগরীতে এক ধনীগৃহে সার্বণি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সে যুগে ধনীপুত্রেরা সাধারণত যেরূপ বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইতেন তিনিও সেইরূপ হইয়াছিলেন। যে শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্রও ছিল না। যে সব সাহিত্য, কাব্য, নৃত্যগীত সে যুগে ধনীপুত্রদের চিত্তকে কলুষিত করিত তাহা সার্বণির চিত্তকেও একদা মলিন করিয়াছিল। এ সকল কথা স্মরণ করিলে অনুতাপে এখনও তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হয়, লজ্জায় তিনি অধোবদন হইয়া পড়েন। অন্তান্ত তাপসদের তিনি গল্পচ্ছলে প্রায়ই বলিতেন, সে সময় তিনি যেন মিথ্যা আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা-কটাহে ভাজা ভাজা হইতেন; অর্থাৎ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যে, নয়নলোভন মহার্ঘ পরিচ্ছদে, মদিরাক্ষী রমণীর আলিঙ্গনে নিজের অস্তিত্বকেই তিনি বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন পর্যন্ত তাঁহার জীবনে এই সব ভয়াবহ কাণ্ড চলিতেছিল। মহর্ষি মঙ্গলমৌলির সাক্ষাৎ না পাইলে তিনি হয়তো অনন্ত নরকেরও অন্ত-সীমায় উপনীত হইতেন। মহর্ষি মঙ্গলমৌলি যখন তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন তখনই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত স্বাদ পাইলেন, তখনই বুঝিলেন—আনন্দ কোথায়, সত্য কি এবং কোন্ পথে গেলে শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সন্ধানের আগ্রহ যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি বলিতেন, একটা তীক্ষ্ণ তরবারির মতো তাহা যেন তাঁহার অন্তরে গাঁথিয়া গেল। দীক্ষা লইবার পর গুরুর আদেশে তিনি মহেশ্বরের উপাসনায় নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু মহাকালের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। একদিন এক শৈব যোগী তাঁহাকে বলিল—পার্থিব বিষয় ত্যাগ না করিলে মহেশ্বরের সাধনা সফল হয় না। মহেশ্বর মহাভিক্ষুক। প্রাসাদে বসিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এ কথা শুনিবার পর তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান করিয়া দিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

দশ বৎসর তিনি অরণ্যবাস করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত আছেন। মিথ্যা

আনন্দের উত্তপ্ত তৈলে কামনা-কটাহে ভর্জিত হইবার সুযোগ আর নাই। পুরাতন ক্ষতগুলিতে অনুতাপ-ঔষধি লেপন করিয়া বিমল আনন্দই তিনি উপভোগ করেন। কিন্তু অতীতের ওই অপবিত্র কামনাক্লিন্ন দিনগুলির কথা কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারেন না। প্রায়ই সে সব কথা মনে পড়ে।

··একদিন তিনি এই অতীত জীবনের কথা, তাঁহার পশু-জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, কি কি দোষ কি ভাবে তাঁহার জীবনে আসিয়া কি ভাবে তাঁহাকে ভ্রষ্ট করিয়াছিল। সহসা নিরঞ্জনার কথা মনে পড়িল।—অভিনেত্রী নিরঞ্জনার কথা। শুধু নিপুণা নর্তকী নয়, অপরূপ রূপসী ছিল সে। যখন সে নৃত্য করিত তখন দর্শকদের চিত্তে ঝড় বহিত, তুফান জাগিত, কামনার শিখা লেলিহান হইয়া উঠিত। আকুল হইয়া পড়িত সকলে—প্রমত্ত যুবক, স্থবির ধনী, স্বল্পবৃত্ত প্রৌঢ় সকলেই। নিরঞ্জনা সকলকেই লালায়িত করিয়া তুলিত, ফুলের মালা লইয়া সকলেই ছুটিত তাহার গৃহের উদ্দেশ্যে, গৃহের বদ্ধদ্বারের সম্মুখে মাল্য-অর্ঘ দান করিয়াই অনেকে তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার প্রদীপ্ত যৌবনের অন্তরালে ছিল পাপ। সে পাপ তাহার আত্মাকে তো মলিন করিয়াইছিল, যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহারাও কলুষিত হইয়াছিল।

সাবর্ণিও তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তখন কতই বা তাঁহার বয়স? তখনও তিনি কিশোর। সেই কিশোর-বয়সেই নিরঞ্জনা তাঁহার অন্তরে কামনা-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। তিনি তাহার গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়াছিলেন, আর অধিক-দূর অগ্রসর হইবার সাহস হয় নাই, আশঙ্কা হইয়াছিল নিরঞ্জনা হয়ত তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিবে। তখন তাঁহার কতই বা বয়স? মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ। ভগবানই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার এ কথা মনে হয় নাই। তখন পাপপুণ্যবোধই ছিল না তাঁহার। কিসে নিজের হিত হয়, কিসে অহিত হয় তাহা তিনি বুঝিতেন না।

···নিজের নির্জন কুটীরে যে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গটি ছিল, তাহারই সম্মুখে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কামনা-বাসনারই নানা কাল্পনিক চিত্র তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নিজের ভাগ্য-দেবতাকে তিনি বারম্বার প্রণাম করিলেন—কি ভয়ঙ্কর গহ্বরের মুখ হইতেই না তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন! প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া

পড়িলেন। প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু খুলিলেন তখন মনে হইল, শিবলিঙ্গের পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। পার্বতী না কি! কিন্তু পরক্ষণেই চিনিতে পারিলেন—নিরঞ্জনা! ঠিক তেমনি সুন্দরী, দশ বৎসর পুর্বে যেমন দেখিয়াছিলেন। হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং পর-মুহূর্তেই আবার দেখা দিল উর্বশীর বেশে। পাটলিপুত্র নগরীর এক প্রমোদাগারে দশ বৎসর পূর্বে নিরঞ্জনাকে তিনি উর্বশীর বেশে দেখিয়াছিলেন মনে পড়িল। ঠিক সেই দৃশ্যটিই আবার যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গ-হিল্লোলে উর্বশী যেন দুলিতেছে, আর দুলিতেছে তাহার কম্বুগ্রীবা, লীলায়িত বাহুযুগল, পীবর স্তনদ্বয়। নয়নে বিলোল কটাক্ষ, আবেগভরে নাসার অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে, ঈষৎ ব্যায়ত আননের ফাঁকে মুক্তার সারির মতো দন্তগুলি দেখা যাইতেছে। ললাটে করাঘাত করিয়া মহর্ষি সার্বণি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "ভগবান ভূতনাথ, এ কি দেখিতেছি! এ যে আমারই কামনার কদর্য মূর্তি!"

উর্বশীর মুখভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, সে যেন কোনও নিগূঢ় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িতেছে,—তাহার নয়নের দীপ্তি যেন অশ্রুজলে নিবিয়া আসিতেছে, মনে হইতেছে যেন ঝটিকা আসন্ন। নিরঞ্জনার এই মূর্তি সার্বণিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নতজানু হইয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—।

"হে ভগবান, প্রভাতে তৃণদলের উপর শিশিরবিন্দুর মতো আমাদের অন্তরে তুমি করুণা দিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু হে দেবাদিদেব, যে করুণা পাপকে প্রশ্রয় দেয়, আমার অন্তর হইতে তুমি সে করুণা অবলুপ্ত করিয়া দাও। আমাকে শক্তি দাও, তোমার মধ্যেই যেন আমি সকলকে ভালবাসিতে পারি, কারণ তুমি ছাড়া আর সবই নশ্বর। তোমারই সৃষ্টি বলিয়া এই নারী আমার অনুকম্পার পাত্রী, সম্ভবত, স্বর্গের দেব-দেবীরাও ইহার অধঃপতনে করুণার্দ্র। নিরঞ্জনার মতো অনবদ্য সৃষ্টি কি তোমার স্নেহপাত্রী নয়? কিন্তু পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলে যে উহাকে কলঙ্কিত করিয়া দিতেছে, তোমার এমন সুন্দর সৃষ্টিটিকে এমন ভাবে কলুষিত হইতে দেওয়া কি উচিত? উহার জন্য আমার অন্তর বিগলিত হইয়া যাইতেছে। যে পাপে সে লিপ্ত তাহা জঘন্য—এ কথা চিন্তা করিলেও আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে পাপীয়সী বলিয়াই কৃপাপাত্রী। তাহার পাপের মাত্রা বেশি বলিয়াই বেশি করুণা সে দাবী করিতে পারে। নিদারুণ পাপের জন্য তাহাকে অনন্ত

নরক ভোগ করিতে হইবে—এ কথা চিন্তা করিলে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না…।"

প্রার্থনা শেষ করিয়া সাবর্ণি অনেকক্ষণ মুদিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখিলেন, একটি শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি কৃষ্ণকায় বানর বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র বানরটি দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করিল। সাবর্ণি বিস্মিত হইয়া গেলেন। বানর কোথা হইতে আসিল? কুটীরের দ্বার তো বন্ধ ছিল! ··সাবর্ণি বুঝিলেন, কোনও মায়াবী মার নিশ্চয়ই তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল। তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে পুনরায় প্রণত হইলেন এবং পুনরায় নিরঞ্জনার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে শঙ্কর, হে নীলকণ্ঠ, তুমি যদি আমাকে শক্তিদান কর, নিরঞ্জনাকে ঐ পঙ্ককুণ্ড হইতে আমি উদ্ধার করিবই…।"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট গেলেন। মহর্ষি শুভঙ্কর কিছুদূরে এক খণ্ড বিস্তীর্ণ জমির উপর কুটীর নির্মাণ করিয়া তাপস-জীবন যাপন করিতেন। কৃষিকর্মে তাঁহার আগ্রহ ছিল। সাবর্ণি দেখিলেন, শুভঙ্কর নিজের বাগানে কি যেন খুঁড়িতেছেন! বৃদ্ধ শুভঙ্করের কুটীর-সংলগ্ন ছোট একটি বাগান ছিল। বাগানটি লইয়াই তিনি সারাদিন কাটাইতেন। সকলে বলিত, শুভঙ্কর এত ভাল লোক যে বনের পশুরাও নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসে, ভূত প্রেত বা শয়তান তাঁকে বিব্রত করে না। সদাহাস্যমুখ প্রসন্নচিত্ত লোক তিনি। তিনিও সাবর্ণির মতো শিবের উপাসক। পরামর্শ করিবার জন্য সাবর্ণি তাঁহার নিকট গেলেন।

মহর্ষি সাবর্ণিকে শুভঙ্কর হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

"জয় শঙ্কর! সব কুশল তো?"

"জয় শঙ্কর! ভালই আছি আপনার কৃপায়। আশা করি, আপনারও সব মঙ্গল।"

কপালের ঘাম মুছিয়া শুভঙ্কর হাস্যমুখে বলিলেন, "মঙ্গলের অভাব তো দেখি না। তারপর আর সব খবর কি?"

"আমাদের আর খবর কি থাকতে পারে বলুন? তাঁর খবরই একমাত্র খবর, তাঁর খবরই নানাভাবে আলোচনা ক'রে আমরা ধন্য। তাঁরই মহিমার একটা দিক প্রকট করবার আশায় আপনার কাছে এসেছি।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

সাবর্ণি বলিলেন, "একটা পরামর্শ করতে এসেছি আপনার সঙ্গে। আজ আমার অন্তরে সহসা একটি কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে।"

"মহেশ্বর কৃপা বর্ষণ ক'রে আমার শাকের ক্ষেতটিকে শ্রীসম্পন্ন করেছেন, তোমার কল্পনার অঙ্কুরটিকেই তেমনি শ্রীমণ্ডিত করবেন সন্দেহ নেই। তাঁর কৃপার কি অন্ত আছে? রোজ সকালে উঠেই তাঁর কৃপা প্রত্যক্ষ করি, প্রতি তৃণখণ্ডে শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে। আমার বাগানের শশায় কুমড়োয় দেখি তাঁর মহিমা। আমি রোজ কেবল প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই সহজ শান্তিটুকু যেন বজায় রাখেন, আর কিছু চাই না। কারণ চারিদিকে কামনা-বাসনার যা দাপট দেখি তাতে ভয় হয়। উদ্দাম কামনার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর তো কিছু নেই। কামনার পাল্লায় পড়লে ঠিক মাতালের মতো অবস্থা হয়, সোজা হয়ে চলতে পারি না। কখনও ডাইনে হেলি, কখনও বাঁয়ে হেলি, সর্বদাই পড়-পড় ভাব। কামোন্মত্ত অবস্থায় এক ধরনের আনন্দ হয় বটে, কিন্তু কামুকের সে আনন্দ শয়তানের হাসির খোরাক জোগায় খালি। সে আনন্দ মনকে পবিত্র করে না, বুদ্ধিভ্রংশ করে কেবল। আর একটা মজা কি জান? ওই কামনা দুঃখের রূপ ধ'রেও আসে কখনও কখনও, সে আরও ভয়ঙ্কর। ভাই সাবর্ণি, আমি বুদ্ধিমান নই, তপস্বীও নই, আমার পাপেরও সীমা নেই। কিন্তু আমার সুদীর্ঘ জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। একটি অভিজ্ঞতা হচ্ছে—দুঃখের চেয়ে বড় শত্রু আমাদের আর নেই। দুঃখের অনুভূতি কুয়াশার মতো সমস্ত আত্মাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আলোর পথ রোধ করে। তখন আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, সর্বদাই যেন ভয় ভয় করে। যে কুবুদ্ধি, যে মার আমাদের বিব্রত করবার জন্যে সর্বদা ওত পেতে আছে, সে সর্বদা চেষ্টা করে সাধুদের হৃদয়কে বিষাদাচ্ছন্ন ক'রে দিতে। কারণ সাধুদের অন্তরে দুঃখের কালো ছায়া ফেলতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। কামনার মোহিনীরূপ দেখিয়ে সে আমাদের তত কাবু করতে পারে না, যত পারে আমাদের মনে দুঃখ জাগিয়ে। তার ছলনার তো অন্ত নেই। মহর্ষি কারণ্ডবের মতো সাধু পর্যন্ত নাকাল হয়ে পড়েছিলেন। একটা কালো শিশুর জন্য অশ্রু বিসর্জন পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাঁকে। শঙ্করের কৃপায় অবশেষে তিনি নিস্তার পান। তিনি যতদিন এখানে ছিলেন আমি তাঁর সাহচর্য লাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, শিষ্যদের সর্বদা আনন্দে রাখতেন, দুঃখকে হতাশাকে আমলই দিতে চাইতেন না। ওঁর মতো লোকও দুঃখের কবলে প'ড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় কথায় আসল কথাটাই চাপা প'ড়ে গেছে। শঙ্করের মহিমা প্রকট করবার জন্যে কি একটা পরামর্শ তুমি আমার

কাছে চাইতে এসেছ, বললে না? কি পরামর্শ? কি কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে তোমার মনে? শঙ্করের মহিমা-প্রচার করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব। সানন্দে করব। ক'রে কৃতার্থ হব। ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

সার্বর্ণি বলিলেন, "শঙ্করের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি জ্ঞানী, পাপ কখনও আপনার বুদ্ধিকে ম্লান করেনি, তাই আপনার পরামর্শ পেলে আমি নির্ভয় হব।"

শুভঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সাবর্ণি, তোমার পাদুকা স্পর্শ করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তুমি জ্ঞানে তপস্যায় আমার চেয়ে অনেক বড়। আমার জীবন পাপে পরিপূর্ণ. মরুভূমি যেমন বালুকণায় পরিপূর্ণ। তবে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"ব্যাপারটা শুনুন তা হ'লে। পাটলিপুত্র গ্রামে নিরঞ্জনা নামে একটি তরুণী আছে। সে রূপজীবিনী, কলুষিত জীবনযাপন ক'রে সমাজকে কলঙ্কিত করছে সে। তার কথা ভেবে আমি বড়ই বিষণ্ণ হয়েছি।"

"বিষণ্ণ হবারই তো কথা। শহুরে সমাজে অনেক স্ত্রীলোকেরই ওই দশা। তুমি কি ওদের উদ্ধার করবার কোন উপায় ঠাউরেছ?"

"মহর্ষি, ঠিক করেছি, পাটলিপুত্রে গিয়ে আমি নিরঞ্জনাকে খুঁজে বার করব এবং শঙ্কর যদি আমার সহায় হন পাপের পঙ্ক থেকে তাকে তুলে সৎপথে নিয়ে আসব। এই আমার সঙ্কল্প। এতে আপনার সম্মতি আছে আশা করি।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শুভঙ্কর বলিলেন, "দেখ ভাই সার্বর্ণি, গোড়াতেই তোমাকে বলেছি আমি স্বল্পবুদ্ধি লোক। পাপও জীবনে অনেক করেছি। এ বিষয়ে মতামত দেবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু মহর্ষি কারণ্ডব একটা কথা বলতেন মনে পড়ছে। তিনি বলতেন—যেখানেই তুমি থাক না কেন, সে জায়গাটি চট ক'রে ছেড়ো না।"

"আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে আপনি কি মন্দের কোনও আভাস পাচ্ছেন মহর্ষি?"

"কারও কোনও সঙ্কল্পের মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় আবিষ্কার করবার মতো বুদ্ধি শঙ্কর আমাকে দেননি। মহর্ষি কারণ্ডব আর একটা কথা বলতেন, মনে পড়ছে। সেটাও শোন। তিনি বলতেন—মাছকে ডাঙায় তুললে সে ম'রে যায়। সন্ন্যাসীরা যদি নিজের গুহা বা আশ্রম ছেড়ে সংসারের লোকের সঙ্গে মেশেন তাঁদেরও দুর্গতি হয়।"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি পুনরায় মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি তিনি আলগা করিতেছিলেন। সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, উড়ুম্বর বৃক্ষটি ফলভারনম্র, প্রতি শাখায় অজস্র ফল ধরিয়াছে। শুভঙ্করের কথার উত্তরে তিনি কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না। একটি বন্য হরিণ একলম্ফে বেড়া ডিঙাইয়া বাগানে প্রবেশ করিল, কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আরও দুই লম্ফে মহর্ষি শুভঙ্করের নিকট আসিয়া তাঁহার অঙ্গে মাথা ঠেকাইতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর স্নেহভরে বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, কি মতলবে এসেছ। চল, দিচ্ছি। জয় শঙ্কর, জয় ত্রিলোচন।"

কোদাল রাখিয়া তিনি কুটীর অভিমুখে গেলেন, হরিণটিও তাঁহার পিছু পিছু গেল। কুটীরের ভিতর হইতে তিনি কয়েকখানা যবের রুটি বাহির করিয়া আনিলেন। হরিণটি তাঁহার হাত হইতেই সেগুলি খাইতে লাগিল।

মৃত্তিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। শুভঙ্করের সহিত আর আলোচনা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি যাহা শুনিলেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নিজের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

তাঁহার মনে হইল, মহর্ষি শুভঙ্কর অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। প্রকৃত জ্ঞান তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ তিনি আমার এ সঙ্কল্পে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। আশ্চর্য! নিরঞ্জনাকে কামনা-রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করাটা কি অসঙ্গত হইবে না? এত বড় হৃদয়হীন হওয়া কি উচিত? না, আমি তাহা পারিব না। ভগবান শঙ্কর আমার সহায় হোন, তাঁহার নির্দেশ সম্বল করিয়াই আমি যাত্রা করিব।

...সাবর্ণি স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিবেন। চলিতে চলিতে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পথের ধারে তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি টিট্টিভ পক্ষী শিকারীর জালে ধরা পড়িয়া ছটফট করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, পক্ষী নয়, পক্ষিনী। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পুরুষ পক্ষীটি উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া ঠোঁট ও নখের সাহায্যে জালটি ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকবার চেষ্টার পর অবশেষে সত্যই সে জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। সাবর্ণির মনে হইল, ওই ছিদ্র দিয়া তাহার সঙ্গিনী এইবার অনায়াসে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। এই দৃশ্য মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তে যে মহতী কল্পনা উদ্রিক্ত করিল তাহা তাঁহার মতো সাধু ব্যক্তির চিত্তেই উদ্ভবযোগ্য। এই দৃশ্যে তিনি যেন একটি

রূপককে মূর্ত দেখিলেন। তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন, ওই পক্ষিনীই নিরঞ্জনা, কামনার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর ওই পুরুষ পক্ষীটি যেমন নখ চঞ্চু দ্বারা জাল ছিন্ন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকেও তেমনি উপদেশ দ্বারা ওই অদৃশ্য কামনাজাল ছিন্ন করিয়া নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি চক্ষু বুজিয়া মনে মনে ইষ্টদেবতা শঙ্করকে স্মরণ করিবার পর তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তরে আশঙ্কারও ছায়াপাত হইল। তিনি দেখিলেন, জালের জটিলতায় পক্ষিনীর পায়ের নখগুলি এমন আটকাইয়া গিয়াছে যে, ছিদ্র সত্ত্বেও সে বাহির হইতে পারিতেছে না।

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। অতি প্রত্যূষে তাঁহার নয়নে এক অলৌকিক দৃশ্য প্রতিভাত হইল। তিনি দেখিলেন, নিরঞ্জনা যেন আসিয়াছে। তাহার মুখভাবে কামনা বা লালসার কোনও চিহ্ন নাই, পোশাক-পরিচ্ছদেও অতি স্বচ্ছ ঘাগরা বা ওড়নার অভব্যতা নাই। একটা ঘনকৃষ্ণ আচ্ছাদনে তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখেরও খানিকটা ঢাকা রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি।···মহর্ষি সাবর্ণিও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অভাবিত ঘটনার মধ্যে যে ভগবান দেবাদিদেবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আভাসিত হইয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই দৃশ্য তাঁহাকে যেন দ্বিধামুক্ত করিল। ভগবান শঙ্করের প্রতীক ত্রিশূলটি হস্তে লইয়া তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার নিকট বহু দুষ্প্রাপ্য শিবস্তোত্র ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায় সেজন্য তিনি কুটীরদ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর প্রতিবেশী সাধু ভূমানন্দকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার নিজ শিষ্যগণের ভার অর্পণ করিলেন। সমস্ত সারিয়া গৈরিকমাত্র সম্বল করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন গঙ্গানদীর উদ্দেশে। পাটলিপুত্র গঙ্গাতীরে অবস্থিত। গঙ্গানদীকে অনুসরণ করিলেই তিনি পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়া যাইবেন, পথ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়া অতিশয় দ্রুতবেগে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না, দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া তিনি ধূলিকঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া অবশ্য তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্লান্তিও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি হাঁটিতেই লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সমস্ত দিন পথ চলিবার পর সন্ধ্যার পূর্বে তিনি গৈরিকবর্ণা গিরিকন্যার দর্শন লাভ করিলেন।

তরঙ্গমুখরা গঙ্গানদীর তীরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া গেল। মর্তে অবতরণকালে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হইতে উচ্ছলিত হইয়া জাহ্নবী যে শিবের জটাজালে নিপতিত হইয়াছিলেন—এই পৌরাণিক কাহিনী তাঁহার মনে পড়িল। তিনি জানু পাতিয়া গঙ্গাস্তব করিতে লাগিলেন। করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, দেবি, তোমার স্পর্শে ভস্মীভূত সগরবংশ নবজন্ম লাভ করিয়াছিল, আশীর্বাদ কর ভগবান নীলকণ্ঠের প্রভাব নিরঞ্জনাকেও যেন নবজন্ম দান করে। মহেশ্বরের কৃপায় আমি যেন তাহাকে মুক্ত করিতে পারি, মহেশ্বরের মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নদীতীরবর্তী এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে ঢুকিয়া কিন্তু তিনি যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন তখন অনেকেই তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিল। গৃহস্থদের এরূপ ব্যবহারে তিনি প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন এটি বৌদ্ধ গ্রাম। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু লোক তখনও এ দেশে ছিল, তাহারা নিজেরাই অধঃপতিত হইয়াছিল—বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নামে বৈষ্ণব, শৈব বা বেদপন্থী সন্ন্যাসীদের নির্যাতন করিতে তাহারা ছাড়িত না। গৃহস্থদের অভদ্র আচরণ দেখিয়া মহর্ষি সার্বর্ণি স্থির করিলেন, কোনও গ্রামের ভিতর তিনি আর প্রবেশ করিবেন না। তাঁহার মনে হইল, গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীদের দুর্ব্যবহারই কেবল যে তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা নয়, পথে ক্রীড়ারত বালকেরাও হয়তো দল বাঁধিয়া তাঁহার পিছু লইবে, কিংবা কূপের নিকট যুবতীগণের বিলোল কটাক্ষ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। তাঁহার মনে হইল, সমাজের সংস্পর্শই কলুষময়, কি যে কখন ঘটিবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং গ্রাম শহর যথাসম্ভব এড়াইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আসিলে শ্মশানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন এবং শ্মশানবিলাসী শঙ্করের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

এই ভাবে ছয় দিন হাঁটিবার পর তিনি পর্বতমালাবেষ্টিত এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, পর্বতগাত্রে নানা ভঙ্গীর বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এক পর্বতের পাদদেশে বিরাটাকার এক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ মূর্তিটির দিকে তিনি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার অন্তরে এক অদ্ভুত আশঙ্কার উদয় হইল। মনে হইল, কোনও মন্ত্রবলে এই বিরাট পুরুষ সঞ্জীবিত হইয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে! দুরাচার

পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকেরা কোথাও আত্মগোপন করিয়া নাই তো! সুযোগ পাইলে শৈব সন্ন্যাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেও যে তাহারা ইতস্তত করে না, এ ধরনের সংবাদ তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন। সেই নির্জন গিরি-বেষ্টিত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিকভাবে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিলে যে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কিছুক্ষণ শিবস্তোত্র আবৃত্তি করার পর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বিরাট বুদ্ধমূর্তির পিছন হইতে একটা বাদুড়ছানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। সাবর্ণির মনে হইল, শিবস্তোত্রের প্রভাবে বুদ্ধমূর্তি বুঝি পাপমুক্ত হইল। বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করিয়া এই রাজপুত্র যে পাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন শিবনামের গুণে তাহাই বোধ হয় বাদুড় রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া গেল। সহসা তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সনাতন হিন্দু-ধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া লোকটা দেশের কি অনিষ্টই না করিয়াছে! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং একটি প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া মূর্তিটির দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরটি মূর্তির কপালের মাঝখানে গিয়া আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। মহর্ষি সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন, মূর্তি যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে, তাহার মুখভাব পরিবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল এখন বুঝি চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িবে। সেই বিরাট মূর্তির বিরাট মুখমণ্ডলে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সাবর্ণির হৃদয় করুণার্দ্র হইল। আর একটু আগাইয়া গিয়া মূর্তিকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, আশা করি তুমি এবার হৃদয়ঙ্গম করেছ যে, দেবদেবীবর্জিত ধর্মপ্রচার করলে সমাজের কি অনিষ্ট হয়। শিবনাম উচ্চারণে তোমার পাপ স্খালন কর। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। শিবনাম ক'রে তুমি পাপমুক্ত হও।"

সাবর্ণির মনে হইল, বুদ্ধমূর্তির চক্ষুদ্বয় যেন আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষুপল্লব যেন ঈষৎ কম্পিত হইল, তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া গেল, মনে হইল সত্যই যেন সে শিবনাম উচ্চারণ করিতেছে।

মহর্ষি সাবর্ণি তখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সেই প্রস্তরমূর্তিকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন। আবার পথ চলা শুরু হইল।

আরও কিছুদূর যাইবার পর তিনি এক বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের

মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে বহু ভগ্ন প্রাসাদ, প্রাকার ও মন্দির রহিয়াছে। যে সব মন্দির তখনও ভূমিসাৎ হয় নাই, সার্বণি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই-গুলিকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্দির মধ্যে কোনও দেব-দেবীর বিগ্রহ নাই। একটি মন্দিরে আলিঙ্গন-বদ্ধ একটি নর-নারীর প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে। নারীটির দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, পুরুষটির নাসিকাগ্র নাই। মন্দিরগাত্রেও দেখিলেন, বহু অশ্লীল চিত্র খোদিত রহিয়াছে—নগ্ন রমণী, নগ্ন পুরুষ, মৈথুনরত নর-নারী জীব-জন্তু ছাড়া অন্য কোনও চিত্রই নাই। তাঁহার মনে হইল, প্রতিটি মূর্তি যেন তাঁহাকেই নির্নিমেষে দেখিতেছে। পুনরায় তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, সম্ভবত কোনও শক্তিশালী হিন্দুরাজা অধঃপতিত বৌদ্ধদের এই সব লালসা-উদ্দীপক কাম-চিত্রগুলিকে অবলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক-রূপে কৃতকার্য হন নাই। ভগ্ন বিধ্বস্ত হইয়াও ইহারা এখনও কাম-লীলা প্রকটিত করিতেছে।

এই ভাবে তিনি সপ্তদশ দিবস নানারূপ কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ অতিবাহন করিলেন। শিবমন্ত্রের বর্মে আবৃত ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত তাঁহার আর কোনরূপ বিপদ ঘটিল না।

অষ্টাদশ দিবসে এক গ্রামের বাহিরে তিনি তালপত্রনির্মিত একটি কুটীর দেখিতে পাইলেন। কুটীরটি তাঁহার অন্তরে পুলক সঞ্চার করিল। কারণ কুটীরটির ভগ্নদশা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এটি নিশ্চয়ই কোন সংসার-বিরাগী সাধুর কুটীর। কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা হইল, হয়তো কোনও শৈব সন্ন্যাসীরই সাক্ষাৎ পাইবেন। সমীপবর্তী হইয়া লক্ষ্য করিলেন, কুটীরে দ্বার বা বাতায়ন নাই, চতুর্দিকেই খোলা কয়েকটি বংশদণ্ডের উপর চালটি কোনক্রমে টিকিয়া আছে। ঘরের মেঝেতে রহিয়াছে কয়েকটি বেল, একটি মাটির কলসী এবং তৃণশয্যা।

সার্বণি স্বগতোক্তি করিলেন, "বেল যখন রয়েছে তখন নিশ্চয় কোন শিবভক্তের আস্তানা এটি। কিন্তু গেলেন কোথা ভদ্রলোক ? দেখা হ'লে দুজনে মিলে শিবনাম করতাম খানিকক্ষণ। শিবের দয়া হ'লে আহারেরও ব্যবস্থা হয়ে যেত হয়তো। ভদ্রলোক শিবের নামে বিল্বফল উৎসর্গ ক'রে আমাকে একটু প্রসাদ কি আর না দিতেন ! কোথা গেলেন তিনি ? একটু সন্ধান করি।"

তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। একটু আগাইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে পদ্মাসনে এক ঋজু-দেহ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। আরও

কাছে গিয়া দেখিলেন, লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। চুল ও দাড়ি একেবারে শুভ্র, গায়ের রঙ গাঢ় রক্তবর্ণ। সাবর্ণির সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই সেই সন্ন্যাসী। যথারীতি সম্ভাষণপূর্বক সাবর্ণি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্র, ভগবান শঙ্কর আপনার মঙ্গল করুন। তাঁহার করুণা আপনাকে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী করুক।"

লোকটি কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। এমনভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল যেন কোনও কথাই শুনিতে পায় নাই। সাবর্ণির সহসা মনে হইল, হয়তো বা সন্ন্যাসী সমাধিস্থ হইয়া আছেন। আর উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনিও করজোড়ে নতজানু হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং শিব-প্রার্থনায় নিরত হইলেন। অনেকক্ষণ কাটিল। ক্রমশ সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু ওই উলঙ্গ রক্তবর্ণ সাধুর কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

সাবর্ণি সসঙ্কোচে পুনরায় বলিলেন, "প্রভু, আপনার যদি ধ্যানভঙ্গ হয়ে থাকে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি আপনার মতো শিবভক্ত হতে পারি।"

এইবার ফল ফলিল।

ঘাড় না ফিরাইয়াই লোকটি উত্তর দিল, "আগন্তুক, তোমার কথার কোন অর্থবোধ হচ্ছে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কেন, তোমার এই শিবই বা কে?"

মহর্ষি সাবর্ণি শিহরিয়া উঠিলেন।

"সে কি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের শিবনাম শোনেন নি—এ কি সম্ভব?"

"খুবই সম্ভব। পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য ব'লে কিছু নেই, তা না হলে বলতাম ধ্রুব সত্য।"

মহর্ষি সাবর্ণি লোকটির নিদারুণ অজ্ঞতায় মর্মাহত হইলেন।

"আপনি কি ভারতবাসী?"

"ভারতবর্ষে যখন জন্মেছি, তখন ভারতবাসী বই কি।"

"অথচ আপনি মহাকাল ত্রিলোচনের নাম শোনেন নি! মৃত্যুর পর অনন্ত সুখময় জীবন লাভ করবার ইচ্ছা কি আপনার নেই? দেবাদিদেবের মহিমা উপলব্ধি না করলে সবই যে বৃথা—এ কথা তো প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত।"

"আমার মনে হয় সবই বৃথা। জন্ম-মৃত্যুও আমার কাছে সমান।"

"বলেন কি! অনন্ত স্বর্গ লাভ করবার ইচ্ছে আপনার নেই? আপনার ওই

কুটীর আর আপনার ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি সন্ন্যাসী।"

"আপনার ধারণা ভুল না হতে পারে।"

"আপনি উলঙ্গ। এর থেকে মনে হয় আপনি সর্বত্যাগী।"

"হতে পারে।"

'আপনার ঘরে মাত্র কয়েকটি বেল দেখলাম। তাই মনে হ'ল হয়তো আপনি ফলাহারী ব্রহ্মচারী।"

'তাও না হয় হ'ল। তাতে কি হয়েছে?"

"তার মানে, আপনি জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য আড়ম্বর ত্যাগ করেছেন।"

"লোকে সাধারণত যে সব জিনিসকে ঐশ্বর্য ব'লে মনে ক'রে বৃথা আস্ফালন আড়ম্বর করে, তা আমি ত্যাগ করেছি।"

"তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনি আমারই মতো দরিদ্র, আমারই মতো নির্মলচরিত্র, এক কথায় আমারই মতো সন্ন্যাসী। কিন্তু আপনি মহাদেবের নাম পর্যন্ত শোনেন নি—এ বড় আশ্চর্য ঠেকছে আমার কাছে। ইহলোকের ঐশ্বর্যসম্ভার ত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য-পীড়িত বঞ্চিত জীবন যাপন করবার সার্থকতা কি, যদি পরলোকে অনন্ত সুখশান্তি পাওয়ার আশা না থাকে?"

"আগন্তুক, আমি নিজেকে একটুও পীড়িত বা বঞ্চিত ব'লে মনে করি না। যে জীবনদর্শন আমি আবিষ্কার করেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি, সূক্ষ্ম বিচার ক'রে তাকে ভাল বা মন্দ কোনও পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টাই আমি করিনি। পৃথিবীতে কিছুই ভাল বা মন্দ নয়। সম্মানজনকও কিছু নেই। ন্যায়-অন্যায়ও আমাদের সৃষ্টি। আমরা নিজেরাই গুণ বা দোষ আরোপ ক'রে প্রত্যেক জিনিসকে স্বধর্মভ্রষ্ট করি—মসলা যেমন ব্যঞ্জনের প্রকৃত স্বাদকে বিকৃত করে।"

"তা হ'লে আপনার মতে সত্য ব'লে কিছু নেই? দেখছি, সামান্য প্রতিমা-উপাসকেরাও যে ধ্রুবের সন্ধান করেন, সে সম্বন্ধেও আপনি অজ্ঞ। আপনি দার্শনিক, না, পশু তা বুঝতে পারছি না। সন্দেহ হচ্ছে পশুর মতোই আপনি অজ্ঞতার কর্দমে নিমজ্জিত রয়েছেন।"

"পশু বা দার্শনিককে গাল দেওয়া বৃথা। পশু যে কি তা আমরা জানি না, আমরা নিজেরা যে কি তাও জানি না। কিছু জানি না আমরা।"

"নাস্তিক ব'লে এক অদ্ভুত সম্প্রদায় আছে শুনেছি। আপনি কি সেই দলের নাকি! তারা কিছুই মানে না। গতিও না, স্থিতিও না। দিনের আলো, রাতের অন্ধকার দুইই তাদের কাছে সমান।"

"বন্ধু, আমি নাস্তিকই। নাস্তিকের মতবাদ তোমার কাছে হয়তো হাস্যকর, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ দেখি। বিরাট মন্দির প্রভাতের স্বর্ণকিরণে ঝলমল করে, আবার সান্ধ্য-আকাশের উজ্জ্বল রঙীন পটভূমিকায় সেই মন্দিরকেই দেখায় কষ্টিপাথরের স্তূপের মতো। ওর সত্য রূপ কি আমি জানি না। আমি জানি, সবই বদলায়। সূর্যকে হিরণ্ময় পাত্রের মতো দেখি, কিন্তু কেন দেখি তা জানি না। অগ্নির তাপ অনুভব করি, কিন্তু অগ্নি কেন যে উত্তপ্ত তা জানি না। বন্ধু, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ মনে হচ্ছে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো দার্শনিকের চক্ষে সবই সমান।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে আপনি সুখভোগে লিপ্ত না থেকে এমন নির্জনে ওই ভগ্নকুটীরে বেল খেয়ে এমন দুর্দশায় আছেন কেন? কেন তা হ'লে এই কষ্ট সহ্য করছেন? আমিও আপনারই মতো নির্জনের কৃচ্ছ্রসাধনা করি। কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য আছে, আমি দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করতে চাই। তিনি প্রসন্ন হ'লে আমি অনন্ত সুখের অধিকারী হব—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমার আচরণ নিরর্থক নয়, ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্তমানে কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনি এ কি করছেন! ভবিষ্যৎ অনন্ত জীবনের অস্তিত্বে আপনার যদি আস্থা না থাকে, তা হ'লে এ দুঃখভোগ কি অনর্থক নয়? এ তো তা হ'লে বাতুলতার নামান্তর। আমি যদি আপনার মতো নাস্তিক হতাম—এই ভয়ঙ্কর উক্তির জন্য শঙ্কর আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন—আগমে নিগমে শাস্ত্রে পুরাণে সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনচরিতে যে শিবমহিমা কীর্তিত তাতে যদি আমার বিশ্বাস না থাকত, আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যই শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন এ সত্যে আমি যদি আস্থাবান না হতাম, সংক্ষেপে আপনার মতো আমি যদি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম, তা হ'লে আমি সন্ন্যাসী হতাম না, সংসারেই থাকতাম। সংসারের ভোগবিলাসেই গা ঢেলে দিতাম। বিলাসের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের ডাক দিয়ে বলতাম—নিয়ে এস তোমাদের সুরা আর সুধা, নিয়ে এস অলঙ্কার আর অহঙ্কারের উপচার আড়ম্বর, চল, আনন্দের হিল্লোলে ভেসে যাই। ...আপনার তাই করা উচিত ছিল। আপনি যা করছেন তাতে আপনার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাচ্ছি না। বর্তমানের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, অথচ ভবিষ্যতের কোনও সুখ আশা করেন না, মনে হচ্ছে আপনি একূল ওকূল দু কূলই হারিয়ে মাঝখানে দিশাহারা হয়ে আছেন, অথচ তা বুঝতে পারছেন না। এ রকম সাধু সাজবার অর্থ কি! আপনার আচরণ বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে, পশুদের ব্যবহারেরও একটা সঙ্গতি থাকে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

সার্বর্ণির কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ ও উত্তাপ ছিল। বৃদ্ধ কিন্তু বেশ শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, "ভাই, যে ব্যক্তিকে তুমি পশুরও অধম ব'লে মনে করছ তার কথা জেনে লাভ কি?"

বৃদ্ধের শান্ত কণ্ঠস্বরে সার্বর্ণি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। সত্য সম্বন্ধে কৌতূহলই তাঁহাকে ভব্যতার গণ্ডী লঙ্ঘন করাইয়াছিল—বৃদ্ধকে অপমান করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি বলিলেন, "সত্য জানবার আগ্রহে আমি যদি শোভনতার সীমা অতিক্রম ক'রে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার উপর ব্যক্তিগতভাবে আমার রাগ বা আক্রোশ থাকবার কথা নয়। কিন্তু আপনি যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, সেই অন্ধকার আমি ঘৃণা করি। আমি ভাবতেও পারি না যে, এমন ভারতবাসী থাকতে পারেন যিনি শিবের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। আপনার মধ্যেই আমি শিবকে প্রচ্ছন্ন দেখছি এবং মনে মনে প্রার্থনা করেছি, আপনার কাছেও তিনি আত্মপ্রকাশ করুন। শিব-মহিমার শুভ্র আলোকে আপনার তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধির মুক্তি হোক। একটি অনুরোধ করছি, আপনার এই অদ্ভুত আচরণের স্বপক্ষে যদি কোনও যুক্তি থাকে আমাকে বলুন, আমি এখনই তা খণ্ডন করব।"

বৃদ্ধ শান্তভাবেই উত্তর দিলেন, "যুক্তি বিবৃত করতে আমার আপত্তি নেই, কিছু না ব'লে চুপ ক'রে থাকতেও আপত্তি নেই। আপনি শুনতে চাচ্ছেন শুনুন। আমার যুক্তির উত্তরে কিন্তু আপনি যা বলবেন তা আমি শুনব না। শোনবার প্রবৃত্তি নেই। আপনার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল আমার জাগেনি। আপনি আপনার মধ্যেই আপনার সুখ-দুঃখ বর্তমান-ভবিষ্যৎ যুক্তি-তর্ক নিবদ্ধ ক'রে রাখুন। তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে বা মাথা ঘামাতে আমি ইচ্ছুক নই। আপনার প্রতি প্রেম বা ঘৃণা কিছুই জাগেনি আমার মনে। দার্শনিকের কাছে তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা দুই-ই সমমূল্য। এখন মনে পড়েছে, শিব নামক যে দেবতাটির আপনি নাম করলেন তাঁর নাম একেবারে শুনিনি যে তা নয়, ছেলেবেলায় একবার শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করিনি কখনও। প্রয়োজনই হয়নি। দেবতা তো একটি নন, শুনেছি সংখ্যায় তাঁরা তেত্রিশ কোটি, হয়তো আরও বেশি, কিন্তু আমার জীবনে তাঁদের কোনও প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তাই তাঁদের কথা চিন্তা করি না কখনও।"

"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম কৌশিক। জাতিতে আমি লিচ্ছবি। শুনেছি আমার পূর্ব-পুরুষরা রাজা ছিলেন। কিন্তু রাজত্ব তাঁদের বেশি দিন টেকেনি। আমার পিতামহের কিছু

বিষয়-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি শেষকালে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করেন। সৌরাষ্ট্রে চ'লে যান তিনি। সেইখানেই আমার পিতার জন্ম হয়। আমার পিতাও প্রথম জীবনে যথেষ্ট দারিদ্র্য ভোগ করেছিলেন। পরে তিনি এক বণিকের সহকারী হয়ে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বাণিজ্যে তাঁর বেশ লাভ হ'ল এবং ক্রমশ তিনি সৌরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হয়ে পড়লেন। আমার দুই দাদা ছিলেন। তাঁদের উনি ওই ব্যবসাতেই লাগালেন। আমাকে দিলেন বিদ্যালয়ে। আমি পড়াশোনায় মন দিলাম। ভালই দিন কাটছিল আমাদের কিন্তু তার পরেই বিপদের ছায়াপাত হ'ল। ব্যাপারটার সূত্রপাত হ'ল বড়দার বিয়ে নিয়ে। বাবা তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে জোর ক'রে বড়দার বিয়ে দিলেন। ফল বিষময় হ'ল। অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। বড়দা বৌদিদিকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না, মেজদা কিন্তু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পরে জানা গেল, তাঁর সঙ্গে একটা অবৈধ যোগাযোগও ঘটেছে। বৌদির মনোভাব ছিল কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তিনি আমার দুই দাদাকেই ঘৃণা করতেন। তিনি ভালবাসতেন এক বাঁশীওলাকে, বিয়ের আগে থেকেই সম্ভবত ভাব ছিল তার সঙ্গে। সে গভীর রাত্রে গোপনে বৌদির ঘরে আসত। একদিন সে ধরা পড়ল। দুই দাদা মিলে তাকে এমন চাবকান চাবকালেন যে, সে ম'রেই গেল। তার আর্তনাদ অনুনয় অশ্রু নিবৃত্ত করতে পারলে না দাদাদের। এর পর যা হ'ল তা আরও ভয়ঙ্কর। বৌদি পাগল হয়ে গেলেন। আমার দুই দাদাও। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। পশুর মতো চীৎকার ক'রে বেড়াতেন তাঁরা। এত চীৎকার করতেন যে মুখ দিয়ে ফেনা গড়াত। কারও দিকে চাইতেন না তাঁরা। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে থাকতেন। একপাল ছেলে তাদের পিছু নিয়েছিল, ছেলেদের যা স্বভাব তাই করত তারা, ওই পাগল তিনটিকে লক্ষ্য ক'রে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ত। কিছুদিন পরে তাঁরা মারা গেলেন—তিনজনেই মারা গেলেন। বাবা বেঁচেছিলেন তখনও, তাঁকেই শ্রাদ্ধশান্তি করতে হ'ল। কিছুদিন কাটল, কিভাবে কাটল অনুমান করতে পারছেন আশা করি। তারপর বাবার পালা এল। তাঁর পেটে একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। শুধু তাই নয়, যা খেতেন বমি হয়ে যেত। এশিয়ার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কিনে ফেলবার মতো অর্থ তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি মারা গেলেন অনাহারে। পেটে কিছুই থাকত না। আমি অবশেষে তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। তাঁর ইচ্ছে ছিল না যে, আমি তাঁর উত্তরাধীকারী হই। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। সমস্ত টাকাটা আমার হাতেই প'ড়ে গেল। গৃহের পরিবেশ ভাল লাগল না আমার। আমি বেরিয়ে পড়লাম দেশভ্রমণে। ভারতবর্ষ ঘুরলাম।

সিংহলে, শ্যামদেশে, যবদ্বীপেও গেলাম। অনেক বড় বড় মঠে, বড় বড় বিদ্যাপীঠে, বড় বড় মন্দিরে, বড় বড় বিদ্বানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আলাপও হ'ল। তাঁদের তর্ক করবার প্রবল ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। প্রত্যেকেই মহা তার্কিক, অপরকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে নিজের বিদ্যা জাহির করতে চায় প্রত্যেকে। একদিন কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গাতীরে এমন একজনকে দেখলাম যে আমার তাক লেগে গেল। দেখলাম গঙ্গাতীরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি লোক পদ্মাসনে স্থির হয়ে ব'সে আছেন। সবাই বললে—উনি একজন উঁচুদরের সন্ন্যাসী, ত্রিশ বছর ধ'রে ঠিক ওই একভাবে ব'সে আছেন। দেখলাম, তাঁর শীর্ণ দেহ লতায় ঘিরেছে, তাঁর রুক্ষ জটায় পাখী বাসা বেঁধেছে। অথচ তিনি বেঁচে আছেন। আমার দুই দাদা বৌদি, সেই বাঁশীওলা আর বাবার কথা মনে পড়ল, কি দুঃখই না তাঁরা পেয়েছেন! বুঝলাম, এই গঙ্গাতীরবাসী সন্ন্যাসীই প্রকৃত জ্ঞানী। আমার যেন একটা উপলব্ধি হ'ল, মনে হ'ল যেন পথ দেখতে পেলাম। বুঝলাম মানুষের দুঃখের একমাত্র কারণ কামনা। আমরা যেটাকে আনন্দ-জনক ব'লে মনে করি, সেইটেই কামনা করি। কাম্য বস্তু না পেলেই দুঃখ হয়, আবার পেলেও সর্বদা ভয় করে—পাছে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা আনন্দজনক, ওটা দুঃখজনক—এই সব বিশ্বাসই দুঃখের হেতু। এই সব বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিলেই দুঃখ, বর্জন করলে দুঃখের হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। সেই সাধুর আদর্শই আমি অনুসরণ করছি। এটা ভাল, ওটা মন্দ—এ বোধ ত্যাগ ক'রে যতদূর সম্ভব নির্বিকার হয়ে নির্জনে স্থির হয়ে ব'সে থাকাটাই আমি একমাত্র শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি অভিনিবেশ সহকারে কৌশিকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কৌশিকের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি যা বললেন তা যে একেবারে অর্থহীন তা নয়। পার্থিব সুখ সত্যই বর্জনীয়। অপার্থিব সুখলাভের জন্যই বর্জনীয়। ঋষিরা যাকে অপার্থিব অনন্ত সুখ ব'লে বর্ণনা করেছেন, সেটাকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেইটাই হ'ল লক্ষ্য। এই সত্যকে অবজ্ঞা করলে স্বয়ং ভগবানকেই অবজ্ঞা করা হয় যে! নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেউ তা করতে সাহস করবে না। কৌশিক, আপনার অজ্ঞতায় আমি ব্যথিত হয়েছি। আপনি এইটুকু শুধু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিতেই পরম সত্য প্রকাশিত। একই তিন, আবার তিনই এক। আপনি আমার কথাগুলি শুনুন ভাল ক'রে।"

কৌশিক বাধা দিলেন, "আগন্তুক, ক্ষান্ত হও। তোমার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমি

শুনতে চাই না। জোর ক'রে আমাকে দলে টানবার চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। আমি কোনও মতবাদই মানি না। কোন সিদ্ধান্তই শেষ কথা বলতে পারেনি, সমস্ত শাস্ত্র-আলোচনাই বন্ধ্যা—এই আমার মত। এই মত অনুসরণ ক'রে আমি মোটামুটি ভালই আছি। তুমি তোমার গন্তব্য পথে চ'লে যাও। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার পর যে নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থায় আমি নিজেকে মগ্ন করতে পেরেছি, সেখান থেকে আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।"

মহর্ষি সাবর্ণি প্রকৃতই একজন শাস্ত্রপারঙ্গম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরের করুণা এখনও এই দুর্ভাগ্য কৌশিকের উপর বর্ষিত হয় নাই। ইহার চিত্ত সাংসারিক কষ্টে এত বেশী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ইহার নাই। মুক্তি বা অনন্ত জীবনের কল্পনা করা এখনও ইহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন অপাত্র বা অনধিকারীর সহিত শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ করিলে অনেক সময় বিষময় ফল হয়, অবিশ্বাসীরা জেদ করিয়া যেন নিজেদের পাপের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেয়। এই সব চিন্তা করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "কৌশিক, ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। আমি চললাম।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই অন্ধকারেই সাবর্ণি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

উষাকালে দেখিতে পাইলেন, গঙ্গার তীরে মুণ্ডক নামক সারস-জাতীয় পক্ষী একপদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গঙ্গার জলে তাহাদের মূর্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। আশেপাশে ঝাউবন। শ্বেতপক্ষ বলাকার শ্রেণী ত্রিভুজাকারে নীল আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে! ঝাউবনের ভিতর হইতে নানাপ্রকার জলচর পক্ষীর বিচিত্র কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সাবর্ণি দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া সুরধুনী সাগরসঙ্গমে চলিয়াছেন, যতদূর দৃষ্টি যায় নৌকার সারি পাল তুলিয়া চলিয়াছে। নদীর তীরে মানুষের বসবাস। কোথাও গগনচুম্বী শ্বেত অট্টালিকা, কোথাও বা কুটীর-শ্রেণী, আর সকলকে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে একটা অর্ধ-স্বচ্ছ কুহেলিকা। কুহেলিকা ধীরে ধীরে যেন নিজেকে প্রসারিত করিতেছে। অনেক বাগান দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটিই ফলে ফুলে ভরা। ক্ষেতে ক্ষেতে শস্যসম্ভার যেন উছলিয়া পড়িতেছে, পক্ষী-কলরবে চারিদিক মুখরিত, জীবনধাত্রী ধরিত্রী

জীবনের বিচিত্র বিকাশে যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সে আনন্দ শস্যশীর্ষে কাঁপিতেছে, ধূলিকণায় বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মহর্ষি সার্বর্ণি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, তোমার কৃপায় আমার যাত্রা সফল হতে চলেছে, তোমাকে নমস্কার। হে মদনান্তক, তোমার যে মহিমার বিচিত্র প্রকাশে প্রকৃতি সমুজ্জ্বলা, তোমার সেই মহিমার প্রভাব নিরঞ্জনাকেও কলুষমুক্ত করুক। যে প্রেমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে মধুময় ক'রে রেখেছ, নিরঞ্জনা যে তা থেকে বঞ্চিত এ আমি ভাবতে পারি না। হীন প্রবৃত্তির যে কালিমা তাকে কলঙ্কিত ক'রে রেখেছে, হে সর্বকলঙ্ক-পাবক যোগীশ্বর, তুমি তা অপসারিত ক'রে কুসুমেরই মতো স্বর্গীয় সুষমায় আবার তাকে ফুটিয়ে তোল।"

প্রার্থনা শেষ করিয়া আবার তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পথে পুষ্পিত তরু বা সুন্দর পাখী দেখিলেই নিরঞ্জনার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে চলিতে বহু সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া কয়েকদিন পরে অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রের সমীপবর্তী হইলেন।

তখন প্রভাত হইতেছিল। নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্বত-সদৃশ উচ্চভূমি দেখিয়া তাহাতেই তিনি আরোহণ করিতে লাগিলেন। সেই উচ্চভূমির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া বহুকাল পরে তিনি সেই বিশাল নগরীকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, নবোদিত সূর্যালোকে অসংখ্য সৌধমালা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিক যেন ঝলমল করিতেছে। তাঁহার আনন্দ হইল, দুঃখও হইল। তাঁহার মনে হইল, এ আনন্দ কামজ। মনে হইল, যাহা দেখিতেছি তাহাতে মূঢ় মানবদের মোহিনী কামনাই কেবল শতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। দম্ভ, বিলাস, আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নাই।

সার্বর্ণির অধরে একটা বক্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। অতীতের সমস্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি নির্নিমেষে কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে অন্তরের ভাবকে ভাষা দিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওই নগরেই কামনার ফলস্বরূপ একদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ওই নগরের বিষাক্ত সুরভিত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে কুহকিনী রাক্ষসীদের গান শুনে ছলাকলায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দের সাগরে পাড়ি দেবার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি। জন্মের দিক থেকে বিচার করলে

ওই আমার শৈশবের লীলাভূমি, সমাজের দিক থেকে দেখলে ওই গৃহ। লোকচক্ষে সে লীলাভূমি পুষ্পাকীর্ণ, সে গৃহ আভিজাত্যমণ্ডিত। পাটলিপুত্র, তোমার সন্তানেরা যে তোমাকে জননী ব'লে শ্রদ্ধা করে তাতে অস্বাভাবিকতা নেই কিছু। সত্যিই তোমার ক্রোড়ে তারা জন্মেছে, সত্যিই তাদের লালন করেছ তুমি। বিলাসবেশে সজ্জিত হয়ে আমিও তোমার বুকে মানুষ হয়েছিলাম একদিন। কিন্তু আমি ত্যাগ করেছি তোমাকে, স্বেচ্ছায় শুভবুদ্ধিবশে ত্যাগ করেছি। মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীরাও ওই উপদেশই দিয়েছেন। যাঁরা বিদ্রোহী, তাঁরাই সন্ন্যাসী, তাঁরা প্রকৃতির পারবশ্য মানতে চান না। বৈদান্তিকেরা পার্থিব সুখ-দুঃখকে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করেন, তপস্বীরা মানব-জীবনকে প্রবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সাধু মাত্রেই সংসারের সংস্রব ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। পাটলিপুত্র, তাই তোমার প্রেমালিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করেছি আমি। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি তোমার ঐশ্বর্যকে, তোমার বিজ্ঞানকে, তোমার ভদ্রতাকে, তোমার চাকচিক্যকে। প্রকৃত মানবতার তুমি জননী নও, তুমি দানবধাত্রী, তোমাকে আমি অভিশাপ দিই। অভিশাপ দিই তোমার ছদ্মবেশী ভদ্রতাকে। হে সর্বত্যাগী শঙ্কর, হে শ্মশানচারী মহাকাল, হে কৈলাসপতি মহেশ্বর, কুবেরের ঐশ্বর্য তোমাকে মুগ্ধ করেনি; তুমি সতীনাথ, তুমি উমাপতি, প্রতি কুমারীর আরাধ্য দেবতা তুমি, কিন্তু তবু তুমি কাম-পঙ্কে নিমগ্ন নও, মদনকে ভস্ম করেছ তুমি। হে মহাশক্তিধর, আমাকে শক্তি দাও, আমি পাপ-পুরীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।"

প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি পর্বত হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন।

…কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর পাটলিপুত্রের বিরাট সিংহদ্বার তাঁহার নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ছায়ায় বসিয়া বহু ফল-বিক্রেতা ফল বিক্রয় করিতেছে। আশেপাশে অনেক ভিক্ষুকও রহিয়াছে। তাহাদের করুণ কণ্ঠ, শীর্ণ ক্লান্তি, লোলুপ দৃষ্টি দেখিয়া সাবর্ণি বিচলিত হইলেন। ছিন্নবাসা এক বৃদ্ধা জানু পাতিয়া বসিয়া ছিল। সে সাবর্ণির বহির্বাসের প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমাকে আশীর্বাদ কর, ভগবান যেন দয়া করেন আমাকে। এ জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি, পরকালে যেন শান্তি পাই। তুমি পুণ্যাত্মা, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দাও আমার।"

"জয় শঙ্কর।"

বৃদ্ধার মাথায় হস্তার্পণ করিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া একদল ছেলের

পাল্লায় পড়িয়া গেলেন তিনি। রাস্তার অভব্য ছেলের দল। তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শুধু তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহা বলিতে লাগিল তাহা অশ্লীল, অশ্রাব্য।

"ওরে দেখ্ দেখ্, এক ব্যাটা ভণ্ড সাধু চলেছে! ব্যাটার গায়ের রঙ যেন কাকের মতো। আর দাড়ি দেখেছিস? ঠিক যেন ছাগল-দাড়ি। মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে কাক-তাড়ুয়ার কাজ হয়। না না বাবা, মাঠে গিয়ে কাজ নেই ওর। ওকে দেখলে মাঠের ফসলই শুকিয়ে যাবে; শীষ ঝ'রে যাবে সব। যমের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও স্থান নেই ওর। এখানে কোথা থেকে জুটল..."

এই ধরনের চীৎকার করিতে করিতে তাহারা ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল।

"অবোধ শিশুদের ভগবান মঙ্গল করুন"—মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "এই বৃদ্ধাটির ব্যবহার কতো শ্রদ্ধাপূর্ণ, আর এই ছেলেগুলো কি অভদ্র। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মূল্য দেয়। বৃদ্ধ কৌশিক নাস্তিক হ'লেও যা বলেছে তা ঠিক। সে অন্ধ বটে, কিন্তু এ জ্ঞান তার আছে যে সে অন্ধ, আলো কি তা জানে না, জানবার স্পৃহাও নেই। মানুষকে একটা কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড দিয়ে মাপবার উপায় নেই। পৃথিবীতে একমাত্র শঙ্করই স্থির, আর সবই মায়া, সবই চঞ্চল।"

দ্রুতবেগে তিনি পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। দশ বৎসর পরে তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়াছেন, আশা করিতেছিলেন অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু কই, সবই তো ঠিক তেমনিই রহিয়াছে! পথ তেমনি প্রস্তরাকীর্ণ, মনে হইতেছিল প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড যেন তাঁহার পরিচিত। মনে পড়িতেছিল প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের সহিত যেন তাঁহার পদস্খলনের ইতিহাস জড়িত আছে। উঃ, কি জীবনই না তিনি যাপন করিয়াছিলেন! সহসা তাঁহার অন্তর ক্ষোভে দুঃখে অনুতাপে তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর পদাঘাত করিতে করিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণ রক্তাক্ত হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বরং দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল, মনে হইল প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম তখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। কিছু দূর গিয়া তিনি একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলেন। সেটিকে বামে রাখিয়া তিনি যে পথ ধরিলেন, সেই পথই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি উদ্যান বাটিকা। চন্দন চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধি বৃক্ষশ্রেণী পথটিকে ছায়াময় ও সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। উদ্যান-বাটিকাগুলি মোটেই বাটিকা নয়, প্রত্যেকটিই এক-একটি হর্ম্য। প্রতিটি

হর্ম্যই মনোরম কারুকার্য-খচিত। কোথাও প্রবালের রক্তদ্যুতি, কোথাও মর্মরের শুভ্রকান্তি, কোথাও বা স্বর্ণগম্বুজের সমুজ্জল শোভা। অর্ধ-উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়া কোনো উদ্যান-বাটিকার অভ্যন্তর দৃষ্ট হইতেছিল। কোথাও মর্মর-বেদিকার উপরি পিত্তলের মূর্তিসকল কাননের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, কোথাও সুরভিত জলের ফোয়ারা কাননের পুষ্পপত্র ও পরিবেশকে শীকর-স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা কৃত্রিম পর্বত বাহিয়া নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, প্রত্যেকটি বাড়ি যেন শান্তির নিলয়। কোথাও কোন শব্দ নাই, মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে।

সাবর্ণি একটি ক্ষুদ্র মনোরম প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া গতিবেগ রোধ করিলেন। এই প্রাসাদটিই তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি প্রাসাদটির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদের স্তম্ভ-গুলি অপরূপ, সেগুলিতে যেন পাষাণের কাঠিন্য বা রূঢ়তা নাই, প্রত্যেকটিতে যেন তন্বী যুবতীর দেহলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রাসাদের অলিন্দে বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পিত্তলমূর্তিসমূহ শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকটিই যে এক বা একাধিক শিল্পীর প্রতিভা-নৈপুণ্যের নিদর্শন, দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। মূর্তিগুলি দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার অন্তরে ক্ষোভই সঞ্চারিত হইল। দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পিতল দিয়েই তৈরি কর বা সোনা দিয়েই তৈরি কর, এ সব বাজে সন্ন্যাসীর মহিমা কখনও চিরস্থায়ী হবে না। এরা নাস্তিক, নরকেই এদের মহিমা চিরস্থায়ী হতে পারে। এদের ভ্রান্ত মতবাদ মানুষকে ভ্রান্ত পথেই নিয়ে যায়। লম্বা লম্বা বক্তৃতা করলেই সাধু হওয়া যায় না, বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করলে তা মন্দিরও হয় না, যদি তাতে দেবতা না থাকেন। ও-সব ভাঁওতায় সাধারণ লোকও বেশিদিন ভোলে না।"

একজন ক্রীতদাস দ্বার খুলিয়া দেখিল, ছিন্ন মলিন আলখাল্লা-পরা একটা কিম্ভুতকিমাকার কুৎসিত লোক ধূলামাখা পায়ে মর্মর-শুভ্র বারান্দায় উঠিয়াছে। সে তাড়া করিয়া গেল।

"নেবে যাও, নেবে যাও। এখানে ভিক্ষে মিলবে না, অন্য কোথাও যাও। নাবছ না যে, মার খাবে নাকি?"

সাবর্ণি শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি ভিক্ষা চাই না। আমাকে তোমার প্রভু সিন্ধুপতি বর্মার কাছে নিয়ে চল।"

এ কথা শুনিয়া ভৃত্যটি আরও চটিয়া গেল।

"আমার প্রভুর কি আর কাজ নেই যে, তোমার মত লক্ষ্মীছাড়া ভূতের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন! আর কথা বাড়িও না, কেটে পড়।"

"বৎস, যা বলছি শোন। তোমার প্রভুকে গিয়ে বল যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার প্রয়োজন আছে।"

ভৃত্যটি এবার ক্ষেপিয়া গেল।

"দূর হ, দূর হ, ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার।"

ভৃত্যটির হস্তে একটি যষ্টি ছিল। তদ্দ্বারা সে সার্বর্ণিকে আঘাত করিল। সার্বর্ণি কিন্তু বিচলিত হইলেন না। মাথা পাতিয়া তিনি আঘাত গ্রহণ করিলেন এবং শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, যা বলছি কর। তোমার প্রভুকে খবর দাও। মিনতি করছি, আমার অনুরোধটি রাখ।"

এবার ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। একটু ভীতও হইল। প্রহারে বিচলিত হয় না, লোকটি তো সাধারণ লোক নয়। সে ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে খবর দিল।

সিন্ধুপতি তখন স্নান করিতেছিলেন। তিনি সদানন্দ পুরুষ, তাঁহাকে দেখিলেই ভাল লাগে। তাঁহার অধরে নয়নে একটি শান্ত মৃদুহাস্য সর্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অবশ্য বোঝা যায় যে, তাঁহার ওই শান্ত হাসিটি অন্তরের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

সার্বর্ণি ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া আসিলেন।

"আরে, আরে, সাবু না কি! বাল্যবন্ধুর এমন আকস্মিক পুনরাবির্ভাব তো কল্পনা করতে পারিনি! তোমাকে দেখেই চিনেছি আমি, খুশীও হয়েছি, কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! তুমি যে ভদ্রবংশের ছেলে তা তোমাকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই! ছি ছি, কি হয়ে গেছ তুমি! মনে হচ্ছে মানুষ নয়, যেন একটা জানোয়ার। ব্যাপার কি বল দেখি?"

সিন্ধুপতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"আমরা একসঙ্গে ব্যাকরণ অলঙ্কার আর দর্শন পড়েছিলাম, না? আমাদের আচার্য জ্ঞানকুম্ভ উপাধ্যায়কে মনে আছে? টোলেই তোমার কেমন যেন একটা বুনো বুনো ভাব ছিল, অনেকটা যেন ঘোড়ার মতো ছিলে তুমি। চট্ ক'রে ভড়কে যেতে, চট্ ক'রে লাফিয়ে উঠতে। মনে আছে?"

মহর্ষি সার্বর্ণি কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল।

সিন্ধুপতি বলিয়া চলিলেন, "সব মনে আছে আমার। কাউকে বিশ্বাস

করতে না তুমি, এমন কি নিজেকেও নয়। তবে মেজাজ তোমার দরাজ ছিল, তার পরিচয় তুমি দিয়েছ। তোমার ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি, এমন কি নিজের জীবনটাও এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ তুমি, যেন একমুঠো ধূলো। তোমার এই অদ্ভুত স্বভাব—প্রতিভা বলতেও আপত্তি নেই আমার—অবাক ক'রে দিয়েছিল আমাকে। তুমি যখন সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলে, সত্যি বলছি, খুব কষ্ট হয়েছিল; মনে হয়েছিল মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে গেল। যাক, এতদিন পর যে তোমার আবার সুমতি হয়েছে, আবার যে তুমি ফিরে এসেছ, এতে সত্যি বলছি খুব খুশী হয়েছি। ধর্মের ভেক কি ভদ্রলোকের মানায়? অরণ্যে বাস করাও কোন ভদ্রলোকের পোষায় না বেশীদিন; তুমিও যে ফিরবে তা জানতাম। আজ একটা শুভদিন বলতে হবে। ছন্দা, নন্দা, আমার বন্ধুটিকে একটু ভদ্র ক'রে তোল তো। ওর হাতে পায়ে গায়ে দাড়িতে চুলে বেশ ক'রে ফুলেল তেল লাগাও।"

সিন্ধুপতি ঘাড় ফিরাইয়া দুইজন ক্রীতদাসীকে আদেশ করিলেন। তাহারা মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেল এবং ভৃঙ্গার, গন্ধপাত্র, তৈল, ধাতব দর্পণ প্রভৃতি আনয়ন করিল। কিন্তু সাবর্ণি হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন এবং আনতনয়ন হইয়া রহিলেন, কারণ ক্রীতদাসী দুইটি সম্পূর্ণ নগ্না ছিল। সিন্ধুপতি স্মিতমুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর নিজেই গিয়া পাদ্য-অর্ঘ আসন এবং খাদ্য পানীয় আনিয়া করজোড়ে বলিলেন, "মহর্ষি, সদয় হোন। আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

মহর্ষি কিন্তু কিছু গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু এইবার তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল। বলিলেন—"সিন্ধুপতি, তুমি ভুল করেছ। আমি ধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসিনি। ধর্মেই যে সার সত্য নিহিত আছে—এ কথা আমি ক্ষণিকের জন্যও ভুলি না। শব্দই যে শঙ্কর—এ কথা আমি উপলব্ধি করেছি। শঙ্করই ব্রহ্মরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে তা পালন করছেন এবং মহাকালরূপে তা ধ্বংস করছেন—এ সত্য বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আমি জানি, তিনি যা সৃষ্টি করেন নি তা এখনও অস্পষ্ট আছে; তিনিই আদি-উৎস, আদি-প্রাণ, চিরন্তন লীলা।"

"আরে সর্বনাশ!"

অর্ধ-স্ফুটকণ্ঠে কথা দুইটি উচ্চারণ করিয়া সিন্ধুপতি একটি সুরভিত অঙ্গচ্ছেদ পরিধান করিতে লাগিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই সাবু, ব্রহ্ম-ট্রহ্ম শুনে ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই। আমি বনে যাইনি বটে, কিন্তু ও-রকম বড় বড় বচন অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছিও। নিজেও দর্শনশাস্ত্র চর্চা কম

করিনি—একসঙ্গেই তো শুরু করেছিলাম, মনে নেই ? তুমি উপনিষদ্ বা পুরাণ থেকে দু-চারটে বচন আউড়ে আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না, সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সমস্ত উপনিষদ্, সমস্ত পুরাণ তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটেছি আমি, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারিনি, পিপাসাও মেটেনি। ওসব পড়ে মনে হয়েছিল মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন ছেলেমানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে তাকে ভোলাবার জন্তেই মুনি-ঋষিরা নানা রকম রূপকথা বানিয়ে গেছেন। শাস্ত্রই বল বা বেদ-উপনিষদ্‌ই বল, গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রে পশু-পক্ষীরা কথা কইছে, বত্রিশ সিংহাসনে পুতলরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে—এসব আশা করি তুমি সত্য ব'লে মনে কর না। চল, ভিতরে চল।"

মহর্ষি সার্বর্ণির হাত ধরিয়া তিনি ভিতরের দিকে একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"এটি আমার গ্রন্থশালা। পাটলিপুত্রে রাজপ্রাসাদেও এ রকম পুঁথি-সংগ্রহ নেই। সমস্ত আমি পড়ে দেখেছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান ? ওসব অসুস্থ মনের অস্বাভাবিক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।"

তিনি জোর করিয়া সার্বর্ণিকে একটি গজদন্তনির্মিত আসনে বসাইয়া দিয়া নিজে আর একটি আসন গ্রহণ করিলেন। সার্বর্ণি তাঁহার সযত্নরক্ষিত গ্রন্থগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চোখে বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। অবশেষে বলিলেন, "ওগুলো পুড়িয়ে ফেল।"

"পুড়িয়ে ফেলব ! বল কি ? মানব-সভ্যতার ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে তা হ'লে যে ! বলছ কি তুমি ! ওগুলো অসুস্থ মনের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু পড়তে যে চমৎকার ! এই সব অস্বাভাবিক স্বপ্ন আর অসুস্থ কল্পনাই তো সরস ক'রে রেখেছে জীবনকে। ওগুলো লোপ পেলে পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রসও লোপ পাবে সঙ্গে সঙ্গে। আমরা তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক বস্তু হয়ে পড়ব তা হলে।"

মহর্ষি সার্বর্ণির মনে চিন্তা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়াই তিনি বলিলেন, "শাস্ত্র নামে অভিহিত এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, মানছি। কিন্তু যিনি সত্য, যিনি শঙ্কররূপে মূর্ত, তিনি কি মিথ্যা কল্পনা হতে পারেন ? মানুষের হিতের জন্য তিনি এসেছেন আমাদের মধ্যে—এ কথা কি শোননি ?"

সিন্ধুপতি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "শুনেছি বইকি ! চমৎকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছ তুমি। এটা তুমি নিশ্চয় মানবে, যিনি মানুষের মতোই চিন্তা করেন, মানুষের মতোই কথা বলেন, খান ঘুমোন বেড়িয়ে বেড়ান, সুযোগ পেলে স্ত্রীসঙ্গও করেন, তিনি মানুষই। তুমি তাঁকে দেবতা ব'লে ভাবছ কেন ? বৈদিক

যুগের ঋষিরা সূর্য চন্দ্র অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশে প্রচুর ঘি পোড়াতেন, উপনিষদ্-যুগের ঋষিরা বললেন—ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, দেবতারা এক ফোঁটাও পাননি, পেতে পারেন না। তারপর এলেন বুদ্ধদেব, তিনি ওদিক দিয়েই গেলেন না। তিনি অষ্ট নিয়মে সকলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নির্বাণের পথ দেখালেন। তাঁর জীবদ্দশায় কেউ কেউ হয়তো তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পরে দেখছি তাঁর চেলারা কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুললেন দাউ দাউ ক'রে। তারপর এলেন কুমারিল ভট্ট, এলেন শঙ্করাচার্য। একের পর এক এসেই যাচ্ছেন! দেবতারাও কি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন? বিশ্বের কুলোয় তেত্রিশ কোটিকে তুলে আছড়াচ্ছে সর্বদা। যাক, ওসব থাক্ এখন। তোমার কথা শুনি। খেতেও চাইছ না, কাপড় পর্যন্ত ছাড়তে চাইছ না, ব্যাপার কি বল দেখি? তোমাকে নিয়ে কি করি আমি।"

"ইচ্ছে করলে একটি মহদুপকার করতে পার। তুমি যেমন সুগন্ধি পোশাক পরেছ, তেমনি একটি পোশাক ধার দাও আমাকে। স্বর্ণখচিত পাদুকাও দাও এক জোড়া। আমার চুলে আর দাড়িতে লাগাবার জন্য দু-এক শিশি সুগন্ধি তেল পেলেও ভাল হয়। আর আমি অত্যন্ত খুশী হব, যদি তুমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে পার আমাকে। দেবে? যদি দাও, বড় কৃতজ্ঞ হব। এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

সিন্ধুপতি সুছন্দা ও সুনন্দা নাম্নী ক্রীতদাসী দুইটির দিকে ফিরিয়া তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদটি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। পোশাকটি কাশ্মীরী কাজ করা, বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্যে অপরূপ। সুছন্দা সুনন্দা যখন সেটিকে খুলিয়া তুলিয়া ধরিল, তখন মনে হইতে লাগিল যেন একটি অদ্ভুত আকৃতির বিচিত্র পুষ্প অদৃশ্য বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল, মহর্ষি সাবর্ণি যে ময়লা শতচ্ছিন্ন দুর্গন্ধ আলখাল্লাটি পরিধান করিয়া আছেন তাহা খুলিয়া তবে নূতন পোশাকটি পরিধান করিবেন। কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি কিছুতেই তাঁহার আলখাল্লা খুলিতে চাহিলেন না। বলিলেন, তিনি বরং গায়ের চামড়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু আলখাল্লা ছাড়িবেন না, পোশাকের উপর তিনি আলখাল্লা পরিবেন। সুতরাং আলখাল্লার নীচেই তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদটি পরাইতে হইল। ক্রীতদাসী হইলেও সুছন্দা সুনন্দা মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, কারণ প্রথমত তাহারা যুবতী, দ্বিতীয়ত রূপসী। সাবর্ণির অদ্ভুত সাজ দেখিয়া তাহারা হাসিতেছিল। সুনন্দা তাঁহাকে মহারাজ সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দর্পণটি তুলিয়া ধরিল। সুছন্দার সাহস আরও

বেশী। সে তাঁহার দাড়িতে হাত বুলাইয়া মুচকি হাসিতে লাগিল। মহর্ষি সাবর্ণি এসব কিছুই দেখিতেছিলেন না, তিনি চক্ষু বুজিয়া শঙ্করকে ডাকিতেছিলেন। সুবর্ণখচিত পাদুকাদ্বয় পরিধান করিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ পেটিকাটি কটিবন্ধে ভাল করিয়া বাঁধিয়া সাবর্ণি সিন্ধুপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, সিন্ধুপতিও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

সাবর্ণি বলিলেন, "সিন্ধুপতি, উপহাস ক'রো না। বিচলিতও হ'য়ো না। আমাকে যা যা দিলে আমি তার সদ্ব্যবহারই করব, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সিন্ধুপতি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, আমি নিশ্চিন্তই আছি। সৎ অসৎ কোন কিছু নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, কখনও ঘামাইও না। আমি জানি কোনও মানুষের পক্ষে সৎ হওয়াও যেমন অসম্ভব, অসৎ হওয়াও তেমনি অসম্ভব। আসলে ও দুটো জিনিসের অস্তিত্বই নেই। আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য—তা-ও সাময়িক সুবিধার জন্য—ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করেছি। সবাই আবার এ বিষয়ে একমতও নই। তুমি যেটা ভাল মনে কর, আমি সেটা করি না। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা ঝামেলা বাঁচিয়ে চলেন। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম আর সংস্কার মেনে চলেন, না চললে সমাজে শান্তিতে বাস করা যায় না। বর্তমান পাটলিপুত্র সমাজের সব রকম সংস্কার মেনে আমি চলি, ভাল-মন্দ বিচার করি না। তাই শহরে আমি গণ্যমান্য লোক। বন্ধু, তোমাকে যে সামান্য উপহার দিয়েছি তা নিয়ে তুমি মনের আনন্দে যা খুশী ক'রে বেড়াও, আমার কিছুতেই আপত্তি হবে না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাবর্ণির মনে হইল, সিন্ধুপতিকে অকপটে সব কথা খুলিয়া বলাই উচিত।

"আচ্ছা, বছর দশেক আগে নিরঞ্জনা ব'লে এক নটী রঙ্গমঞ্চে নাচত তাকে মনে আছে তোমার? তাকে চেন কি?"

"চিনি মানে! রূপসী নিরঞ্জনাকে পাটলিপুত্রে কে না চেনে! এই কিছুকাল আগে আমিই তো ক্ষেপেছিলাম তাকে নিয়ে। প্রচুর টাকা খরচ ক'রে রেখেও ছিলাম তাকে কিছুদিন। ওর জন্যে খানিকটা জমিদারি বিক্রি ক'রে ফেলতে হয়েছে।" তাহার পর একটু থামিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তিন-তিনখানা মোটা কবিতার বইও লিখতে হয়েছে, ও-রকম বাজে কবিতা আমার কলম দিয়ে কি ক'রে যে বেরুল তা ভেবে পাই না। কিন্তু কি করি বল, উপায় ছিল না কিছু। মেয়েমানুষের ব্যাপার, বিশেষত নিরঞ্জনার মত রূপসীর, ধন মান বুদ্ধি বিবেক

সমস্ত তার পদপ্রান্তে রেখে হাতজোড় ক'রে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। চিরকাল যদি থাকতে পারতাম, কৃতার্থ হয়ে যেতাম। চিরকাল যদি অপরূপ সৌন্দর্যে ডুবে থাকা সম্ভব হ'ত তা হ'লে শাস্ত্রফাস্ত্র ব্রহ্ম-ট্রহ্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করেছ সাবু। গভীর অরণ্যে এতকাল তপস্যা ক'রেও নিরঞ্জনাকে মনে আছে তোমার? ওর টানেই এসেছ না কি! আমরা তাহ'লে আর কল্‌কে পাব না দেখছি।"

সিন্ধুপতি হাসিলেন না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মহর্ষি সার্বণি কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। লোকটা এত বড় গর্হিত পাপের কথা সরস ভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল! পৃথিবী বিদীর্ণ হইল না, বিদীর্ণ পৃথিবীর ভিতর হইতে নরকের অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া তাহাকে গ্রাসও করিল না! সব যেমন ছিল তেমনি রহিল। সিন্ধুপতির মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সে বিষণ্ণ চিত্তে তাহার বিগত যৌবনের অন্তর্হিত দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছে। কারণ সত্যই তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল।

মহর্ষি সার্বণি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নিরঞ্জনার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ সেজন্য আসিনি। আমি এসেছি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করবার জন্যে। আমি তাকে কামের পঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করব সেই শঙ্করের চরণে, যিনি সতীনাথ, যিনি উমাপতি, যিনি মদনকে ভস্ম করেছিলেন, অথচ যিনি অনন্ত প্রেমের আকর। ভগবান নীলকণ্ঠ যদি আমার প্রতি বিরূপ হন, তা হ'লে নিরঞ্জনা আজই পাটলিপুত্র ত্যাগ ক'রে মঠে প্রবেশ করবে।"

সিন্ধুপতির অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিল।

"একটি কথা কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বন্ধু। নীলকণ্ঠ কন্দর্পকে ভস্ম করেছিলেন, কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারেন নি। বিদেহী কন্দর্প আরও ভয়ানক। তিনি আগে ছিলেন পঞ্চ-শর, এখন হয়েছেন অসংখ্য-শর। নিরঞ্জনা মূর্তিমতী রতি। তাকে সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করলে কন্দর্পের রোষে পড়বে বন্ধু। কথাটা মনে রেখো।"

"স্বয়ং শঙ্কর আমার সহায়। শঙ্করের কাছে এ প্রার্থনাও আমি জানাচ্ছি তিনি তোমাকেও রক্ষা করুন। তুমিও পাপের পঙ্কে ডুবে আছ সিন্ধুপতি।"

এই কথা বলিয়া সার্বণি বাহির হইয়া গেলেন, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। সিন্ধুপতি কিন্তু সঙ্গ ছাড়িলেন না, কিছু দূর গিয়া তিনি সার্বণির কানে কানে পুনরায় বলিলেন, "কন্দর্পকে চটিও না। তাঁর রোষ ভয়ঙ্কর, প্রতিশোধ আরও ভয়ঙ্কর।"

সার্বর্ণি এ কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সিন্ধুপতির সহিত আলাপ করিয়া তিনি মোটেই সুখী হন নাই, তাঁহার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সতীর্থ সিন্ধুপতি যে একদিন নিরঞ্জনার প্রণয়ী ছিল, সে যে অর্থের বিনিময়ে নিরঞ্জনাকে ধারাবাহিকরূপে কিছুদিন ভোগ করিয়াছে—এই নিদারুণ সংবাদ যেন সার্বর্ণির বুকে শেল হানিতেছিল। সুরত-প্রসঙ্গ মাত্রেই তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্তে জুগুপ্সার সঞ্চার করে, কিন্তু নিরঞ্জনা-সম্পর্কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার চিত্তকে মথিত করিয়া বিষোদ্গিরণ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এতদপেক্ষা ঘৃণ্যতর পাপ পৃথিবীতে আর যেন কিছু নাই, হইতেও পারে না। একটা অদৃশ্য ঈর্ষার অনলে তিনি যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সিন্ধুপতিকে বারম্বার অভিশাপ দিলেন আর মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে শঙ্কর, আমাকে শক্তি দাও,—শক্তি দাও। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মানসিক শক্তি সত্যই যেন বর্ধিত হইল। তিনি মনে মনে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, নটী নিরঞ্জনাকে যেমন করিয়া হোক পাটলিপুত্রবাসীদের কবলমুক্ত করিয়া তিনি লইয়া যাইবেন।

নিরঞ্জনার সহিত দিনের বেলা দেখা করা যায় না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। সার্বর্ণি যখন পাটলিপুত্রের পথে পুনরায় বাহির হইলেন তখন প্রভাতও উত্তীর্ণ হয় নাই। শঙ্করের কৃপালাভ করিবার জন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ না নিরঞ্জনার সহিত দেখা হয় ততক্ষণ তিনি জলস্পর্শ পর্যন্ত করিবেন না। অনাহারেই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে একটা দেবমন্দির তাঁহার নয়নগোচর হইতেছিল। তাহারই কোন একটাতে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের ধ্যানে তিনি সমস্ত দিন নিমগ্ন থাকিতে পারিতেন। কিন্তু একটিতেও তিনি প্রবেশ করিলেন না। তিনি জানিতেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমস্ত মন্দির অপবিত্র করিয়া দিয়াছে। যেখানে ভগবান শঙ্করের বা বিষ্ণুর মূর্তি ছিল সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়াছেন। ভক্তের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করিয়া নাস্তিক বৌদ্ধরা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছে। ওই সব চূড়াসমন্বিত বৃহৎ হর্ম্যগুলি আর ধর্মমন্দির নাই, উহারা ধার্মিক ভোগীদের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। না, একটি মন্দিরেও তিনি প্রবেশ করিলেন না।

তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পাটলিপুত্রের পথে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আচরণ যেন প্রকৃত শৈবের মতো হয়, মুখভাবে যেন কোনও অভব্যতা প্রকটিত না হইয়া পড়ে। তাই সন্ন্যাসীসুলভ বিনয়ে

তাঁহার দৃষ্টি কখনও ভূমিনিবদ্ধ, কখনও বা তপস্বীসুলভ আনন্দে আকাশমুখী হইতে লাগিল। শিব-চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাবক্ষে এক সুসজ্জিতা ময়ূরপঙ্খী দক্ষিণা বাতাসে রঙীন পাল তুলিয়া পাড়ি জমাইতেছে। বলিষ্ঠকায় নাবিকেরা আরও পাল তুলিয়া ময়ূররূপিণী তরণীটিকে আরও বেগবতী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তরণীর অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সুমিষ্ট বাঁশীর সুর। হালের কাছে একটি অপ্সরীমূর্তি শূন্যে দুই বাহু মেলিয়া যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে। সাবর্ণি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে পড়িল, তিনিও একদিন জীবনসমুদ্রে ঠিক ওই ভাবেই পাড়ি জমাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। মায়া বা মোহের কবলে পড়িয়া তিনি বিভ্রান্ত হন নাই। অপ্সরী তাঁহার জীবনেও আসিয়াছিল কিন্তু টিকিতে পারে নাই, উড়িয়া গিয়াছে, উড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।···

নিকটেই এক স্থানে মোটা মোটা কাছি স্তূপীকৃত ছিল। তাহার উপর তিনি উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ পথ চলিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল একটু বিশ্রাম না করিলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িবেন। নিরঞ্জনার সহিত সাক্ষাতের সময় দুর্বল হইয়া পড়িলে চলিবে না। ঘুমে তাঁহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতেছিল, সেই কাছির উপরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ঘুমের ঘোরে এক অতি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন তিনি। মনে হইল চতুর্দিকে যেন তূর্যধ্বনি হইতেছে, আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। স্বপ্নের ঘোরে তিনি আতঙ্কিত হইলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল প্রলয় বুঝি আসন্ন। ভীতকম্পিত চিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন দীর্ঘ পদক্ষেপে এক বিরাট পুরুষ তাঁহার সমীপবর্তী হইতেছেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ বিরাট পুরুষ তাঁহার পূর্বপরিচিত। মনে পড়িল, আসিবার সময় পর্বতমালা-বেষ্টিত গ্রামে তিনি পাষাণময় যে বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন তাহাই সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে সমুজ্জ্বল। লোকে যেমন শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনিও তেমনি তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন। বহু নদ নদী পর্বত প্রান্তর পার হইয়া, রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহা ভয়ঙ্কর। চতুর্দিকে কেবল রুক্ষ পর্বতমালা আর ভস্ম—উত্তপ্ত ভস্ম। পর্বতগুলি রন্ধ্রময়, প্রতি রন্ধ্র হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের নিকটবর্তী হইয়া সেই বিরাট পুরুষ নিজ গতিবেগ রোধ করিলেন এবং তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন।

বলিলেন, "দেখ।"

সাবর্ণি গর্তের মুখে উঁকি দিয়া দেখিলেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। গহ্বরের ভিতরে অসংখ্য কৃষ্ণ প্রস্তরমালা এবং সেই প্রস্তরমালার ভিতর হইতে এক ভয়ঙ্করী অগ্নিতরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। সেই অগ্নিস্রোতের রক্তাভ আলোকে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা আরও ভয়ঙ্কর। অসংখ্য পিশাচ অসংখ্য মৃত-ব্যক্তির আত্মাকে নির্যাতন করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, মৃতব্যক্তিদের দেহ বা পরিচ্ছদ বিকৃত বা বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেককে চেনা যাইতেছে। সাবর্ণি সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, নির্যাতনে ইহারা কেহই বিচলিত হইতেছেন না। সকলেরই মুখভাব শান্ত, কষ্টের কোন চিহ্ন নাই। দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় গৌরাঙ্গ পুরুষ (সম্ভবত ইনি একজন কবি) অর্ধনিমীলিত নয়নে উদাত্ত কণ্ঠে গান করিতেছেন। ক্ষুদ্রকায় একদল দানব তাঁহার অধরে কণ্ঠে উত্তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতেছে। কবির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি তন্ময়চিত্তে গানই গাহিয়া চলিয়াছেন। নিকটেই একজন জ্যোতিষী উপুড় হইয়া বসিয়া ধূলির উপর গণিতের অঙ্কপাত করিতে-ছিলেন, আর একটা পিশাচ তাঁহার কর্ণে উত্তপ্ত তৈল ঢালিতেছিল, কিন্তু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছিল না। সাবর্ণি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি আরও দেখিলেন, সেই অগ্নি-নদীর তপ্ত সৈকতে বহু বিদ্যার্থী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠে মগ্ন—কেহ বা আলাপ করিতেছে, মনে হইতেছে কোনও তপোবনে যেন গুরু শিষ্যদের উপদেশ দিতেছেন। আরও একটু দূরে তিনি বৃদ্ধ কৌশিককেও দেখিতে পাইলেন। মনে হইল তিনি এসব কিছুই দেখিতেছেন না, কেবল অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িতেছেন। ভূগর্ভ হইতে একজন দেবদূত উঠিয়া আসিল। সে যে দেবদূত তাহা তাহাকে দেখিয়াই সাবর্ণি বুঝিতে পারিলেন। দেবদূত আসিয়া সম্মুখে দিব্য স্বর্গীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল, কিন্তু কৌশিক তাহাও দেখিতে পাইলেন না।

হতবুদ্ধি হতবাক্ সাবর্ণি তখন সেই বিরাট বুদ্ধমূর্তির দিকে চাহিতে গেলেন, দেখিলেন তিনি নাই! একটি অবগুণ্ঠিতা নারী দাঁড়াইয়া আছে।

সে বলিল, "ভাল ক'রে দেখ, প্রণিধান কর। নরকে এসেও এদের চৈতন্য হয়নি। মর্তলোকে যে সব মিথ্যা মায়া এদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তা এখনও এদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মৃত্যু এদের মোহমুক্ত করতে পারেনি। মরলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। জীবনে যারা সত্যকে উপলব্ধি করেনি, মৃত্যুর পরও তারা সে উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যে সব পিশাচ আর দানব এদের নির্যাতন করছে তারা নির্মম নিয়তির মূর্ত প্রতীক। ওই অন্ধ মূঢ়

আত্মারা এদেরও দেখতে পায় না, এদের নির্যাতনও অনুভব করতে পারে না, এদের শাসনের মর্মও বুঝতে পারে না। কোনরূপ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা এদের নেই। নিজেদের সর্বনাশও এরা বুঝতে পারে না। এদের অন্তরে মোহের পাষাণ চেপে আছে, এদের দুঃখবোধও নেই, সে বোধ সঞ্চার করবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই।"

সার্বর্ণি বলিলেন, "ভগবান সর্বশক্তিমান।"

অবগুণ্ঠিতা রমণী উত্তর দিল, "ভগবানও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না। এদের শাস্তি দিতে হলে সর্বাগ্রে এদের অন্তরে চেতনার আলোকপাত করতে হবে। সত্য সম্বন্ধে এরা যদি সচেতন হয় তবেই এদের মুক্তি হবে।"

মহর্ষি সার্বর্ণি ভীত চিত্তে পুনরায় গর্তের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবার তিনি যেন সিন্ধুপতির আত্মাকে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, একটি অর্ধ-দগ্ধ চামেলীকুঞ্জের নিকট সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে বারাঙ্গনা অম্বপালী। অম্বপালীর স্বর্ণাভ অঙ্গচ্ছেদে, অপূর্ব মুখভাবে, কোমল দৃষ্টিতে লালসা ও তিতিক্ষা, সত্য ও মায়া যেন যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভীষণ অগ্নিপ্রবাহ তাহাদের যেন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, বরং মনে হইতেছে তাহারা যেন আসন্ন প্রভাতের উষালোকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পদতলে যেন উত্তপ্ত সৈকত-ভূমি নাই, শ্যামল তৃণাস্তরণ রহিয়াছে। সিন্ধুপতিকে দেখিবামাত্র সার্বর্ণি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভগবান শঙ্কর, ওকে ধ্বংস কর, নিপাত কর। ও নিরঞ্জনাকে নষ্ট করেছে।"

সার্বর্ণির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, একটি শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। বলিতেছে, "কে মশাই আপনি, আপনার মাথা খারাপ নাকি? এমনভাবে এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন? এ কি ঘুমোবার জায়গা! আর একটু হ'লে জলে গড়িয়ে পড়ে যেতেন যে! ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠুন, দাঁড়ান।"

সার্বর্ণি কেবল দুইটি মাত্র কথা বলিলেন, "জয় শঙ্কর!" তাহার পর তিনি চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে অদ্ভুত স্বপ্নের কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, স্বপ্নটি শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ স্বপ্নে নরকের যে দৃশ্য তাঁহার মানস-পটে প্রতিফলিত হইল তাহা ভগবদ্-মহিমাবর্জিত, উহা নরকের সত্য চিত্রই নহে। কোন্ স্বপ্ন শুভ অশুভ, কোন্টাতে দেবতার প্রভাব, কোন্টাতে দানবের— তাহা তিনি সহজেই নির্ণয় করিতে পারিতেন, কারণ বহুকাল মনুষ্য-সমাজের

বাহিরে বহুদূরে আরণ্য পরিবেশে বাস করিয়া তিনি নানাপ্রকার অদেহী দেব-দানবের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। দানবেরা যে মায়ারূপ ধারণ করিয়া সাধুদের সর্বদাই বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে—এ কথা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের মতো লোককেও স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাতে ছুটিতে হইয়াছিল। দানবেরা খুবই ধূর্ত, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করাও খুব কঠিন। সীতা কি সন্ন্যাসী-বেশী রাবণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন কি তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কে তাঁহাকে এই হীনকার্যে প্ররোচিত করিতেছে? না, মায়াবী দানবদের চেনা খুব সহজ নয়। কিন্তু মহর্ষি সার্বর্ণিকে ফাঁকি দেওয়াও খুব সহজ নয়। তিনি অচিরাৎ বুঝিতে পারিলেন, যে স্বপ্নটি তিনি এখন দেখিলেন তাহা দানবীর মায়া মাত্র। চন্দ্রমৌলি ধূর্জটি তাঁহাকে এমনভাবে দানবের কবলে কেন নিক্ষেপ করিলেন—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন। সহসা লক্ষ্য করিলেন—তিনি জনস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছেন, তাঁহার চতুর্দিকে ভীড়। ইহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, স্রোতের গতি একমুখী, অর্থাৎ সকলেই একই স্থান অভিমুখে চলিয়াছে। নগরের জনতায় সুষ্ঠুভাবে চলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না, সুতরাং নদীস্রোত-বাহিত জড়পদার্থের ন্যায় তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। নিজেরই গৈরিক অঙ্গচ্ছেদে পা জড়াইয়া দুই-একবার পড়িয়াও গেলেন। তিনি বুঝিতেই পারিলেন না, এতগুলি লোক এত দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছে! কোথাও কি আগুন লাগিয়াছে, না, আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? জনতার মধ্যে একজনকে ডাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা এমন দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়াছেন?"

লোকটি উত্তর দিল, "আপনি শোনেন নি নাকি? আজ রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটক অভিনয় হচ্ছে যে। অনেক বড় বড় অভিনেতা নামবেন, দ্রৌপদীর ভূমিকায় নামছেন স্বয়ং নিরঞ্জনা। সকলেই তাই সেখানে চলেছে। আপনি যদি যেতে চান, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরঞ্জনা নামিতেছে? মহর্ষি সার্বর্ণি ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতগুলি লোকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে নিরঞ্জনা কি ভাবে নিজেকে প্রকটিত করিবে? সে দৃশ্য কি তিনি সহ্য করিতে পারিবেন? দ্রৌপদীর ভূমিকায়? পঞ্চপতির স্ত্রী দ্রৌপদী—! তাহার পর সহসা আবার তাঁহার মনে হইল, এই ভীড়ের মধ্যেই নিরঞ্জনার সহিত দেখা হওয়া ভাল। দূর হইতে নিরঞ্জনার চেহারা হাবভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, সে আয়ত্তাতীত কি না?

তিনি লোকটির সঙ্গ লইলেন। বেশীদূর যাইতে হইল না, অনতিদূরেই রঙ্গমঞ্চ দেখা গেল।

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ বেশ মনোরম মনে হইল। সম্মুখেই অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা, তাহাতে বহুমূর্তি সুসজ্জিত। জনতাকে অনুসরণ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণি ও তাঁহার সঙ্গী একটি সঙ্কীর্ণ গলি পার হইয়া অবশেষে বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দিক আলোকে আলোকময়। অনেক দর্শক ইতিমধ্যেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও উভয়ে পাশাপাশি দুইটি আসন গ্রহণ করিলেন। সাবর্ণি দেখিলেন, রঙ্গমঞ্চে কোনও যবনিকা নাই। রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া একটি আলোকিত প্রান্তরে বেদীর মতো একটি উচ্চ স্থান রহিয়াছে এবং তাহার এক পার্শ্বে একটি দণ্ডের উপর একটি গোলাকার চক্রের মধ্যে একটি মৎস্য বিলম্বিত রহিয়াছে। আকাশপটে চক্রটি অদ্ভুত দেখাইতেছিল। বেদীটির আশেপাশে কাছে দূরে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবিরও দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি শিবিরের সম্মুখে তরবারি ঝুলিতেছে, শিবিরশীর্ষে শোভা পাইতেছে পুষ্প-শোভিত স্বর্ণময় ঢাল। সাবর্ণি বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দর্শকদের গুঞ্জনধ্বনি ছাড়া চতুর্দিকে আর কোন শব্দ নাই। সকলেরই দৃষ্টি ওই বেদী এবং শিবিরগুলির উপর নিবদ্ধ। মহর্ষি সাবর্ণি সহসা চক্ষু মুদিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কোনও কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিন্তু যাঁহার সঙ্গে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রকৃতি অন্যরূপ। কথা না বলিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি নাট্যশিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে লাগিলেন, "আগে আগে অভিনেতারা উদাত্ত কণ্ঠে কাব্য আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তাঁদের আবৃত্তিতেই কাব্যরস মূর্ত হয়ে উঠত সবার মনে, টিকা বা ভাষ্যের প্রয়োজনই হ'ত না। এখন আবৃত্তি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে অভিনয়, মানে অঙ্গভঙ্গী—কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী। উদ্দেশ্য ইতর লোককে খুশী করা। এখন আর রসিকের স্থান কোথাও নেই মশাই, যেখানেই যান, দেখবেন বেরসিকের দল কিলবিল করছে। মেয়েরাও প্রকাশ্যে অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে আজকাল। এমনিতেই তো মেয়েরা আমাদের পরম শত্রু, আমাদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে গোল্লায় পাঠাচ্ছে আমাদের ; তার উপর যদি এখন খোলা-খুলিভাবে রঙ্গমঞ্চে অঙ্গভঙ্গী করবার সুযোগ পায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।"

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "ঠিকই বলেছেন আপনি, মেয়েরাই আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। তারা আনন্দদায়িনী, সেই জন্যই বোধ হয় অমঙ্গলকরী। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?"

"আমার নাম ডমরু। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। মেয়েরা মোটেই আনন্দদায়িনী নয়, ঠিক উলটো। আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত চিন্তা-ভয়ের কারণ ওরাই। আমাদের তীব্রতম বেদনার কারণ কি জানেন? প্রেম। সম্রাট অশোকের নাম নিশ্চয় শুনেছেন আপনি?"

"শুনেছি।"

"তিনি বুড়ো বয়সে তিষ্যরক্ষিতা নামে এক নর্তকীর প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন—এ-ও নিশ্চয় আপনার অজানা নয়?"

"এ কথাও শুনেছি।"

"তিষ্যরক্ষিতা কি করেছিল স্মরণ আছে কি আপনার?"

"না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মনে হচ্ছে তিনি কি একটা যেন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন।"

"ব্যভিচার ব'লে ব্যভিচার! অশোকের যুবকপুত্র কুণালকে পাপ-পথে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কুণাল যখন তাতে অসম্মত হলেন, তখন সে অশোকের কাছে মিথ্যা নালিশ করলে যে, কুণাল জোর ক'রে তার ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এ কথা শুনে অশোক কুণালের চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে দূর ক'রে দিলেন তাকে দেশ থেকে। অন্ধ কুণাল পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এক শিল্পী অন্ধ কুণালের একটি চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। সে ছবিটি আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি, কিনে টাঙিয়ে রেখেছি আমার শোবার ঘরে। ছবিটি প্রতিদিন আমাকে মনে করিয়ে দেয়—নারী ভয়ঙ্করী।"

মহর্ষি সাবর্ণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসে আপনি সুখ পান ডমরু?"

"আমি?"—ডমরু ম্লান হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি অক্ষম পেট-রোগা লোক, বেশী সুখ ভোগ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কেবল একটি মাত্র জিনিসে আমি সুখ পাই—চিন্তা। আমাকে আপনি চিন্তাশীল বলতে পারেন।"

ডমরুর এই মনোভাবের সুযোগ লইয়া মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার চিত্তে আধ্যাত্মিক আলোকপাত করিবেন মনস্থ করিলেন।

"ভাই ডমরু, যদি প্রকৃত সুখের অভিলাষী আপনি হন, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি।"

"বলুন, শুনি।"

"শুনুন তা হ'লে। সত্যই সুখের উৎস। এই উৎসের স্বরূপ কি এবং কি করলে তা আয়ত্ত করা যায় তা বলবার আগে—।"

"চুপ, চুপ, চুপ করুন।"

বহু লোক হাত তুলিয়া সার্বণিকে থামাইয়া দিল। চতুর্দিকে নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর সহসা শিবিরগুলির ভিতর হইতে রণবাদ্য বাঁজিয়া উঠিল।

অভিনয় আরম্ভ হইল। সুসজ্জিত ক্ষত্রিয় নৃপতিরা একে একে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই বেদী উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে ও সহর্ষে দেখিলেন, দ্রৌপদী-বেশিনী নিরঞ্জনা দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শকের অন্তরে আনন্দের শিহরণ সঞ্চারিত হইল। ক্ষণ-পরেই সেই বেদীর উপর হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিল, দ্রুপদের কুলপুরোহিত তাহাতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং মন্ত্র পাঠ করিবার পর হস্ত উত্তোলন করিলেন। সমস্ত বাদ্য নীরব হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সমাগত বীরগণ, আজ ষোড়শ দিবস। আমার ভগ্নী কৃষ্ণা আজ স্নানান্তে উত্তম বসন, উপযুক্ত অলঙ্কার এবং কাঞ্চনী মাল্য ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণা হয়েছেন, তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহারাজ দ্রুপদ ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রদত্ত ধনুতে গুণ পরিয়ে শূন্যে স্থাপিত যন্ত্রমধ্যস্থ মীনের প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে যিনি উক্ত মীনের চক্ষু ভেদ করতে পারবেন তিনি কৃষ্ণাকে পাবেন। পার্শ্বেই জলপাত্রে মীনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে, এই সেই ধনু, এই বাণ এবং ওই লক্ষ্য। যন্ত্রটির মধ্যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঁচবার শরসন্ধান ক'রে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। উচ্চ কুলজাত, রূপবান যে বর এই দুঃসাধ্য কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগ্নী কৃষ্ণা তাঁর ভার্যা হবেন—এই সত্য আমি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি।" তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সমাগত রাজন্যবর্গের পরিচয় প্রদান করিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলের পরিচয় বিবৃত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, "এইবার আপনারা একে একে শর-সন্ধান করুন।"

ব্রাহ্মণদের বেশ ধারণ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণদের সহিত মঞ্চস্থলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহাদের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের চিনিতে পারিলেন। তাঁহাদের মত্তগজেন্দ্রবৎ আকৃতি ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ দীপ্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ইহার পর শর-সন্ধান আরম্ভ হইল।

অধিকাংশ রাজা যদিও দ্রৌপদীকে লাভ করিবার জন্ত লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কন্দর্পবাণে আহত হইয়া সদর্পে পরস্পরের সহিত স্পর্ধিত বাক্য-বিনিময়ও করিতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভেদে তাদৃশ সফলকাম হইলেন না। অনেকে ধনুতে গুণ পর্যন্ত পরাইতে অক্ষম হইলেন। অনেকে ধনুর আঘাতে ভূশায়ী হইয়া জনতার উপহাসের লক্ষ্যস্থল হইলেন। দুই-একজন ধনু উত্তোলন পর্যন্ত করিতে পারিলেন না। এক-একজন বীর এইভাবে যেমনিই ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন, অমনই জনতার ভিতর হইতে তুমুল হাস্যধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অলঙ্কারভূষিতা কাঞ্চনমাল্যশোভিতা কৃষ্ণা কিন্তু নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তন্ময় হইয়া কাহারও ধ্যান করিতেছেন।

সার্বণি মুগ্ধনেত্রে দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ছিলেন। কত কথাই তাঁহার মনে হইতেছিল! কৃষ্ণার গম্ভীর ধ্যানমগ্ন মূর্তির দিকে চাহিয়া তাঁহার আশা হইতেছিল, তিনি সফল হইবেন। নিরঞ্জনার মুখে যখন এখনও এমন পবিত্র দীপ্তি জাজ্বল্যমান, তখন পাপ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই—এখনও তাহার উদ্ধারের আশা আছে।

সহসা কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্যকান্তি যুবা সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ধনুতে গুণ পরাইলেন এবং জ্যা আকর্ষণপূর্বক টঙ্কারধ্বনি করিলেন। সকলে বুঝিতে পারিলেন, মহাবীর কর্ণ শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জনতার মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চতুর্দিকে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, কর্ণ হয়তো লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। কৃষ্ণা এতক্ষণ প্রস্তর-প্রতিমাবৎ ধীর স্থির নিস্পন্দ ছিলেন, সহসা তিনি সঞ্জীবিত হইলেন। এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সুতপুত্রকে বরণ করব না। ওঁর শরসন্ধান করবার প্রয়োজন নেই।"

কর্ণের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর উচ্চ হাস্য করিয়া তিনি ধনু দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর আসিলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তিনি ধনুতে গুণ পরাইতে পারিলেন না, জানু পাতিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। মহাবীর জরাসন্ধও অপারগ হইলেন। বক্রোক্তিতে এবং ব্যঙ্গহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত হইতে লাগিল। তখন মদ্ররাজ শল্য সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কিন্তু সেই বিশাল ধনু বক্র করিতে গিয়া নিজেই ভূশায়ী হইলেন। হাস্য-কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিল। এইরূপ একে একে অনেক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর শরসন্ধানে

ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। তখন ব্রাহ্মণদিগের ভিতর হইতে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন গাত্রোত্থান করিলেন। এক দীন ব্রাহ্মণের এই উচ্চাভিলাষ দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বারণও করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, বিখ্যাত ক্ষত্রীয় বীরদের পক্ষে যাহা অসাধ্য, দুর্বল ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা সাধ্য হইবে কিরূপে ? আমরা এখানে হাস্যাস্পদ হইতে আসি নাই। আমাদের প্রতিপালক রাজন্যবর্গের বিদ্বেষভাজন হইতেও চাহি না। কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই এই ক্ষাত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করা উচিত নহে। আর একদল ব্রাহ্মণ কিন্তু ঠিক বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন : এই যুবার গমনভঙ্গী সিংহের ন্যায়, আশা করা যায় ইঁহার বিক্রমও সিংহের মতো হইবে, সুতরাং ইনি সফলকাম হইতে পারেন। ইঁহাকে বারণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যে সর্বকর্মকুশল হইতে পারেন, জল বায়ু বা ফলমাত্র আহার করিয়াও তিনি শক্তিমান হইতে পারেন—এই সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করাই কর্তব্য।

অর্জুন অগ্রসর হইয়া আসিয়া ধনুর নিকট বিরাট পর্বতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধনু প্রদক্ষিণ করতঃ বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনু উত্তোলন করিলেন। তাহার পর যাহা হইল তাহা সকলেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন—অনায়াস-দক্ষতাসহকারে ধনুতে গুণ পরাইয়া তিনি একে একে পাঁচটি শরসন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। অন্তরীক্ষ ও সভাস্থলে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সহর্ষে উত্তরীয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন, তূর্যধ্বনি দশ দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, পরাজিত রাজবৃন্দ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিলেন ; সুত মাগধগণের স্তুতিপাঠে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হইয়া উঠিল। দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আর কৃষ্ণা ? তাঁহার মুখভাবে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। ইন্দ্রতুল্য অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল তাঁহার অন্তর-দীপ যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হাস্য না করিয়াও তিনি যেন হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি বাক্যও নির্গত হইল না, তাঁহার দৃষ্টিই বাঙ্ময় হইয়া উঠিল, ভাবাবেগে তিনি বিহ্বল হইয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহার আচরণে অশোভন চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

সহসা পরাজিত রাজন্যবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। জয়দ্রথ চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "বন্ধুগণ, আমি দ্রুপদ-কন্যাকে হরণ করিব, তোমরা আমার সহায় হও।

তিনি সদলবলে ভীমপরাক্রমে পাঞ্চালীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সহসা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কার্মুকে টঙ্কার দিয়া বীরদর্পে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাঁহার পর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি লক্ষ্যভেদ করিয়' ন্যায়সঙ্গতভাবে যে কন্যাকে বধূরূপে অর্জন করিয়াছেন তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার সহায়তা করিব।"

অর্জুন ত্বরিতহস্তে ধনুর্বাণ তুলিয়া সিংহবৎ গর্জন করিয়া উঠিলেন। সে গর্জন সত্যই ভয়ঙ্কর। সে গর্জনে জয়দ্রথের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর অর্জুন যখন শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হইল তাহা যুগপৎ বিস্ময়কর ও হাস্যকর। প্রভঞ্জনের সম্মুখে শুষ্ক পত্ররাশির ন্যায় সকলে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

সহসা সাবর্ণি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হস্ত আস্ফালন করিয়া তিনি তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পাটলিপুত্রের অধিবাসীরা, শ্রবণ কর। আজ যে অভিনয় তোমরা দেখলে, নূতন ধরনে সে অভিনয় আর একবার হবে। তোমরা শ্রবণ কর, ঘৃণ্য কাপুরুষদের হাত থেকে আমিও অর্জুনের মত কৃষ্ণাকে উদ্ধার করব। সে কৃষ্ণা কাব্যের নায়িকা নয়, বাস্তবের মানবী। সে জানে না যে, সে নিরঞ্জনা।"

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা সকলেই সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইল। অনেকে ভাবিল লোকটা পাগল। অনেকে হাসিল, অনেকে ব্যঙ্গও করিল। তাহার পর কেহই তাঁহার প্রতি আর বিশেষ মনোযোগ দিল না। অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছিল, সকলেই রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

ডমরুও সাবর্ণির এই অদ্ভুত আচরণে কম বিস্মিত হন নাই। এ বিষয়ে হয়তো তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, সাবর্ণি কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না, ডমরুকে এড়াইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে তিনি নিরঞ্জনার দ্বারে গিয়া করাঘাত করিলেন।

নিরঞ্জনা বাস করিত নগরের বাহিরে এক বিরাট সুসজ্জিত প্রাসাদে। ছায়াশীতল কাননপরিবৃত প্রাসাদটি অপরূপ। প্রাসাদসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা, উৎস, এমন কি ছোট একটি নদী পর্যন্ত ছিল। নদীর দুই তীরে ছিল দেবদারু চন্দন বকুল প্রভৃতির বীথি।

করাঘাতের উত্তরে দ্বার খুলিয়া গেল। সাবর্ণি দেখিলেন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি

ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহার উভয় হস্তেরই প্রতি অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় এবং প্রতিটি অঙ্গুরীয় বহুমূল্য প্রস্তরখচিত।

সার্বণি কহিলেন, "আমি নিরঞ্জনার সঙ্গে এখনি দেখা করতে চাই। তার কাছে আমাকে অবিলম্বে নিয়ে চল।"

সার্বণির অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দেখিয়া এবং কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর শুনিয়া ভৃত্যটি আপত্তি করিতে সাহস করিল না। বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন। দেবী বাগানের মধ্যে শিলানিবাসে আছেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরঞ্জনার শৈশব ইতিহাস অতিশয় করুণ। তাহার জন্ম হইয়াছিল একটি পান্থশালায় এবং সেই পান্থশালাতেই তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পিতা মণিবজ্র সারথি নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত এই পান্থশালাটির প্রভু এবং পরিচালক ছিলেন। পান্থশালায় নানাপ্রকার পান্থের সমাবেশ হইত। বিদেশী বণিকেরাও আসিতেন; তা ছাড়া আসিতেন গান্ধার, বাহ্লীক, গ্রীক, সিরিয়ার পর্যটকেরা। স্থানীয় অনেক রাজকর্মচারীরাও আসিতেন—বিশেষ করিয়া সেনা-বিভাগের লোকেরা। কিন্তু সে পান্থশালায় আর একদল লোকও যাতায়াত করিতেন, যাঁহাদের আচার আচরণ একটু অসাধারণ ছিল। তাঁহারা নিজেদের বৌদ্ধ নামে পরিচিত করিতেন বটে, কিন্তু যে ধর্ম তাঁহারা অনুসরণ করিতেন সে ধর্মের নাম ছিল গুহ্যধর্ম, কারণ তাহা প্রকাশ্যে আচরণীয় ছিল না, সে ধর্মাচরণের জন্য গোপনতার আশ্রয় লইতে হইত। নিরঞ্জনার পিতা মণিবজ্র ছিলেন তাঁহাদের নেতা এবং গুরুস্থানীয়। সমস্তই গোপনতার আররণে আবৃত থাকিত। পান্থশালার নিত্যপরিবর্তনশীল পরিবেশে, নিত্য নব আগন্তুকদের আবির্ভাবে এবং অন্তর্ধানে যে প্রভাব নিরঞ্জনার অজ্ঞাতসারেই তাহার চরিত্রগঠন করিতেছিল, সে প্রভাব তাহাকে দার্শনিকতার উচ্চলোকে হয়তো একদিন উন্নীত করিতে পারিত; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। পান্থশালার চলমান জীবনধারার যে স্বাদ সে পাইয়াছিল তাহা বৈচিত্র্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু কলুষিত। সে আনন্দে সন্তরণ করিতে পারে নাই, খরস্রোতে বারম্বার পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া ক্রমাগত বিপর্যস্তই হইয়াছিল। আনন্দ নয়—ক্ষোভ, ভয়, বিস্ময় তাহার শৈশব জীবনকে যে বিচিত্র রূপ দান করিয়াছিল তাহা আর যাহাই হউক মহিমান্বিত ছিল না।

নিরঞ্জনার চিত্তপটে শৈশবের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত ছিল। তাহার মধ্যে একটি

চিত্র এই।—তাহার পিতার শিষ্যেরা একদিন গভীর রাত্রে একটি কিশোরী চণ্ডাল-কন্যাকে লইয়া পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন বিশেষ প্রকার আহারাদির বন্দোবস্তও ছিল। ছাগমাংস, কুক্কুটমাংসও আহারের উপকরণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত মাংস সংগ্রহের জন্য একটি কৃষ্ণা কুক্কুরীকে মুদগরাঘাতে বধ করিয়াছিল। সুরা তো ছিলোই। আরও সব নানাবিধ অদ্ভুত উপকরণও সঞ্চিত হইয়াছিল, সেগুলি নিরঞ্জনাকে দেখানো হয় নাই। নিরঞ্জনার মা যোগিনী এই গুহ্যপূজায় যোগ দিতেন অর্থের লোভে। নিরঞ্জনার সন্দেহ হইত, পূজার পদ্ধতিতে তাঁহার অন্তরের তেমন সায় যেন ছিল না। ওই কিশোরী চণ্ডাল-কন্যাকে তিনি যেন ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থলিপ্সা তাঁহার ঈর্ষাকে পরাজিত করিয়াছিল। মণিবজ্রের শিষ্যেরা সকলেই প্রায় ধনী ছিলেন। গুহ্যপূজার আয়োজন করিবার অছিলায় যোগিনীর হস্তে প্রচুর অর্থ দিতেন। পূজার আয়োজন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত—প্রচুর থাকিত—তাহা যোগিনীরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। যোগিনী এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। যেদিন ওই চণ্ডাল-কন্যাকে আনা হইয়াছিল সেদিন যোগিনীর হস্তে একজন শিষ্য এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কেহ দিয়াছিলেন পঞ্চাশ, কেহ কুড়ি। দশের কম কেহই দেন নাই। যোগিনী শুধু লোভ-পরবশ হইয়াই যে গুহ্যপূজায় সহযোগিতা করিতেন তাহা নয়, প্রতিবাদ করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না। মণিবজ্রকে তিনি ভয় করিতেন। কারণ ক্রুদ্ধ মণিবজ্র ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিলেন। রাগিয়া গেলে তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান থাকিত না। প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া একবার যোগিনীকে তিনি প্রহার করিতে করিতে অর্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগিনী অবশ্য তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অর্থ-লোভ ছিল। ক্রমশ এ বিশ্বাসও তাঁহার হইয়াছিল যে, সহধর্মিণী হিসাবে স্বামীর ধর্মাচরণে বিঘ্ন উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত। সুতরাং গুহ্যপূজায় তিনি সহায়তা করিতেন। ওই চণ্ডাল-কন্যাকে একটি ভিন্ন ঘরে লইয়া গিয়া গভীর রাত্রে গোপনে কি ধরনের পূজা যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিরঞ্জনা তখন বুঝিতে পারে নাই। গভীর রাত্রে সে কেবল শুনিতে পাইয়াছিল, চণ্ডাল-কন্যাটি চীৎকার করিতেছে এবং তাহার সে চীৎকারের সহিত মিশিয়াছে সঙ্গীত, মন্ত্রপাঠ এবং অট্টহাস্য।

মণিবজ্রের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নিরঞ্জনাকেও অন্তরালে লইয়া গিয়া মাঝে মাঝে কি সব বলিতেন, নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত না। তাঁহাদের বক্তব্য যে অশ্লীল তাহা বুঝিবার বয়সও তখন তাহার হয় নাই। কিন্তু তাহার মনের এ

শুচিতা বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। সমর্থ পুরুষদের মনোযোগ অকালেই তাহার বয়স বাড়াইয়া দিল। ক্রমশ সে সবই বুঝিতে শিখিল।

যখন তাহার বয়স নয় বৎসর, তখন মণিবজ্রের এক শিষ্য হেবজ্র নামক এক অদ্ভুত দেবতার মূর্তি তাহাকে দেখাইয়াছিল। মূর্তিটি সত্যই অদ্ভুত। অষ্টশির, ষোড়শভুজ এক বলিষ্ঠ দেবতা এক তরুণীকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, একজনের নাক আর একজনের নাক স্পর্শ করিয়া আছে। দেবতাটির পদতলে কতগুলি শবদেহ। প্রতিভাবান শিল্পীর হস্তে উৎকীর্ণ সেই প্রস্তরমূর্তি নিরঞ্জনাকে কিছুদিন সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে সমস্ত দিন ওই কথাটা চিন্তা করিত, রাত্রে স্বপ্নও দেখিত।

···এইভাবে কিছুদিন কাটিল। নিরঞ্জনার বয়স আর একটু বাড়িল। সে ক্রমশ অনুভব করিতে লাগিল যে, পুরুষেরা নানা ছলে তাহার সান্নিধ্য কামনা করে। সন্ধ্যাবেলায় যুবকদল তাহারই উদ্দেশে গান গাহিয়া পান্থশালার আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে পান্থশালায় আসিয়া খাবার খায় তাহাকে দেখিবে বলিয়া। একদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন বিদেশী বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের শিরস্ত্রাণ, মুখে চাপ দাড়ি, আগুল্‌ফলম্বিত রেশমী পোশাকে উগ্র আতরের গন্ধ। প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ। তাহারা আসিয়া দাবী করিল 'আমরা উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয় চাই। দুই রাত্রি তোমার এখানে বাস করিব। দুই দিন, দুই রাত্রির জন্য তোমাদের কন্যাটিকেও চাই, সে-ই আমাদের সর্ববিধ সেবা করিবে। অন্য কোন ভৃত্যের প্রয়োজন নাই। ইহার জন্য যত অর্থ চাও পাইবে।' মণিবজ্র দুই শত স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেন, বণিকেরা সানন্দে সম্মত হইল। তাহাদের পরুষ স্পর্শ এবং পাশবিক ব্যবহার নিরঞ্জনার অন্তরে যেন একটা অপ্রত্যাশিত বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। সে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, একটা অজ্ঞাতপূর্ব রহস্যময় অরণ্যে সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। শুধু যে ভীত হইল তাহা নয়, পুরুষের আচরণে একটা আত্মপ্রসাদের খোরাকও পাইল। বণিকের দল চলিয়া যাইবার পূর্বে মণিবজ্রকে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা তো দিলই, নিরঞ্জনাকেও পৃথকভাবে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। কিন্তু সে স্বর্ণমুদ্রা নিরঞ্জনার হাতে বেশীক্ষণ থাকিতে পাইল না, বণিকের দল পথের বাঁকে অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিনী তাহা ছিনাইয়া লইলেন।

ক্রমশ যোগিনী এবং মণিবজ্র বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের কন্যাটি নিতান্ত নগণ্য নয়। ইহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইদানীং মুখ্যত তাহার আকর্ষণেই তাঁহাদের পান্থশালায় দলে দলে পান্থসমাগম হইতেছে। একদিন

মণিবজ্রের এক শিষ্য প্রস্তাব করিলেন, নিরঞ্জনাকে এইবার গুহ্যপূজার কন্যারূপে বরণ করা হোক। মণিবজ্র শিষ্যের নিকট খোলাখুলিভাবে অর্থ দাবী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। বলিলেন, নিরঞ্জনা এখনও দ্বাদশ বর্ষে পড়ে নাই, তা ছাড়া উহার মা যোগিনী সম্মত না হইলে গুহ্যপূজায় তাহাকে নিয়োগ করা উচিত হইবে না। যোগিনীর সম্মতি পাইতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই। স্বর্ণমুদ্রার লোভে তিনি রাজী হইয়াছিলেন। মনিবজ্র গোপনে তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যদি দুই শত মুদ্রা পাও রাজী হইয়া যাইবে। যোগিনী বলিয়াছিলেন, কিন্তু নিরঞ্জনা যদি রাজী না হয়! সে আজকাল ক্রমশ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুনিয়া মণিবজ্রের চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন—যদি এমনিতে রাজী না হয়, চাবুক আছে।

ইহার পর হইতেই নিরঞ্জনার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। পিতৃগৃহ নরকে পরিণত হইল। অপরিচিত অসভ্য পুরুষদের সঙ্গ তাহার প্রায়ই ভাল লাগিত না, মাঝে মাঝে সে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু চাবুক ছিল। মণিবজ্রের নির্মম প্রহার হইতে যোগিনীও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। ভগবান কিন্তু একজন রক্ষক জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য কিঙ্কর। নিরঞ্জনাকে অতি শৈশব হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল সে। মণিবজ্রের অমানুষিক অত্যাচার হইতে সে-ই তাহাকে রক্ষা করিত। কিঙ্করের সহায়তায় নিরঞ্জনা মাঝে মাঝে পলায়ন করিত। কোথায় যাইত, কোথায় থাকিত তাহা কিঙ্কর ছাড়া আর কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। অনেক সময় একাধিক দিন সে আত্মগোপন করিয়া থাকিত, কিঙ্করই তাহাকে খাবার দিয়া আসিত। কিঙ্করেরই খোশামোদ করিয়া মণিবজ্র এবং যোগিনী—বিশেষ করিয়া যোগিনী, পুনরায় নিরঞ্জনাকে গৃহে লইয়া আসিতেন। প্রতিশ্রুতি দিতেন, আর তাহাকে কিছু বলিবেন না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহারা বিলম্ব করিতেন না, আবার সে কিঙ্করের সহায়তায় পলায়ন করিত। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

মণিবজ্র ও যোগিনীকে ক্রমশ এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল যে, নিরঞ্জনা পশু নয়, মানুষ। তাহার সহায়তায় যদি অর্থোপার্জনই করিতে হয় তাহাকে পীড়ন করিলে চলিবে না। শক্তি প্রয়োগ না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। বেশী জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সহায়তায় অর্থোপার্জন করিতে হইলে তাহার আনুকূল্য না থাকিলে চলিবে না।

…অবশেষে তাঁহারা কৌশলই অবলম্বন করিলেন। নিরঞ্জনাকে আর তাঁহারা

প্রহার বা তাড়না করিতেন না, বরং মাঝে মাঝে ছোটখাটো উপহার কিনিয়া দিয়া তাহার মনোরঞ্জনেরই প্রয়াস পাইতেন। কখনও রঙীন শাড়ি, কখনও সুদৃশ্য অলঙ্কার মাঝে মাঝে তাহার অদৃষ্টে জুটিতে লাগিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিরঞ্জনার মনে শান্তি একটুও ছিল না। গভীর রাত্রে প্রায়ই কেহ না কেহ তাহাকে লইয়া টানাটানি করিত,—কখনও বা কোনও সুরামত্ত বণিক, কখনও বা কোনও বলিষ্ঠ সৈনিক, কখনও বা আর কেহ।

এই সময় কিঙ্কর যদি কাছে না থাকিত নিরঞ্জনার জীবনধারা যে কোন্ পথে প্রবাহিত হইত তাহা অনুমান করা শক্ত। হয় সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার দুঃসহ জীবনের অবসান করিয়া দিত, না হয় তাহাকে অতিশয় ঘৃণ্য নিম্নশ্রেণীর রূপজীবীর পঙ্কিল জীবন যাপন করিতে হইত।

কিঙ্কর তাহাকে একটা নূতন জগতের সন্ধান দিল। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, গোপনে—প্রকাশ্যে দিবার উপায় ছিল না। যে পরিবেশে তাহারা বাস করিতেছিল সে পরিবেশে প্রকাশ্যভাবে সদাচরণ করাই অসম্ভব ছিল। সকলকেই গুহ্যধর্মের সাধক বা সমর্থক হইতে হইত। কিঙ্করকে সকলেই বৌদ্ধ বলিয়া জানিত, কিন্তু সে যে গোপনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শৈব হইয়াছিল—এ কথা কেহ জানিত না। সে-যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহাকে অহি-নকুলের সম্পর্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে অসমর্থ ছিলেন, তাঁহারা ভণ্ডামি করিতেন। যে স্থানে বৌদ্ধ-ধর্মের আধিক্য সে স্থানে হিন্দুরা বৌদ্ধ সাজিয়া থাকিতেন। আবার যেখানে হিন্দুরা প্রবল সেখানে বৌদ্ধগণ হিন্দুত্বের ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেন।

কিঙ্করের একটু ইতিহাস আছে। তাহার প্রপিতামহ সত্যই একদা বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বৌদ্ধ রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহাকে ধর্ম-পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাহাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশেরও উত্তরাঞ্চলে, হিমালয়-সন্নিহিত এক গ্রামে। তাহার প্রপিতামহের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এক রাজার প্রভাব বা প্রতিপত্তি বেশীদিন থাকে না। রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধ রাজার বংশধরগণ ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের যখন শোচনীয় অবস্থাবিপর্যয় ঘটিল তখন তাহার পুত্রকে অর্থাৎ কিঙ্করের পিতামহকে ভিটা ত্যাগ করিতে হইল, কারণ চারিদিকেই তখন বৌদ্ধ-নির্যাতন চলিতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণক দেখিলেই লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিত। এ অবস্থায় কোনও বিশেষ ধর্মের

প্রতি আস্থা রাখাই কঠিন। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোন ধর্মের মহিমাই সাধারণ লোকের চিত্তকে তখন উদ্বুদ্ধ করিত না, ধর্মকে তখন স্বার্থ সাধনের উপায়স্বরূপ লোকে গ্রহণ করিত। কিঙ্করের পিতা গুরুচন্দ্র কোনও ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন না। অবস্থা এবং পরিবেশ অনুসারে নিজেকে কখনও বৌদ্ধ, কখনও হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতেন। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে দেশের নানা স্থানে পর্যটন করিতে হইত, যেখানে যেরূপ পরিচয় দিলে সুবিধা হইবে সেখানে নিজের সেইরূপ পরিচয় দিতেন। সুতরাং তিনি কোথাও হিন্দু, কোথাও বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শেষবয়সে পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক ভৈরবীর আশ্রমে তাঁহাকে বসবাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। তাঁহার তৃতীয় পত্নী অনুরাধা যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল তিনি তখন বংশলোপের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। প্রথমা এবং দ্বিতীয়া পত্নীও বন্ধ্যা ছিলেন। চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করিতে গুরুচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, চতুর্থ পত্নী তাঁহাকে পুত্র দান করিতে পারিবে কি? বিগত তিনটি পত্নী রূপে গুণে বা স্বাস্থ্যে কিছুমাত্র কম ছিল না, তাহাদের গর্ভে কোনও সন্তানই তো হয় নাই, চতুর্থার গর্ভে হইবে তাহার স্থিরতা কি? তিনি সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু সংবাদ দিলেন যে, এক ভৈরবীর একটি পালিত কন্যা আছে, সে কন্যাটিকে তিনি যদি পত্নী-রূপে লাভ করিতে পারেন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কারণ ভৈরবী যোগসিদ্ধা এবং শক্তিশালিনী, কন্যাটিও সুলক্ষণা। ভৈরবী আশীর্বাদ করিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বহু স্থানে হইয়াছে। বহু নিঃসন্তান ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় সন্তানলাভ করিয়াছে। এ কথা শুনিয়া গুরুচন্দ্রও ভৈরবীর শরণাপন্ন হইলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার জন্য একটি আশ্রয় নির্মাণ করিয়া দিলেন, অবশেষে ভৈরবীর গুরু গোরক্ষনাথের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া ভৈরবীর পালিতা-কন্যাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে কিঙ্করের জন্ম হইল।

ভৈরবীর গুরুদেব গোরক্ষনাথ সত্যই অসাধারণ যোগী ছিলেন। হিমালয়েই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী কোন গুহা তাঁহার তপস্যাপীঠ ছিল—ইহাই জন-শ্রুতি। কিন্তু প্রকৃত ঠিকানা কেহ জানিত না। মধ্যে মধ্যে তিনি হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়া ভৈরবীর আশ্রমে কিছুদিন করিয়া থাকিতেন বটে। কিন্তু সমাজের সংস্পর্শ তাঁহাকে কাতর করিত, আশ্রমে বেশীদিন তিনি থাকিতেন না, কিছুদিন থাকিবার পরই হিমালয়ের গহনে অন্তর্ধান করিতেন। ভৈরবী শুধু যে তাঁহার শিষ্যা ছিলেন

তাহা নয়, পরম স্নেহের পাত্রীও ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তিনি গুরুচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, কারণ খুব কম লোকেরই তাঁহাকে গুরুরূপে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। গুরুচন্দ্রকে দীক্ষা দিবার পর সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন; আর ফিরেন নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং তৎপরে কিঙ্করের দুর্ভাগ্য দেখা দিল। এক ভীষণ মহামারীর প্রকোপে পড়িয়া ভৈরবী, গুরুচন্দ্র, কিঙ্করের জননী নীলনলিনী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গুরুদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। তাঁহাদের গৃহগোবিন্দ নামে একজন পুরাতন ভৃত্য ছিল। অনাথ কিঙ্করের লালনপালনের ভার তাহারই উপর পড়িল। কিঙ্করের ভাগ্যে গৃহগোবিন্দও বেশীদিন বাঁচিল না। সে বৃদ্ধ হইয়াছে, কফরোগে আক্রান্ত হইয়া সে-ও একদিন ভব-লীলা সাঙ্গ করিল। অন্তিম নিশ্বাস ফেলিবার পূর্বে কিঙ্করকে সে একটি আশ্বাস কিন্তু দিয়া গেল। বলিয়া গেল, "বাবা গোরক্ষনাথ একদিন না একদিন এখানে আসবেন। তোমার এ বিপদের কথা তিনি জানতে পারবেনই এবং সময় হ'লে তোমার কাছে আসবেন। তুমি যেখানেই থাক, আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ ক'রো না। আশ্রমে এসে মাঝে মাঝে খবর নিও, তাঁর দেখা একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাবে।"

গৃহগোবিন্দের মৃত্যুর পর বালক কিঙ্কর প্রথমে কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। বালক হইলেও সে নির্বোধ ছিল না। সে যখন দেখিল সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন আর সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। কাজের সন্ধানে বাহির হইল।

নিকটবর্তী এক বৌদ্ধ মঠে তাহার কাজও একটি জুটিল। সেখানে গিয়া সে বলিল, তাহার প্রপিতামহ দীক্ষিত বৌদ্ধ ছিলেন। অবস্থাবিপর্যয়ে তাহারা কুলধর্ম বজায় রাখিতে পারে নাই বটে, তাহার পিতাকে এক ভৈরবীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ যদি কৃপা করেন তাহা হইলে কুলধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সে কৃতার্থ হয়। ক্ষপণকগণ কৃপা করিলেন, এবং কিঙ্কর তাঁহাদের কিঙ্কররূপে নিযুক্ত হইল।

বলা বাহুল্য, পিতা এবং পিতামহের ন্যায় কিঙ্করও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিল। অর্থাৎ বাহিরে যদিও সে বৌদ্ধ আচার, বৌদ্ধ পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল, ভিতরে ভিতরে সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। গৃহগোবিন্দ মৃত্যুকালে যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাও সে বিস্মৃত হইল না। বৌদ্ধ মঠের কাজকর্ম শেষ করিয়া রাত্রে সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এত বড় আশ্রম সে একা ভোগ করিতে পারিল না, অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি আশ্রম-ভবনের উপর

নিপতিত হইল। ওই বৌদ্ধ ক্ষপণকরাই একে একে আসিয়া আশ্রমের ঘরগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন।

কিঙ্করকে অবশ্য ক্ষপণকরা তাড়াইয়া দিলেন না। ভৃত্যদের থাকিবার জন্য দূরে যে ঘরটি ছিল সেই ঘরেই সে থাকিবার অনুমতি পাইল। ক্ষপণকরা মঠটি দখল করিয়া লইয়া কিছুদিন বেশ শান্তিতে বাস করিলেন। কিছুদিন পরে কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত হইল। একদিন রাত্রে এমন একটি কাণ্ড ঘটিল তাহা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি ভয়ঙ্কর। গভীর নিশীথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিষ্ঠাকৃতি একদল লোক ভীমপরাক্রমে আশ্রম আক্রমণ করিল এবং বৌদ্ধ ক্ষপণকদের প্রহার করিতে করিতে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহাদের দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, আরক্ত নয়ন, গুচ্ছাকৃতি শ্মশ্রু, শাল-প্রাংশু পেশী-সমৃদ্ধ দেহ এবং ব্যাঘ্রহুঙ্কার কিঙ্করকে শুধু আতঙ্কিতই করিল না হতজ্ঞানও করিল। যদিও কেহই তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, তাহার নিকটে পর্যন্ত আসে নাই, তথাপি এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া নিজের ঘরে সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

·· যখন জ্ঞান হইল তখন সে অনুভব করিল, অজ্ঞান অবস্থায় সে গৃহান্তরে নীত হইয়াছে। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, বিরাট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের পাশে এক মৃগচর্মের আসন এবং আসনের পাশে একটি বৃহৎ শঙ্খ রহিয়াছে। তাহার পর একজন ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রুগুম্ফে সমাচ্ছন্ন, নয়নের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল।

তিনি মৃগচর্মে উপবেশন করিয়া কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, কিঙ্কর, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার পিতার গুরু গোরক্ষনাথ। তোমাকে দীক্ষা দেবার জন্যে এসেছি। আর একজনকে দীক্ষা দেবার জন্যেও আর একবার আমাকে আসতে হবে। তোমাকে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি চলে যাব, কিন্তু আবার আসব আমি। তুমি আমার প্রতীক্ষা ক'রো, এ আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ ক'রো না।"

কিঙ্কর সভয়ে বলিল, "প্রভু, আপনি আসবার কিছু পূর্বে এখানে একদল ডাকাত এসেছিল।"

"তারা ডাকাত নয়, তারা শিবের অনুচর। যে নাস্তিক পাষণ্ডের দল এই শিবস্থানকে কলঙ্কিত করছিল, তাদের শাস্তি দিতে তারা এসেছিল। আর তারা এখানে আসবে না।"

"আমি কি তা হ'লে এখানে একাই থাকব?"

"তোমার নিয়তি তোমাকে নানা স্থানে ঘোরাবে। এই বৌদ্ধদের সংস্পর্শেই তোমাকে থাকতে হবে অনেক দিন। বাইরে যে বেশই তুমি ধারণ ক'রে থাক না, অন্তরে যদি তুমি প্রকৃত শৈব হয়ে থাকতে পার, তোমার ভয় নেই। ভগবান অন্তরটাই দেখেন। শঙ্কর তা হ'লে তোমাকে কৃপা করবেন।"

"বৌদ্ধদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।"

"বৌদ্ধদের মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে। ওদের নরককুণ্ড থেকে একজন আর্তকে উদ্ধার করবার ভার নিতে হবে তোমাকে। যে দিন তা পারবে সেই দিন শঙ্কর কৃপা করবেন, তার কিছুদিন পরেই মুক্তি হবে তোমার। এখন এস, তোমাকে দীক্ষা দিই।"

গোরক্ষনাথ সেই রাত্রে কিঙ্করকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা যখন শেষ হইল, তখন পূর্বদিগন্তে ঊষা হাসিতেছিল।

গোরক্ষনাথ কিঙ্করকে বলিলেন, "তুমি এবার বিশ্রাম কর। আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব। ভয় পেয়ো না। শঙ্করের সেবক তুমি—এ কথা সর্বদা মনে রাখলে আর ভয় থাকবে না।"

ধীরে ধীরে তিনি আশ্রম-প্রাঙ্গণের আলো-আঁধারিতে মিলাইয়া গেলেন। কিঙ্কর প্রত্যাশা করিয়াছিল, পরদিন আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই।

কিঙ্কর প্রহৃত ক্ষপণকদের এড়াইয়া চলিতেছিল। কিন্তু সহসা কোথাও সে জীবিকা-নির্বাহের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও পুনরায় তাহাকে সেই বৌদ্ধ আশ্রমেই ফিরিয়া যাইতে হইল। প্রহৃত ক্ষপণকগণ রাজপুরুষদের সহায়তায় দস্যুদলের সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইতে-ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা সফলকাম হইলেন না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন দস্যুদল কিঙ্করকে হয়তো মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন এবং পূর্বকর্মে নিয়োগ করিলেন। কিঙ্কর গোরক্ষনাথের সংবাদ সযত্নে গোপন করিয়া রাখিল। এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল, কিছুদিন পরে একদিন কিঙ্করকে তাহার ভাগ্য-দেবতা স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পাটলিপুত্র-নিবাসী মণিবজ্র এই বৌদ্ধ ক্ষপণকদের মঠে যাতায়াত করিতেন। নানা সূত্রে তাঁহার সহিত ইঁহাদের যোগ ছিল। কিঙ্করের কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি একদিন মঠাধিপতিকে অনুরোধ করিলেন, আমার পান্থশালায় একটি ভৃত্যের নিতান্ত দরকার। আপনি যদি অনুমতি করেন কিঙ্করকে আমি লইয়া যাই। মঠাধিপতি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

কিঙ্কর যখন পাটলিপুত্রে গিয়া মণিবন্ত্রের পান্থশালায় নিযুক্ত হইল, তখন সবে-মাত্র নিরঞ্জনার জন্ম হইয়াছে। নিরঞ্জনাকে সে শিশুকাল হইতেই মানুষ করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ তাহাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা সে বিস্মৃত হইল না। বাহিরে বৌদ্ধসঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেও অন্তরে শৈবধর্মের প্রতি তাহার নিষ্ঠা অটুট রহিল। গোরক্ষনাথ যে মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাও সে বিস্মৃত হয় নাই, সুযোগ পাইলেই সে মন্ত্র সে প্রত্যহ জপ করিত।

এই ভাবে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। নিরঞ্জনা তাহার নয়নের মণি হইয়া উঠিল। তখনও কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে, এই নিরঞ্জনার কথাই গোরক্ষনাথ তাহাকে দীক্ষা দিবার পূর্বেই ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। ইহাকেই যে বৌদ্ধ-নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহাকে দীক্ষা দিবার জন্যই যে গুরু গোরক্ষনাথ আর একবার হিমালয় হইতে নামিয়া আসিবেন—এ সব কথা তাহার মনে জাগে নাই। গোরক্ষনাথের নির্দেশ অনুসারে সে অবশ্য আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করে নাই, প্রায়ই আশ্রমে যাইত এবং খোঁজ রাখিত কেহ আসিয়াছে কি না! আশ্রমটি সংস্কার-অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছিল। বৌদ্ধ ক্ষপণকগণ আর একবার সেখানে বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক উপদ্রবে বিপর্যস্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সকলের মনে এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ভৈরবী, শুক্লচন্দ্র এবং গৃহগোবিন্দের প্রেতাত্মা ওই আশ্রমে অদৃশ্যভাবে বসবাস করিতেছে, তাহারা আর কাহাকেও সেখানে থাকিতে দিবে না। কিঙ্করের কিন্তু ভয় ছিল না, ক্ষপণকদের যে কে বিপর্যস্ত করিতেছে তাহা গোরক্ষনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন। সে সুযোগ পাইলেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইত এবং আশ্রমের যে ঘরটি তখনও পড়িয়া যায় নাই সেই ঘরে গিয়া গোরক্ষনাথের জন্য অপেক্ষা করিত। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি যখন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন তখন আসিবেনই। মাঝে মাঝে ওই ঘরটিতে গিয়া সে রাত্রিবাসও করিত। নিরঞ্জনার উপর অত্যাচার যখন চরমে উঠিত, তখন নিরঞ্জনাকেও সে মাঝে মাঝে সেখানে লইয়া যাইত। নিরঞ্জনা তাহার মুখ হইতে গোরক্ষনাথের কথাও শুনিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গোরক্ষনাথের বিষয়ে নানারূপ অসম্ভব কাহিনী শুনিয়া তাহার মনে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত অলৌকিক ধারণা হইয়া গিয়াছিল। কিঙ্কর যখন বলিত—"তিনি হিমালয়ে থাকেন, মানসসরোবরে স্নান করেন, কৈলাসে তপস্যা করেন, মহাশক্তি মহাপুরুষ তিনি। তিনি আবার আসবেন, আমাকে বলে গেছেন আসবেন। তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন

তাঁর কাছে। তুমি কিন্তু এসব কথা কাউকে বলো না যেন—" তখন নিরঞ্জনার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া উঠিত, মনে হইত কবে সেই ত্রাণকর্তা আসিবেন।

নিরঞ্জনার জীবন ক্রমশ বিষময় হইয়া উঠিতেছিল। সুরা-উন্মত্ত ধনী কামুকের দল তাহার মনে যে কামনা উদ্দীপ্ত করিত তাহাতে কিছু উন্মাদনা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমহীন বলিয়া তাহার কদর্য রূপ অচিরেই প্রকট হইয়া পড়িত ; তাহার সমস্ত দেহমন পাশবিক কামের কলুষে যেন সর্বদা ক্লেদাক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে আনন্দ ছিল না, তাহার বীভৎসতায় সে ভীত বিমর্ষ মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল। এ দুর্বহ জীবনভার সে যেন আর বহিতে পারিতেছিল না।

একদিন গভীর রাত্রে এক বর্বর বণিকের আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ছুটিতে ছুটিতে সে অন্ধকার এক বৃক্ষতলে গিয়া আত্মগোপন করিল বটে ; কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রমত্ত বর্বরটা হয়তো তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তাহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। লোকটা পশ্চাদ্ধাবনই করিয়াছিল, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তাহার পদদ্বয় স্থির ছিল না, কিছুদূর অসংলগ্ন ভাবে ছুটিবার পর তাহার পদস্খলন হইল, সে পথের ধারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। কিঙ্কর ছিল না। সে আশ্রমে গিয়াছিল। রাত্রে হয়তো সে আর ফিরিত না, কিন্তু একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিতে পাইল, নিরঞ্জনা ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। একটু পরে প্রমত্ত বণিকটাকেও সে দেখিতে পাইল, তাহার পতনও লক্ষ্য করিল। তাহার পর সে যাহা করিল তাহা অদ্ভুত। হতচেতন বণিকটার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে সে লইয়া গেল এবং কিছুদূরে গিয়া একটি কূপের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে গেল নিরঞ্জনার কাছে। নিরঞ্জনা যে একটা গাছের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে তাহা সে দেখিতে পাইয়াছিল। গাছের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু নিরঞ্জনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই মাতালটাই বুঝি আসিতেছে। সে আবার ছুটিতে লাগিল, কিঙ্করও পশ্চাদ্ধাবন করিল। চীৎকার করিয়া সে নিরঞ্জনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত, কিন্তু নিরাপদ নহে বলিয়া তাহা আর করিল না।

কাছাকাছি আসিয়া নিম্ন কণ্ঠে সে বলিল, "নিরঞ্জনা, শোন, শোন, আমি কিঙ্কর।"

নিরঞ্জনা দাঁড়াইয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল।

কিঙ্কর কাছে আসিয়া বলিল, "আমি আশ্রম থেকে আসছি। শুভ সংবাদ আছে। গুরু গোরক্ষনাথ এসেছেন। তিনি তোমাকে ডাকছেন, দীক্ষা দিতে চান।"

"আমাকে ?"

"তোমাকে দীক্ষা দিতেই এসেছেন তিনি। চল।"

"আমার মতো মেয়ের দীক্ষা নিয়ে কি লাভ হবে কোনও ?"

"হবে। না হ'লে তিনি আসতেন না। তিনি যখন এই জন্তেই এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে তাঁর। আর দেরি করা চলবে না, চল তুমি।"

•

সেই রাত্রেই গোরক্ষনাথ নিরঞ্জনাকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়া বললেন, "জীবনের বাইরের রূপ দেখে বিচলিত হ'য়ো না। সে রূপ কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর, কিন্তু তা ক্ষণিক। তোমার জীবনে অনেক দুঃখ আসবে। অনেক প্রণয়ী আসবে, অনেক সুখ আসবে, অনেক কামনা আসবে। তোমার ঐশ্বর্য অতুল হবে, খ্যাতিও অনেক হবে। দুঃখও কম পাবে না। কিন্তু বিচলিত হ'য়ো না। ধ্রুব সত্যের উপর বিশ্বাস রেখো। যদি রাখতে পার সেই বিশ্বাসই তোমাকে সকল প্রকার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবে, তোমার মুক্তি হবে। আমার কর্তব্য শেষ হ'ল। এবার আমি চললাম। আশীর্বাদ করি শিবের করুণা বর্মের মতো তোমাদের রক্ষা করুক।"

গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন।

নিরঞ্জনার দীক্ষা হইয়া গেল বটে, কিন্তু কিঙ্কর লক্ষ্য করিতে লাগিল, কামনার যে বিষ তাহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশই যেন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। পিতার পান্থশালায় সে অবাঞ্ছিত পুরুষের সংস্রবে আসিতে চাহিত না বটে, কিন্তু মনোমত যুবক পাইলে খুশীই হইত। ক্রমশ কিঙ্করকেও সে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত দিনটা সে প্রায় বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দিত। কিছুদিনের মধ্যেই নৃত্যগীত-প্রিয় একদল যুবকও তাহার চারিদিকে জুটিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে সে বাহিরে বাহিরে—কখনও নদীর ধারে, কখনও কোন ভগ্ন-প্রাকারের অন্তরালে, কখনও বা জনবিরল পথে পথে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিতামাতাকে সে আর ভয় করিত না, পিতামাতাও ইহা লইয়া তাহাকে আর ভৎ'সনা করিতেন না। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সে ফিরিত, কিছু অর্থ লইয়াই ফিরিত। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মণিবজ্রের দলের একজন গোঁড়া

বৌদ্ধ হেরুকচরণ অনেক দিন হইতেই কিঙ্করের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, কিঙ্করের চক্রান্তেই তাঁহারা নিরঞ্জনাকে নিজেদের গুহ্যসাধনামার্গে সহচরীরূপে পান নাই। একদিন গভীর রাত্রে তিনি গোপনে নিরঞ্জনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিঙ্কর তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। ইহাও তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, কিঙ্কর যদিও নিজেকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে সে বিধর্মী। বিধর্মী না হইলে একদিন সে নিজেই নিরঞ্জনাকে লইয়া গুহ্যধর্মে যোগ দিত। যাহার গুহ্যধর্মে যোগ দিবার আগ্রহ নাই, সে আবার কি রকম বৌদ্ধ? কিঙ্করকে প্রকাশ্যে কিছু বলিবার উপায় ছিল না, কিঙ্করই মণিবজ্রের পান্থশালার মেরুদণ্ডস্বরূপ, তাহার অভাবে পান্থশালা অচল হইয়া পড়িবে। কিঙ্কর না থাকিলে যোগিনীরও চলিত না, কারণ যোগিনীও ক্রমশ সুরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৃহের যাবতীয় কর্ম, এমন কি রন্ধন পর্যন্ত, কিঙ্করই করিত। সুতরাং প্রকাশ্যে কিঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করিবার উপায় ছিল না। হেরুকচরণের সে সাহস হইত না, কিন্তু কোনও ছুতায় কিঙ্করকে জব্দ করিবার জন্য তিনি মনে মনে ওৎ পাতিয়া থাকিতেন।

একদিন তিনি সুযোগ পাইলেন। মণিবজ্রের পান্থশালা হইতে কিছুদূরে একটি নাতিবৃহৎ অরণ্য ছিল এবং সে অরণ্যের মধ্যে একটি ভগ্নস্তূপ ছিল। কিন্তু সে ভগ্নস্তূপটি যে আসলে একটি প্রাচীন মন্দির এবং তাহার ভিতরে যে একটি শিবলিঙ্গ বর্তমান—এ কথা অনেকেই জানিত না। কারণ স্থানটি দুর্গমও ছিল, ভয়াবহও ছিল, লোকে বলিত—ওই স্থানে শঙ্খচূড় সাপ নাকি বাস করে! কিঙ্কর কিন্তু শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব জানিত, অবসর পাইলে সেখানে নির্জনে সে শিবপূজাও করিত।

একদিন সে হেরুকচরণের নিকট ধরা পড়িয়া গেল। হেরুকচরণ এক কিশোরী চণ্ডালকন্যাকে লইয়া ওই গভীর বনে সম্ভবত গুহ্যধর্ম পালনমানসে গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার নজর পড়িল কিঙ্কর উক্ত ভগ্নস্তূপের পিছন হইতে বাহির হইতেছে, তাহার হাতে কিছু বিল্বপত্র এবং আকন্দ ফুল। হেরুকচরণ বিস্মিত হইলেন। সর্পসঙ্কুল বলিয়া সাধারণত কেহ ওই ভগ্নস্তূপের কাছাকাছি যায় না, কিঙ্কর ওখানে কি করিতেছে? হেরুকচরণ কৌতূহলী হইলেন। কিঙ্কর যখন চলিয়া গেলেন, তিনি সাবধানপদবিক্ষেপে ভগ্ন মন্দিরের সমীপবর্তী হইয়া শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেখিলেন, শিব যে নিয়মিত পূজিত হন তাহার চিহ্নও বর্তমান। কিঙ্করের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া হেরুকচরণ পুলকিত হইলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ইহা লইয়া এখনই যদি হৈ-হৈ করা

যায়, কিঙ্কর হয়তো ব্যাপারটা অস্বীকার করিবে। তিনি স্থির করিলেন, কিঙ্করকে একদিন হাতে-নাতে ধরিতে হইবে, সঙ্গে একজন সঙ্গীও লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। কিঙ্কর একদিন হাতে-নাতেই ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু ফল যাহা হইল তাহা ভয়ানক। হেরুকচরণ মহামাতঙ্গ নামক জিঘাংসা-পরায়ণ রাজপুরুষদের প্রিয় একজন বৌদ্ধকে লইয়া গিয়াছিলেন। উভয়ে যখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম করিতেছিল। মহামাতঙ্গ কিঙ্করের পশ্চাদ্দেশে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া বলিল, "তুই শালা বাইরে নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে পরিচয় দিস্, এ কি করছিস তুই ?"

এ ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিঙ্কর ক্ষেপিয়া গেল। নিকটে একটা ত্রিশূল ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া সে মহামাতঙ্গের শির লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূলটা গিয়া বিঁধিল বুকের মাঝখানে। মহামাতঙ্গকে ধরাশায়ী হইতে হইল। হেরুকচরণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

"এ কি করলে, এ কি করলে কিঙ্কর ?"

কিঙ্কর উত্তর দিল, "আমি করিনি, স্বয়ং শিব করেছেন।"

"তুমি কি শিব হয়ে উঠেছ আজকাল ?"

"আমি শিবের ভক্ত। তিনিই আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছেন। ভক্তের অপমান ভগবান সহ্য করেন না।"

সহসা হেরুকচরণ লক্ষ্য করিলেন মহামাতঙ্গের কান দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। তিনি একটু ভীত হইয়া পড়িলেন এবং যাহা করিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত তো বটেই, একটু হাস্যকরও। কোনও কিছু না বলিয়া হঠাৎ তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। কিঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ মৃতদেহটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সেও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় নর-হত্যার অপরাধে রাজপুরুষেরা কিঙ্করকে বন্দী করিলেন। এক সপ্তাহ পরে তাহার বিচার হইল। বিচারক ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে কিঙ্কর এতকাল বৌদ্ধধর্মের মুখোশ পরিয়া সকলকে ছলনা করিতেছিল—আসলে সে শৈব, তখন কিঙ্করের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হইল না। অকস্মাৎ ক্রোধের বশে মহামাতঙ্গকে দৈবাৎ মারিয়াছে বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিলে কিঙ্করকে লঘু শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু ভণ্ড আচরণের কথা শুনিয়া সে ইচ্ছা তাঁহার হইল না। তিনি কিঙ্করের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। বলিলেন, কেবল একটি শর্তে সে প্রাণে বাঁচিতে পারে। সে যদি সর্বসমক্ষে শিবলিঙ্গের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনুতপ্তচিত্তে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ

করে, তাহা হইলেই কিছু অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন। কিঙ্কর এ শর্তে মুক্তি ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। সে মৃত্যুই বরণ করিল। ত্রিশূল আঘাতে মহামাতঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া বিচারক তাহাকে শূলে দিবার আদেশ দিলেন।

যে স্থান দিয়া কিছুকাল পূর্বে কিঙ্কর নিরঞ্জনাকে গোপনে গোরক্ষনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই শূল প্রোথিত হইল। জল্লাদগণ কিঙ্করকে হস্তপদবদ্ধাবস্থায় শূলের উপর চড়াইয়া দিল। কিঙ্কর কোনও আপত্তি করিল না, কোনও আর্তনাদও করিল না। সে তারস্বরে শিবনাম কীর্তন করিতে করিতে শূলে আরোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইয়া গেল। সে শূল তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেও অধরোষ্ঠ নড়িতেছিল, মনে হইতেছিল সে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে। কেহ কেহ বলে, সে দুই-একবার নাকি 'জয় গুরু' 'জয় গুরু'ও বলিয়াছিল। তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

কিঙ্করের যখন মৃত্যু হইল তখনও নিরঞ্জনা কিশোরী, তাহার বয়স তখন বারো বৎসর। বলা বাহুল্য, কিঙ্করের এই শোচনীয় মৃত্যু তাহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিল; কিন্তু তখন ইহা তাহার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ছিল যে, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করিয়া কিঙ্কর প্রকৃত শান্তিলাভই করিয়াছে। বরং ঠিক বিপরীত কথাটাই সে যেন বুঝিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, সৎপথ মানেই বিপদসঙ্কুল পথ। ভাল লোক সর্বদাই বিপন্ন, তাহার কিছুতেই যেন নিস্তার নাই, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে মরিতে হইবে। এই ব্যাপারের পর হইতে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কেমন যেন ভয়ই হইয়া গেল, সৎপথ তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ভাল পথে গিয়া দরকার নাই, এত কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না।

যৌবনে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার প্রণয়ী জুটিয়াছিল। প্রতিবেশী ছোঁড়ার দল সুযোগ পাইলেই তাহার অনুসরণ করিত, এমন কি অনেক বৃদ্ধও তাহাকে প্রলোভন দেখাইত। এ জাতীয় প্রণয় ব্যাপারে কিছু অর্থাগম হয়। সে অর্থ দিয়া সে প্রসাধনদ্রব্য, শাড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি কিনিত। ফলে, তাহার পিতামাতা ক্রমশ তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। তাহার উপার্জিত অর্থে একমাত্র তাঁহাদেরই ন্যায্য অধিকার আছে—ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। নিরঞ্জনা বাহিরে কাটাইলেই তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেন, উপার্জিত অর্থ সে তাঁহাদের আনিয়া

দিবে। কিন্তু নিরঞ্জনা সব সময় দিত না, ফলে অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। যোগিনী তাহাকে তিরস্কার করিতেন, প্রহার পর্যন্ত করিতেন। ফলে মাঝে মাঝে তাহাকে বাড়ির বাহিরে রাত কাটাইতে হইত। অনেক সময় নগরপ্রাকারের পার্শ্বে—যেখানে অন্ধ খঞ্জ ভিখারীর দল শ্বাপদ-সরীসৃপের সঙ্গে রাত্রি কাটায়—সেইখানে নিরঞ্জনাও রাত্রি কাটাইত। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কিঙ্কর ছিল না, অন্য কাহারও হাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতেও তাহার সাহস হইত না, সুতরাং পলায়ন করিয়াই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইতেছিল।

একদিন অত্যধিক প্রহৃত হইয়া সে নগর-সিংহদ্বারের নিকট বসিয়া রোদন করিতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ়াকে দেখিলেই মনে হয় এককালে তিনি অপরূপ রূপসী ছিলেন। ক্ষণকাল নিরঞ্জনাকে নিরীক্ষণ করিয়া সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ওমা, সোনার প্রতিমা এমন ভাবে ধূলোয় লুটোচ্ছে কেন! কার মেয়ে তুমি, তোমার বাপ-মা কোথা?"

নিরঞ্জনা কোনও উত্তর দিল না। আনত নয়নে চুপ করিয়া রহিল।

"কাঁদছিলে কেন বল তো? এমন চাঁদপানা মুখ, কিসের দুঃখ তোমার? তোমার বাপ-মা কোথা?"

এবার নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আমার বাবা মাতাল, মা কৃপণ।"

"তারা তোমাকে মারধোর করে নাকি?"

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল। প্রৌঢ়া তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "বাপ-মা যদি অমন হয় কি দরকার তাদের কাছে থাকবার? আমার সঙ্গে যাবে? তোমাকে দেখে বড় ভাল লেগেছে আমার। আমার সঙ্গে চল তো, খুব যত্ন ক'রে রাখব। আহা, কি চেহারা! যেন টগর ফুলটি! আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব তোমার। কি জাত তোমরা?"

"আমার বাবা বৌদ্ধ।"

"আমার ছেলে, নিজের মুখে বলতে নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। যদি আস আমার সঙ্গে, দেখতেই পাবে। যাবে?"

"যাব।"

সেই প্রৌঢ়ার সঙ্গে নিরঞ্জনা সেই দিনই পাটলিপুত্র ত্যাগ করিল এবং কিছুদিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি অন্য কেহ নহেন—বিখ্যাত নর্তকী মিশ্রকেশী, যাহাকে লোকে

সংক্ষেপে একদা মিশরি বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার রূপ-যৌবন অন্তর্হিত হইয়াছিল, আর তিনি নাচিতে বা গাহিতে পারিতেন না, কিন্তু নৃত্য-বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে রূপসী বালিকা সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে রীতিমত নাচ শিখাইতেন এবং তাহারা পারদর্শিনী হইলে বড়লোকদের প্রমোদ-উৎসবে তাহাদের ভাড়া দিতেন। ইহাই তাঁহার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় ছিল। নিরঞ্জনাকে দেখিবামাত্র তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে যদি ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়, নর্তকী হিসাবে ইহার ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। এমন অপরূপ দেহের গঠন, এমন লাবণ্য সচরাচর দেখা যায় না। ইহাও তাঁহার মনে হইয়াছিল, ইহাকে সত্যই যদি আপনার করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎও কম উজ্জ্বল হইবে না। নৃত্যগীত-পটিয়সী নিরঞ্জনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে তিনি কঠোরভাবে বেত্রহস্তে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একটু বেসুরা বা বেতালা হইবার উপায় ছিল না, হইলেই তিনি বেত্রাঘাত করিতেন। নিরঞ্জনার অন্য কোথাও যাইবার উপায় ছিল না, মিশ্রকেশী সর্বদাই তাহার উপর কড়া নজর রাখিতেন। কিন্তু সে সর্বাপেক্ষা বেশী মুশকিলে পড়িয়াছিল মিশ্রকেশীর পুত্র শ্রীমন্তকে লইয়া। শ্রীমন্ত ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির। সে যদি প্রেম করিত নিরঞ্জনা হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; কারণ সে ছিল অক্ষম পৌরুষহীন। কখনও সে কোনও স্ত্রীলোকের প্রেম অর্জন করিতে পারে নাই, যত স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে সে আসিয়াছিল সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। তাই স্ত্রীজাতির উপর সে জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোকদের নির্যাতন করিয়াই সে আনন্দ পাইত। নিরঞ্জনাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া সে নানাভাবে তাহাকে নির্যাতন করিতে লাগিল। সে নিরঞ্জনার গালে আঁচড়াইয়া দিত, চিমটি কাটিয়া তাহার বাহুমূলে ক্ষত সৃষ্টি করিত, কখনও কখনও পিছন হইতে ছুঁচও ফুটাইয়া দিত। তাহার মায়ের মতো সেও নিরঞ্জনার ভবিষ্যৎ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল নিরঞ্জনা বহুভোগ্যা রূপজীবিনী হইবে। এই জন্য সে আরও হিংস্র হইয়া উঠিত, ঈর্ষায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইয়া যে বিষ উদ্গিরিত হইত তাহা ভয়ঙ্কর, তাহার একমাত্র প্রকাশ ছিল নির্যাতনে। নিরঞ্জনা তাহার না হইয়া অপরের হইবে ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য নির্যাতনের নব নব উপায় সে উদ্ভাবন করিত।

কিন্তু তাহার একটি গুণ ছিল। সে নাচের অদ্ভুত নকল করিতে পারিত, যে কোনও নাচের। যদিও তাহা বিকৃত নকল, কিন্তু মুখভঙ্গী দ্বারা এমন একটি

রসের সৃষ্টি করিতে পারিত যাহা প্রকৃতই হাস্যরস এবং উপভোগ্য। শুধু হাস্যরসই নয়, মুখভাব এবং অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সে সর্বপ্রকার ভাব, এমন কি গভীর প্রেমের ভাবও চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে পারিত। তাহার নিকট হইতে নিরঞ্জনা এই বিদ্যাটাও শিখিতে লাগিল। নারীবিদ্বেষী শ্রীমন্তের নিকট হইতে শেখা কিন্তু সহজ ছিল না। শিখাইবার ছলে সে কেবল নানা যন্ত্রণা দিত। নিরঞ্জনা কিন্তু দমিল না। বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও সে নৃত্য, গীত এবং মূক অভিনয় এই ত্রিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। কোনও নির্যাতনই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে নির্যাতনে অভ্যস্তই ছিল, বাল্যকালে তাহার নিজের পিতা-মাতাই তো তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছেন। সুতরাং দৈহিক নির্যাতন তাহার পক্ষে নূতন কিছু ছিল না। সে সাগ্রহে শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া নর্তকী মিশ্রকেশীর কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কারণ তাঁহার ব্যবহার যতই কঠোর হউক না কেন, নৃত্যগীত-বিদ্যায় তিনি যে পারঙ্গমা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। নিরঞ্জনাকে তিনি যে অন্তরের সহিত শিক্ষা দিতেছেন, তাহাও নিরঞ্জনা বুঝিতে পারিত। সুতরাং তাঁহার পদ্ধতি যতই নিষ্ঠুর হউক, নিরঞ্জনা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল; কারণ তাহার ভবিষ্যৎ তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনার যখন বয়স বাড়িল, নৃত্যে গীতে মূক অভিনয়ে সে-ও যখন পারদর্শিনী হইল, তখন মিশ্রকেশী তাহাকে ধনীদের উৎসব-সভায় পাঠাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অর্থের বিনিময়ে। এইখানেই মিশ্রকেশীর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। নিরঞ্জনা ধনী রসিকদের রসবোধকে তৃপ্ত করিতে লাগিল, ক্রমশ তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইল। বর্বর-প্রকৃতির ধনী কুশীদজীবীরা অনেক সময় উৎসবশেষে তাহাকে নিজেদের বাগান-বাড়িতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনা আপত্তি করিত না, কারণ সে তখনও প্রণয়ের আস্বাদ পায় নাই। অর্থমূল্যই তাহার নিকট পর্যাপ্ত ছিল।

একদিন কিন্তু এক অভিজাত বংশীয় যুবক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে রাত্রে সে যুবকদের এক প্রীতি-সম্মেলনে নাচিতে গিয়াছিল। নৃত্য শেষ হইয়া গেলে নগর-কোটালের অনিন্দ্যকান্তি যুবক পুত্র যৌবন-উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া প্রণয়গদগদ ভাষায় সহসা তাহাকে সম্বোধন করিল। যাহা বলিল তাহা হাস্যকর, কিন্তু যুবকের মুখ দেখিয়া নিরঞ্জনার হাসি পাইল না। যুবক বলিল, "নিরঞ্জনা, আমি তোমার—সর্বতোভাবে তোমার। আমি তোমার মাথার মুকুট, অঙ্গের

বসন, চরণের পাদুকা। তুমি তোমার পাদুকাকে যেমন পদদলিত করছ, আমাকেও তেমনি কর। আমার সোহাগই তোমার মুকুট হোক, আমার প্রেমই বসনের মতো তোমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকুক। সুন্দরী নিরঞ্জনা, তুমি চল আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে চল। বাইরের পৃথিবী বাইরে পড়ে থাক্। পৃথিবীকে ভুলে যাও তুমি—।"

নিরঞ্জনা যুবকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সত্যই সে রূপবান। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, মুখের গৌরবর্ণ তৃণবৎ সবুজ হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন একটা মেঘ নামিয়া আসিতেছে, যুবকের আমন্ত্রণ কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার সহিত গেল না। যুবকের উন্মুখ-আগ্রহ, আন্তরিক অনুরোধ ব্যর্থ হইল। তখন সে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। নিরঞ্জনার মধ্যে যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব দুর্দমনীয় শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বর্মাবৃত করিয়া দিল। নগর-কোটালের রূপবান পুত্র মৃগপতির অনুরোধ, আবেদন, বলপ্রয়োগ তুচ্ছ হইয়া গেল তাহার কাছে। সে দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসকে ব্যাহত করিয়া দিল। নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল সে।

নিরঞ্জনার ব্যবহারে অন্যান্য অতিথিরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। মৃগপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো যে কোনও নটীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। নিরঞ্জনার মতো সামান্য একটা নটী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! তাঁহারা নিরঞ্জনার সুবুদ্ধির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, মেয়েটা হয়তো পাগল।

মৃগপতিকে কিন্তু সে রাত্রে একাই ফিরিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রণয়জ্বরে সে জর্জরিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনাকে না পাইলে সে আর বাঁচিবে না। পরদিন প্রভাতে সে প্রচুর পুষ্পসম্ভার লইয়া নিরঞ্জনার দ্বারদেশে পুনরায় যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতি ভয়াবহ—চোখের কোলে কালি, চুল বিস্রস্ত, মুখের বর্ণ মলিন। নিরঞ্জনা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু সে দূরেই রহিল, কাছে আসিল না। সেও কষ্ট পাইতেছিল, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না—কষ্টটা কিসের, কষ্টটা কেন! নিজেকেই সে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছিল, এ রকম হইল কেন, কেন তাহার কিছু ভাল লাগিতেছে না, একটা অনির্দিষ্ট বেদনা কেন সারা মন জুড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রণয়ীর অভাব ছিল না, মৃগপতি ছাড়া আরও অনেকে তাহার দ্বারে হানা দিয়াছিল, কিন্তু সে কাহারও সহিত দেখা করিল না, সকলকেই বিদায় করিয়া দিল। কাহারও সান্নিধ্য

সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে ঘরের খিল পর্যন্ত খুলিল না, দিবালোককে পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া সমস্ত দিন কেবল কাঁদিল।

মৃগপতি ধনীর পুত্র। শুধু তাহাই নহে, গণ্যমান্য একজন রাজপুরুষের পুত্র সে। এত সহজে নিরস্ত হইবার লোক সে নয়। সে জোর করিয়া নিরঞ্জনার গৃহের দ্বার উন্মোচন করাইল। নিরঞ্জনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতাও তাহার ছিল। কিন্তু ততটা সে করিল না। সে রসিক ব্যক্তি, সে জানিত জোর করিয়া দেহটাকে হয়তো স্বাধিকারে আনা যায়, কিন্তু মন পাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সে প্রত্যহ আসিয়া নিরঞ্জনাকে অনুনয় করিতে লাগিল, উপহারে উপহারে তাহার গৃহ ও সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল। শেষে অবাধ্য শিশুকে লোকে যেমন স্নেহের ভৎর্সনা করে, তেমনি ভৎর্সনাও তাহাকে করিল, ভয়ও দেখাইল। তবু কিন্তু নিরঞ্জনার হৃদয়-কপাট খুলিল না। তাহার বাড়িতে যাইতে নিরঞ্জনা সহজে রাজী হইল না। পুরুষের প্রথম প্রণয়-স্পর্শে কুমারী যেরূপ ভীত হয়, সে নিজে একদিন যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমনি এক কুমারী-সুলভ ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল। মৃগপতির সহস্রবিধ অনুনয়ের উত্তরে সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—না, না, না, না।

এক পক্ষ অতিবাহিত হইল, তখন সে নিজের অন্তর বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল সে মৃগপতির প্রেমে পড়িয়াছে, বুঝিতে পারিল অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব স্বপ্নলোক নামিয়া আসিয়াছে। আর সে দ্বিধা করিল না। মৃগপতির সঙ্গে একদিন তাহার বাড়িতে গেল, আর ফিরিল না। যে জীবন তাহারা যাপন করিতে লাগিল তাহা মধুময়, স্বপ্নময়, অপূর্ব। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের যেন তৃপ্তি হইত না। কি যে বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না, পাইলেও ভাষা জুটিত না, শিশুদের মতো অর্থহীন অসংলগ্ন আলাপেই তাহারাপরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারিত। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। কখনও গঙ্গার শুভ্র বালুসৈকতে, কখনও ঝাউবনে, কখনও রজনীর নিবিড় অন্ধকারে, কখনও জ্যোৎস্নার গভীর আবেশে তাহারা নিজেদের হারাইয়া ফেলিত, আবার ফিরিয়া পাইত। কখনও বা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাহারা পর্বতের সানুদেশে চলিয়া যাইত, সেখানে বন্যকুসুম চয়ন করিতে প্রভাত দ্বিপ্রহরের উত্তীর্ণ হইত তবু তাহাদের খেয়াল হইত না যে, বাড়ি ফিরিতে হইবে। একই পাত্র হইতে সুরাপান করিত তাহারা। নিরঞ্জনা যখন একটি

আঙুর মুখে তুলিত তখন তাহার বিম্বাধরধৃত সেই আঙুরটিই মৃগপতি নিজ অধর দিয়া তাহার মুখ হইতে তুলিয়া লইত।

মিশ্রকেশী একদিন ক্রোধভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মৃগপতিকে বলিলেন, "নিরঞ্জনা আমার কন্যা ও আমার নয়নের মণি, ওকে আমি দিতে পারব না। তুমি ওকে ছেড়ে দাও।"

মৃগপতি প্রচুর অর্থ দিয়া নয়নের মণির মূল্য শোধ করিয়া দিল। মিশ্রকেশী চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার লোভের অন্ত ছিল না। আরও অর্থের লোভে তিনি পুনরার মৃগপতির বাসভবনে হানা দিলেন। মৃগপতি আর তাঁহাকে অর্থ দিল না, নগররক্ষকের সহায়তায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। বিচারের সময় আবিষ্কৃত হইল, তিনি বহু অপরাধে অপরাধিনী। বহু বালিকার তিনি সর্বনাশ করিয়াছেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। তাঁহার মৃতদেহ বন্য পশুদের নখদন্তে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

নিরঞ্জনা নিজের কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া মৃগপতিকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার স্বভাবসুলভ শিল্পপ্রতিভা যেন কিছুকালের জন্য মৃগপতির মধ্যে চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছিল। সে যখন মৃগপতিকে বলিত, 'আমি চিরকাল তোমারই ছিলাম' তখন সে বাণী তাহার মর্ম হইতেই উৎসারিত হইত, তাহার মধ্যে কপটতা ছিল না। মৃগপতিও যখন বলিত, 'তুমি অনন্যা। তোমার মতো আমি আর কাউকে কখনও দেখিনি' তখন তাহার মধ্যেও ভণ্ডামি ছিল না। একটা রঙীন স্বপ্ন তাহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

স্বপ্ন কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই ভাঙিয়া গেল। সহসা একদিন নিরঞ্জনা আবিষ্কার করিল, তাহার হৃদয় শূন্য, সে একাকিনী। তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনা মৃগপতিকে যে রূপ অর্পণ করিয়াছিল তাহা সহসা অন্তর্ধান করিল, মৃগপতির রূপান্তর ঘটিল, তাহাকে আর সে যেন চিনিতে পারিল না। স্বপ্নলোক মেঘের প্রাসাদের মতো শূন্যে বিলীন হইল। ইহাতে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল সে। তাহার মনে হইল, মৃগপতির এ পরিবর্তন কেমন করিয়া ঘটিল! যে অসাধারণ অসামান্য ছিল, কোন মন্ত্রবলে সে সামান্য সাধারণ হইয়া গেল। যে প্রেমকে সে অমর ভাবিয়াছিল, তাহার প্রাণহীন শবমূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

অবশেষে মৃগপতিকে ত্যাগ করিয়াই একদিন সে চলিয়া গেল। যে মৃগপতিকে সে মৃগপতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকেই আর কাহারও মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—ইহাই হইল তাহার গোঁপন প্রেরণা।

তাঁহার ইহাও মনে হইল, যাহাকে কখনও ভালবাসি নাই তাহার সঙ্গে বাস করা বরং কম দুঃখজনক, কিন্তু যাহাকে একদিন ভালবাসিয়াছি কিন্তু এখন আর বাসি না, বাসিতে পারি না, তাহার সহিত প্রেমহীন জীবন যাপন করা নিদারুণ।

সে আবার পথচারিণী হইল।

মন্দিরে মন্দিরে যে সব সেবাদাসী নগ্ন নৃত্য করিয়া দেবতা-পূজার ছলে কামুক ধনীদের বাসনা তৃপ্ত করে, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করিয়া অথবা উদ্যানবাটিকায় প্রমোদে-উৎসবে মাতিয়া যাহারা রূপ-যৌবনের পসরা পণ্যের মতো ফেরি করিয়া বেড়ায়, নিরঞ্জনা অবশেষে তাহাদেরই দলে যোগ দিল। প্রমত্তা নগরীর বিলাস-বসন কোনটাই সে বাদ দিল না, প্রমোদের ঘূর্ণাবর্তে সে আবর্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল রঙ্গমঞ্চ। যে রঙ্গমঞ্চে নানা দেশ হইতে আগত নট-নটীরা সহস্র সহস্র লোলুপ দর্শকের চিত্তকে লোলুপতর করিয়া তোলে, সেই রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া তাহার স্বপ্ন আবার রঙীন হইয়া উঠিল।

সে নর্তকীদের, অভিনেত্রীদের—বিশেষ করিয়া যাঁহারা পৌরাণিক চরিত্রে বা দেবীদের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিতেন তাঁহাদের—বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিত, কি নৈপুণ্যবলে, কোন্ মন্ত্রে তাঁহারা দর্শকদের হৃদয় হরণ করিয়াছেন! কিছুকাল পর্যবেক্ষণ করিবার পর তাহার ধারণা হইল, সুযোগ পাইলে সেও ভাল অভিনয় করিতে পারিবে। রঙ্গমঞ্চের মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে একদিন নিজের গোপন অভিলাষ ব্যক্তও করিয়া ফেলিল। তাহার অসামান্য রূপ ও অল্প বয়স দেখিয়া, মিশ্রকেশী সযত্নে তাঁহাকে যে নাচ গান মূক অভিনয় শিখাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া রঙ্গমঞ্চ-স্বামী মুগ্ধ হইলেন। নিরঞ্জনা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল এবং নর্তকী তিষ্যরক্ষিতার ক্ষুদ্র ভূমিকায় একদিন অবতীর্ণও হইল।

তাহার অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহা লইয়া খুব একটা হৈ-চৈ হইল না। রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। পূর্বার্জিত প্রশংসার অলৌকিক দ্যুতি পুরাতন অভিনেত্রীদের মস্তকে যে মহিমামুকুট পরাইয়া দর্শকদের উত্তেজিত করিয়া তোলে তাহা নিরঞ্জনা তখনও অর্জন করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহার প্রথম অভিনয়-রজনীতে প্রেক্ষাগৃহ করতালিমুখরিত হইয়া উঠিল না। কিন্তু কয়েক মাস ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করিবার পর তাহার সৌন্দর্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চ ক্রমশ প্রভাবিত হইল। শেষে এমন প্রবলভাবে প্রভাবিত হইল যে, সমস্ত নগরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যেন ভাঙিয়া পড়িল। নিরঞ্জনার বিপুল খ্যাতির টানে বড় বড় রাজপুরুষ এবং ধনী নাগরিকগণ তো

গেলেনই, সামান্ত মুটে-মজুররাও আহারের পয়সা বাঁচাইয়া রঙ্গমঞ্চের প্রবেশমূল্য সংগ্রহ করিল। নিরঞ্জনার উদ্দেশে কবিরা কবিতা লিখিলেন। গম্ভীর দার্শনিকরাও তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। যখন নিরঞ্জনার শিবিকা মন্দির বা মঠের পাশ দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাঁহারাও স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাহাকে লইয়া অনেক সময় তাহার বিরুদ্ধেই অলঙ্কারময়ী বক্তৃতায় মুখরিত হইয়া উঠিতেন। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা সাহস করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না, মুখ ফিরাইয়া লইতেন। তাহার গৃহদ্বারে অগুরুচন্দনসুরভিত পুষ্পমাল্য স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। তাহাকে লইয়া মাঝে মাঝে কলহও তুমুল হইয়া উঠিত, অনেক সময় শোণিতপাতও। বহু প্রণয়ী তাহার চরণকমলে অহরহ অজস্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিতে লাগিল, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণেরাও পশ্চাৎপদ রহিলেন না, তাঁহাদের সযত্নসঞ্চিত ধনরাশিও নদীর স্রোতের মতো নিরঞ্জনার কামনা-সঙ্গমতীর্থের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিরঞ্জনার চিত্ত প্রসন্ন হইল। জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়া গর্বে আনন্দে সত্যিই সে বিজয়িনীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গের দেবতারাও বুঝি তাহার মস্তকে অদৃশ্য পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। যে আত্মধিক্কার একদিন তাহার চিত্তকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। সকলের ভালবাসা পাইয়া সে নিজেকেও ভালবাসিতে শিখিল।

ইন্দ্রপ্রস্থের বিপুল অভিনন্দন কিছুদিন ভোগ করিবার পর একদিন একটা অদ্ভুত বাসনা তাহার মনে জাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, পাটলিপুত্রে ফিরিয়া যাইবে। যেখানে একদিন তাহার বাল্যকাল নিদারুণ দুঃখে লজ্জায় দৈন্যে দুর্দশায় অতিবাহিত হইয়াছিল, যেখানে একদিন সে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো পথে-প্রান্তরে পঙ্কে-পুষ্পে আহারের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল সেইখানেই সে ফিরিয়া যাইবে আবার। খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের তাহার অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। সত্যই সগৌরবে সে একদিন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিল। পাটলিপুত্রও অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি করিল না। নিরঞ্জনার খ্যাতি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রূপসী কলাকুশলা নর্তকী, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী নিরঞ্জনাকে পাটলিপুত্র সাগ্রহে সম্বর্ধনা করিয়া তাহাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। পাটলিপুত্রেও তাহার অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের ভীড় হইতে লাগিল, পাটলিপুত্রেও প্রণয়ীর অভাব ঘটিল না। প্রণয়ীরা কিন্তু আর নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না, প্রণয়ীদের সম্বন্ধে তাহার মোহই কাটিয়া গিয়াছিল। আর কাহারও মধ্যে মৃগপতিকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাহার আর ছিল না।

পাটলিপুত্রে যাঁহারা নিরঞ্জনার গৃহে প্রায় প্রত্যহই পদার্পণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক সিন্ধুপতিও ছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে 'নিষ্কাম' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিতেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার আলাপ এবং ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত ছিল। তাঁহার গভীর জ্ঞান বা উচ্চাঙ্গের ভাববিলাস কিন্তু নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রেমেও সে পড়ে নাই, বরং তাঁহার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তিতে সে মাঝে মাঝে বিরক্তই হইত। আর একটা কারণও ছিল। সিন্ধুপতি ছিলেন সন্দেহবাদী, অলৌকিক বা অসম্ভব কোন কিছুতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নিরঞ্জনার সব কিছুতেই বিশ্বাস ছিল। সে ভগবানকে বিশ্বাস করিত, শয়তানকেও বিশ্বাস করিত। অদৃষ্ট মানিত, তুকতাক মানিত, পাপ-পুণ্যও মানিত। তপ-জপেও তাহার আস্থা ছিল। গোরক্ষনাথকে সে ভোলে নাই, মহাদেবের অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস ছিল। শুধু মহাদেবই নয়, বৌদ্ধ হিন্দু সমস্ত দেবদেবীকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কুসংস্কারও কম ছিল না—কুকুর বিড়াল কাঁদিলে সে ভীত হইয়া পড়িত, কাকের অশ্রান্ত চীৎকার বা পেচকের বিশেষ একটা ডাক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। এমন কি বশীকরণেও তাহার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস করিত যে, রক্তাক্ত মেষলোমে পরিস্রুত সুরা পান করাইলে প্রণয়ী বশীভূত হয়। তাহার মনের প্রবণতাই ছিল ওইরূপ। অজ্ঞাত অসম্ভবের দিকে তাহার চিত্ত সর্বদাই যেন আশায় আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া থাকিত! মানহীন পরিচয়হীন কাহাকে যেন সে মনে মনে আহ্বান করিত এবং অহরহ আশা করিত—সে আসিবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিবে। ভবিষ্যৎ ভীতিপ্রদ ছিল তাহার কাছে। কিন্তু ওই ভবিষ্যৎকে জানিবার আগ্রহও কম ছিল না তাহার। বহু জ্যোতিষী, বহু যাদুকর, বহু তান্ত্রিককে সে প্রশ্রয় দিত। ইহাও সে বুঝিত যে তাহারা অনেকেই প্রতারক, তবু তাহাদের দূর করিয়া দিতে পারিত না। মৃত্যুভয়ও প্রবল ছিল তাহার, সর্বত্র সে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইত। যখন সে বিলাসস্রোতে ভাসমান বা প্রণয়ীর বাহুপাশে নিষ্পিষ্ট, তখন সহসা তাহার মনে হইত কাহার তুষারশীতল অঙ্গুলি যেন তাহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতি তাহাকে আশ্বাস দিতেন: "পলিতকেশে জরাজীর্ণ হয়ে অনন্ত অন্ধকারে চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যাওয়াই যদি আমাদের নিয়তি হয়, আজকের এই স্বর্ণকিরণোজ্জ্বল দিনই যদি আমাদের জীবনের শেষ দিন হয় তাতে হয়েছে কি? তাতে ভয় পাচ্ছ কেন? যতক্ষণ বেঁচে আছ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নাও। ভোগের পরিমাপই জীবনের পরিমাপ। ছোট ভাবে ভয়ে

ভয়ে সসঙ্কোচে যদি ভোগ কর, তোমার জীবনও ক্ষুদ্র শঙ্কিত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বুদ্ধি, আর এই জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করারই অপর নাম তো প্রেম। যা আমরা জানি না, যা জানবার উপায় নেই, যা আছে কি নেই বলা অসম্ভব—সে-সব নিয়ে নিজেকে এমন ক'রে কষ্ট দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না—।"

এ সব কথা শুনিয়া নিরঞ্জনা আশ্বস্ত হইত না, রাগিয়া উঠিত।

সিন্ধুপতির বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে সে ক্রোধভরে বলিত, "আপনারা সুবিধাবাদী ভীরু, তাই নাস্তিকতার ভান ক'রে সব জিনিস এড়িয়ে যেতে চান। আশা করবার সাহস নেই আপনাদের, অনিবার্যকে ভয় করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আপনাদের এ আস্ফালন একটুও ভাল লাগে না আমার। আমি আপনাদের মতো এড়িয়ে যেতে চাই না। আমি জানতে চাই, জানতে চাই।"

জীবনের রহস্য জানিবার জন্য সে নানাবিধ দর্শনের পুস্তক পড়িত। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না। শৈশবের অতীত জীবন মনে পড়িত তাহার। শৈশবের কথা বহুবার বহুরূপে ভাবিত সে। ভাবিতে তাহার ভাল লাগিত। অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে সেই সব গলিতে, সেই সব পান্থশালায় অথবা নদীতীরের সেই সব স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, যেখানে একদিন অতি দুঃখে তাহার শৈশব কাটিয়াছিল। স্থানগুলির পূর্বরূপ আর ছিল না, অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, অনেক স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। তবু তাহারই মধ্যে সে নিজের শৈশবের দিনগুলির সন্ধান করিত। তাহার পিতামাতার মৃত্যু তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিত, কিন্তু পিতামাতাকে সে যে ভালবাসিতে পারে নাই—এ বেদনার কোন সান্ত্বনাই সে খুঁজিয়া পাইত না।

একদিন রাত্রে এক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে নিজের কুঞ্চিত চিকুরদাম ঢাকিয়া সে পাটলিপুত্র নগরীর উপান্তে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিতে পাইল মন্দিরের ভিতর শিব-স্তোত্র পঠিত হইতেছে—

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ-গণাভরণং
রণ-নির্জিত-দুর্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

তখন শৈব-নির্যাতন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, শৈবগণ নির্ভয়ে তখন প্রকাশ্যে

নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিতেন। নিরঞ্জনা উৎকর্ণ হইয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত স্তোত্রপাঠ শুনিতে লাগিল। মন্দিরের বন্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছিল। নিরঞ্জনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বন্ধ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। নিরঞ্জনা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বহু লোক সমবেত হইয়াছে। শুধু পুরুষ নয়, বহু স্ত্রীলোকও আছে, বালক-বালিকাও অনেক। শিবস্তোত্রের পবিত্র সূত্রে সকলেই যেন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি বালক-বালিকারাও মুদিত নয়নে নতজানু হইয়া এক বিরাট সমাধির সম্মুখে আবেগভরে শ্রদ্ধাপূত চিত্তে স্তোত্র পাঠ করিতেছে। সমাধিটি নিষ্কলঙ্ক শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত, বিল্বপত্রে ও ধুস্তুরপুষ্পে সজ্জিত। অগুরু ধূপের গন্ধ মন্দিরের বায়ুমণ্ডলকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দিকে অসংখ্য ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরগাত্রে শিবপুরাণের বহু কাহিনী চিত্রে উৎকীর্ণ। কোথাও নটরাজ মূর্তি, কোথাও সতীশব স্কন্ধে তাণ্ডবনৃত্যমত্ত ধূর্জটি, কোথাও তিনি মদনভস্ম করিতেছেন, কোথাও বা আবার কিরাতবেশে অর্জুনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, কোনও চিত্রে বিষপান করিতেছেন, কোথাও বা প্রসন্ন হাস্যে বরদান করিতেছেন তপস্বিনী অপর্ণা উমাকে। স্তবগান সহসা থামিয়া গেল। গৈরিক-বসনপরিহিত পুরোহিতগণ প্রণত হইলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রণত হইল। নিরঞ্জনার মনে হইল, এই মন্দিরের অপূর্ব পরিবেশে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে, নিবিড় আনন্দের সহিত নিবিড় বেদনার মধুর সংমিশ্রণ, জীবনের আনন্দ এবং মৃত্যুর বিভীষিকা সঙ্গীতে ভঙ্গীতে ভক্তিতে শক্তিতে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর ভক্তগণ উঠিয়া সমাধিটিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। নিরঞ্জনা লক্ষ্য করিল, ইহারা কেহই ধনী নহে, সকলেই সামান্য লোক, চেহারা দেখিলে মনে হয় সকলেই কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহাদের আড়ম্বরহীন সরলতা নিরঞ্জনাকে মুগ্ধ করিল। তাহাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মুখের শিশুসুলভ কমনীয়তা মন্দিরের পবিত্রতাকে যেন পবিত্রতর করিতেছিল। সকলেই একে একে সমাধিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। জননীরা ছোট ছোট শিশুদেরও দুই হাতে তুলিয়া তাহাদের মাথা সমাধির সম্মুখে নত করাইয়া দিল।

নিরঞ্জনা একজন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কেন আজ এখানে এসেছেন? এখানে কি বিশেষ কোনও উৎসব ছিল?"

পুরোহিত উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আজ আমরা পরমশৈব কিঙ্করের স্মৃতিপূজা করতে এসেছি। তিনি শৈব ছিলেন—এই অপরাধে সেকালের বৌদ্ধ রাজপুরুষদের

রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। মিথ্যা অপরাধের ছলে তাঁরা তাঁকে এই স্থানে শূলবিদ্ধ ক'রে হত্যা করে। তিনি হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মত্যাগ করেন নি। তাঁরই স্মৃতিপূজা করবার জন্য আজ আমরা সমবেত হয়েছি। এটি তাঁরই সমাধি।"

নিরঞ্জনা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়ন দুইটি কখন যে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। যখন সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল; দেখিল পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। তখন ধীরে ধীরে সেও জানু পাতিয়া সমাধির সম্মুখে বসিল এবং প্রণাম করিল। অর্ধবিস্মৃত কিঙ্করের মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে, অগুরু চন্দনের গন্ধে, ফুলের শোভায়, প্রদীপের আলোকে সে ছবি ধীরে ধীরে মহিমময় হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জনার মনে হইল—কিঙ্কর ভাল লোক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ সে যে-লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে তাহার গুরুত্ববিচার সাধারণ ভালমন্দের মানদণ্ডে করা যায় না। আজ সে মহৎ, আজ সে সুন্দর। তাহার স্থান আজ মানবতার বহু উর্ধ্বে। কোন্ শক্তিবলে সে এত উর্ধ্বে উঠিল? কি সে শক্তি যাহা পার্থিব ধনসম্পদকে অবহেলা করিয়া, দৈনিক প্রমোদ-বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে চিরন্তন মহানন্দলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়? কিঙ্কর কি পাইয়াছিল? সে আর দূরে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গিয়া সমাধিপ্রস্তরের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিঙ্কর তাহার যে চোখ দুইটি ভালবাসিত সেই চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছিল সহসা ঘৃতপ্রদীপের কিরণ ছটায় সেই অশ্রুবিন্দু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জনা পুনরায় জানু পাতিয়া বসিল, বহু কামনার উদয়-অবসানের লীলাপীঠ যে অধর, সেই অধর শীতল প্রস্তরে সংলগ্ন করিয়া সে পরম শৈব কিঙ্করের সমাধিকে শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করিল।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সিন্ধুপতি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। অঙ্গে তাঁহার অভিসারের বেশ। বেশ সুরভিত, অঙ্গে স্বর্ণাভ রেশমের অবিন্যস্ত অঙ্গচ্ছেদ। তিনি নীতিবিষয়ক একটি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। নিরঞ্জনাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন।

"কি কষ্টই দিয়েছ তুমি আমাকে আজ!"—সিন্ধুপতির কণ্ঠস্বরে হাসির লহর খেলিয়া গেল: "তোমার অপেক্ষায় ব'সে ব'সে আমি কি করছিলাম জান? এই শুষ্ক কঠোর নীতির বইটার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। কিন্তু এই নীতির অরণ্যে অদ্ভুত সব জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। ধর্ম-উপদেশ নয়, অহঙ্কারের স্বরূপ-নির্ণয়ও নয়। এই নীরস বইটার পাতায় আমি আবিষ্কার করেছি অসংখ্য নিরঞ্জনাকে।

তারা সব আকারে ছোট ছোট, আমার আঙুলের চেয়ে কেউ বেশী বড় হবে না। কিন্তু কি তাদের রূপ, কি তাদের মহিমা! মনে হ'ল এক তুমিই যেন বহু রূপ ধারণ করেছ। কারও অঙ্গে স্বর্ণখচিত রক্তাম্বর, কেউ স্বচ্ছ শুভ্র মেঘের স্বপ্নে ভাসমান। কেউ আবার যেন পাষাণী প্রতিমার মতো—নগ্না, ভাষাহীনা এবং সেই জন্যেই যেন আকাঙ্ক্ষিতা। সর্বশেষে দেখলাম, তাদের মধ্যে দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল, দুজনে দেখতে ঠিক একরকম, তফাত বোঝা যায় না। দুজনেই আমার দিকে চেয়ে হাসলে। একজন বললে, 'আমি প্রেম'—আর একজন বললে, 'আমি মৃত্যু'।"

এই সব বলিতে বলিতে নিরঞ্জনাকে তিনি বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নিরঞ্জনার চোখের ঘৃণাব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টি লক্ষ্য করিলে তিনি হয়তো থামিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের কবিত্বই আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার একটি কথাও নিরঞ্জনার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

তিনি বলিয়া চলিলেন, "আমি যখন পড়ছিলাম 'আত্মসংযম থেকে কখনও ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়, তখন আমি তার অর্থ করছিলাম 'নিরঞ্জনার চুম্বনমদিরা অগ্নির চেয়েও তপ্ত, মধুর চেয়েও মিষ্ট'। আমার মত দার্শনিকের এ মতিভ্রম কেন হয়েছে জান? তোমারই জন্য। তুমিই নীতিশাস্ত্রের নূতন ভাষা সৃষ্টি করেছিলে আমার মনে। তোমার ভিতর দিয়েই আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি নিত্য নূতনরূপে—"

নিরঞ্জনা কিছুই শুনিতেছিল না। তাহার মন তখনও কিঙ্করের সমাধির নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিঙ্করের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল। দীর্ঘশ্বাসে চমকিত হইয়া সিন্ধুপতি তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন।

"দীর্ঘশ্বাস কেন? এমন মন-মরা হয়ে আছ কেন বল তো? এই বাস্তব পৃথিবীটাকে ভুলে থাকতে পারলেই তো সুখ। ভোলবার উপায়ও জানি আমরা। তবে দেরি করছ কেন? এস জীবনের সুখ-দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাই আমরা। এস না, অমন করছ কেন? তোমার প্রেমের তরঙ্গে অবগাহন করবার আশায় কতক্ষণ ধ'রে ব'সে আছি। আমার দেহের প্রতি পরমাণু তৃষিত হয়ে রয়েছে।"

এইবার নিরঞ্জনা ক্ষেপিয়া উঠিল।

"প্রেম? ও-কথা উচ্চারণ করবেন না আর। আপনি কখনও কাউকে ভালবাসেন নি। আমিও আপনাকে ভালবাসি না। না, না, বাসি না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। আপনি চলে যান এখান থেকে। এখনি চলে যান।

আপনার মতো অলস, কামুক ধনীদের ঘৃণা করি আমি। চলে যান আপনি এখান থেকে। যারা দরিদ্র তারাই ভাল, তারাই মহৎ। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন কিঙ্কর ব'লে এক চাকর ছিল আমার। সে শৈব ছিল ব'লে বৌদ্ধনামধারী কতকগুলো পিশাচ ধনী হত্যা করেছিল তাকে। সে-ই ভালবাসত আমাকে, সে-ই জানত প্রেম কাকে বলে। আপনি প্রেমের কি জানেন? আপনি তার পায়ের নখেরও যোগ্য নন। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান আপনি। আমি আর আপনার মুখদর্শন করব না।"

নিরঞ্জনা ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল সে। মনে মনে সংকল্প করিল, এইবার কিঙ্করের আদর্শ অনুসরণ করিবে সে।

কিন্তু সঙ্কল্প করা সহজ, সে অনুসারে কাজ করা কঠিন। প্রভাতে উঠিয়াই আবার সে পূর্বের জীবনস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। যে-সব বিলাসের আয়োজন পূর্ব হইতেই করা ছিল, তাহা লইয়াই সে আবার মাতিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে আর একটা বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, রূপযৌবন বেশীদিন থাকিবে না। যতদিন থাকে ততদিন যতটুকু সুখভোগ করা যায় ততটুকুই তো লাভ। রূপযৌবনের বিনিময়ে যতটা গৌরব আহরণ করিতে পারা যায় ততটুকু আহরণ করিবার জন্য তাই সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল —তাহার অভিনয় আরও নিখুঁত হইল। ভাস্কর চিত্রকর কবিদের কল্পনাকে সত্যই যেন সে রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার অঙ্গচালনার ভঙ্গীতে এমন একটি সংযত নিখুঁত সঙ্গতিময় শাশ্বত রূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে, মনে হইত, ঠিক যতটুকু শোভন ততটুকু সে ব্যক্ত করিতেছে। রসিক ও গুণীরা বলিতেন, "নিরঞ্জনা শুধু শিল্পীই নয়, গণিতেও পারদর্শিনী।" যাহারা অজ্ঞ দরিদ্র অবনত ভীত তাহাদের সম্মুখে নিরঞ্জনা আত্মপ্রকাশ করিল, কিন্তু ভিন্নভাবে। তাহার অজস্র দানে অভিভূত হইয়া তাহারা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইত। তাহার যশের সৌরভে দশদিক যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু তাহার মনে সুখ ছিল না, মানসিক অশান্তি কিছুতেই যেন দূর হইতেছিল না, মৃত্যুভয় বাড়িতেছিল। তাহার রমনীয় প্রাসাদ, কমনীয় কানন পাটলিপুত্রের গৌরবস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রাসাদ-বাসিনীর কাননবিহারিণী মনে শান্তি ছিল না।

বিদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে বহু রকম দুর্লভ গাছ আনাইয়া নিজের বাগানে লাগাইয়াছিল। একটি কৃত্রিম নদীও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মূলে জলসেচন করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদও ছিল একটি। হ্রদের চারিদিকে নিপুণ শিল্পীরা

ঐতিহাসিক প্রাচীন স্তম্ভশ্রেণীর অনুকরণ করিয়া একটা পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যেন। বহু মর্মরমূর্তিও ছিল। মনে হইত একদল নগ্না রূপসী নানা ভঙ্গিতে যেন হ্রদের জলে নিজেদের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে।

শিলা নিবাসটি ছিল এই বাগানের মধ্যেই। শিলা-নিবাস না বলিয়া অপ্সরী-নিবাস বলিলে যেন আরও শোভন হইত, কারণ বহুমূল্য মর্মর-নির্মিত গৃহটির ঠিক দ্বারদেশে তিনটি অপরূপ অপ্সরীর মূর্তি ছিল। শিল্পী তাহাদের এমনভাবে গড়িয়াছিলেন যে মনে হইতেছিল, তিনটি তরুণী স্নানের পূর্বে গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতেছেন এবং পাছে কেহ তাঁহাদের দেখিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, নিকটে কেহ আছে কিনা! মূর্তি তিনটি যেন জীবন্ত।

সম্মুখেই হ্রদের নীল জল। সেই নীল জলে প্রতিফলিত আলোকই শিলা-নিবাসকে আলোকিত করে। ঘরের ভিতর যে আলো প্রতিফলিত হয়, তাহা কোমল নীলাভ। দেওয়ালে নানা রূপ ছবি মুকুট মাল্য বিলম্বিত ছিল। ছবিগুলি নিরঞ্জনারই নানা ভঙ্গীর ছবি। বিবিধ প্রকার মুখোশও টাঙানো ছিল—কোনটা সুন্দর, কোনটা বা বিষাদময়। তাছাড়া ছিল রঙ্গমঞ্চের বহু দৃশ্যের বহু আলেখ্য। অদ্ভুত জন্তুর ছবিও ছিল—অদ্ভুতাকৃতি বামন, ভীষণাকৃতি দৈত্য; মানব এবং পশুর সমন্বয়ে প্রকৃতির নানারূপ মূর্তি ও চিত্রও ছিল কোথাও কোথাও। গৃহের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র নিকষ স্তম্ভের উপর ছিল পুষ্পধনু মদনের মনোহর একটি মূর্তি, —অপরূপ মূর্তি, হস্তিদন্তনির্মিত। সিন্ধুপতি এটি উপহার দিয়াছিলেন। এক স্থানে কুলুঙ্গিতে ছিল কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ছাগজননীর মূর্তি, ছয়টি শাবক তাহার স্ফীত স্তনের নিকট উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ছাগী ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখের পা দুইটি তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ঘরের মেঝেতে কাশ্মীরী শাল পাতা রহিয়াছে, মাথার বালিশগুলি সিংহচর্মনির্মিত, তাহার উপর অদ্ভুত কারুকার্য। ঘরের কোণে কোণে স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত আতর সমস্ত ঘরটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। পিছন দিকের দেওয়ালে একটি বিরাট কাছিমের খোলা ঠেসানো রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সোনার পেরেক ঠোকা। বিশাল কূর্মটি ভারতসমুদ্রে ধরা পড়িয়াছিল। কূর্মটি এত বৃহৎ যে তাহার পৃষ্ঠাবরণটি দিয়া নিরঞ্জনার খাট প্রস্তুত হইয়াছে। দিনের বেলা খাটটি দেওয়ালে ঠেসানো থাকে। কল্লোল-ছন্দিত, পুষ্পবিচিত্র, গন্ধমদির এই পরিবেশে নিরঞ্জনা প্রত্যহ ওই কূর্মশয্যায় বিশ্রাম করে। রাত্রির আহারের পূর্বে হয় সে এখানে একা থাকে কিংবা কোনও বিশেষ বন্ধুর সহিত গল্প করে। রঙ্গমঞ্চের চিন্তা ছাড়া আর একটি চিন্তা সম্প্রতি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রতিদিন বয়স

বাড়িতেছে—এই নিদারুণ সত্যটা ক্রমশ যেন তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন দ্রৌপদীর অভিনয় করিবার পর নিরঞ্জনা শিলা-নিবাসে বিশ্রাম করিতেছিল। দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ ছিল দর্পণে। নিজের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ রূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, এইবার ক্রমশ মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিবে, মাথার চুলও ক্রমশ পাকিবে। বিশেষ কোনও মন্ত্রপাঠ করিয়া অথবা বিশেষ কোনও ঔষধ বা ধূপের ধোঁয়া এই অনিবার্য পরিণামের গতিরোধ করিবে—এই অলীক স্তোকবাক্যে তাহার মন আর প্রবোধ মানিতেছিল না। অহরহ কে যেন মনের ভিতর বসিয়া বলিতেছিল, নিরঞ্জনা, তোমার যৌবন আর থাকিবে না, তুমিও বৃদ্ধা হইবে।…

তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দর্পণে আর একবার স্নেহভরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে যেন একটু আশ্বস্ত হইল। মনে হইল, পরে যাহাই হউক, তাহার রূপ এখনও কিন্তু অম্লান আছে, এখনও যাহা আছে তাহা বহু লোকের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে। কথাটা মনে হইতে তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিল। দর্পণকে সম্বোধন করিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, 'এত বড় পাটলিপুত্রে আমার মতো আর কে আছে! আমার মতো কমনীয় নমনীয়তা আর কারো আছে কি, এমন লীলায়িত গতিভঙ্গী, এমন অপরূপ বাহুবল্লরী? তুমি কি জান না বাহুবল্লরীই প্রেমের নিগড় রচনা করে?'

সহসা তাহার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত অদ্ভুত এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চক্ষু জ্বলন্ত, শ্মশ্রু অবিন্যস্ত, কিন্তু অঙ্গে মহার্ঘ পরিচ্ছদ। দর্পণ ফেলিয়া সে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সাবর্ণি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রূপসী নিরঞ্জনাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর মথিত করিয়া নীরবে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছিল—ভগবান, এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চিত্তকে যেন কলুষিত না করে, ইহার স্পর্শে আমি যেন ধন্য হই।

একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি কথা কহিলেন।

বলিলেন, "নিরঞ্জনা, অনেক দূর থেকে আমি এসেছি। তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি আমাকে তোমার কাছে টেনে এনেছে। শুনেছি তুমি অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী, অনুপমা মোহিনী, তোমার আকর্ষণে উদ্বেলিত জনসমুদ্র নাকি তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে! তোমার ঐশ্বর্যের খ্যাতি, প্রেমের কাহিনী ঠিক যেন রূপকথার মতো। মনে হয় যেন পৌরাণিক ধীবরকন্যা সত্যবতী, নব কলেবর ধারণ ক'রে বহু পরাশরের হৃদয় হরণ করছ। তাই আমি এসেছি, শুধু

তোমাকে দেখতে নয়, তোমার পরিচয় লাভ করবার জন্তে। যা স্বচক্ষে দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে জনশ্রুতি তোমাকে সম্যক মর্যাদা দিতে পারেনি। যা শুনেছিলাম দেখছি তুমি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী সুন্দর। শুধু রূপের নয়, বুদ্ধির দীপ্তিও তোমার মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করেছে। তোমার কাছে এসে এ ভয়ও আমার হচ্ছে যে, আরও কাছে গেলে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারব না—আমার মতো তপস্বীরও হয়তো হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাবে। অর্থাৎ এ কথাটা আমি অনুভব করছি যে, তোমার কাছে এসেই আবিষ্ট হয়ে পড়তে হয়—তোমার আকর্ষণী শক্তি দুর্বার।"

সাবর্ণি ব্যঙ্গের স্বরে কথাগুলি বলিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসের মতো শুনাইল। তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া নিরঞ্জনার কিন্তু রাগ হইল না। সাবর্ণিকে দেখিয়া প্রথমে সে ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার পর সে বিস্মিত হইল। বন্য বর্বরের মতো কে এই লোকটা! চোখের জলন্ত দৃষ্টি গম্ভীর কিন্তু আগ্রহপূর্ণ! এ রকম সমন্বয় তো প্রায় দেখা যায় না! তাহার কৌতূহল হইল। প্রত্যহ যে সব লোকের ভীড় দেখা যায় এ লোকটি তো তাহাদের কাহারও মতো নয়। বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

ব্যঙ্গের স্বরে নিরঞ্জনা উত্তর দিল।

"আগন্তুক অত সহজে আকৃষ্ট হয়ো না। আমার রূপের বহ্নি অনেককে পুড়িয়েছে, হয়তো তোমাকেও পোড়াবে। আমার দিকে আকৃষ্ট হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। লোকে বলে, আমি সর্বনাশিনী।"

সাবর্ণি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। আমি তোমাকে জীবনের চেয়ে, এমন কি নিজের আত্মার চেয়েও বেশী ভালবাসি। তোমার জন্য আমি তপস্যা ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি, নিজের ব্রত ভঙ্গ ক'রে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যে সব কথা উচ্চারণ করছি তা কোন তপস্বীর পক্ষে গৌরবের নয়। আমার যা দেখা উচিত নয় তাই দেখেছি, যা শোনা উচিত নয় তা শুনেছি। সত্যিই আমার আত্মাকে বিচলিত করেছ তুমি। মনে হচ্ছে হৃদয়-দুয়ার সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে, উন্মুক্ত হৃদয়দ্বার দিয়ে নির্ধারিত ধারায় মনের ভাবধারা বেরিয়ে পড়ছে, ঠিক যেন ঝরণাধারার মতো। মনে হচ্ছে সে ঝরণাধারায় বন্য কপোত-কপোতীরা বুঝি তৃষ্ণার জল পাবে। হিমালয়ের অরণ্য অতিক্রম ক'রে পায়ে হেঁটে তোমার জন্য আমি এসেছি। দিবারাত্রি হেঁটেছি—অসীম কষ্ট সহ্য ক'রে হেঁটেছি। পথে কঙ্কর

কর্দম বৃশ্চিক কণ্টক সর্প কি না ছিল! কিন্তু আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনি। অন্তরে প্রেম না থাকলে এ অসাধ্য-সাধন আমি করতে পারতাম না। সত্যিই আমি তোমাকে ভালবেসেছি নিরঞ্জনা। কিন্তু আমার কথা শুনে একটা ভুল তুমি ক'রো না। কামের তাড়নায় যারা তোমার কাছে ক্ষিপ্ত কুকুর বা মত্ত ষণ্ডের মতো ছুটে আসে, আমাকে তাদের দলে ফেলো না। সিংহ হরিণকে যে কারণে ভালবাসে, তারাও ঠিক সেই কারণেই তোমাকে ভালবাসে। তাদের কামক্লিন্ন প্রেম তোমার আত্মাকে গ্রাস করছে প্রত্যহ। আমি যে প্রেম নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তাতে কামগন্ধ নেই—তা পবিত্র, তা আধ্যাত্মিক, মহেশ্বরের বিরাট সত্তার একটা অংশরূপে তোমাকে আমি ভালবেসেছি, এ ভালবাসার নামই স্বর্গীয় প্রেম, এর তুলনা নেই। এ প্রেম একটি মধু-রজনীতেই শেষ হয়ে যাবে না, এ প্রেম সত্যশিবসুন্দরের নিত্য উৎসবের অঙ্গ হয়ে থাকবে। এ প্রেম অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।"

নিরঞ্জনার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল সাবর্ণির বক্তৃতা তাহার মনে রেখাপাত পর্যন্ত করে নাই। হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে দেখাও কোথায় তোমার সেই প্রেম। বিলম্ব ক'রো না। আর বক্তৃতা দিও না। বক্তৃতা আমাকে ক্লান্ত করে, বক্তৃতা আমি মোটেই ভালবাসি না। যে অদ্ভুত স্বর্গীয় প্রেমের কথা বললে কোথায় তা? আমার কি মনে হয় জান, স্বর্গীয় প্রেম নেই। তুমি অনেক বক্তৃতা করলে বটে। কিন্তু সে প্রেম তুমি আমাকে দিতে পারবে না, আর পাঁচজনের মতো তুমিও অলীক স্বপ্নের জাল বুনছ খালি। স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলা সহজ, কিন্তু তা দেওয়া সহজ নয়। স্বীকার করছি তুমি কল্পনাকুশল কবি একজন। কল্পনার জোরে তুমি যে নিষ্কাম প্রেমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছ, বাস্তবে তা নেই—তা অসম্ভব, অজ্ঞাত। প্রেমের রহস্য জানতে আর কারো বাকী নেই। পৃথিবীতে চুম্বনের আদান-প্রদান অনাদিকাল থেকে চলছে তো। তোমার চেহারা দেখে বোধ হয় তুমি কোনও যাদুকর। প্রণয়ী হলে প্রেমের রহস্য অবিদিত থাকত না তোমার—তা নিয়ে এত বক্তৃতাও করতে না তুমি।"

"নিরঞ্জনা, ব্যঙ্গ ক'রো না। বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই সেই অজ্ঞাত প্রণয়ের পসরা তোমার কাছে বয়ে এনেছি।"

"তোমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে বন্ধু। কোনরকম প্রণয়ই আর অজ্ঞাত নেই আমার কাছে।"

"তুমি জান না নিরঞ্জনা।"

"সব জানি। কিছুই আমার অজানা নয়।"

"আমি যে প্রণয় তোমার কাছে আজ নিবেদন করতে এসেছি, তা সত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তুমি এতদিন প্রেম ব'লে যা জেনেছ তা প্রেম নয়—কাম। তোমার সমস্ত জীবনই কামকলঙ্কিত।"

নিরঞ্জনার চোখে একটা আগুনের ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

প্রদীপ্তনয়নে সে বলিল, "বন্ধু, যার আতিথ্য গ্রহণ করতে আজ তুমি এসেছ, তার সামনে এ কথা ব'লে তুমি শালীনতার পরিচয় দাওনি। হয়তো সাহসের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু তা দুঃসাহস। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে কি কলঙ্কিনী ব'লে মনে হয়! আমি তো আমার এ জীবনের জন্য একটুও লজ্জিত নই, আমার মতো এ জীবন যারা যাপন করে তাদের জন্যও নই। সকলে হয়তো আমার মতো ধনী বা রূপসী নয়, কিন্তু তবু তাদের কলঙ্কিনী মনে করবার কল্পনাও করি না আমি! লজ্জা কেন হবে বল? আমি অন্যায় তো কিছু করিনি। আমি আমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আজ পর্যন্ত কি পরিবেশন করেছি জান? আনন্দ। সেই জন্যেই আমি আজ বিখ্যাত। আজ পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী ব'লে যাঁদের নাম আছে তাঁদের চেয়েও বেশী ক্ষমতা আছে আমার, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পদানত হয়েছেন, আমার করুণাকণা পাবার জন্যে আমার পায়ে ধ'রে সেধেছেন। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমার এই ছোট পা দুটির দিকেও। এই পা দুটি চুম্বন করবার জন্যে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক হৃদয়-শোণিত বিসর্জন করতে প্রস্তুত। আমি হয়তো মহৎ নই, ইতিহাসের পাতাতেও আমার নাম থাকবে না, তবু আমি যা হতে পেরেছি তার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি, লজ্জা নয়। যে সব মহাত্মা ধর্মের উচ্চ-শিখরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাদের দৃষ্টিতে হয়তো আমি বালুকণার মতোই তুচ্ছ। কিন্তু এই অতি তুচ্ছ বালুকণাকে কেন্দ্র ক'রে কি আলোড়নই না চলছে, তা আশা করি, তোমার অবিদিত নেই। যে আনন্দ আমি পরিবেশন করছি তার কণামাত্র লাভ করবার উন্মাদনায় কত সুখ, কত হতাশা, কত ঘৃণা, কত প্রেম যে উথলে উঠছে চারিদিকে—কত হত্যা, কত শিল্প, কত পাপ, কত পুণ্য যে লীলায়িত হচ্ছে অহরহ, তার তুলনা স্বর্গে-নরকে কোথাও আছে কি? আমার মহিমায় দিগ্‌দিগন্ত সমুজ্জ্বল, আমাকে কলঙ্কিনী বলা কি শোভা পায় বন্ধু?"

সার্বণি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

"অনেক সময় মানুষের চক্ষে যা মহিমময়, ঈশ্বরের বিচারে তাই কলঙ্কলিপ্ত। নিরঞ্জনা, তুমি আর আমি এক জগতের লোক নই। দুজনে দুই বিভিন্ন জগতে মানুষ হয়েছি, এত বিভিন্ন যে আমাদের চিন্তার মিল নেই, পরস্পরের ভাষাও

আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভগবান ধূর্জটি সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি তোমার সঙ্গে আমি একমত হবই, যতক্ষণ না আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হয় ততক্ষণ তোমার সঙ্গ আমি ছাড়ব না। এ কাজ খুবই শক্ত তা আমি জানি, কিন্তু আমি নিরস্ত হব না। যদিও এখনও পর্যন্ত আমি জানি না কোন্ বহ্নিতে তোমাকে গলিয়ে নিজের আদর্শের ছাঁচে তোমাকে ঢালব। কিন্তু তবু আমি থামব না, প্রাণপণে চেষ্টা করব। তুমি অনবদ্যা, তোমাকে মহনীয়া করতে চাই। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেয়ে সম্পূর্ণ নূতন ক'রে সম্পূর্ণ নূতনরূপে রূপায়িত ক'রে চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চাই। যদি আমি সফলকাম হই, নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। তুমিও স্বীকার করবে যে, সত্যিই তোমার নবজন্ম হ'ল। মন্দাকিনীর অমৃতধারা প্রবাহিত হবে তোমাকে ঘিরে, সে ধারায় স্নান ক'রে অপাপবিদ্ধা কুমারীর পবিত্র সৌন্দর্য লাভ করবে তুমি আবার। আহা, কোনও শক্তিবলে আমি নিজেই যদি এই মুহূর্তে মন্দাকিনীতে রূপান্তরিত হতে পারতাম, তা হ'লে এখনই তোমাকে আমি ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম অনন্তের দিকে।"

নিরঞ্জনার ক্রোধ প্রশমিত হইল।

সে নিজের সংস্কার অনুযায়ী ভাবিল, 'লোকটি যখন অনন্তের কথা বললে, নব-জন্মের কথা বলছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও মাদুলীটাদুলী আছে ওর কাছে। সম্ভবত কোন তান্ত্রিক। জরামৃত্যুকে জয় করবার মন্ত্র জানে। ওকে চটাব না, প্রত্যাখ্যান করব না। দেখাই যাক না কি হয়!'

সে ভয়ের ভান করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গেল এবং ঘরের শেষ-প্রান্তে গিয়া বিছানায় উপবেশন করিয়া বুকের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে আনত-নয়নে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মসৃণ কপোলের উপর দীর্ঘ নয়নপল্লবের কোমল সূক্ষ্ম ছায়া, তাহার ত্রস্ত লজ্জিত দেহভঙ্গিমা, তাহার দোদুল্যমান চরণ-কমল দুটি অপরূপ করিয়া তুলিল তাহাকে। মনে হইল, কোন কুমার বুঝি স্বপ্নের ঘোরে সহসা আত্ম-আবিষ্কার করিয়াছে।

মহর্ষি সাবর্ণি নির্নিমেষে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি বুঝি আর দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গেল, মস্তিষ্কের মধ্যে তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হইল। পর-মুহূর্তেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। তাঁহার দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনে হইল দৃষ্টির সম্মুখে যেন সাদা মেঘ নামিতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাদেবই বুঝি নিরঞ্জনাকে তাঁহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া দিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। মনে হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মনে হচ্ছে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে তোমার আপত্তি নেই। এও হয়তো তুমি ভাবছ, তোমার এ আত্মসমর্পণ কেউ দেখতে পাবে না। তোমার এ শিলা-নিবাস নির্জন। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি কি লুকোতে পারবে?"

নিরঞ্জনা মাথা নাড়িল।

"ঈশ্বর! শিলা-নিবাসের উপর পাহারা দেবার জন্য কে তাঁকে সাধতে গেছে? আমার মতো সামান্য নটীর জন্য তিনি মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? যদিই বা ঘামান, যদি আমার আচরণ তাঁর মনঃপূত না হয়, আমার ব'য়ে গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের আচরণ তাঁর মনঃপূত হবেই বা না কেন? তিনিই তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের মধ্যে যদি কিছু মন্দ থাকে তা তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর অন্তর আমাদের কামনা বাসনা দেখে রাগ করা উচিত নয়, আশ্চর্য হওয়াও উচিত নয়। সবই তো তাঁর দেওয়া। বড় বড় ধার্মিকরা তাঁর সম্বন্ধে যা বলেন তা অত্যন্ত অসঙ্গত ব'লে মনে হয় আমার। খুব সম্ভবত ওসব মনগড়া কথা তাঁদের। ঈশ্বরকে কে জেনেছে বল? তুমি তাঁর কথা বলছ কোন্ অধিকারে? ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি আছে তোমার?"

ইহা শুনিয়া সাবর্ণি ধার-করা মূল্যবান পরিচ্ছদটি ঈষৎ উন্মোচন করিয়া নিরঞ্জনাকে নিজের গৈরিক উত্তরীয়টি দেখাইলেন।

"আমি হিমাচল অরণ্যের তপস্বী মহর্ষি সাবর্ণি। সেখান থেকেই আমি এসেছি। পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার থেকে আমি এতকাল দূরে স'রে অরণ্যের গহনে শিবের ধ্যানে কালাতিপাত করেছি। মানবসমাজে এতদিন আমার অস্তিত্বই ছিল না। সহসা একদিন, কেন জানি না, তোমার মূর্তি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমি অনুভব করলাম, পাপের কবলে প'ড়ে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছ, মহামৃত্যু তোমাকে গ্রাস করছে। তাই তোমার কাছে আমি এসেছি, তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। নিরঞ্জনা, তুমি জাগো, ওঠো, আত্মস্থ হও।"

মহর্ষি সাবর্ণির নাম নিরঞ্জনা শুনিয়াছিল। তাঁহার কথা, তাঁহার চেহারা, তাঁহার গৈরিক বসন দেখিয়া সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তপস্বীরা যে কত শক্তিশালী তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। তাঁহারা রুষ্ট হইলে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও লোকের সর্বনাশ করিয়া দিতে পারেন—এ অন্ধ বিশ্বাস তাহার ছিল। দুর্বাসা ও শকুন্তলার কাহিনী সে নিতান্ত অলীক কাহিনীমাত্র মনে করিত না।

সে শশব্যস্ত হইয়া আলুলায়িত কুন্তলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করজোড়ে মহর্ষি সাবর্ণির সম্মুখে সাশ্রুনয়নে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বলিল, "যদি দোষ ক'রে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে কেন আপনি এসেছেন, কি আপনি চান, তা জানি না। না জেনে হয়তো অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জামি হিমালয়বাসী তপস্বীরা আমাদের মতো রূপজীবাদের ঘৃণা করেন। প্রায়ই আমাদের অভিশাপ দেন। আপনিও হয়তো আমাকে অভিশাপ দিতেই এসেছেন। কি আমার দোষ তা আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। আপনার তপোবলে আমার বিশ্বাস আছে, আপনাদের আমি ভক্তি করি। আমার উপর রাগ করবেন না, আমাকে ঘৃণাও করবেন না—এইটুকু শুধু আমার অনুরোধ। অনেকে আপনাদের নিয়ে উপহাস করে, বিশ্বাস করুন, আমি কখনও তা করিনি। আপনাদের স্বেচ্ছাকৃত দৈন্যকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি। আশা করি আমার এ ঐশ্বর্যকে আপনিও হীনচক্ষে দেখবেন না। আমি দেহ-চর্চা করেছি, হয়তো কিছু রূপও আমার আছে, নৃত্য-গীত-অভিনয়ই আমার বেশী—কিন্তু এসবের জন্য আমি তো দায়ী নই। আমার রূপ, আমার ভাগ্য, আমার প্রকৃতি—কিছুই আমি সৃষ্টি করি নি। আমি ভগবানের সৃষ্টি, তিনি আমাকে যেমন করেছেন আমি তেমনি হয়েছি। পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্যেই তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অন্য রকম হওয়ার আমার উপায় নেই। আপনি এখনি বললেন যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। তাই আশা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আবার তাই অনুরোধ করছি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলবেন না। আমার ভয় করছে, আমাকে রক্ষা করুন আপনি।"

নিরঞ্জনা মহর্ষি সাবর্ণির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

মহর্ষি সাবর্ণি তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বলিলেন, "ওঠ, ওঠ, কোন ভয় নেই তোমার। তোমাকে আমি ঘৃণাও করি না, অভিশাপ দিতেও আসিনি। আমি তাঁরই নির্দেশে তোমার কাছে এসেছি, যিনি মদনকে ভস্মীভূত ক'রেও পার্বতীর মনস্কাম পূর্ণ করেছিলেন। তোমাকে আমি ঘৃণা করব কেমন ক'রে ? আমি নিজেও তো নিষ্পাপ নই। ভগবান শঙ্কর যে শক্তি আমাকে দিয়েছেন তার অনেক অপব্যবহার আমি করেছি। বিশ্বাস কর, আমি ক্রোধবশে তোমার কাছে আসিনি, এসেছি অনুকম্পাভরে। সত্যই তোমাকে আমি ভালবাসি। হৃদয়ের আবেগই আমাকে তোমার দ্বারে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে হৃদয়াবেগের উৎস পরার্থপরতা, অন্য কিছু নয়। তোমার দৃষ্টি

কামনা-কলুষে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা না হলে তুমি আমার এই হৃদয়াবেগে সেই পবিত্র বহ্নি প্রত্যক্ষ করতে, যা দেবাদিদেবের প্রসন্ন নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়, যার স্নিগ্ধ স্পর্শ জ্বালাহীন, যা কাউকে দগ্ধ ক'রে অঙ্গার বা ভস্মে পরিণত করে না, যা পবিত্র ক'রে, কৃতার্থ ক'রে, আলোকিত ক'রে, যার স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়।

নিরঞ্জনা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে আর সার্বণিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিল না।

"আপনার কথায় নিশ্চিন্ত হলাম, আমার ভারি ভয় হয়েছিল। হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীদের কথা আগে আমি অনেকব্যর শুনেছি। মহর্ষি কারণ্ডব আর তাঁর দুই শিষ্য হংসপক্ষ আর কঙ্কধীমান তো বিখ্যাত তপস্বী, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প আমি শুনেছি। আপনার নামও আমার কাছে অজ্ঞাত নয়, আপনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তপস্যার জোরে সাধনায় অনেক অগ্রসর হয়েছেন—এসব আগেও জানতাম। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আপনার মতো লোক আমার কাছে আসবেন। আপনাকে দেখেই কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে, আপনি সাধারণ লোক নন। আচ্ছা, একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। বলব কথাটা?"

"বল।"

"বৌদ্ধ ক্ষপণকরা, শ্মশানচারী তান্ত্রিকেরা, বৈদান্তিক বা সাংখ্য পণ্ডিতেরা, ম্লেচ্ছ বা যবন যাদুকরেরা যে আশ্বাস আমাকে দিতে পারেন নি, আপনি কি তা পারবেন? আপনি আমাকে ভালবাসেন বলছেন। আমাকে জরা-মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারবেন?"

"নিরঞ্জনা, যারা সত্যই বাঁচতে চায় তারা বাঁচে, মৃত্যু তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। একটি কথা শুধু শোন। যে সব কুৎসিত ভোগবিলাস মানুষকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায় তা পরিত্যাগ কর। তোমার যে অনুপম দেহ, অনবদ্য রূপরাশি স্বয়ং শঙ্কর সৃষ্টি করেছেন, লোলুপ রাক্ষসদের হাতে তা তুলে দিও না। আমি বুঝতে পারছি, তোমার এসব ভাল লাগছে না। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমার সঙ্গে এসে নির্জনতার ক্রোড়ে বিশ্রাম নাও কিছুদিন। হিমালয়ের শান্তিতে অবগাহন কর কিছুকাল। যা পাওয়ার জন্য তুমি উৎসুক নিজেই এসে আবিষ্কার কর সেটা। তুমি চাইছ আনন্দ, যে আনন্দ অমলিন, যা কখনও শেষ হবে না, কখনও নিষ্প্রভ হবে না। সে আনন্দ কি ক'রে পাওয়া যায় জান? দারিদ্র্য বরণ ক'রে, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, সমাধিস্থ হয়ে, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে

বিলীন ক'রে দিয়ে। আজ তোমার আচরণ হয়তো তোমাকে এই সত্য এই আনন্দ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কালই আবার তুমি সেই সত্য আনন্দের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারবে। যা সন্ধান করছ তাই পাবে। নিজেই তুমি বলবে, প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পেলাম।"

নিরঞ্জনা কিন্তু অনেক দূরের কথা ভাবিতেছিল।

"আচ্ছা, আর একটা কথা বলুন তো। আমি যদি আমার বিলাস ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করি, তা হ'লে স্বর্গে আমার যে নবজন্ম লাভ হবে তাতে আমার এই দেহ, এই রূপ বজায় থাকবে কি?"

"নিরঞ্জনা, আমি তোমার কাছে অনন্ত জীবনের বার্তা এনেছি। আমি যা বলছি তা সত্য।"

"আচ্ছা, এসবের কি প্রমাণ আছে কোনও? আপনি যা বলছেন তা সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি ধরুন আমি প্রমাণ চাই।"

"প্রমাণ স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, প্রমাণ আমাদের শৈবশাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস, প্রমাণ আমাদের জীবন। এই পথে যদি চল, তুমি নিজেই অজস্র প্রমাণ পাবে। আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না।"

"মহর্ষি, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। সত্যিই আমি জীবনে কোনও সুখ পাইনি। রাণীর চেয়েও ভাল ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু সারাজীবন পেয়েছি লাঞ্ছনা আর কষ্ট। সত্যই আমি পরিশ্রান্ত। অনেকে আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রে, কিন্তু আমি ঈর্ষা ক'রি সেই স্থবিরা দন্তহীনা বৃদ্ধাকে, ছেলেবেলায় যাকে আমি নগরতোরণের পাশে ব'সে মিষ্টান্ন বিক্রি করতে দেখতাম। অনেকবার আমার মনে হয়েছে যে, দরিদ্ররাই ভাল লোক, তারাই সুখী, ভগবানের আশীর্বাদ তারাই পেয়েছে, সান্ত্বনাও পেয়েছে। ঠিকই বলেছেন আপনি, দীনতার মধ্যেই মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আপনি আমার মনের অন্ধকার দূর করেছেন, মনের অতলে যে সত্য ঘুমিয়ে ছিল, মনে হচ্ছে, যেন তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। জেগে উঠেছে সে। কিন্তু তবু মনে প্রশ্ন জাগছে, কি বিশ্বাস করব, কাকে বিশ্বাস করব, কি আমার ভবিষ্যৎ, জীবনের অর্থই বা কি?"

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সাবর্ণির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। একটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেন তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "শোন, নিরঞ্জনা, আমি তোমার কাছে একা আসিনি। আর একজন এসেছেন আমার সঙ্গে। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, কারণ তোমার চোখের দৃষ্টি এখনও স্বচ্ছ হয়নি,

এখনও তোমার দৃষ্টির সামনে আবরণ রয়েছে, তাঁকে দেখবার যোগ্যতা এখনও লাভ করনি তুমি। কিন্তু শীঘ্রই লাভ করবে, দেখবে সে মূর্তি কি মনোহর! তখন নিজেই তুমি বলবে, এমনটি আর কখনও দেখিনি। ইনিই প্রেমের দেবতা। একটু আগে তিনি যদি হাত বাড়িয়ে তোমাকে আমার দৃষ্টি থেকে ক্ষণিকের অবলুপ্ত ক'রে না দিতেন, তা হ'লে হয়তো তোমার রূপে অকৃষ্ট হয়ে আমি পাপেই লিপ্ত হতাম, কারণ আমি এখনও দুর্বল। কিন্তু তিনি আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছেন। তিনি মঙ্গলময়, তিনি শক্তিমান, তিনি ত্রাণকর্তা, তিনিই রুদ্র, আবার তিনিই আশুতোষ। তাঁর এ পলকপাতে প্রলয় ঘটতে পারে; কিন্তু তিনি পরম কারুণিক, সামান্য বিল্বপত্রেই সন্তুষ্ট। স্বয়ং কুবের তাঁর ধনরক্ষক, কিন্তু তবু তিনি অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী, তবু তিনি দিগম্বর উদাসীন। তিনি মদনকেও ভস্ম করেন, আবার কুমার কার্তিকেয়কেও সম্ভব করেন উমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে। তিনি মহেশ্বর অথচ শ্মশানচারী। তিনি স্থাণু আবার তিনিই নটরাজ। তিনিই আজ আমার সঙ্গে এসেছেন তোমার দ্বারে। ··প্রভু, তুমি কি আসনি? তোমার চোখে যে আমি জল দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জন্য কাঁদছ তুমি? তোমার অশ্রুধারাই পরিশুদ্ধ করবে নিরঞ্জনাকে। তোমার ঠোঁট দুটি যেন নড়ছে। কি বলবে তুমি, বল। বল, আমি শুনছি।···নিরঞ্জনা, শোন শোন, এ আমার কথা নয়, তাঁর কথা। তোমাকে উদ্দেশ ক'রেই বলছেন—আমি যে তোমাকেই খুঁজছি, পথ হারিয়ে কোথায় তুমি চ'লে গেছ! এতদিন পরে। পেয়েছি তোমাকে। আমার কাছ থেকে আর সরে যেও না। কোনও ভয় নেই তোমার। হাত ধর, আমার সঙ্গে চল, যদি চলতে না পার আমিই তোমাকে বহন করব। এস নিরঞ্জনা, আমার প্রিয় শিষ্যা, আমার কাছে এস। আমার সঙ্গে কাঁদ, সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব তাপ শীতল হবে।"

মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিরঞ্জনা দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অপূর্ব প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন স্বয়ং শিবকেই প্রত্যক্ষ করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, তাহার অর্ধ-বিস্মৃত বাল্যজীবন যেন তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল কিঙ্করকে। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "পরম শৈব কিঙ্করকে মনে পড়েছে আমার। মনে পড়েছে গুরু গোরক্ষনাথকে। যে সময় আমার দীক্ষা হয়েছিল সেই সময়ই যদি আমার মরণ হ'ত, তা হ'লেই ভাল হ'ত বোধ হয়। এ ভোগ আমাকে ভুগতে হ'ত না।"

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সাবর্ণি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাহার দিকে খানিকটা আগাইয়া গেলেন।

"তোমার দীক্ষা হয়েছিল! গোরক্ষনাথ তোমার গুরু! জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর, জয় দেবাদিদেব উমানাথ! কিসের টানে আমাকে যে তোমার কাছে টেনে এনেছে তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখে কেন যে এত ভাল লাগছে—এ রহস্যের গূঢ় মর্মও আর আমার অবিদিত নেই। তোমার সঙ্গে অদৃশ্য মন্ত্রের ডোরে আমি বাঁধা আছি ব'লেই তোমার সন্ধানে তপোবন ত্যাগ ক'রে এই কলুষিত নগরে আমাকে আসতে হয়েছে। এস ভগ্নি, এস, তোমাকে চুম্বন করি।"

সাবর্ণি নিরঞ্জনার ললাট চুম্বন করিলেন। তাহার পর তিনি নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং শিবই এবার নিরঞ্জনার অন্তরে নিগূঢ় ভাষায় কথা বলিবেন, তাঁহার বক্তব্য আর কিছু নাই। নিরঞ্জনাও নত নেত্রে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। শিলা-নিবাসে সহসা এক নিবিড় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। নদীর মৃদু কলধ্বনি আর নিরঞ্জনার ক্রন্দনরব ছাড়া আর কোন শব্দই নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিল না। মহর্ষি সাবর্ণিও যেন কতকটা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নিরঞ্জনার প্রবাহমান অশ্রুধারা দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিঙ্কর এবং গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি তাহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণাঙ্গিনী ক্রীতদাসীরা প্রবেশ করাতে সে কতকটা আত্মস্থ হইল। ক্রীতদাসীরা পুষ্পমাল্য গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া সম্বিত ফিরিয়া পাইল নিরঞ্জনা। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হইল। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেঁদে আর লাভ কি! যা হবার তা তো হয়েছে, হবেও। আপাতত যা কর্তব্য তাই করি। আজ রাত্রে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রাত্রে খেতে হবে আমাকে জীমূতবাহনের বাড়িতে। আরও দু-একটি সুন্দরী মেয়ের আসবার কথা আছে সেখানে। সুতরাং সাজতে হবে আমাকে একটু। তাদের কাছে একটু সেজে না গেলেও মান থাকে না। এরা আমাকে সাজাতে এসেছে। মহর্ষি, আপনি একটু আড়ালে বসবেন গিয়ে?"

"এরা কে?"

"এরা প্রসাধনকুশলা ক্রীতদাসী অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে এদের কিনেছি। বিশেষ ক'রে সোনার আংটি-পরা কুন্দদন্তা এই মেয়েটি এ বিষয়ে পারঙ্গমা। একজন শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে অনেক টাকা দিয়ে একে কিনেছি।"

মহর্ষি সাবর্ণি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে নিমন্ত্রণে যাইতে দিবেন না, বাধা দিবেন—যথাসাধ্য দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই

মনে হইল, হঠকারিতা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহাতে হয়তো উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।

"জীমূতবাহন লোকটি কে ? আর কে কে থাকবে সেখানে ?"

'জীমূতবাহন নৌবিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি তো থাকবেনই, তা ছাড়া থাকবেন সিন্ধুপতি। আরও জনকয়েক দার্শনিক পণ্ডিতের আসবার কথা আছে। কবি চিন্ময়ও থাকবেন শুনেছি। নৌবিহারের মহাস্থবিরও আসবেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ধনী যুবকও আসবেন দু-একজন। তা ছাড়া আসবেন তরুণীরা, রূপ এবং যৌবনই যাদের একমাত্র পরিচয়।"

মহর্ষি সার্বর্ণি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, যাও, আপত্তি করব না। কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি কোনও কথা বলব না, চুপ ক'রে তোমার পাশে ব'সে থাকব কেবল।"

নিরঞ্জনা হাসিয়া উঠিল।

"আপনি যাবেন ? বেশ, চলুন। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সন্ন্যাসীকে আমার প্রণয়ীরূপে দেখলে তারা ভাববে কি ?"

ক্রীতদাসীরা তাহাকে সাজাইতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মহর্ষি সার্বর্ণির সহিত জীমূতবাহনের গৃহে উপস্থিত হইয়া নিরঞ্জনা দেখিল, অন্যান্য অতিথিগণও আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলের মহার্ঘ কৌচগুলির উপর নানাভাবে অঙ্গবিস্তার করিয়া সকলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। টেবিলের উপর অনেকগুলি রৌপ্য থালি সুসজ্জিত রহিয়াছে, টেবিলের মধ্যস্থলে রহিয়াছে চারিটি অপ্সরীবাহিত একটি রৌপ্যভাণ্ড। ভাণ্ডের ভিতরে রহিয়াছে সুসিদ্ধ স্বাদু মৎস্যকে স্বাদুতর করিবার চাটনি।

নিরঞ্জনাকে দেখিয়া অতিথিবর্গ পুলকিত হইলেন এবং নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন।

"স্বাগত সৌন্দর্য-লক্ষ্মি !"

"স্বাগত সঙ্গীত-সরস্বতি !"

"বন্দে দেবমানবরঙ্গিণি !"

"নমস্তে চির আকাঙ্ক্ষিতে !"

"স্বাগত দুঃখদায়িনি, দুঃখতারিণি চ !"

"স্বাগত নির্মল-মুক্তে !"

"বন্দে পাটলিপুত্র-কমল-কিন্নরি !"

এই ধরনের সংস্কৃতবহুল হাস্যকর অভিনন্দনে নিরঞ্জনা ঈষৎ বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অভিনন্দন-বর্ষণ সমাপ্ত হইলে জীমূতবাহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "জীমূত, আমি একজন তপস্বীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। মহর্ষি সার্বর্ণি—হিমালয়বাসী পরম শৈব। এঁর সাধনা উজ্জ্বলা, এঁর বাণী অগ্নিগর্ভা।"

জীমূতবাহন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সার্বর্ণিকে অভ্যর্থনা করিলেন : "স্বাগত। শৈবধর্ম এখন সম্মানিত। শৈবধর্মকে ব্যক্তিগতভাবে আমিও শ্রদ্ধা করি, যদিও নিজে আমি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ব'লেই এ বিশ্বাস আমার আছে যে, ভগবান তথাগতের সদ্ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তা সর্বপ্রকার সত্য ধর্মকে সানন্দে সম্মান দেখাতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক দেবতার মধ্যে, ধর্মের মধ্যে কিছু সত্যের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু ওসব কথা থাক্ এখন। আপনি আসাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি—এইটেই এখন সব চেয়ে বড় কথা। পানাহার ক'রে আনন্দ লাভ ক'রে আমাকে ধন্য করুন—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আসুন, এবার আমরা আরম্ভ করি। সময় তো আর বেশী নেই।"

জীমূতবাহন আন্তরিকতার সহিতই কথাগুলি বলিলেন। কিছু পূর্বেই তিনি নব উদ্ভাবিত নূতন ধরনের একটি রণতরীর সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক একটি বিরাট গ্রন্থের চতুর্থ পর্বও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনটা বেশ খুশী ছিল। মহর্ষি সার্বর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন, "মহর্ষি, আমাদের সংসর্গ আশা করি আপনার খুব খারাপ লাগবে না। এখানে অনেকগুলি সজ্জন সমবেত হয়েছেন আজ। আলাপ করলে হয়তো আনন্দ পাবেন। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার বিহারের মহাস্থবির হর্ষগম্ভীর। এঁরা তিনজন দার্শনিক—ইনি সিন্ধুপতি, ইনি শিখিকণ্ঠ আর ইনি নভোনীল। আর ইনি হচ্ছেন কবি চিন্ময়। আর এ দুজন হচ্ছেন আমার বন্ধুপুত্র চারুদত্ত আর শুভদত্ত—এঁরা অশ্বব্যবসায়ী। আর ওঁদের কাছে ব'সে আছে রোহিণী আর রেবতী। ওদের পরিচয় আমি আর কি দেব! ওদের পরিচয় ওদের সর্বাঙ্গেই লেখা রয়েছে, চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

সিন্ধুপতি আগাইয়া আসিয়া সার্বর্ণিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কানে কানে বলিলেন, "ফাঁদে পা দিয়েছ দেখছি। তোমাকে আগেই সাবধান

করেছিলাম, আবার করছি, রতিকে ঘাঁটিও না। তার পাল্লায় প'ড়ে তোমাকে কোথায় আসতে হয়েছে দেখ। তুমি ধার্মিক লোক, গহন অরণ্যের পর্ণকুটিরে তুমি অভ্যস্ত, কোথায় এনে ফেলেছে তোমায় বুঝতে পারছ? সাবধান ভাই, দেবতার উপর তোমার ভক্তি আছে, কিন্তু এর উপর টান হ'লে একেই সবার ওপরে স্থান দিতে হবে এবার। সর্বধর্মের সর্ব দেবতার জননী ব'লে নতি-স্বীকার করতে হবে ওর কাছে। তা না করলে তোমার নিস্তার নেই। রতিদেবী সোজা দেবী নন। পণ্ডিত জনার্দনের মতো গণিতশাস্ত্র বিশারদ কি বলেছিলেন জান? রতির কৃপা না হ'লে আমি ত্রিভুজের মর্ম বুঝতে পারতাম না।"

মহর্ষি সাবর্ণি সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না।

শিখিকণ্ঠ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবর্ণির দিকে চাহিয়া ছিলেন। মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সহর্ষে তিনি করতালি দিয়া উঠিলেন।

"হয়েছে, হয়েছে। ইনি অভিনয় দেখছিলেন। ওঁর চেহারা, ওঁর দাঁড়ি, ওঁর পোশাক তখনই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। নিরঞ্জনা যখন দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল তখনই খুব মেতে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করছিলেন।"

"শৈব মহর্ষি? প্রণম্য ব্যক্তি তা হ'লে। সাবধানে আলাপ করতে হবে, ক্ষেপে গেলে শাপশাপান্ত ক'রে বসবেন হয়তো, চেহারা তো দুর্বাসার মতো, অন্তরে শঙ্করাচার্য আছেন সম্ভবত।"

রোহিণী ও রেবতী চক্ষু দিয়া নিরঞ্জনাকে যেন গ্রাস করিতেছিল। নিরঞ্জনার স্বর্ণাভ চিকুরে দুলিতেছিল নীলাভ অপরাজিতার একটি মালা। মালার প্রতি অপরাজিতাটিকে নীল নয়ন বলিয়া ভুল হইতেছিল, আবার কখনও মনে হইতেছিল তাহার নয়ন দুটিই বুঝি অপরাজিতা ফুল। নিরঞ্জনার রূপের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য, সে রূপের স্পর্শে নির্জীব অলঙ্কারও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। তাহার রূপালি-জরি-বসানো শাড়িটিও একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতিটি পাটে পাটে ভাঁজে ভাঁজে যেন বৈরাগ্যের সুর নীরবে বাজিতেছিল। তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িত, যদি তাহার কণ্ঠে স্বর্ণহার বা প্রকোষ্ঠে স্বর্ণকঙ্কণ থাকিত। কিন্তু সে সব ছিল না। বস্তুত সে সবের প্রয়োজনও ছিল না। নিরাভরণ কণ্ঠ ও বাহুর কমনীয়তাই তাহাকে অনন্যা করিয়া তুলিয়াছিল। রোহিণী ও রেবতী নিরঞ্জনার প্রসাধনরুচি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে কথা তাহাকে বলিল না, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

রোহিণী বলিল, "সত্যি, কি অপরূপ সুন্দরী আপনি! আপনি প্রথমে যখন পাটলিপুত্রে এসেছিলেন তখন কি এর চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলেন? এর চেয়ে বেশী রূপ কি হতে পারে কারও! আমি তখন শিশু, আমার মা আপনাকে তখন দেখেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, আপনি তখন নাকি অতুলনীয়া ছিলেন।"

রেবতী মুচকি হাসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নূতন প্রণয়ীটি কে? কোথায় পেলেন এঁকে, অদ্ভুত চেহারা! হঠাৎ মনে হয় হাতীর মাহুত! কোন্ দেশের লোক ইনি? গুহাবাসী, না, পাতালবাসী?"

রোহিণী রেবতীর মুখে হাত দিয়া বলিল, "বোকার মতো কি যা-তা বলছিস! প্রেমের রহস্য কি সহজে বোঝা যায়? তবে আমি ও-রকম লোকের চুমু খেতে রাজী নই। মুখ তো নয়—যেন আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কিন্তু নিরঞ্জনা যেমন দেবীর মতো রূপসী, তেমনি দেবীর মতো করুণাময়ীও। কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। আমাদের সঙ্গে ওঁর ওইখানে তফাত। আমরা পছন্দসই লোক না হ'লে কাছে ঘেঁষতে দিই না।"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "ওঁর সম্বন্ধে সাবধানে কথা ব'লো। উনি যে-সে লোক নন। অসাধারণ শক্তিশালী যাদুকর উনি একজন। খুব আস্তে আস্তে বললেও উনি সব কথা শুনতে পান। এমন কি মনের কথাও অবিদিত থাকে না ওঁর কাছে। একটু অন্যমনস্ক হ'লে হয়তো হৃদয়টিই তোমার চুরি ক'রে নেবেন, আর তার জায়গায় রেখে দেবেন কঠিন পাথর একটা। কাল জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে মারা যাবে।"

ইহার পর জীমূতবাহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "বন্ধুগণ, এইবার আপনারা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করুন। ওহে, তোমরা এইবার মধু আর সুরা পাত্রে পাত্রে ঢালতে শুরু কর।"

ক্রীতদাসগণ পাত্রে পাত্রে সুরা ঢালিতে লাগিল।

জীমূতবাহন নিজের পাত্রটি তুলিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, অবলোকিতেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতক্ষণ একটি প্রাণীও বদ্ধ থাকবে ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করব না। যে জড়তায় আমরা আবদ্ধ, সুরা তা কথঞ্চিৎ নাশ করে। তাই সুরার এত আদর। বৈদিক ঋষিরা সুরাকে সোমরস নামে অর্চনা করতেন। আমরা মহাযানীরা কেবল নিজেরা নির্বাণ চাই না, আমরা চাই প্রত্যেকেই নির্বাণ লাভ করুক। সেই ঈপ্সিত আনন্দের যে পাথেয় প্রয়োজন, সুরাপানে আশা করি আমরা তা পাব। আসুন।"

মহর্ষি সাবর্ণি ব্যতীত আর সকলেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। বিলাস-

লালসা-ক্লিষ্ট সুরাপায়ী লোকগুলির সান্নিধ্য সার্বণি পছন্দ করিতেছিলেন না ; কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

সুরাপাত্রটি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া শিখিকণ্ঠ কহিলেন, "আমার পিতামহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়তো এই ধর্মের মর্ম বুঝতেন, আমার বাবাও আশা করি বুঝতেন, আমি কিন্তু কিছু বুঝি না। কোন ধর্মের মর্মই আমার মাথায় ঢোকে না। নির্বাণের প্রকৃত অর্থ কি তা আজও আমার বোধগম্য হ'ল না। অশ্বঘোষ এর যে অর্থ করেছিলেন তা যদি হয় অর্থাৎ নির্বাণ মানে যদি নিবে যাওয়া হয়, তা হ'লে সে নির্বাণ লাভ করবার আগ্রহ আমার নেই। আমি চিরকাল জ্বলতেই চাই। মনে হয় মহামাত্য জীমূতবাহনও তাই চান, না চাইলে তিনি রণতরী নির্মাণে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ করতেন না।"

জীমূতবাহন হাসিয়া উত্তর দিলেন, "শিখিকণ্ঠ, আমি জানি, সমাজ বিষয়ে তুমি উদাসীন, সামাজিক দায়িত্বের কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে। তোমার ধারণা, ধার্মিক হ'লেই বুঝি লোটাকম্বল নিয়ে সংসার ত্যাগ করতে হয়। আমি কিন্তু মনে করি, ধার্মিক হয়েও দেশসেবা করা সম্ভব। আর এও মনে করি যে, দেশসেবা করতে হ'লে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উচ্চকর্মচারী হিসাবে করতে পেলে অনেক সুবিধা হয়, অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়। ধর্মের মত রাষ্ট্রও মানবসভ্যতার একটা বড় সম্পদ। আর তারা পরস্পর-বিরোধীও নয়। রাষ্ট্রের সেবা করা আর ধর্মের সেবা করা অনেক সময় একই জিনিস। অদ্ভুত জিনিস এই রাষ্ট্র।"

দেখা গেল, চারুদত্ত বা শুভদত্ত নির্বাণ বিষয়ে তেমন কৌতূহলী নন। হর্ষগম্ভীরের উক্তির মাঝখানেই চারুদত্ত শুভদত্তকে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠী মিত্রশেখরের মন্দুরায় যে নতুন ঘোড়াটা এসেছে দেখেছ ? চমৎকার নয় ? ঘোটকী হ'লে তন্বী বলতাম। কি ছিপছিপে গড়ন, কি গ্রীবাভঙ্গী।"

শুভদত্ত মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "দেখেছি, কিন্তু তুমি যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছ, তেমন কিছু নয়। ক্ষুরগুলো দেখেছ ? ক্ষুরগুলো কত ছোট লক্ষ্য করেছ ? ও ঘোড়া বেশীদিন দৌড়তে পারবে না, কিছুদিনের মধ্যে খোঁড়া হয়ে পড়বে।"

ঘোড়ার আলোচনাতেও বাধা পড়িল। রেবতী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, আর একটু হ'লেই আমি মাছের কাঁটা গিলে ফেলেছিলাম একটা। কাঁটা তো নয়, কাটারি যেন একখানা। ভাগ্যে গিলে ফেলিনি ! এ কাঁটা পেটে ঢুকলে আর রক্ষে ছিল না। ঠাকুর আমাকে ভালবাসেন, তাই বাঁচিয়ে দিলেন।"

"ঠাকুর ভালবাসেন না কি তোমাকে ?" সিন্ধুপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,

"তা হ'লে ঠাকুরের মানুষের মতো দুর্বলতা আছে বলতে হবে। ভালবাসা মানেই দুঃখ পাওয়া। ঠাকুর-দেবতারাও দুঃখ ভোগ করেন নাকি আমাদের মতো? তা হ'লে তাঁরাও তো নিখুঁত নন, আমাদের মতন হতভাগ্য।"

রেবতী চটিয়া গেল।

"আপনি চুপ করুন তো, বোকার মতো যা-তা বলবেন না। অদ্ভুত আপনার স্বভাব, কোন জিনিসের সোজা মানে বুঝতে পারেন না, মনে হয় বুঝেও যেন বোঝেন না। ইচ্ছে ক'রে সোজা জিনিসকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেবার মানে কি! ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।"

রেবতী থামিতেই সিন্ধুপতি বলিলেন, "থেমো না রেবতী, তোমার যা খুশি ব'লে যাও, কিন্তু থেমো না। যতবার তুমি মুখ খুলছ ততবার তোমার দাঁতগুলি দেখতে পাচ্ছি আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার দাঁতের কাছে কুন্দফুল সত্যিই হার মেনেছে।"

এই সময়ে ধীরপদে একজন বৃদ্ধ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, বিলাস বা পারিপাট্যের কোন চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল গম্ভীর, গতিভঙ্গী যেন একটু উদ্ধত। তিনি অতিথিবর্গের নিকটবর্তী হইতেই জীমূতবাহন ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইলেন।

"আসুন, শীলভদ্র, আসুন। এইখানে বসুন আপনি। ইদানীং নূতন কোনও গ্রন্থে হাতে দিয়েছেন নাকি? আমার যতদূর স্মরণ হয় বিরানব্বইটা অমর গ্রন্থ আপনার অক্লান্ত লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আমরা আরও আশা করি। আশার তো শেষ নেই।"

শীলভদ্র নিজের দুগ্ধশুভ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "দোয়েল পাখী সারাজীবন গান গেয়ে যায়। ওইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক। নীতির মহিমাকীর্তন করাও আমার পক্ষে তেমনি। ও ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারি না, ওই আমার একমাত্র কাজ। সারাজীবন ওই ক'রে চলেছি।"

শিখিকণ্ঠ। মহর্ষি শীলভদ্র, আপনি আমাদের সকলের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের যে সব নীতিনিষ্ঠ গম্ভীরচরিত্র পূর্বপুরুষদের কাহিনী আমরা শুনি, আপনিই বোধ হয় তাঁদের শেষ প্রতীক। তাঁদের শুভ্রমহিমার আভাস আপনার মধ্যেই পাই কেবল। বর্তমানযুগের জনতায় আপনি একক। আপনার কথাও বোধ হয় সকলে বুঝতে পারে না।

শীলভদ্র। ওটা তোমার ভুল ধারণা শিখিকণ্ঠ। নীতির মহিমা আজও অম্লান আছে পৃথিবীতে। মগধে, ইন্দ্রপ্রস্থে, এমন কি গান্ধারেও আমার অনেক অকপট

শিষ্য আছেন। শুধু ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই নয়, রাজা মহারাজা, শ্রেষ্ঠী বণিক, এমন কি অনেক ক্রীতদাসও বিশুদ্ধ নীতিধর্মের সমর্থন ক'রে প্রাচীন ঋষিদের সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আর নীতিধর্ম যদি লোপই পায়, তা হ'লেই বা আমার ক্ষতি কি! নীতিধর্মের উত্থান-পতনের সঙ্গে আমার সুখদুঃখের কোন সম্পর্ক নেই, নীতিধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বও আমার নয়। নির্বোধেরাই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা ক'রে শেষে অসুখী হয়। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে, যা ইচ্ছা নয় তা হবে না—এইটেই আমি জানি। সেইজন্যই আমি সহজে বিচলিত হই না কোন কিছুতে। নির্বিকার না হ'লে সুখী হওয়া যায় না। নীতিধর্ম যদি লোপ পায় পাক, তাতে আমার মানসিক শান্তি একটুও বিঘ্নিত হবে না। জ্ঞানচর্চা ক'রে বা অভয়কে উপলব্ধি ক'রে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এতেও ঠিক সেই রকমই আনন্দ পাব। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানকে অনুকরণ করাই আমার সমস্ত প্রয়াসের মূল নীতি। আমার এও মনে হয় যে, ঈশ্বরের চেয়েও এই অনুকরণ বেশী মূল্যবান, কারণ এ অনুকরণ করা দুরূহ তপস্যাসাপেক্ষ।

সিন্ধুপতি। বুঝেছি। এরূপ তপস্যা যে দুরূহ তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। কিন্তু সুমহৎ ঈশ্বরকে নকল করাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয় এবং তার জন্য অসীম কৃচ্ছ্রসাধনা করার নামই যদি তপস্যা হয়, তা হ'লে যে ব্যাঙটা নিজের দেহটাকে ফুলিয়ে ষাঁড়ের মতো হতে চেয়েছিল তাকেও একজন উঁচুদরের তপস্বী বলতে হবে।

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি ব্যঙ্গ করছ। ব্যঙ্গে তুমি সুনিপুণ। কিন্তু যে ষাঁড়ের কথা এখনই তুমি বললে তা সত্যিই যদি ঈশ্বর হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনও ভেক সত্যিই যদি তার সমতুল্য হতে পারে, তা হ'লে ষাঁড়ের চেয়ে ভেককেই তুমি কি বেশী বাহাদুরি দেবে না? ভেকের এ অসাধ্য-সাধনের কে না প্রশংসা করবে!

শীলভদ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত চারিজন ভৃত্য একটি কারুকার্যময় বিরাট রৌপ্যপাত্র বহন করিয়া প্রবেশ করিল। পাত্রের উপর ছিল একটি আস্ত বন্যশূকর। শূকরটি সম্ভবত শূল্যপক্ব নয়, সিদ্ধ করা। কারণ তাহার গাত্রের রোমাবলী নষ্ট হয় নাই। তাহার সঙ্গে ময়দার তৈরী কয়েকটি শূকরছানাও থাকাতে বোঝা যাইতেছিল যে ওটি শূকর নয়, শূকরী।

মহর্ষি সাবর্ণির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দার্শনিক নভোনীল বলিলেন, "খুবই আনন্দের কথা যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একজন অতিথি আজ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সঙ্গদান ক'রে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। আরও আনন্দের কথা যে

ইনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। ইনি অরণ্যনিবাসী বিখ্যাত মহর্ষি সাবর্ণি। শুনেছি অরণ্যের নির্জনতায় শিবের ধ্যান ক'রে ইনি অদ্ভুত তপস্বীজীবন যাপন ক'রে থাকেন।"

জীমূতবাহন। আমরাও শুনেছি সে কথা। ওঁকেই আজ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করতে আহ্বান করছি।

নভোনীল। কিন্তু আমি আর একটা কথাও বলতে চাইছি। ওঁকে শুধু প্রধান অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করলেই যথেষ্ট হবে না। ওঁর আনন্দবিধান করতে হবে। দেখতে হবে কি ওঁর সত্যিই ভাল লাগে! আমার নিজের ধারণা, খাদ্য বা পানীয়ের বৈচিত্র্য ওঁকে ততটা মুগ্ধ করবে না, যতটা করবে আলোচনার বৈচিত্র্য। উনি যে-ধর্মের সাধক সেই ধর্মের আলোচনাই নিঃসন্দেহে ওর পক্ষে প্রীতিকর হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমারও হবে, যদিও শৈবধর্মের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য, কিন্তু শিবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বিশ্বের মঙ্গলার্থে যিনি বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে যে সব রূপক বা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে তা অপরূপ। মহত্ত্বের অসংখ্য নিদর্শন আছে সে সবের মধ্যে। এ দেশে অনেক ধর্ম আছে যা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার মূল কথা ভয়ঙ্করকে নানাভাবে তোষামোদ ক'রে তুষ্ট করা। এদের যদি দেবতা আখ্যাও দেওয়া যায় তা হ'লেও বলতে হবে, এরা অতি নিম্নস্তরের দেবতা, নিম্নস্তরের লোকদেরই পূজা পাবার যোগ্য। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকে আর্যঋষিরা শিবের যে সব কল্পনা করছেন, তা সুস্পষ্ট হয়েও এত নিগূঢ়, এত ভয়ঙ্কর অথচ এত মনোহর, এত আপাতবিরোধী অথচ এত সত্য যে, মনে হয়, মানুষ যুগে যুগে যে সব শক্তির কাছে মাথা নত করেছে মহেশ্বরই তার প্রতীক। তিনি ধ্বংসেরও দেবতা, সৃষ্টিরও দেবতা, তিনি ভস্ম করেছেন আবার পার্বতীরও মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। সমুদ্রমন্থনের পর যখন বিষ উঠল, যখন সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হ'ল, তখন বিষপান ক'রে সৃষ্টিরক্ষা করলেন তিনিই, যাঁর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি ধ্বংস করা। এই পরস্পরবিরোধী-গুণসম্পন্ন দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কাব্যে ধর্মে স্থপতিতে, এক কথায় আমাদের সমাজে প্রতিভার যে স্ফুরণ হয়েছে তা অলঙ্কৃত করেছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে। একটা বিশেষ কল্পনা রূপায়িত হয়েছে শিবকে কেন্দ্র ক'রে। সেই কল্পনা হচ্ছে এই যে, জীবন আর মৃত্যু বিভিন্ন নয়, একটি ধারার বিভিন্ন প্রকাশ। দুটো অবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। জন্মে যার আরম্ভ, মৃত্যুতে তারই স্বাভাবিক পরিণতি, এবং সে পরিণতি সমাপ্তি নয়,—আর এক জন্মের, নবীনতর আর এক আরম্ভের সূচনা। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতা যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছে জীবনকে,

যুগে যুগে তার দর্শন বদলেছে, শিবকে যদি আমরা সে সবের সমন্বয় বা সার মনে করি, তা হ'লে—

শিখিকণ্ঠ। নভোনীল, একটু থাম ভাই। আগে আমার একটা কথা শুনে নাও। প্রগতিশীল আর্যসভ্যতার দর্শন-বৈচিত্র্য শুধু শিবকে কেন্দ্র ক'রে কেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে কেন্দ্র ক'রেও তো এ দেশে আবর্তিত হয়েছে—দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীকে কেন্দ্র ক'রেও। পুরাণ প'ড়ে দেখলেই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবে। বৌদ্ধধর্মের আওতাতেও যে সব দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহিমাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। বৈচিত্র্যকেই যদি শিব-মহিমার মাপকাঠি হিসাবে ধরো, তা হ'লে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দাবীটা অন্তত বিস্মৃত হয়ো না।

নভোনীল। দেখ ভাই শিখিকণ্ঠ, তর্ক ক'রে বৃহৎ সত্যকে কখনও ধরা যায় না। বৃহৎ উপলব্ধিকে অনুভবে বুঝতে হয়। নির্বাণ কি, বুদ্ধদেব তা ভাষায় বলতে পারেন নি। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা, এমন কি বুদ্ধিমান লোকেরাও তা বুঝতে পারেন নি। পেরেছেন তপস্বীরা। সত্যের উপলব্ধি তর্ক ক'রে হয় না, বুদ্ধি দিয়েও হয় না। তার জন্যে মনের একটা বিশেষ প্রস্তুতি, বিশেষ অনুভূতি চাই। শিবের কথা বলছিলাম, তাঁর সম্বন্ধেই বলি তাঁর অনেক নাম আছে। শিবু, মহেশ্বর, ত্র্যম্বক, ধূর্জটি, নীলকণ্ঠ, জলমূর্তি প্রভৃতি অনেক নাম থেকে আমি এইটুকু শুধু বুঝেছি যে, ওগুলো বিভিন্ন তপস্বীর বিভিন্ন রকম উপলব্ধির ফল। শিবকে যিনি যেমনভাবে দেখেছেন, তিনি তেমনই নামকরণ করেছেন। বৃহৎ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি সবাই, যিনি যতটুকু পেরেছেন তিনি ততটুকুকেই একটা বিশেষ নামে চিহ্নিত করেছেন। এ কথাও পুরাণকারেরা বলেছেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূলত একই সত্য, আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা নাম, আলাদা আলাদা রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের মহিমার বৈচিত্র্যও তাই কীর্তিত হয়েছে আলাদা আলাদা ক'রে।

শিখিকণ্ঠ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্ত্রী দেওয়াও কি প্রয়োজন ছিল সে জন্য?

নভোনীল। ছিল বই কি। আধ্যাত্মিক জগতে স্ত্রীলোকদের বিশেষ মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। এটা কারও অবিদিত নেই যে, জীবজগতে স্ত্রীলোকেরাই প্রসবিতা, স্ত্রীলোকেরাই জননী। এর অর্থ বিশদ করলে এই দাঁড়ায় যে, অতি সূক্ষ্ম বীজকে ওঁরা গোপনে আহরণ করেন, গোপনে লালন ক'রে বড় করেন, তারপর প্রসব করেন সন্তানরূপে। এই ভাবে সমস্ত জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন ওঁরা। তাই ওঁদের

জগদ্ধাত্রীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতেও সেই এক ব্যাপার। সূক্ষ্মভাবকে মনের মধ্যে গ্রহণ ক'রে লালন করবার, পালন করবার এবং অবশেষে বৃহৎ রূপে প্রসব করবার অদ্ভুত শক্তি আছে ওঁদের। আমাদের দেশে তাই ওঁদের নামই দেওয়া হয়েছে শক্তি। পুরুষদের অনুভূতিতে যা এড়িয়ে যায়, পুরুষরা যা ধরতে পারেন না, তা ওঁদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। শুধু ধরা পড়ে! সেই অনুভূতিকে লালন ক'রে ওঁরা আশ্চর্য সৃষ্টিতে পরিণত করতে পারেন। পুরুষে এ ক্ষমতা নেই। পুরুষও স্রষ্টা, অজস্র সৃষ্টির বীজ, অসংখ্য আধ্যাত্মিক প্রেরণা পুরুষই বিকিরণ করতে পারেন ; কিন্তু তাকে সংহত ক'রে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারেন নারীরা। সেইজন্যই পুরাণে প্রত্যেক স্রষ্টার সঙ্গে এক-একজন শক্তিও যুক্ত হয়ে আছেন। ব্রহ্মার সঙ্গে বাণী না থাকলে ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রকাশই পেত না। বাণী প্রকাশের দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী না থাকলে বিষ্ণু পালন করতে পারতেন না, কারণ লক্ষ্মীই প্রকৃত পালনের দেবতা, তাঁর শক্তি না পেলে বিষ্ণুর পক্ষে পালন করা সম্ভবপরই হ'ত না। মহাদেবের সঙ্গে আমরা কিন্তু দেখি সতীকে, পার্বতীকে আর কালীকে। পুরাণকারেরা এই তিনটি শক্তিকে এক ক'রে দেখবার নানা প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দক্ষকন্যা সতী শিবনিন্দা শুনে আত্মহত্যা করেন। শিব তাঁর মৃতদেহকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ক্রমশ সেই মৃতদেহ খণ্ডীকৃত হয়ে ভারতের একান্ন স্থানে পড়ে একান্নটি পীঠস্থান হ'ল। তারপর পুরাণকারদের কল্পনায় সেই সতীই আবার মূর্ত হলেন পার্বতীরূপে, জন্মগ্রহণ করলেন হিমালয়দুহিতা হয়ে—মেনকার ক্রোড়ে। তিনি তপস্যা করে পেলেন মহাদেবকে পতিরূপে। এই পার্বতীরও আবার নানা রূপ। অর্ধস্ফুট কৈশোরে তিনি আলোকের মতো বলে উমা, কাঞ্চনবর্ণা বলে গৌরী। তারপর তিনি যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন তখন তিনি দুর্গা। শুধু তাই নয়, বিভিন্নরূপে বিনাশ করেছেন তিনি। মহিষাসুরকে মেরেছেন মহিষমর্দিনীরূপে, রক্তবীজকে সংহার করেছেন কালীরূপে, শুম্ভকে মেরেছেন তারারূপে, নিশুম্ভকে বধ করেছেন ছিন্নমস্তারূপে। কখনও বা জগদ্ধাত্রীরূপে, কখনও বা দশভুজা হয়ে অসুরবাহিনী বিনাশ করেছেন তিনি। চণ্ডীমাহাত্ম্য নারী-মহিমারই কীর্তন। যে সব অসুর মানব-সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তাদের বিনাশ করেছেন নারী-রূপিণী শক্তি, পুরুষেরা পারেন নি। ব্রহ্মকেও আবিষ্কার করেছেন নারীরা। উপনিষদে আছে, দেবতারা ব্রহ্মকে প্রথমে চিনতে পারেন নি, পেরেছিলেন উমা। সেইজন্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে একটি ক'রে শক্তিস্বরূপিণী নারীর সংযোগসাধন করেছেন পুরাণকারেরা।

শিখিকণ্ঠ। তোমার নারী-প্রশস্তির সঙ্গে আমার মতেরও কিছুমাত্র অমিল নেই। কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটা ছিল নারী নয়, মহেশ্বরের মহিমা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই ত্রয়ীকে যদি তিনটি পৃথক সত্তা ব'লে মনে কর এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, তা হ'লে কেবল মহেশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলা শক্ত।

নভোনীল। দেখ, দেবতাদের মধ্যে কে বৃহত্তম, সে বিচার সাধারণ লোকেদের। যাঁরা তপস্বী তাঁরাও নিজেদের আরাধ্য দেবতাকে হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, না মনে করলে তাঁদের সাধনা হয়তো নিখুঁত হয় না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে আমরা যখন বিচার করব তখন আমাদের দৃষ্টি উদারতর হওয়া উচিত। লাল শ্রেষ্ঠ, কি নীল শ্রেষ্ঠ, কি সবুজ শ্রেষ্ঠ—এ বিচার যেমন হাস্যকর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—সে বিচারও তেমনি হাস্যকর। আমি কেবল বলবার চেষ্টা করছিলাম যে মহাদেবকে যখন দেবাদিদেব বলা হয়েছে, তখন মনে হয় এ দেশের কবিরা মহাদেবের মধ্যেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও স্বরূপ কল্পনা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তিরূপে পরে যিনি সরস্বতী হয়েছেন, তিনিই হয়তো সতী ; বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে হয়তো প্রথমে তাঁরা পার্বতীরূপে চিত্রিত করেছেন। এসব অবশ্য আমার কল্পনা, সত্য না-ও হতে পারে। ভাই, সত্যকে পাওয়ার উপায় বিজ্ঞানও নয়, কল্পনাও নয়। আনন্দময় উপলব্ধি ছাড়া সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না।

হর্ষগম্ভীর। এ কথাটা খুব ঠিক বলেছ নভোনীল। আনন্দই হ'ল তাঁর স্বরূপ। দেহ বা মন সে আনন্দলাভ করতে অক্ষম, পারে শুধু আত্মা। দেহের জড়তা অতিক্রম ক'রে মায়াময় মনোজগৎ পার হয়ে বিশুদ্ধ আত্মাই সে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। তখন তার কাছে মৃত্যু নবজন্মের সূচনারূপে প্রতিভাত হয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে সে তখন একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ ক'রে অস্তিত্বের চরমশিখরে উঠে সমাধিস্থ হয়। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর নেই। এই অবস্থারই বিশেষণ নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ। এই অনাদি এই অনন্ত অস্তিত্ব।

সিন্ধুপতি। চমৎকার বলেছেন! কিন্তু দেখুন, আমার মাঝে মাঝে একটু খটকা লাগে। অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের মধ্যে আমি কেমন যেন গুলিয়ে ফেলি, কোনও প্রভেদ দেখতে পাই না। ভাষা দিয়ে এদের তফাত কি বোঝানো যায়? যা আপনি অনন্ত অস্তিত্ব ব'লে বর্ণনা করলেন তা আমার কাছে ভয়ঙ্কর শূন্য ব'লে মনে হ'ল। কারণ শূন্য ছাড়া আর কি অনাদি বা অনন্ত হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হ'ল, একেবারে শূন্য কোন কিছু কল্পনা করাও শক্ত। আপনি যে অবস্থাকে নির্বিকার নিখুঁত নির্গুণ ব'লে বর্ণনা করলেন, তা পেতে হ'লে আমরা

অস্তিত্ব বলতে যা বুঝি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হবে। তা হ'লে আর রইল কি! ভগবানকেও এই শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছেন দার্শনিকেরা ; কারণ তাঁকেও তাঁরা নির্বিকার নিগুর্ণ নিখুঁত ব'লে কল্পনা করেছেন। শূন্যের মধ্যে যদি সব হারিয়ে যায়, তা হ'লে অস্তিত্ব আর নাস্তিত্বের কোনও প্রভেদ থাকে না। তখন মনে হয়, আমরা কিছুই জানি না। লোকে বলে, দার্শনিকদের মধ্যে মতের মিল হয় না। যাঁরা দার্শনিক নন, তাঁদের মধ্যেও মতের মিল নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে সকলের মিল শেষ পর্যন্ত হবেই, আমরা পথটা খুঁজে পাচ্ছি না।

জীমূতবাহন। দর্শনশাস্ত্রের রহস্যময় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামালে সময় মন্দ কাটে না। অবসর পেলে আমিও মাঝে মাঝে জট ছাড়াই। কিন্তু আমার ভাল লাগে কৌটিল্যদর্শন। ওহে, আরও মাধ্বী সুরা আন। সকলেরই পানপাত্র খালি হয়ে গেছে দেখছি। ভরে দাও আবার।

চিন্ময়। সুরা-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ল একটা। যখন সুরাপান করি না, তখন সমাজের সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের মহিমা মনকে মুগ্ধ করে। মনে হয় লোকে পেট ভরে খাচ্ছে, প্রাণ ভরে ঘুমুচ্ছে, প্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, কাব্যে প্রেরণা পাচ্ছে—এই সবই বুঝি আনন্দের চরম অভিব্যক্তি। কিন্তু আপনার উৎকৃষ্ট মাধ্বী সুরা পেটে পড়লেই মনের অবস্থা বদলে যায়। তখন যুদ্ধের সাধ জাগে। মনে হয় সমাজের উন্নতির জন্য যুদ্ধ করা কিংবা স্বাধীনতার জন্য রণাঙ্গনে ছুটে যাওয়ার চেয়ে বেশী আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই। শান্তিময় সামাজিক জীবনকে অত্যন্ত হীন মনে হয় তখন, সে জীবন যাপন করছি ব'লে লজ্জা অনুভব করি। মনে হয় এ শান্তি পরাধীনতার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। তখন ইচ্ছা করে, স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন আমিও তেমনি করি। স্বাধীনতার গান গাইতে গাইতে অসিহস্তে রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়ি রক্তাক্তদেহে।

জীমূতবাহন। আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতাও সঙ্কীর্ণ ছিল, তা সকলের জন্য ছিল না। তাঁরা যেটা সর্বজনীন স্বাধীনতা নামে অভিহিত করতেন, সেটা তাঁদেরই বাহুবলার্জিত স্বেচ্ছাচার কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। একটা জাতির পক্ষে স্বাধীনতা যে পরম সম্পদ তা আমি জানি। কিন্তু যতই বয়স বাড়ছে ততই বুঝতে পারছি যে, কেন্দ্রে শক্তিশালী শাসনকর্তা বা শাসনপরিষদ না থাকলে দেশের মঙ্গল হয় না। সাধারণ লোকেরা তাদের সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতাও নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে না। শাসনব্যবস্থা

দুর্বল বা শিথিল হ'লেই প্রজাদের বিপদ। সেজন্য যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বা অন্য কিছু ক'রে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিহীন করবার প্রয়াস পান, তাঁরা প্রজাদের মিত্র নন। এটাও আমি অনুভব করেছি, যাবনিক গণতন্ত্রবাদ প্রচলিত হবার আগে প্রজারা ধার্মিক শক্তিশালী রাজাদের রাজত্বেই সুখে বাস করত।

হর্ষগম্ভীর। আমার মতে কিন্তু, ভাই জীমূতবাহন, কোনও শাসনব্যবস্থাই সুব্যবস্থা নয়। কোনও সুব্যবস্থা যে হবে সে আশাও আমার আর নেই। যবনেরা অনেক রকম ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কিছুই টেকেনি। আমি তো কোথাও কোন আশা দেখি না। লক্ষণ দেখে বরং মনে হয় সমাজ ক্রমশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, সমস্ত মানবজাতিটাই ক্রমশ যেন ধাপে ধাপে নেবে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার মনে হয় এই শোচনীয় অধঃপতনে সাহায্য করাই বুঝি আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আর কিছুই তো করতে পারছি না আমরা। আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বিজ্ঞান ধর্মের আদর্শ দিয়ে আমরা কি আর করছি বল? মানব-জাতির আসন্ন মরণটাকে অনুভব করছি কেবল, উপভোগ করছি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

জীমূতবাহন। পশু-প্রকৃতির মানব ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজকোষে যদি অর্থ থাকে, নৌবহর এবং সেনাবাহিনী যদি শক্তিশালী থাকে, তা হ'লে—

হর্ষগম্ভীর। ওই ভয়ঙ্কর পশু-প্রকৃতিই জয়ী হবে শেষে। আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ কি? সাম্রাজ্য যত বড়ই হোক, তা একদিন ধ্বংসোন্মুখ হবেই এবং সেই ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অসভ্য বর্বরের দল একদিন লুটে খাবেই—এই ইতিহাসের সাক্ষ্য। এই ভারতবর্ষে আর্য-মহিমার আলো একদিন দশ দিক উদ্ভাসিত করেছিল, এইখানেই একদিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রাজত্ব করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক। এইখানে ভবিষ্যতে আসবে উন্মত্ত পশুর দল। সর্বত্রই আসবে। পৃথিবীতে উচ্চাঙ্গের শিল্প সাহিত্য বা দর্শন ব'লে কিছু আর থাকবে না। ভবিষ্যতের শিল্প সাহিত্য বা দর্শন পশুত্বেরই জয়গান করবে। কেবল মন্দির থেকে নয়, মানুষের হৃদয় থেকেও দেবতারা বিতাড়িত হবেন। মহারাত্রি কালরাত্রি ঘনিয়ে আসবে। অসভ্য পশুরা কি বেদ উপনিষদ বেদান্ত সাংখ্য ত্রিপিটকের মর্ম বুঝতে পারবে কখনও? পারবে না। ভিত্তি টলছে, সব ধসে যাবে। যে ভারতবর্ষ একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল, সেই ভারতবর্ষেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্মশান রচিত হবে। ভয়ঙ্কর মহাকালের ব্যায়ত আনন আমি দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমিই বোধ হয় শেষ মন্দিরের শেষ পুরোহিত।

এই সময় ঘরের পরদা সরাইয়া এক অদ্ভুতাকৃতি কুব্জ মনুষ্যমূর্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেশহীন মস্তক গম্বুজের মতো। পরিধানে নীলরঙের আলখাল্লা,

লালরঙের পায়জামাটি স্বর্ণতারকাখচিত। মহর্ষি সাবর্ণি একেশ্বরবাদী পণ্ডিত অগ্নিদেবকে অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন। এই লোকটিকে তিনি বড় ভয় করিতেন। ইনি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে প্রখর যুক্তিবলে ছিন্নভিন্ন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি প্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়েরই শত্রু। মহর্ষি সাবর্ণির আশঙ্কা হইল, এই দুর্ধর্ষ লোকটা তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এখনই হয়তো চীৎকার করিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিবে। অর্বাচীন পণ্ডিতদের অসার বাহ্বাস্ফোটে তিনি এতক্ষণ বিচলিত হন নাই, অগ্নিদেবকে দেখিয়া কিন্তু তিনি ভীত হইলেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল উঠিয়া পলায়ন করেন ; কিন্তু নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া সে ইচ্ছা তিনি দমন করিলেন। তিনি অনুভব করিলেন, নিরঞ্জনার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দেবীত্বে উন্নীত হইতে তাহার আর বিলম্ব নাই। অগ্নিদেব সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠেন, নিরঞ্জনাই তাঁহাকে রক্ষা করিবে। নিরঞ্জনা তাঁহার পাশেই বসিয়া ছিল, তিনি বাম হাত দিয়া তাহার অঞ্চলটি ধরিয়া রহিলেন। মনে মনে শঙ্করকেও স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অগ্নিদেবের আবির্ভাব সকলকেই পুলকিত করিল। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং বাগ্মিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই সহর্ষে তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন।

হর্ষগম্ভীরই প্রথমে কথা কহিলেন।

"আপনার আগমনে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়েছি অগ্নিদেব। খুব ভাল সময়ে এসেছেন আপনি। শৈবধর্ম নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে নূতন কিছু শুনতে পাব নিশ্চয়ই। শৈবধর্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বাজারে চলতি আছে তারই পুনরুক্তি চলছিল। আপনি নতুন কিছু শোনান। নভোনীল অনেক কথা শোনালেন আমাদের। নভোনীলকে আপনি তো চেনেন, যুক্তির চেয়ে উপমার দিকে ওঁর প্রবণতা বেশী। মহর্ষি সাবর্ণির চিত্তবিনোদনের জন্য শৈবধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করছিলেন, তাকে কাব্য বললে খুব অন্যায় হয় না। মহর্ষি সাবর্ণি কোনও জবাব দেননি। সম্ভবত মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে আছেন উনি। শৈব সাধুরা ও-রকম করেন মাঝে মাঝে। যাক, নগাধিরাজের দেবতাই সম্ভবত ওঁর মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছেন, তা না হ'লে আমরাও ওঁর কাছ থেকে কিছু পেতাম। আপনিও ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেন। আমরা সবাই জানি, আপনি এককালে শৈবধর্ম নিয়ে খুব মেতেছিলেন, বড় বড় রাজসভাতে এ নিয়ে বক্তৃতা পর্যন্ত করেছেন, শৈবধর্ম সম্বন্ধে

অনেক অভিনব তথ্যও নাকি আবিষ্কার করেছিলেন শুনেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর এই তিনজনই কি ভগবান? আমার তো ধারণা একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অগ্নিদেব। আমারও তাই ধারণা। ভগবান এক, তাঁর বাপ-মা নেই, তিনি অজাত, তিনি মৃত্যুহীন, তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁর থেকেই নিখিল বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ওসব ছেলে-ভোলানো রূপকথা মাত্র।

সিন্ধুপতি। এ কথা আমরাও জানি অগ্নিদেব যে, আপনার ঈশ্বরই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে হ'লে ঈশ্বরের উপর একটু অনুকম্পা হয়। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেকায়দায় থাকতে হয়েছিল। অনন্তকাল ধ'রে নিশ্চয় তাঁকে ইতস্তত করতে হয়েছিল, সৃষ্টি করবেন কি-না! নিশ্চয়ই মানবেন, এ অবস্থা সুখকর নয়। নিগুর্ণ থাকবার জন্য তাঁকে নির্বিকার থাকতে হয়েছিল, তার মানে নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হ'লে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকাও মুশকিল। তাই আপনারা বলছেন যে, তিনি অবশেষে সৃষ্টি করাই ঠিক করলেন। আপনার কথায় বিশ্বাস করলাম অগ্নিদেব। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য নিজের নির্বিকারত্ব নষ্ট ক'রে সৃষ্টির জটিল ঝামেলায় মেতে উঠে ঈশ্বর খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন ব'লে মনে করি না। সে যাই হোক, ভগবান কেমন ক'রে সৃষ্টি করলেন সেইটেই বলুন আমাদের, শোনা যাক।

অগ্নিদেব। যাঁরা নিজেরা হিন্দু নন—যেমন নভোনীল এবং হর্ষগম্ভীর—তাঁরাও জ্ঞান অর্জন করবার আগ্রহে হিন্দুধর্মের অনেক তথ্য জেনেছেন; তাঁরা জানেন ভগবান স্বয়ং কিছুই সৃষ্টি করেন নি, করেছিলেন অন্য আর একটা জিনিসের মাধ্যমে। তাকে জিনিস বা বস্তু বললে ঠিক তার স্বরূপ বোঝানো যায় না অবশ্য। কিন্তু তার মাধ্যমেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্তুত সে-ই সৃষ্টি করল, ঈশ্বর নয়। এই যে মাধ্যম—নানাধর্মে এর নানারকম নাম আছে।

হর্ষগম্ভীর। ঠিক বলেছেন। যবনরা একেই বোধ হয় হার্মিস, অ্যাপোলো, অ্যাডোনি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

অগ্নিদেব। আমি কিন্তু ভারতীয় আর্যবংশধর, আমি একে বলব—শূন্য। এই শূন্যই একদা স্পন্দিত হ'ল, সেই স্পন্দনই ক্রমশ রূপান্তরিত হ'ল সৃষ্টিতে। শূন্যের সেই স্পন্দনই সৃষ্টিকর্তা—হংসবাহন ব্রহ্মা, গরুড়বাহন বিষ্ণু বা ষণ্ডবাহন মহেশ্বর নন। ওসব স্বল্পবুদ্ধি কবিদের উদ্ভট কল্পনামাত্র। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে মূর্তিরূপে কল্পনাই করা হয়নি, হয়েছে সূর্যের জ্যোতিরূপে। বেদ বা ব্রাহ্মণ-সংহিতায় ব্রহ্মার উল্লেখই নেই, আছে হিরণ্যগর্ভের। মহাদেব তো স্বয়ম্ভু। বেদে রুদ্র আছে, মহাদেব নেই। কারও মতে রুদ্র অগ্নিরই অন্য নাম। মোট কথা, নানারকম অবিশ্বাস্য রূপকথা

উপকথার সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে নিয়ে। বুদ্ধি একটু কম না হ'লে ওসবে আস্থাস্থাপন করা কঠিন।

মহর্ষি সার্বর্ণি বিবর্ণমুখে সব শুনিতেছিলেন, এই কথায় তাঁহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, চক্ষুর দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না।

অগ্নিদেব বলিয়া চলিলেন, "শূন্যের ওই স্পন্দনকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর মনে করলেও ওঁদের কিছুতেই ঈশ্বর বলা চলবে না। কারণ শূন্যের ওই স্পন্দন ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের প্রেরণা মাত্র। সিন্ধুপতি, ঈশ্বরকে নিয়ে উপহাস ক'রো না। তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তিনি মুটে-মজুরের মতো মাটি কেটে বা হাতুড়ি চালিয়ে এই নিখিল বিশ্ব নির্মাণ করেননি। তাঁর প্রেরণায় শূন্য স্পন্দিত হয়ে নিখিল বিশ্বরূপে আপনি বিকশিত হয়েছে, ফুল যেমন আপনি বিকশিত হয়। তাঁর প্রেরণায় স্পন্দিত শূন্যই স্রষ্টা, তাই সে বিশ্ব নিখুঁত হয়নি, তাই তা বদলাচ্ছে; কারণ ঈশ্বর নিজে তা সৃষ্টি করেননি, করলে তা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত—ভাল-মন্দের এমন জগা-খিচুড়ি হ'ত না।

সিন্ধুপতি। আপনাদের মতে কি ভাল কি মন্দ সেইটে তা হ'লে বুঝিয়ে বলুন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হর্ষগম্ভীরই প্রশ্নটির উত্তর দিবার প্রয়াস পাইলেন। টেবিলের উপর ধাতুনির্মিত একটি ক্ষুদ্র গর্দভের মূর্তি ছিল, আর তাহার পিঠের দুই দিকে ঝুলিতেছিল দুইটি ঝুড়ি। একটিতে ছিল কালো ফল, আর একটিতে সাদা।

হর্ষগম্ভীর গর্দভটিকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটির দিকে চেয়ে দেখ। কালো সাদা দু রকম ফলই চমৎকার দেখাচ্ছে আমাদের চোখে। কিন্তু এই ফলগুলির যদি ভাববার ক্ষমতা থাকত তা হ'লে সাদা ফলগুলি বলত, 'ফলের পক্ষে সাদা হওয়াটাই ভাল, কালো হওয়াটা মন্দ।' আর কালো ফলগুলিও ঘৃণা করত সাদা ফলগুলিকে। কিন্তু আমাদের চোখে দুইই ভাল। ভগবানের চোখেও তেমনি সব ভাল। আমরা ফলগুলিকে যেমন পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখছি, ভগবানও নিখিল বিশ্বকে ঠিক তেমনিভাবে দেখছেন। আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা সবটা দেখতে পাই না, তাই ভাল-মন্দের চূড়ান্ত বিচারও করতে পারি না। আমাদের চোখে মন্দটাই অনেক সময় ভাল ব'লে মনে হয়। কিন্তু যা কুৎসিত নিঃসন্দেহে তা কুৎসিত, তা সুন্দর নয়। সব সুন্দর হ'লে সুন্দর ব'লে কিছু থাকতও না। কারণ তুলনা ক'রেই আমরা সুন্দরকে সুন্দর বলতে পারি। আর সেই জন্যই বোধ হয় সৃষ্টিতে সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রাধান্য এবং এক হিসেবে তা বোধ হয় ভালই।

শীলভদ্র। কিন্তু সমস্যাটা নীতির দিক দিয়ে বিচার করা উচিত। যা মন্দ, তা মন্দই। সে মন্দে অসীম সৃষ্টিকাব্যে হয়তো ছন্দপতন হয় না। কিন্তু মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনকাব্যে হয়। যে পাপী মন্দ আচরণ করে তার পদস্খলন হয়, এবং সেটা কাম্য নয়।

জীমূতবাহন। বাঃ,বেশ বলেছেন এটা। যুক্তিটা চমৎকার!

শীলভদ্র। এটাও অবশ্য মানতে হবে, এই সৃষ্টি এক মহাকবি রচিত বিয়োগান্ত নাটক। সেই মহাকবির নাম ঈশ্বর। তিনি তাঁর নাটকে প্রত্যেককে একটি ক'রে নির্দিষ্ট ভূমিকা দিয়েছেন। তিনি যদি তোমাকে ভিক্ষুক, রাজপুত্র বা খঞ্জ ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তোমার কর্তব্য সেই ভূমিকাটির মর্যাদা রক্ষা করা। বস্তুত তা না ক'রেও বোধ হয় উপায় নেই, তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতিই তোমাকে সেই দিকে নিয়ে যাবে, তোমার নীতিজ্ঞানও তদনুযায়ী হবে।

সিন্ধুপতি। তা হ'লে খঞ্জকে চিরকাল ল্যাংচাতে হবে, পাগল চিরকাল উনপঞ্চাশৎ পবনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে থাকবে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের আর সুচরিত্রা হবার উপায় থাকবে না, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকই থাকতে হবে, প্রতারক ক্রমাগত মিথ্যাই বলবে, খুনী চিরকাল খুনই করবে। তারপর নাটক যখন শেষ হবে তখন সমস্ত অভিনেতা—রাজা প্রজা, ন্যায়বান অত্যাচারী, সতী অসতী, মহৎ ক্ষুদ্র, ভদ্র খুনী—সবাই কবির কাছ থেকে সমান প্রশংসা পাবে। এই কি আপনার বক্তব্য?

শীলভদ্র। সিন্ধুপতি, তুমি আমার বক্তব্যটাকে দুমড়ে মুচড়ে যা-তা ক'রে দিলে, সুশ্রী কুমারী রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন। তুমি এসব ব্যাপার কিছু বোঝ না। সৃষ্টি ঈশ্বর, ন্যায় অন্যায়, নীতি দুর্নীতি—এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তোমার। থাকলে এসব বলতে না। তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

সিন্ধুপতি একটু স্মিত হাস্য করিলেন শুধু। কোনও প্রত্যুত্তর দিলেন না।

নভোনীল। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু ভাল-মন্দ উভয়েরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এও আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষই একটি মাত্র পথে চ'লে মুক্তি পেতে পারে না, তা সে পথ যত মহৎই হোক না কেন। মুক্তির সন্ধানে মন্দও প্রয়োজনীয় পাথেয়। পুরাণে এ নিয়ে অনেক গল্প আছে। রাবণ যদি সীতাকে হরণ না করতেন তা হ'লে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতেন না, অহল্যা যে মুহূর্তে পাপাচরণ ক'রে পাষাণী হলেন সেই মুহূর্তেই শ্রীরামচন্দ্রের উপর তাঁর একটা দাবি জন্মাল। সুতরাং পাপকে ঘৃণা করা বা পাপীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা আমার মতে অর্থহীন। পাপই নানামূর্তিতে ভগবানকে আকর্ষণ করে। পাপ আছে

ব'লেই ঈশ্বরের ত্রাতা নাম সার্থক। সুতরাং ভাল এবং মন্দ দুটোরই প্রয়োজন, তাই সংসারে দুটোরই অস্তিত্ব আছে।

অগ্নিদেব। ঠিকই বলেছ তুমি। মুক্তি-প্রাসাদের সব কটা ইটই ভাল নয়। মন্দও অনেক আছে। হয়তো বনিয়াদটাই মন্দ দিয়ে তৈরী, কে জানে!

নভোনীল। ভাল-মন্দর সঙ্গে কিন্তু সৎ-অসতের অনেক সময় গোলমাল হয়। যার অস্তিত্ব আছে তাই সৎ, যার নেই সেই অসৎ। এই সৎকেই নানা রূপে, নানা আলোতে, নানা দৃষ্টিতে দেখেছেন নানা যুগের ঋষিরা। মায়া এই সৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ব'লে অনেকে মায়ার নিন্দা করেন, মায়াকে অসৎ বলেন। কিন্তু এ কথাও না মেনে উপায় নেই যে, সত্যের সঙ্গে মায়ারূপী অসৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এই মায়া নিয়ে নানা রূপক রচিত হয়েছে আমাদের কাব্যে পুরাণে। এই মায়াকে কখনও বলা হয়েছে বিষ, কখনও লোভ, কখনও কাম, কখনও দম্ভ, কখনও বা আর কিছু। আপনাদের অবশ্য অবিদিত নেই কিছু, আপনারা যদি অনুমতি দেন তা হ'লে বক্তব্যটা আর একটু বিশদ ক'রে বলি।

প্রায় সকলেই নভোনীলকে তাঁহার বক্তব্য বিশদতর করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময়ে বংশীধ্বনির তালে তালে পা ফেলিয়া বারোজন সুন্দরী তরুণী ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখা গেল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক-একটি সুচিত্রিত বৃহদাকার ঝাঁপি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ঝাঁপিতে রহিয়াছে বিবিধ প্রকার ফল। তাহারা টেবিলের উপর ফলগুলি সাজাইয়া দিয়া একে একে চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বংশীও নীরব হইল।

নভোনীল আরম্ভ করিলেন, "সমস্ত সৃষ্টিকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হ'লে পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের গল্পটা একটা অপরূপ দার্শনিক তত্ত্বের প্রতীক ব'লে মনে হবে। এই মায়াময় সৃষ্টি-সমুদ্রকে দেব-দানব মিলে চিরকালই মন্থন করছে। সে মন্থনে সহায়তা করছেন স্বয়ং কূর্মরূপী ভগবান, মন্থনরজ্জু হয়েছেন মহাতপস্বী বাসুকী। কিন্তু মন্থনদণ্ড হয়েছেন মন্দর পর্বত—একটা বিরাট বস্তুপিণ্ড, একে আমি তামসিকতার প্রতীক বলব। এই তামসিকতাকে কেন্দ্র ক'রেই দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন চলছে চিরকাল। এ মন্থনে জ্ঞানীরাও যে চিরকাল সহায়তা করেছেন তার ইঙ্গিত রয়েছে তপস্বী বাসুকীর মন্থনরজ্জু হওয়াতে। ভগবান লীলাময়, সব লীলাতেই তিনি থাকেন, কিন্তু এই তামসিকতার লীলায় তিনি কূর্মরূপ ধারণ করেছেন। মায়াময় বিষয়-সমুদ্র মন্থন ক'রে তাই উঠল—যা মানুষ চিরকাল চেয়েছে—অমৃত, ধন্বন্তরী, লক্ষ্মী, সুরা, চন্দ্র, রম্ভা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ,

পারিজাত, সুরভী, ঐরাবত, শঙ্খ আর ধন্বন্তরি। এর প্রত্যেকটির গুণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে বৈষয়িকজীবনে অর্থাৎ বস্তুর জগতে এসবের বেশী কাম্য মানুষের আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এ রূপকের নৈতিক মহত্ত্ব তখনই সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত হ'ল যখন পুরাণকার দেখালেন যে, বিষয়-সমুদ্রকে বেশী মন্থন করলে শেষ পর্যন্ত বিষ ওঠে। বিষ উঠলও। আর সে বিষ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য তা পান ক'রে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। এইখানেই মহাদেবের মহত্ত্ব, মহাকালের চিরন্তন লীলা। এই বিষটাকেও আমি অসৎ মনে করি না, এও সৎ, কারণ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একমাত্র মহাদেবের মতো যোগীই এই বিষকে আত্মসাৎ করতে পারেন, তাই তিনি দেবাদিদেব, আর তাই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ভাল-মন্দ দুইই ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। রামায়ণের স্বর্ণ-মৃগের কাহিনী, সীতাহরণ, অহল্যার ব্যভিচার প্রভৃতি এই সত্যেরই নানা রূপ। বিভিন্ন কবিরা আপন আপন কল্পনা অনুসারে যুগে যুগে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন এই চিরন্তন সত্যকে।

হর্ষগম্ভীর। তারও পূর্বে যম-যমীর কাহিনীতেও হয়তো এরই ইঙ্গিত আছে। যা এখন আমরা অন্যায় ব'লে মনে করি, তা না করলে মনুষ্যজাতিই হয়তো অবলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু তবু এটা মানতেই হবে, ওসব আচরণ এখন আর সমর্থনযোগ্য নয়। যে অন্যায় মানুষ একদিন বাধ্য হয়ে বা মোহগ্রস্ত হয়ে করেছে সে অন্যায়কে সভ্যযুগে টেনে আনা অসঙ্গত।

নভোনীল। আমি কিন্তু মনে করি এই অন্যায় বা মন্দ বা পাপ—যে নামই দিন একে—এটা সত্যেরই একটা অঙ্গ, একটা অংশ। আমাদের বিচারে তা অন্যায় বা অসঙ্গত হ'লেও সৃষ্টি থেকে তা মুছে ফেলা যাবে না। অহল্যা সীতা মেনকা সূর্পণখা সবাই চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। রাম-রাবণ পরস্পরের পরিপূরক, ওরা চিরকাল জন্মাবে।

চিন্ময়। আমি কিন্তু জানতে চাইছি, এ যুগে কোথায় তারা জন্মেছে! বিশেষ ক'রে মেনকার খবরটা জানতে পারলে খুশী হতাম।

নভোনীল। তা জানতে হলে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা দরকার তা কবিদের সম্ভবত নেই। কবিরা জ্ঞানী নয়, তারা কারিকর। কথার বেসাতি করে তারা, তাদের হাব ভাব বুদ্ধি অনেকটা শিশুর মতো। কথায় কথা গেঁথে অলীক রূপকথা বুনে আর ছন্দের টুং টাং শুনে তারা মেতে থাকে, আর পাঁচজন শিশু-প্রকৃতির লোককেও মাতায়।

চিন্ময়। ঘরোয়া ভাবে যা বললেন, তা বাইরে বিদ্বৎসমাজে কখনও যেন

উচ্চারণ করবেন না। করলে গাল খাবেন। এটা কি আপনার জানা নেই যে, পৃথিবীতে প্রথম মহাকাব্য উচ্চারিত হয়েছিল কবিতায়! আপনি যে সব উদাহরণ এখন দিলেন, তা মহাকবিদের কাব্য থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলেন। একমাত্র কবিতাই মানুষের অন্তরতম সত্য প্রকাশ করতে পারে। কবিতা দেবতাদেরই প্রিয়, তাই সমস্ত দেবমন্ত্র কবিতায় রচিত। এ কথা সকলেই জানে যে, কবিরাই দ্রষ্টা, তাঁদের চোখে সবই রহস্যময় অথচ সবই সুস্পষ্ট। আমি কবি, আমি তাই জানি—এ যুগের মেনকা কোথায় আছেন। আপনাকে রহস্য ক'রে প্রশ্নটা করেছিলাম, খবরটা আমার জানা আছে। বেশী দূর নয়, আপনার কাছেই আছেন তিনি। ওই দেখুন, নীল মখমল উপাধানে হেলান দিয়ে ব'সে আছেন সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী, তাঁর চোখের কোণে টলমল করছে অশ্রু, অধরকোণে চুম্বন। ওই যে ব'সে আছেন তিনি। শুধু পাটলিপুত্রের নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত এশিয়ার গৌরব উনি। একদা সুরসভাতলে যিনি নৃত্য করেছিলেন, বিশ্বামিত্রের যিনি তপোভঙ্গ করেছিলেন, এ যুগে তাঁর নাম নিরঞ্জনা।

রেবতী। ওমা, কি বলছেন আপনি! বিশ্বামিত্র ঋষি কি আজকের লোক! নিরঞ্জনা দেবি, সত্যি আপনি তাঁর তপোভঙ্গ করেছিলেন না কি? তাঁর কি দাড়ি ছিল?

চারুদত্ত। তাঁর দাড়ি ছিল কি না জানি না, কিন্তু এক রকম বুনো ঘোড়ার দাড়ি আছে জানি। বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন, না, ঘোড়া ছিলেন।

"আমি আর বসতে পাচ্ছি না বাবা। শুলুম।" এই বলিয়া শুভদত্ত মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন।

চিন্ময় দাঁড়াইয়া সুরাপাত্রটি আস্ফালন করিতে করিতে বলিলেন, "সুরাপান করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তবে তা সুখ-মৃত্যু হবে, তাতে কোনও গ্লানি থাকবে না।"

বৃদ্ধ জীমূতবাহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বসিয়াই ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার কেশহীন প্রকাণ্ড মস্তকটি বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

শিখিকণ্ঠও আর নিজের দার্শনিকত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে নিঞ্জনার নিকট আগাইয়া গেলেন এবং তাহার পাশে বসিয়া মৃদুগুঞ্জনে নিবেদন করিলেন, "নিরঞ্জনে, আমি দার্শনিক, আমার মোহমুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু তুমি আজ আমাকে মুগ্ধ করেছ, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

নিরঞ্জনা। এতদিন বাসেন নি কেন?

শিখিকণ্ঠ। তাই মনে হচ্ছে উপবাস ক'রে আছি।

নিরঞ্জনা। আমিও আজ কিছু খাইনি, জল খেয়ে আছি কেবল। ভালবাসার কথা ভাল লাগছে না এখন, আমাকে ক্ষমা করুন।

শিখিকণ্ঠ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রেবতীর নিকট চলিয়া গেলেন। রেবতী দৃষ্টির ইঙ্গিতে তাঁহাকে ভূশায়ী শুভদত্তকে দেখাইয়া দিল। তাহাকে তুলিতে বলিল। শিখিকণ্ঠকে রেবতীর নিকট যাইতে দেখিয়া নভোনীল নিরঞ্জনার নিকট উঠিয়া গেলেন, কোন ভূমিকা না করিয়া বা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, একেবারেই তাহার অধর চুম্বন করিয়া বসিলেন।

নিরঞ্জনা। আমি আপনাকে বেশী ধার্মিক মনে করেছিলাম।

নভোনীল। কোনও সঙ্কীর্ণ ধর্ম আমি মানি না, মানবধর্মের সম্পূর্ণতায় আমি সর্বদা পরিপূর্ণ।

নিরঞ্জনা। ও! নারী-সংসর্গে আপনার আত্মা কলুষিত হবে—এ ভয় বুঝি আপনার নেই?

নভোনীল। নারী-সংসর্গ দৈহিক ব্যাপার, ওর সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

নিরঞ্জনা। তা হ'লে আপনি আমার কাছ থেকে স'রে যান। যিনি আমাকে কায়মনোবাক্যে, সমস্ত দেহ দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালবাসতে পারেন না, তাঁকে আমি প্রশ্রয় দিই না। দার্শনিকরা যে এত নির্বোধ—এ ধারণা আমার ছিল না।

ভোজনকক্ষের দীপগুলি একে একে নিবিয়া যাইতেছিল। ভোরের আলো ক্রমশ পরদাগুলির ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া অতিথিবর্গের জাগরণক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতাকে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে লাগিল। মেঝের উপর শুভদত্তের পাশে চারুদত্তও পড়িয়াছিল। নেশার ঘোরে সে ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিতেছিল। নভোনীল রোহিণীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। শিখিকণ্ঠ হাস্যো-দ্বেলিতা রেবতীর দুগ্ধধবল গ্রীবার উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিতবর্ণ সুরা ঢালিতেছিলেন। পদ্মরাগমণিসন্নিভ সুরাবিন্দুগুলি তাহার নগ্ন গ্রীবা ও স্তন বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। শিখিকণ্ঠ অধর বাড়াইয়া তাহাই পান করিতেছিলেন।

প্রবীণ শীলভদ্র সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং সিন্ধুপতির স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনি এখনও খাড়া আছেন দেখছি। চলুন, ওদিকে যাওয়া যাক।"

তাঁহারা ভোজনকক্ষের পশ্চাদ্দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শীলভদ্র। মনে হচ্ছে, আপনি ভাবছেন কিছু একটা। কি ভাবছেন?

সিন্ধুপতি। বিশেষ কিছু নয়। মনে হচ্ছিল, এই রূপজীবাদের প্রণয়লীলা অনেকটা কার্তিক পুজোর মতো।

শীলভদ্র। তার মানে?

সিন্ধুপতি। এরা প্রত্যেকেই কার্তিক পুজো করে জানেন বোধ হয়। কন্দর্পকান্তি কার্তিককে নানা বেশে সাজিয়ে ময়ূরের উপর চড়িয়ে খুব সমারোহ ক'রে পুজো করে তার। কিন্তু পুজো ওই একদিন। পরদিনই বিসর্জন। ওদের রূপও ওই রকম, প্রণয়ও ওই রকম, শুধু ক্ষণিকের খেলা।

শীলভদ্র। হোক না। সবই তো ক্ষণভঙ্গুর, সবই তো ছায়ার মতো। আসক্তিটাই খারাপ। ওদের প্রতি আসক্ত হওয়াটাই ভুল।

সিন্ধুপতি। ওদের রূপটা যদি ছায়ার মতো হয়, কামনাটা তা হ'লে আলো। দুটোই ক্ষণিকের মায়া। তা হ'লে আসক্ত হবই না বা কেন? কামনাটা তো উড়িয়ে দিতে পারি না, সেটা থাকবেই। আলোর প্ররোচনায় ছায়ার পিছু পিছু ছুটলে তা হ'লে ক্ষতি কি?

শীলভদ্র। আপনার যুক্তি শুনে হাসি পাচ্ছে। বিশ্বাস করুন, একমাত্র নিরাসক্তিতেই পৌরুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুপতি। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ নিরাসক্ত হবে কেমন ক'রে?

শীলভদ্র। শুনুন তা হ'লে বলি। বললেই বুঝবেন শীলভদ্র কি ক'রে নিরাসক্ত থাকতে পেরেছে।

শীলভদ্র একটি মর্মর স্তম্ভে হেলান দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। ঊষার অরুণভাতি তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেবও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা সুরাপ্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অসংলগ্নভাবে উন্মত্তবৎ চীৎকার বা হাস্য করিলেন, কিন্তু তাহা শীলভদ্রের গম্ভীর ভাষণকে ব্যাহত করিতে পারিল না। তাহা এমন সুষ্ঠু, এমন চমৎকার হইল যে অগ্নিদেব বলিলেন, "সত্যিই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার যোগ্যতা হয়েছে আপনার।"

হর্ষগম্ভীর মন্তব্য করিলেন, "জ্ঞানীদের হৃদয়েই তো ভগবান থাকেন।"

তাঁহার পর তাঁহারা মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শীলভদ্র যেন এই আলোচনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যখন আমার কাছে আসবে তখন সে যেন আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে না পায়, সে যেন দেখে আমি আত্মসংশোধনে এবং

কর্তব্যকর্মে নিরত আছি। বলিষ্ঠ দু হাত আকাশের দিকে তুলে আমি যেন বলতে পারি—ভগবান, তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে নিজেকে যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলে আমি তার অমর্যাদা করিনি। আমার জীবনের অক্লান্ত সাধনা মালার মতো গেঁথে গেঁথে পরিয়ে দিয়েছি তোমার গলায়, অঞ্জলির মতো সমর্পণ করেছি তোমার চরণে। তোমার অমোঘ বিধান বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে। যথেষ্ট বেঁচেছি।"

দুই হাত তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। দিব্য প্রভায় তাঁহার মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর নিজেকে সম্বোধন করিয়া সহর্ষে তিনি বলিলেন, "জীবনের মায়া এবার কাটাও শীলভদ্র। যে বৃক্ষ তোমাকে লালন করেছিল, যে ধরণী তোমাকে ধারণ করেছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পক্ব ফলের মতো এবার খসে পড় জীবনের বৃন্ত থেকে। এবার বিদায় নাও।"

এই বলিয়া সহসা তিনি নিজের পরিচ্ছদের ভিতর হইতে একটি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নিজের বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সিন্ধুপতি, হর্ষগম্ভীর এবং অগ্নিদেব তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া যখন তাঁহাকে ধরিলেন, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

নারীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরাঘোরে আচ্ছন্ন অতিথিগণ বিস্মিত-তন্দ্র হইয়া অসম্বদ্ধ ভাষায় অস্ফুট আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, প্রভাত-বায়ুতে দোদুল্যমান পরদাগুলির ছায়াসমূহ হইতেও যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। হর্ষগম্ভীর এবং সিন্ধুপতি ধরাধরি করিয়া বিবর্ণ শীলভদ্রকে একটি শয্যায় শায়িত করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ জীমূতবাহনের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, তিনি সৈনিকসুলভ তৎপরতার সহিত শীলভদ্রের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "চিকিৎসক সুরসেনকে অবিলম্বে ডেকে আন।"

সিন্ধুপতি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা যে ভাবে প্রণয় কামনা করি, উনি ঠিক সেই ভাবেই মৃত্যু কামনা করেছেন। আমাদের সকলেরই মতো নিজের কামনারই তৃপ্তি সাধন করেছেন উনি। ওঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন উনি কামনাহীন দেবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।"

জীমূতবাহন ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, এত জিনিস থাকতে মৃত্যু কামনা করলেন উনি! বেঁচে থাকলে এখনও কত কাজ করতে পারতেন! কি দুর্দৈব!"

মহর্ষি সাবর্ণি এবং নিরঞ্জনা নিস্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন।

তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয় ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহারা আশার আলোকও দেখিতে পাইলেন—পলায়নের এই তো সুযোগ।

সহসা সার্বণি নিরঞ্জনার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর যাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের ডিঙাইয়া, যাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের এড়াইয়া তিনি নিরঞ্জনাকে সেই শোণিত-সুরাপিচ্ছিল পরিবেশ হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন।

পাটলিপুত্রে তখন প্রভাত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত হর্ম্যশ্রেণীর চূড়াগুলি আকাশের আলো আঁধারিতে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথের দু ধারে যদিও উচ্ছিষ্ট মাটির বাসন, শালপাতা, ইতস্তত ভ্রাম্যমান রোমহীন দুই-একটি কুকুর প্রভাতের সৌন্দর্যের সহিত ঠিক খাপ খাইতেছিল না, তথাপি কিন্তু প্রভাতের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মহর্ষি সার্বণি প্রথমেই সিন্ধুপতির দেওয়া মূল্যবান পরিচ্ছদটি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিলেন এবং পদতলে তাহা দলিত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওদের কথা তো শুনলে! কি না বললে ওর! মদের চাটের সঙ্গে সৃষ্টিমাহাত্ম্যকে পর্যন্ত ওরা চিবিয়ে দিলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দানব-মানব দেব-দেবী সীতা-অহল্যা রাম-রাবণ—সকলকে এক ঢেঁকিতে ফেলে কি জঘন্যভাবে কুটলে ওরা বল তো? তোমার সঙ্গে তুলনা দিলে মেনকার! ছি ছি ছি ছি! ওর মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক ওই অগ্নিদেব। সবজান্তা নাস্তিক লোক। উনি শাক্ত-বৈষ্ণব শৈব-গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম চেখে চেখে এখন হয়েছেন শূন্যবাদী। ও শব্দটির অর্থ কি জান? মিথ্যাবাদী। বাকী দার্শনিকগুলোর কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক। সকলের সামনেই তোমার দিকে লুব্ধ বাহু বাড়াতে সাহস করলে ওরা। তুমি যখন তাড়িয়ে দিলে তখন বেশ সপ্রতিভ ভাবে চ'লে গেল আর এক দলের কাছে। তারপর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে কি ভাবে মাটিতে লুটোতে লাগল তা তো নিজের চোখেই দেখলে। নিজেদেরই বমিতে লিপ্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্রীতদাসীদের পদপ্রান্তে। পশু—পশু—পশু সব। ওই যে পাগল বুড়োটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মহত্যা ক'রে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ক'রে বসল, ওর কি কখনও মুক্তি হবে ভেবেছ? আত্মঘাতীর কখনও মুক্তি হতে পারে? তোমার চোখের সামনেই যে এসব ঘটল, এঁর জন্য শঙ্করকে কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি। তিনিই ঘটালেন এসব তোমার চোখ ফোটাবার জন্যে। তুমি নিজেই আজ মর্মে মর্মে অনুভব করলে, কি জঘন্য বীভৎস ভয়ঙ্কর পরিবেশে এতকাল তোমার জীবন

কেটেছে। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, বল, তুমি নিজেই বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? ওদের কদর্য ইঙ্গিত, কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গী, অশ্লীল ভাষণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওই সব নারীরূপী বানরীদের সাহচর্যে তুমি থাকতে পারবে কি আর? বল, তুমি কি ওদের মতো হতে চাও? উত্তর দাও।"

নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তরও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষদের প্রেমহীন বর্বরতা, নারীদের অশোভন আচরণ সত্যই তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতেও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সে।

সে উত্তর দিল, "প্রভু, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমার মাথা ঘুরছে, কপালের শিরগুলো দপ দপ করছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন। মনে হচ্ছে, কেউ যদি আমাকে এখন অমৃতও এনে দেয়, হাত তুলে আমি তা নিতে পারব না। বিশ্রাম ছাড়া এখন আমার আর কিছু কাম্য নেই। কিন্তু কোথায় কেমন ক'রে তা পাব?"

"ভয় পেয়ো না বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রামের সময় আসছে তোমার এবার। তোমার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মলিনতাও এবার ধুয়ে যাবে। শুভ্র মেঘের মতো নির্মল হবে তুমি। কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চল।"

ক্রমশ মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনার গৃহের সমীপবর্তী হইলেন। দেখিতে পাইলেন শিলা-নিবাসের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষচূড়াগুলি শিশিরস্নাত হইয়া প্রভাতের মৃদু কিরণে কম্পিত হইতেছে। মর্মরমূর্তি-পরিবেষ্টিত একটি প্রাঙ্গণে কয়েকটি শিলাসন ছিল, নিরঞ্জনা তাহারই একটিতে বসিয়া পড়িল, সাবর্ণির দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে তা হ'লে কি করতে হবে বলুন।"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "তোমাকে যিনি খুঁজতে এসেছেন তাঁকে অনুসরণ করতে হবে। যারা সুরা প্রস্তুত করে তারা যেমন পচে যাবার আগেই আঙুরগুলো লতা থেকে তুলে নেয়, তিনিও তেমনিভাবে তোমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন সংসার থেকে। এখনই এখান থেকে আমরা চলে যেতে চাই। এখনই যদি সোজা আমরা পশ্চিম দিকে বেরিয়ে পড়ি তা হ'লে সন্ধ্যার কিছু পরে শিবানী-আশ্রমে পৌঁছব। সেখানে কেবল শিবের উপাসিকারা থাকেন। অনেক তপস্বী আছেন সে আশ্রমে। আশ্রমের নিয়মগুলি এত সুন্দর, জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সেগুলিতে যে, মনে হয় যদি কোনও ছান্দসিক গায়ক ওগুলি সঙ্গীতে গেঁথে বীণা-তম্বুরা সহযোগে গান করেন তা হ'লে ধর্মকাব্য হিসাবে রসিক সমাজে তা চিরকাল আদর পাবে। যে সব তপস্বিনী সেখানে থাকেন, তাঁরাও দেবী-স্বরূপিণী। ধরণীর মৃত্তিকার উপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বর্গের দিকে। মর্তলোকেই দেবলোক সৃষ্টি করেছেন তাঁরা; মনে হয় তাঁরা মানবী নন,

দেবকন্যা। মহাভিক্ষুক শিবের প্রসাদ লাভ করবার জন্যে তাঁরা সকলেই ভিখারিণী হয়েছেন, কেউ উমার মতো, কেউ বা সতীর মতো শিবের তপস্যা করছেন। শুনেছি স্বয়ং শিবও নাকি মাঝে মাঝে নানা বেশে দেখা দেন তাঁদের, উমার কাছে যেমন এসেছিলেন বৃদ্ধের রূপে, অর্জুনের কাছে কিরাতবেশে। এই শিবানী-আশ্রমেই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে ওদের সাহচর্য লাভ করে নিজেই তুমি বুঝবে কি পবিত্র স্থানে তুমি এসেছ। তাঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তুমি গেলেই ভগ্নীর মতো সস্নেহে সাদরে তোমাকে সম্বর্ধনা করবেন তাঁরা। আশ্রমজননী শুভ্রধারা নিজে আশ্রমদ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার ললাট চুম্বন ক'রে বলবেন, "কন্যা, স্বাগত।"

নিরঞ্জনা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "শুভ্রধারা! রাজকন্যা শুভ্রধারা!"

"হ্যাঁ, তিনিই। বিলাসবেশ পরিত্যাগ ক'রে তিনি গৈরিক ধারণ করেছেন বহুকাল পূর্বে। যিনি বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন, একজনের সেবিকা হয়ে তিনি ধন্য মনে করছেন নিজেকে।"

নিরঞ্জনার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইল। সে সাগ্রহে বলিল, "আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর কাছে।"

তাঁহার অভিযান সফল হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষি সাবর্ণি হৃষ্ট হইলেন। নিজের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর করিয়া বলিলেন, "সেখানেই তো নিয়ে যাব তোমাকে। নিয়ে গিয়ে প্রথমে পৃথক একটি ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করব তোমার। প্রথমে তোমাকে কিছুদিন অনুতাপ করতে হবে। নির্জন ঘরটিতে ব'সে বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ করবে তুমি। নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত শিবানী-আশ্রমের উপাসিকাদের সঙ্গে মেশাটা সমীচীন হবে না তোমার পক্ষে। তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেলে তখন তুমি মিশবে। তোমাকে একটি ঘরে পুরে স্বহস্তে তাতে তালা লাগিয়ে দেব। ভয় পেয়ো না, তোমার এ বন্দিত্ব মুক্তিরই সূচনা। যে মুহূর্তে তুমি যোগ্যতা অর্জন করবে সেই মুহূর্তে স্বয়ং শিব এসে তোমার দ্বার উন্মোচন ক রে দেবেন। আমার কথা অবিশ্বাস ক'রো না, সত্যিই তিনি আসবেন। যখন আসবেন তখন নিজেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আনন্দ-শিহরণ জাগবে, মনে হবে যেন অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছ।"

নিরঞ্জনা পুনরায় বলিল, "শুভ্রধারার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।"

সাবর্ণি পুলকচিত্তে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যে পার্থিব সৌন্দর্যকে তিনি এতকাল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই পার্থিব সৌন্দর্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। চক্ষু দিয়া তাঁহার অন্তর যেন আলোকধারা পান করিতে লাগিল,

কোথাকার অজানা সমীরণ তাঁহার তপ্ত ললাট স্নেহভরে স্পর্শ করিয়া গেল। সহসা প্রাঙ্গণের এক কোণে শিলা-নিবাসের প্রবেশপথটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। করিবামাত্র তাঁহার মনে পড়িল, সমীরণ-কম্পিত যে তরুশীর্ষগুলিকে তিনি এতক্ষণ সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন সেগুলি এতকাল এই রূপজীবার পাপ-নিবাসকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাও মনে হইল, যে প্রভাত-সমীরণকে এখন এত পবিত্র মনে হইতেছে, তাহা বহু ব্যভিচারী লম্পটের নিশ্বাসবায়ুতে দূষিত। এসব মনে হওয়াতে তাঁহার অন্তর দুঃখে বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এত কষ্ট হইল যে, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন, "নিরঞ্জনা, আমরা কোন দিকে না চেয়ে এখনই এখান থেকে পালাই চল। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। যে সব উপকরণ, বিলাসের যে দ্রব্য-সম্ভার তোমার কলুষিত অতীত জীবনের সাক্ষী হয়ে আছে, যে সব জিনিস তোমাকে এতকাল মিথ্যা মোহবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল—ওই পরদা, ওই বিছানা, ওই ফুলদানি, ধূপদানি, ওই দীপাধার, ওই সব পরিচ্ছদ, তুমি চ'লে গেলেও তারা তো তোমার কুকীর্তি ঘোষণা করতে থাকবে। এই অশুচি জিনিসগুলোকে নিয়ে যাওয়াও চলবে না। ওদের মধ্যে পাপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ওদের সংসর্গ করলেই প্রচ্ছন্ন পাপ আবার প্রকট হয়ে উঠবে, নানা ইঙ্গিতে কথা কইবে, দুর্নিবার আকর্ষণে আবার টানবে তোমাকে। ওদের অস্তিত্ব লোপ করতে হবে। যা যা তোমার অতীত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিল, সব ধ্বংস ক'রে ফেল। দেরি ক'রো না, এই সুযোগ। শহরের লোকেরা এখনও জাগেনি, সবাই ঘুমুচ্ছে। তোমার ক্রীতদাসদের আদেশ দাও, এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে তারা কাঠ স্তূপীকৃত করুক, তাতে আগুন দিয়ে, এস, তোমার অতীত জীবনের পাপের প্রতীকগুলোকে অগ্নিমুখে সমর্পণ করি। ভস্মীভূত হয়ে যাক তারা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।"

নিরঞ্জনা সম্মত হইল।

বলিল, "আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। আপনি ঠিকই বলেছেন, অশরীরী প্রেতাত্মারা অনেক সময় প্রাণহীন জিনিসকে আশ্রয় ক'রে থাকে। আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। গভীর রাত্রে এক-একটা জিনিস যেন নানা কৌশলে কথা বলে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর টক টক ক'রে শব্দ হয় কোনটা থেকে, কোনটা থেকে মনে হয় যেন আলোর ঝিলিক বেরুচ্ছে। শিলা-নিবাসে ঢোকবার মুখেই একটি নারীর মর্মর মূর্তি আছে। দেখেছেন নিশ্চয়, সে যেন স্নান করতে যাবার আগে কাপড়

ছাড়ছে। একদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জীবন্ত মানুষের মত সে যেন ঘাড় ফেরাল। আমার এত ভয় হয়েছিল কি বলব! এ কথা সিন্ধুপতিকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না, আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। আমার বিশ্বাস ওই মর্মর মূর্তিটার প্রাণ আছে। একবার এক মস্ত ধনী যুবক আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে দেখে নয়, ওই মর্মর মূর্তিটি দেখে তিনি কামোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সে কি কাণ্ড! ঠিকই বলেছেন আপনি, একটা অদৃশ্য যাদুলোক ঘিরে আছে আমাকে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রাণহীন মূর্তিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কত লোক প্রাণ দিয়েছে। তবে এতগুলো দামী জিনিস একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলবেন? ওগুলো বড় বড় শিল্পীদের প্রতিভার নিদর্শন। ও রকম পরদা আর সৃষ্টি হবে না। ওগুলো যদি পুড়িয়ে দেন অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কয়েকটা পর্দায় অদ্ভুত রঙের উপর যে সূক্ষ্ম জরির কাজ আছে তা সত্যিই অতুলনীয়। যাঁরা আমাকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন, অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তাঁদের অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এজন্য। আমার কাছে এমন সব পানপাত্র, মূর্তি আর ছবি আছে যা দুষ্প্রাপ্য। বহু অর্থব্যয় করলেও যা আর পাওয়া যাবে না। ওগুলো এমন ভাবে নষ্ট করবার প্রয়োজন কি? কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিলেও তো হয়। কিন্তু আপনিই ভাল জানেন—কি উচিত, কি অনুচিত। আপনি যা করতে চান করুন। আমি আপত্তি করব না।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনা সাবর্ণির পিছু পিছু শিলা-নিবাসে প্রবেশ করিল।

ঘরের দেওয়ালে বহুরকম মুকুট, মাল্য এবং চিত্র বিলম্বিত ছিল। ঘরে ঢুকিয়া নিরঞ্জনা দ্বারপালকে আদেশ করিল সমস্ত ক্রীতদাসকে ডাকিয়া আনিতে। তাহারা যখন আসিতে লাগিল তখন সাবর্ণি লক্ষ্য করিলেন যে, নিরঞ্জনার ক্রীতদাসরাও অসাধারণ। প্রথমেই আসিল চারিজন পীতকায় চীনা সূপকার, তাহারা প্রত্যেকেই একচক্ষু। একই জাতের চারিটি একচক্ষু ক্রীতদাস সংগ্রহ করা সহজ নহে, প্রচুর অর্থসাপেক্ষও বটে। ইহাদের দেখিয়া নিরঞ্জনার অতিথিরা যথেষ্ট আমোদ পাইতেন। কি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া চক্ষু নষ্ট হইল সে কাহিনী নিরঞ্জনার আদেশে তাহারা অতিথিদের শুনাইত। তাহাদের পরে একে একে আসিল ঘোড়ার সহিসেরা, শিকারীরা, পাল্কী-বাহকেরা, দুইজন লোমশ মালী ও ছয়জন ভীষণ-দর্শন কাফ্রী। তিনজন গ্রীসদেশীয় যবন ক্রীতদাস তাহার পরে আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল বৈয়াকরণিক, একজন কবি এবং

একজন গায়ক। তাহারা প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আসিল কয়েকজন ঘূর্ণিতলোচনা, বিকটবদনা, অদ্ভুতদর্শন কাফ্রী রমণী। তাহাদের পিছু পিছু ধীর মন্থরগমনে বেশবাস সম্বরণ করিতে করিতে ছয়জন শ্বেতকায় রূপসী ক্রীতদাসীও সর্বশেষে আসিল। সার্বণি লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ে পাতলা স্বর্ণ-শৃঙ্খল রহিয়াছে। প্রত্যেকের মুখভাবও অপ্রসন্ন। সকলে সমবেত হইলে নিরঞ্জনা মহর্ষি সার্বণিকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি যা করতে বলেন তাই কর তোমরা। ইনি সিদ্ধপুরুষ, এঁর আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু হবে।"

তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্যই যে নিরঞ্জনা এ কথা বলিল তাহা নয়, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করিত। সে শুনিয়াছিল হিমালয়বাসী শৈব সাধুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁহারা কাহাকেও যদি দণ্ড দ্বারা আঘাত করেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ধূম নির্গত হয় এবং আহত ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

মহর্ষি সার্বণি ক্রীতদাসীদের বিদায় করিয়া দিলেন। যবন ক্রীতদাস তিনটিকেও তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তাহাদের চেহারাও কমনীয়, অনেকটা নারীর মতো। অবশিষ্ট ক্রীতদাসদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "এই উঠানের মাঝখানে অনেক কাঠ এনে জমা কর। তারপর তাতে আগুন দাও। বিরাট একটা চিতার মতো প্রস্তুত কর। চিতার আগুন যখন বেশ জ্ব'লে উঠবে তখন সেই লেলিহান শিখায় এ বাড়ির সমস্ত বিলাসসামগ্রী এনে এনে ফেল। বাড়ির বাইরে চারিদিকে যা যা আছে তাও আন। সমস্ত পুড়িয়ে ফেল।"

আদেশ শুনিয়া ক্রীতদাসেরা ঘাবড়াইয়া গেল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল সকলে। আড়চোখে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিরঞ্জনাকেও নীরব নিস্পন্দ দেখিয়া তাহারা পরস্পরের আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহাদের সন্দেহ হইতে লাগিল, ব্যাপারটা হয়তো রসিকতা।

"যা বললাম তা কর।"—মহর্ষি পুনরায় আদেশ দিলেন।

ক্রীতদাসরা যখন হৃদয়ঙ্গম করিল যে ব্যাপারটা রসিকতা নহে, তখন তাহারা তৎপর হইয়া উঠিল। অনেকে মনে মনে খুশীও হইল। যাহারা দরিদ্র তাহারা সাধারণত ধনীর ঐশ্বর্যকে সুচক্ষে দেখে না, সে ঐশ্বর্যকে ধ্বংস বা লুণ্ঠন করিতে পারিলে তাহারা আনন্দিত হয়। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে এবং সানন্দে চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মহর্ষি সার্বণি নিরঞ্জনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এক-একবার মনে হচ্ছিল, তোমার এই সব মহার্ঘ বিলাস-উপকরণ, স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তা প্রভৃতি

ঐশ্বর্য কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে দান ক'রে দিই; মনে হচ্ছিল, যা একদিন ঘৃণ্যতম পাপের সহায়ক হয়েছে তা পুণ্যকর্মে উৎসর্গিত হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, আমার এ চিন্তা নিতান্ত বৈষয়িক চিন্তা, ঈশ্বরের প্রেরণা এর উৎস নয়। তাছাড়া কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এসব জিনিস দান করা সে প্রতিষ্ঠানকে, সে প্রতিষ্ঠানের মহত্ত্বকে অপমান করা। তুমি যে সব জিনিস ব্যবহার করেছ, এমন কি যা তুমি স্পর্শও করেছ সে সবের একমাত্র সদ্‌গতি হচ্ছে অগ্নি। সমস্ত পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার যে সব ওড়না, যে সব শাড়ি, যে সব অলঙ্কার অসংখ্য প্রণয়ীর অসংখ্য চুম্বনে কলঙ্কিত হয়েছে, লেলিহান অগ্নিশিখার স্পর্শে তারা পবিত্র হোক। এর মধ্যে করুণাময় শঙ্করের অমোঘ বিধান যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। ক্রীতদাসরা দেরি করছে কেন? সব শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। তুমিও ভিতরে গিয়ে তোমার শাড়ি, ওড়না, গয়না, ফুলের মালা ছেড়ে তোমার দাসীদের মধ্যে যে সব চেয়ে গরীব তার কাছ থেকে একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে সেইটে পরো। কারণ যে দেবতার কৃপালাভ করবার জন্য তুমি যাচ্ছ, তিনি নিজেই ভিখারী, দিগম্বর। সমস্ত ত্যাগ ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে।"

নিরঞ্জনা আপত্তি করিল না, ভিতরে চলিয়া গেল। ক্রীতদাসগণ প্রাঙ্গণে কাষ্ঠের স্তূপ সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল; অগ্নি যেই ধরিয়া উঠিল অমনি তাহারা গৃহসজ্জার মহার্ঘ উপকরণগুলি বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হস্তীদন্তের, মেহগিনির, চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্যখচিত পেটিকাগুলির ভিতর হইতে কত যে মূল্যবান রত্নখচিত মুকুট হার কঙ্কণ অঙ্গুরীয় বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। সমস্তই একে একে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল। কুণ্ডলায়িত কৃষ্ণ ধূমরাশি ধীরে ধীরে বিরাট স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার পর ভীষণ একটা শব্দ হইল, মনে হইল একটা দানব যেন সহসা গর্জন করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই অগ্নিদেব রুদ্রমূর্তিতে প্রকটিত হইলেন, দৃশ্য এবং অদৃশ্য শিখা লকলক করিয়া উঠিল, নিরঞ্জনার অলঙ্কারগুলিকে তিনি যেন গ্রাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রীতদাসগণের উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল। তাহারা দ্বারে দ্বারে দোদুল্যমান স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত পরদাগুলিও টানিয়া টানিয়া আনিয়া আগুনের ভিতর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভারী টেবিল, সোফা, বিছানা ও খাটের গুরুভারে তাহাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের উৎসাহ কমিল না। তিনজন বলিষ্ঠ কাফ্রী বহুবর্ণবিচিত্র অপ্সরী-মূর্তিগুলি দুই হাতে জাপটাইয়া তুলিয়া আনিতেছিল, তাহার মধ্যে স্নানোদ্যতা সেই অপ্সরীটিও ছিল, যাহার প্রেমে পড়িয়া

একজন ধনীপুত্র পাগল হইয়া গিয়াছিল। প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে মনে হইতেছিল তিনটি দৈত্য বুঝি নারীহরণ করিতেছে। মর্মর মূর্তিগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গেল, তখন মহর্ষি সার্বণি যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন।

ঠিক এই সময়ে নিরঞ্জনাও বাহির হইয়া আসিল। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি, তাহার নগ্নপদ, অতি সাধারণ বস্ত্রাবৃত তাহার অনুপম দেহলাবণ্য তাহাকে যেন নূতন মহিমা দান করিয়াছিল, মনে হইতেছিল, মূর্তিমতী কামনা যেন সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিয়াছে। বাগানের মালীটিও তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সে হস্তিদন্তনির্মিত কামদেবের একটি মূর্তি লুকাইয়া আনিয়াছিল। নিরঞ্জনা ইঙ্গিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া মহর্ষি সার্বণির দিকে আগাইয়া গেল। ক্ষুদ্র মূর্তিটি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "এটিকেও কি আগুনে ফেলে দিতে বলেন? এ মূর্তিটি অতি প্রাচীন, শিল্পের অতি অদ্ভুত নিদর্শন। কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও এটিকে আর পাওয়া যাবে না। নষ্ট হয়ে গেলে চিরকালের মতো চ'লে যাবে এটি। এখন পৃথিবীতে এমন কোন শিল্পী নেই যিনি ঠিক এর মতো আর একটি কামদেব নির্মাণ করতে পারেন। আর একটি কথাও আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। কামদেব প্রেমের দেবতা, তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে অপমান করা কি উচিত হবে? প্রেমই কী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? আমি জীবনে যদি কোন পাপ ক'রে থাকি তা প্রেমের পথে না গিয়েই করেছি, এঁর প্ররোচনায় নয়—এর নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রেই করেছি। এঁর নির্দেশে যা করেছি তার জন্য আমি একটুও অনুতাপ করি না, যা করিনি তার জন্যই আমি অনুতপ্ত। ইনি প্রেমের পায়েই আত্মসমর্পণ করতে বলেন, পশুর পায়ে নয়। সর্বধর্মের ইনিই প্রধান দেবতা, তাই ইনি পূজনীয়। আপনি ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটির গঠননৈপুণ্য কি অপূর্ব! মনে হচ্ছে মালীর দাড়ির ঝোপে একটি জীবন্ত শিশু যেন লুকিয়ে আছে। সিন্ধুপতি যখন আমার প্রণয়ী ছিল তখন এটি আমাকে উপহার দিয়েছিল, বলেছিল, 'এ আমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে।' কিন্তু কামদেব তার কথা আমাকে একদিনও মনে করিয়ে দেয়নি, দিয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থের একটি যুবকের কথা, যাকে সত্যিই আমি ভালবেসেছিলাম। সবই তো পুড়িয়ে দিলেন আপনি, এটিকে পোড়াবেন না। এটিকে বরং কোন মন্দিরে দান ক'রে দিন। যে একে দেখবে সেই মুগ্ধ হবে, তারই মন পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রেমই তো ঈশ্বর।"

মালীটি ভাবিল, কামদেব বুঝি রক্ষা পাইলেন। সে মূর্তিটিকে স্নেহভরে আদর

করিতে লাগিল। সহসা সাবর্ণি তাহার হাত হইতে মূর্তিটি কাড়িয়া লইয়া সজোরে তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সিন্ধুপতি যখন ও মূর্তিকে স্পর্শ করেছে তখন ও অশুচি হয়ে গেছে। কোনও মন্দিরে স্থান পাবার যোগ্যতা ওর নেই।"

তাহার পর তিনি পাগলের মতো ওড়না, আয়না, চিরুনি, সেতার, এস্রাজ, বীণা, বাঁশী, প্রদীপ, স্বর্ণ-পাদুকা যাহা যাহা কাছে পাইলেন স্বহস্তে সব ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাবণের চিতাও বোধ হয় এমন ভাবে জ্বলে নাই। ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত হইয়া ক্রীতদাসেরা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ধূমে, স্ফুলিঙ্গে, চীৎকারে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিদারুণ শব্দে ঘুমন্ত প্রতিবেশীদের ক্রমশ ঘুম ভাঙিতে লাগিল। তাঁহারা বাতায়ন খুলিলেন এবং চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাহার পর কোথায় আগুন লাগিয়াছে জানিবার জন্য হন্তদন্ত হইয়া সকলে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেকে ইহা পর্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ অসম্পূর্ণ বা বিস্রস্ত রহিয়াছে। সকলেরই মনে মুখে একই প্রশ্ন— ব্যাপারটা কি?

যাঁহারা নিরঞ্জনার বাড়ির সম্মুখে সমবেত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বণিক। নিরঞ্জনা তাঁহাদের একজন প্রধান খরিদ্দার ছিল। অলঙ্কার, আতর, রেশম প্রভৃতি দেশী-বিদেশী বহু জিনিস তাঁহারা নিরঞ্জনার নিকট বিক্রয় করিতেন। ইঁহারা গলা বাড়াইয়া ঠাহর করিবার চেষ্টা করিলেন, ভিতরে এই অগ্নিকাণ্ডের অর্থ কি! যে সব অল্পবয়স্ক ছোকরা সবে উচ্ছন্ন যাইতে শিখিয়াছে, যাহারা হাতে গলায় ফুলের মালা দুলাইয়া ভোরের দিকে স্খলিতচরণে বাড়ি ফিরিতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইয়া পড়িল এবং কোলাহল করিতে লাগিল। ক্রমশ বেশ ভীড় জমিয়া গেল। ক্রমশ এ কথাও আর চাপা রহিল না যে, একজন সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় অভিনেত্রী নিরঞ্জনা তাহার সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া পরলোকের সন্ধানে যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বণিকেরা ভাবিল, নিরঞ্জনা যখন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহার নিকট আর কিছু বিক্রয় করিবার আশা নাই। এমন একটা শাঁসালো খরিদ্দার চিরকালের মতো হাতছাড়া

হইয়া যাইতেছে, এই ভয়ঙ্কর চিন্তা তাহাদের বিচলিত করিয়া তুলিল। এ কথাও তাহাদের মনে হইল, ওই সন্ন্যাসী যাদুমন্ত্রপ্রভাবে নিশ্চয়ই নিরঞ্জনার বুদ্ধি-ভ্রংশ করিয়াছে, তাহা না হইলে এমন একটা অঘটন ঘটিবে কেন! সুতরাং অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন। না করিলে অনেক ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিরঞ্জনাকে কেন্দ্র করিয়াই তো অনেক দোকান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অবশেষে মনে হইল, ওই সন্ন্যাসীকে আমরা এমন অনর্থ করিতে দিব কেন? আমরা বাধা দিব। দেশে কি আইন নাই? বিচারক নাই? নিরঞ্জনা সমস্ত পাটলিপুত্রের সম্পদ, একটা সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, চালাকি না কি! তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

অল্পবয়স্ক ছোকরারা ক্ষুব্ধ হইল অন্য কারণে। তাহাদের মনে হইল, নিরঞ্জনা যদি চলিয়া যায় তাহা হইলে তো সব গেল, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ অভিনয় উৎসব নিবিয়া যাইবে। রঙ্গমঞ্চে নিরঞ্জনাই তো সম্রাজ্ঞী। নিরঞ্জনার নাগাল পাইবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, নিরঞ্জনা তাহাদেরও আনন্দের উৎস। তাহারা তাহাদের প্রণয়িনীদের মধ্যে কল্পনায় নিরঞ্জনাকেই চুম্বন করে, আলিঙ্গন করে। সমস্ত পাটলিপুত্রই নিরঞ্জনাময়। সে আছে বলিয়াই পাটলিপুত্রের আকাশ বাতাস মদির, তাহার অস্তিত্বই সকলকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছে।...

যুবকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। শ্রীতিলক নামক এক যুবকের সহিত কিছুকাল পূর্বে নিরঞ্জনার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে তারস্বরে ভণ্ড সন্ন্যাসীদের গালাগালি দিতে লাগিল। অবশেষে সকলেই নিরঞ্জনার আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার মন্তব্য শোনা যাইতে লাগিল।

"এভাবে চ'লে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

"চুরি ক'রে চলে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।"

"আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। হায় হায় হায়।"

"ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সংসার চলবে কি ক'রে! মেয়েগুলোর বিয়ে হবে না যে!"

"নিরঞ্জনাকে যে মুকুটগুলো দিয়েছিলাম তার দাম না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই ওকে যেতে দেব না।"

'আমাকে পঞ্চাশখানা শাড়ি আনতে বলেছে। তার দামও দিয়ে যেতে হবে।"

"চতুর্দিকে ওর ধার। চলে গেলেই হল!"

"ও চলে গেলে দ্রৌপদী, উর্বশী, দময়ন্তী, মেনকার ভূমিকায় অমন অভিনয় আর কে করবে! রোহিণী বা রেবতীর সাধ্য নেই ওর কাছাকাছি হবার।"

"নিরঞ্জনা না থাকলে জীবনই তো অন্ধকার হয়ে গেল হে। পাটলিপুত্রের আকাশে নিরঞ্জনাই সূর্য, নিরঞ্জনাই চন্দ্র, নিরঞ্জনাই নক্ষত্র।"

নগরের সমস্ত ভিক্ষুকরাও সমবেত হইয়াছিল। অন্ধ খঞ্জ পক্ষাঘাতগ্রস্ত গলিত-কুষ্ঠবিক্ষত বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে আসিয়াছিল, কেহ আর বাকি ছিল না। তাহারা জনতার পিছনে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ করিতেছিল।

"নিরঞ্জনা না থাকলে আমরা বাঁচব কি ক'রে? কে আমাদের খাওয়াবে? নিরঞ্জনার রান্নাঘর থেকে শত শত ভিক্ষুক খেতে পায় রোজ। ওর প্রণয়ীরা আমাদের মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে যায় রোজ—এখন আমাদের গতি কি হবে?"

তস্করেরাও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের অন্য মতলব ছিল। তাহারা গগনবিদারী চীৎকার করিয়া জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছিল লুটপাট করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া।

এই কোলাহলের মধ্যে বৃদ্ধ বণিক জনকদেব কেবল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বড় ব্যবসায়ী। গান্ধার হইতে পশমের এবং সমতট হইতে কার্পাস বস্ত্রের আমদানি করিয়া তিনি পাটলিপুত্রের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিতেন। নিরঞ্জনার নিকট তাঁহার বহু টাকা বাকি ছিল। নিরঞ্জনা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চলিয়া যাইতে পারে—এ সংশয় তাঁহার মনে কোনও দিন জাগে নাই। তিনি উৎকর্ণ হইয়া সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের সূক্ষ্মাগ্র দাড়িতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন। তাঁহাকে অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলাইয়া অবশেষে তিনি শ্রীতিলকের সমীপবর্তী হইলেন। বলিলেন, "আপনার সঙ্গে নিরঞ্জনার তো খুব আলাপ ছিল এককালে! চেষ্টা ক'রে দেখুন না একটু, সন্ন্যাসীটার কবল থেকে যদি ওকে ছাড়াতে পারেন!"

"সন্ন্যাসীর সাধ্য কি ওকে নিয়ে যায়! মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে না কি! যাচ্ছি আমি নিরুর কাছে। জাঁক করছি না, তবে আমার বিশ্বাস এতদিন পরে আমাকে কাছে পেলে ওই ভূতুড়ে সন্ন্যাসী আর আমল পাবে না। কি কালো রঙ বাবা! যেন ঝুল মেখে রয়েছে। মানুষের এ রকম রঙ দেখেছেন আপনি এর আগে? একটা ভালুক যেন! ওহে, সর সর, আমাকে যেতে দাও।"

শ্রীতিলক কাহাকেও ধাক্কা দিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া অবশেষে নিরঞ্জনার কাছে গিয়া হাজির হইলেন এবং তাহাকে এক ধারে ডাকিয়া বলিলেন, "নিরু, চিনতে পারছ আমাকে? কি কাণ্ড করছ তুমি!

তুমি চলে যাবে শুনে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। এখনও তোমাকে ভুলতে পারিনি নিরু, তোমাকে ভোলা যায় কি—তুমিই বল?"

শ্রীতিলক আর বেশী কিছু বলিবার অবকাশ পাইলেন না। মহর্ষি সাবর্ণি সগর্জনে অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন।

"পাষণ্ড, মৃত্যুভয় যদি থাকে নিরঞ্জনার অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। নিরঞ্জনা আর নটী নেই। সে এখন নিষ্পাপ, সে এখন ঈশ্বরের। স'রে যাও এখান থেকে।"

"তুই বেটা সরে যা, কুত্তা কোথাকার!"—ক্রোধে শ্রীতিলকের মুখ হইতে অভব্য ভাষা বাহির হইয়া পড়িল—"আমি আমার পুরনো সইয়ের সঙ্গে কথা কইছি, তুই শালা ভালুক সামনে এসে দাঁড়ালি কোন্ আক্কেলে? তোর ওই দাড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তোকেই ওই আগুনের মধ্যে ফেলে দেব জানিস? বাঁদরামি করবার জায়গা পাওনি তুমি? মেয়েমানুষকে ভোজবাজি দেখিয়ে পার করবে ভেবেছ? আমার প্রাণ থাকতে তা পারবে না।"

শ্রীতিলক নিরঞ্জনার দিকে পুনরায় হস্ত-প্রসারণ করিতেই মহর্ষি সাবর্ণি আচমকা তাঁহাকে এমন জোরে একটা ধাক্কা দিলেন যে, তিনি মুখ থুবড়াইয়া সেই জলন্ত স্তূপের নিকট পড়িয়া গেলেন। আর একটু হইলে তাঁহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যাইত।

বৃদ্ধ জনকদেব এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এইবার সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি মহর্ষি সাবর্ণির বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শ্রীতিলককে সন্ন্যাসী প্রহার করিয়াছে—এই অজুহাতে ক্ষিপ্ত জনতাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবেন। হইলও তাই। অনতিবিলম্বে একদল লোক সাবর্ণিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীতিলকের কাপড়ে আগুন লাগে নাই বটে, কিন্তু মাথার চুল একটু ঝলসাইয়া গিয়াছিল। ক্রোধে এবং ধূমে তিনি প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও জনতার সহায়তা লইয়া সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিবেন ঠিক করিয়া উন্মত্তের মতো তাহাদের দলে যোগ দিলেন এবং গালাগালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিছু পিছু দণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে ভিখারীর দলও আসিতে লাগিল। ভিখারীদের মধ্যে যাহারা চলচ্ছক্তি-রহিত তাহারাও ক্ষান্ত হইল না। হামাগুড়ি দিয়া দল বৃদ্ধি করিল। অচিরাৎ মহর্ষি সাবর্ণি ও নিরঞ্জনাকে ঘিরিয়া যেন একটি অরণ্য গড়িয়া উঠিল—ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু ও দণ্ডের অরণ্য। তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। জনতা চীৎকার করিতে লাগিল।

"খুন কর সন্ন্যাসীকে।"

"আগুনে ঠেলে ফেলে দাও। জীবন্ত পোড়াও ব্যাটাকে।"

সার্বর্ণি নিরঞ্জনাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মূঢ় পাষণ্ডের দল, তোমরা কি নিজেদের শঙ্করের চেয়েও শক্তিমান ভেবেছ? যে নারী স্বেচ্ছায় শঙ্করের চরণে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে তোমরা ছিনিয়ে নিতে চাও? ছিনিয়ে নিতে পারবে? এত শক্তি কি আছে তোমাদের? এ হাস্যকর ব্যাপারে না যেতে তোমরা বরং নিরঞ্জনাকেই অনুসরণ কর। যদি করতে পার তোমাদের মধ্যে যা কর্দমের মতো মলিন হয়ে আছে তা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। যে মিথ্যা বন্ধন তোমাদের ক্রীতদাসের মতো পরাধীন ক'রে রেখেছে তা ছিন্ন কর, নিরঞ্জনা যেমন করছে। বিলম্ব ক'রো না, শঙ্কর তোমাদের সকলের জন্যই অপেক্ষা করছেন, আর কতকাল তিনি অপেক্ষা করবেন? কালের করাল গহ্বরে পশুর মতো বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর শরণ নিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ কর। তোমাদের উদ্ধারের এখন একমাত্র উপায় অনুতাপ করা। জীবনে যে সব পাপ করেছ অকপটে তা স্বীকার কর, কাঁদ, প্রার্থনা কর, শঙ্কর তোমাদেরও চরণে স্থান দেবেন, নিরঞ্জনাকে যেমন দিয়েছেন। তোমাদের পাপও ওর চেয়ে কিছু কম নয়। এখানে তোমাদের মধ্যে একজনও কি আছে যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, গণিকার চেয়ে সে কম পাপী? তোমরা প্রত্যেকেই তো মূর্তিমান কদর্যতা। শঙ্করের দয়াতেই কেবল তোমাদের নাক মুখ দিয়ে নর্দমার মতো ময়লা বেরোয় না।"

মহর্ষি সার্বর্ণির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার বাক্য-গুলিও যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তাঁহার মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা কয়েক মুহূর্তের জন্যই। বণিক জনকদেব সার্বর্ণির বক্তৃতায় কান দেন নাই, তিনি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেগুলি তিনি ভিক্ষুকদের হাতে হাতে দিয়া ছুঁড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। মহর্ষি সার্বর্ণির কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তাঁহার কপালে আসিয়া আঘাত করিল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রক্তধারা তাঁহার গাল বাহিয়া টপ টপ করিয়া নিরঞ্জনার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল, তপস্যাক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ বুঝি শোণিতে পরিণত হইয়া তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। সার্বর্ণি নিরঞ্জনাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার কর্কশ বহির্বাসের ঘর্ষণে তাঁহার সুকোমল অঙ্গ পীড়িত হইতেছিল, রক্তপাত দেখিয়া তাহার অন্তর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া সিন্ধুপতি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বর্ণচম্পকশোভিত মূল্যবান শিরস্ত্রাণটি দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। শীলভদ্রের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন। নিরঞ্জনার বাড়ির পাশ দিয়াই রাস্তা। হট্টগোল শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর ভীড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিলা-নিবাসের সমীপবর্তী হইলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। তিনি যেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইলেন। নিরঞ্জনার ছিন্ন মলিন বেশ, বিরাট অগ্নিস্তূপ এবং রক্তাক্ত সাবর্ণিকে দেখিবেন—এ প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। কয়েক মুহূর্ত তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না, কোন কিছুতেই বেশী বিস্মিত বা বিচলিত তিনি হইতেন না। কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার বাল্যবন্ধুটি ক্ষিপ্ত জনতার কবলে পড়িয়াছে তখন আর অবিচলিত দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকাটা উচিত মনে হইল না। হাত তুলিয়া তিনি সকলকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

"থাম, থাম, এ কি করছ তোমরা ? এই সন্ন্যাসী আমার বাল্যবন্ধু, নিজের লোক, পাগলের মতো তোমরা করছ কি ?"

সিন্ধুপতির বাক্‌চাতুর্য দার্শনিক মহলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, কিন্তু মূর্খ জনতাকে শান্ত করিতে পারে এমন উগ্র বাগ্মিতা তাঁহার ছিল না। কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করিল না। সাবর্ণির মাথার উপর আর এক প্রস্থ শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। সাবর্ণি সর্বাঙ্গ দিয়া নিরঞ্জনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং লোষ্ট্রের আঘাতকে শঙ্করের অনুগ্রহ ভাবিয়া তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সিন্ধুপতি উচ্চতম গ্রামে চীৎকার করিয়াও যখন উন্মত্ত জনতাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না তখন যে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারই হস্তে সাবর্ণি ও নিরঞ্জনাকে সমর্পণ করিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সাধারণ ইতর লোকের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কোন কালেই উচ্চ ছিল না। তাহাদের তিনি দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মনে হইল, একটা কৌশল করিলে ইহারা হয়তো নিবৃত্ত হইবে। তিনি ধনী এবং শৌখীন লোক ছিলেন, সঙ্গে সর্বদা কিছু অর্থ থাকিত। তখন তাঁহার সঙ্গে একটি থলিতে কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। তিনি থলিটি লইয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপকারীদের মধ্যে ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাদের কানের কাছে থলিটি নাড়িতে লাগিলেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের মধুর নিক্বণও প্রথমে তেমন কার্যকরী হইল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইল।

যে সব ভিক্ষুক উন্মত্তবৎ ঢিল ছুঁড়িতেছিল তাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সিন্ধুপতি তখনই থলি খুলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ফল হইল। সকলে টাকা ও মোহর কুড়াইতে লাগিল। কৌশল সফল হইয়াছে দেখিয়া সিন্ধুপতি চারিদিকে অনেক দূরে দূরে টাকা ছুঁড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুক, ক্রীতদাস ও বণিকের দল মাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শ্রীতিলককে ঘিরিয়া যে সব অভিজাতবংশীয় যুবক দাঁড়াইয়াছিল, মজা দেখিয়া তাহারা অট্টহাস্য করিতে লাগিল। শ্রীতিলকের ক্রোধ প্রশমিত হইয়াছিল। নূতন মজা দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা প্রলুব্ধ জনতাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহারা নিজেরাও পয়সা টাকা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত প্রান্তরে আর মানুষের মাথা দেখা গেল না, চারিদিকেই কেবল ন্যুব্জপৃষ্ঠ। মনে হইতে লাগিল, যেন আকাশ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য বৃষ্টি হইতেছে এবং এক অদ্ভুত জন-সমুদ্রের তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতেছে। সাবর্ণির কথা সকলে ভুলিয়া গেল।

সিন্ধুপতি তখন তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। নিজের গাত্রাবাস দিয়া তাঁহাকে এবং নিরঞ্জনাকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের পাশের একটা রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর তিনজনেই কিছুক্ষণ নীরবে ছুটিতে লাগিলেন। জনতার নিকট হইতে দূরে গিয়া যখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, জনতা আর তাঁহাদের নাগাল পাইবে না তখন তাঁহাদের গতিবেগ মন্দীভূত হইল।

সিন্ধুপতি তখন নিরঞ্জনার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "সাধুর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তা হ'লে! রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল বটে, কিন্তু তাকে অরণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, সাবর্ণি ঠিক উল্টোটা করলে। নগর থেকে তোমাকে অরণ্যে নিয়ে চলল।"

নিরঞ্জনা উত্তর দিল, "তার কারণ আপনাদের সঙ্গ আমার আর ভাল লাগছিল না। আপনাদের ঐশ্বর্যের নানা আড়ম্বর, আপনাদের মেকি মুখোশ আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। জীবনে আজ পর্যন্ত যা জেনেছি, যা ভোগ করেছি, তার সম্বন্ধে এতটুকু মোহ নেই আর। তাই অজানার সন্ধানে বেরিয়েছি। আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু অন্তত বুঝেছি যে, যা আমরা আনন্দ ব'লে উপভোগ করি তা প্রকৃত আনন্দ নয়। মহর্ষি বলেছেন—দুঃখই প্রকৃত আনন্দের উৎস। তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, কারণ সারাজীবন উনি সত্যেরই সন্ধান করেছেন।"

সিন্ধুপতি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু পেয়েছেন একটি মাত্র সত্য। আমি

সারাজীবন সন্ধান ক'রে অনেক সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সে হিসেবে আমি ওঁর চেয়ে বড় সত্যদর্শী। কিন্তু সে জন্য আমি গর্ব অনুভব করি না, সে জন্য বেশী সুখীও হইনি।"

সাবর্ণি তাঁহার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সিন্ধুপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি যেন মনে ক'রো না যে, আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি বা তোমার আচরণ অযৌক্তিক মনে করেছি। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার তুলনা করলে কোন্‌টা বেশী ভাল তা নির্ণয় করতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। সুনন্দা আর সুছন্দা আমার স্নানের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। আমি ফিরে গিয়ে এখন স্নান করব, তারপর মধ্যপ্রদেশের অরণ্য থেকে আহরিত শূল্যপক্ক একটি তিত্তির পক্ষী আহার করব। তারপর পড়ব কালিদাস বা ভবভূতি। অনেকবার পড়েছি, তবু পড়ব। তুমি তোমার পর্ণকুটিরে ফিরে গিয়ে তোমার শিবলিঙ্গের সামনে উটের মতো হাঁটু গেড়ে বসবে, তারপর যে সব প্রাণহীন মন্ত্র সহস্রবার আউড়েছ সেগুলিই বোধ হয় আবার আওড়াবে, তারপর কিছু শুষ্ক ফল-মূল খাবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমাদের দুজনের জীবন দু রকম ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য এক। সমস্ত মানবজাতিরই ওই এক লক্ষ্য—আনন্দ লাভ করা, যা করা অসম্ভব, যা পাওয়া যায় না, আলেয়ার মতো যা কেবল সকলকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তোমাকে উপহাস ক'রে খেলো করবার অধিকার আমার নেই, যদিও আমি আমার নিজের জীবনযাত্রার ধরনটাকেই বেশী পছন্দ করি। নিরঞ্জনা, তোমাকেও বাধা দেবার চেষ্টা আমি করব না। তুমি ওর সঙ্গেই যাও। বিলাস, ঐশ্বর্য, সঙ্গীত, অভিনয়, খ্যাতি প্রভৃতির মধ্য থেকে এতদিন তুমি যা পেয়েছ, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাবার আশা যদি পেয়ে থাক, কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে এর চেয়ে বেশী সুখী হওয়া তোমার পক্ষে যদি সম্ভবপর হয়, তা হ'লে সে সুখ লাভ কর গিয়ে। সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তুমি অভাবনীয় একটা সুযোগও পেয়ে গেছ। আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছ। আমি এবং সাবর্ণি প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে মাত্র একটি পথ বেছে নিয়েছি, সেই পথ অনুসরণ ক'রেই সুখের সন্ধান করছি। তুমি একটা পথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আর একটা পথে পা বাড়াচ্ছ। এ সুযোগ সকলের হয় না, তোমাকে আমি ঈর্ষা করি। আমি কিছুক্ষণের জন্যও সাবর্ণির মতো সন্ন্যাসী হবার সুযোগ পেলে খুশী হতাম। কিন্তু তা আমি পাব না, আমার মনের গড়ন আর বদলাবে না। সুতরাং চলি এবার। আমার বিদায় অভিনন্দন

গ্রহণ কর তোমরা। নিরঞ্জনা, তোমার অদৃষ্ট, তোমার প্রকৃতি, তোমার অন্তরের নিগূঢ় প্রেরণা যে পথে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই পথেই যাও তা হ'লে। আমার আন্তরিক শুভ কামনা রইল তোমার সঙ্গে। তোমার নূতন সন্ধান জয়যুক্ত হোক। সুখী হও, যদি পার। বুঝতে পারছি কথাগুলো খুব বাজে শোনাচ্ছে। কিন্তু কি করব বল, যাওয়ার আগে দু-চার কথা বলতেই হবে। যে মোহিনী মায়ায় তুমি আমার জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলে, যার স্মৃতি সুখস্বপ্নের মতো এখনও আমার জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বেদনাময় বৃহৎ ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করা এখন শোভা পায় না, তাই সে সব আর বলব না। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ছিলে। কিন্তু তোমাকে হয়তো আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি। স্বতঃস্ফূর্ত মহিমান্বিতা তুমি, অদ্ভুত রহস্যে রহস্যময়ী, অপূর্ব কিরণে উজ্জ্বল করেছিলে আমার জীবনকে। এবার বিদায় নেবার সময় এসেছে, হাসিমুখে বিদায় দাও। জানি না কোন্ বিধাতা কি উদ্দেশ্যে তোমার মতো অপরূপাকে এই নির্মম পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।"

সিন্ধুপতি যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন মহর্ষি সাবর্ণির অন্তর ক্রোধে পুড়িয়া যাইতেছিল। সহসা তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূর হয়ে যাও তুমি। তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তুমি ঘৃণ্য নরকের কীট। দূর হয়ে যাও। যারা আমাদের এতক্ষণ গাল দিচ্ছিল, আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছিল তাদের চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর তুমি। তারা অজ্ঞ, কি করছে তারা তা জানে না। ওদের মাথায় শঙ্করের আশীর্বাদ একদিন হয়তো বর্ষিত হবে, আমি ওদের জন্যে মনে মনে প্রার্থনাও করেছি, ওদের অন্ধকার জীবন শিবের মহিমা-কিরণে একদিন আলোকিত হবে। কিন্তু তুমি, সিন্ধুপতি, তুমি মূর্তিমান গরল ছাড়া আর কিছু নও, তোমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ। তুমি যেখানে যাবে মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ছড়াতে যাবে। সহস্রমুখ পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর তুমি, তোমার হাসি আরও ভয়ানক। পিশাচেরা এক শতাব্দী চেষ্টা ক'রে যে সর্বনাশ করতে পারবে না, তোমার হাসি এক নিমেষে তা পারবে। তুমি দূর হও।"

সিন্ধুপতি স্নেহভরে তাঁহার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, চললাম তা হ'লে। তোমার ধর্মবিশ্বাস তোমাকে মাত্র দুটি জিনিস দিয়েছে দেখছি—প্রেম আর ঘৃণা। আমরণ সেই দুটিকেই আঁকড়ে থাক। নিরঞ্জনা, চলি তা হ'লে, আর হয়তো দেখা হবে না। আমাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। আমিও পারব না।"

সিন্ধুপতি চলিয়া গেলেন। আঁকাবাঁকা বহু গলি পার হইয়া তিনি অবশেষে

শ্মশানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি দোকানে শবদাহের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। স্তূপীকৃত চন্দনকাষ্ঠগুলির দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিলেন, এইগুলিই তাঁহার জীবন-পথের শেষ সঙ্গী হইবে। ইহাদের ভস্মের সহিত তাঁহার ভস্মও মিশিয়া যাইবে। সহসা তাঁহার মনে হইল, মদনও ভস্মীভূত হইয়াছিল। বুকের কাছটা কেমন যেন ব্যথা করিয়া উঠিল। সান্ত্বনা বহন করিয়া দার্শনিক চিন্তাও উদিত হইল। ভাবিলেন, সময় বা আয়ু কিছু আছে কি? এসব তো মনের ভ্রম মাত্র। আয়ু কিছু নাই, সুতরাং তাহা শেষ হইবে কিরূপে? চিরকাল কি বাঁচিয়া থাকিব? না। বাঁচিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। চিরকাল মৃত্যুর মধ্যেই ছিলাম, আছি এবং থাকিব। ইহাই সত্য। যাহা আমাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে তাহার আগমন-আশঙ্কায় নূতন করিয়া ম্রিয়মান হওয়া মূঢ়তারই নামান্তর। ইহা যেন পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার মতো। পুস্তকটি পড়িতেছি কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। পুস্তকটি মৃত্যু।—এই চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তিনি পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয়ের ভার লঘু হইল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনি নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছন্দা-নন্দার হাস্যকলরব তাঁহাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিল। তাহারা ভিতরে লুকোচুরি খেলিতেছিল।

মহর্ষি সাবর্ণি নিরঞ্জনাকে লইয়া পাটলিপুত্র ত্যাগ করিলেন। গঙ্গার তীর ধরিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি সাবর্ণির ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই। তিনি নিরঞ্জনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতকাল যে সব পাপ তুমি করেছ গঙ্গার সমস্ত জল দিয়েও তা ধুয়ে পরিষ্কার করা যাবে না। তোমার যে দেহ ভগবান নিজের মন্দিরের মতো ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন সেই দেহ তুমি শূকরীর মতো, কুক্কুরীর মতো বিক্রি করেছ ওই সব অধার্মিক লম্পটদের কাছে। তোমার পাপের সীমা নেই। দুরপনেয় পাপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠার মতো লিপ্ত হয়ে আছে তোমার সর্বাঙ্গে।"

নিরঞ্জনা কোন উত্তর দিল না—প্রখর রৌদ্রে, কঙ্করাকীর্ণ পথে নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেক দূর চলিবার পর ক্লান্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইল, পা দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তৃষ্ণায় রসনা শুষ্ক হইল, কিন্তু মহর্ষি সাবর্ণি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সাধারণ মানুষের হয়তো দয়া হইত, কিন্তু তাঁহার হইল না। নিরঞ্জনার কলঙ্কিত দেহটা নির্যাতিত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে এই ভাবিয়া তিনি বরং আনন্দিতই হইলেন। এই পবিত্র ভাব তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, অতীত পাপের সাক্ষ্য বহন করিয়া যে দেহটা এখনও রূপে রসে টলমল করিতেছে, সেই দেহটাকে বেত্রাঘাত করিয়া

বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া দিবার বাসনাও তাঁহার হইল। একটু চিন্তা করিয়া এ বাসনার সমর্থনও তিনি নিজের অন্তর হইতে পাইলেন, বিশেষ করিয়া যখন তাঁহার মনে পড়িল যে নিরঞ্জনা সিন্ধুপতির সহিত একই শয্যায় শয়ন করিয়াছে। এই পাপের বীভৎসতায় তিনি এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া গেল—মনে হইতে লাগিল এখনই বুঝি বুকটা ফাটিয়া যাইবে। যে অভিশাপ তিনি উচ্চারণ করিতে গেলেন কণ্ঠ দিয়া তাহা বাহির হইল না, দন্তে দন্তে ঘর্ষিত হইয়া অস্ফুট শব্দ বাহির হইল কেবল। সহসা এক লম্ফে তিনি নিরঞ্জনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, চোখের দৃষ্টিতে ধক ধক করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। মনে হইতেছিল স্বয়ং রুদ্রই বুঝি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনার নিগূঢ় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই সম্ভবত এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সহসা তাহার মুখের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন।

নিরঞ্জনা কিছু বলিল না, তাহার গতিও শ্লথ হইল না, সে নীরবে নিষ্ঠীবন মুছিয়া ফেলিল।

ইহার পর সাবর্ণিই তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিরঞ্জনা যেন মানুষ নয়, একটা অতলস্পর্শী গহ্বর। তিনি একটু ভীত হইলেন। সামান্য একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভীত হইয়াছেন বলিয়া আত্মধিক্কারেও তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর তিনি পথের ধূলার উপর রক্তবিন্দু দেখিতে পাইলেন। নিরঞ্জনার পা হইতে রক্ত পড়িতেছে। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং মহাকালই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা মনে হইবামাত্র এক অদ্ভুত আনন্দে তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি নিরঞ্জনার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিরঞ্জনার রক্তাক্ত চরণ চুম্বন করিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আমার ভগিনী, আমার মা, পুণ্যবতী মা—"

মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দেবদূতগণ, তোমরা এ রক্ত-বিন্দুগুলি ভগবান আশুতোষের কাছে নিয়ে যাও। যিনি ব্যাধকে বরদান করেছিলেন, তিনি নিরঞ্জনাকেও ক্ষমা করবেন। তাঁর ইচ্ছা হ'লে যেখানে যেখানে রক্ত পড়েছে সেখানে সেখানে ফুল ফুটে উঠবে হয়তো। রক্তাক্ত বালুভূমি

পুষ্পাকীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতে পাপীদের হৃদয়ে সান্ত্বনা বহন ক'রে আনবে। নিরঞ্জনা পবিত্রা, পুণ্যশীলা।"

ঠিক এই সময়ে একটি বালক একটি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহর্ষি সাবর্ণিকে দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। মহর্ষি তাহাকে নামিতে বলিলেন। সে নামিতেই তিনি নিরঞ্জনাকে গর্দভটির পৃষ্ঠে বসাইয়া নিজেই তাহার লাগাম ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

···সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ঘনপত্রসমন্বিত বিটপীসমাচ্ছন্ন এক স্রোতস্বিনীর তীরে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গর্দভটিকে একটি বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া সাবর্ণি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। সঙ্গে তিনি কিছু খাবার আনিয়াছিলেন। নিরঞ্জনার সহিত তাহা আহার করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল পান করিলেন। তাহার পর কথাবার্তা শুরু হইল।

নিরঞ্জনা বলিল, "এমন পরিষ্কার জল আমি আর কখনও পান করিনি। এমন নির্মল বাতাসও এর আগে আমার গায়ে লেগেছে ব'লে মনে পড়ে না। মৃদু সমীরণের স্পর্শকে মনে হচ্ছে যেন ভগবানের স্পর্শ।"

সাবর্ণি বলিলেন, "ভগ্নি, সন্ধ্যা আসন্ন। দূরের পাহাড়গুলি রাত্রির ঘননীল ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর একটু পরেই তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থে গিয়ে পৌছবে। অনন্ত প্রভাতের ঊষালোক কিছুক্ষণ পরে তোমার নয়নরঞ্জন করবে।"

তিনি আর বিশ্রাম করিলেন না। নিরঞ্জনাকে লইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র গভীর নিশীথে নদীর অসংখ্য তরঙ্গশীর্ষে জ্যোৎস্না মাখাইতে লাগিল, আর সাবর্ণি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে নদীর তীরে তীরে চলিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইল। দেখা গেল তাঁহারা এক বিরাট রুক্ষ প্রান্তরের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রান্তরের পরপারে কয়েকটি আকাশ-চুম্বী তালগাছ এবং কতকগুলি কুটির দেখা যাইতেছিল।

"মহর্ষি, ওই কি সেই তীর্থ যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"ঠিকই ধরেছ মা, ওইখানেই তোমার আশ্রয়, নিজের হাতে ওইখানেই তোমাকে আমি সমর্পণ ক'রে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কুটিরগুলির

আশেপাশে অনেকগুলি নারীমূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। নিরঞ্জনার মনে হইল মধু-চক্রের পাশে যেন মৌমাছিরা উড়িতেছে।

আরও নিকটবর্তী হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সকলেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কেহ রুটি সেঁকিতেছেন, কেহ তরকারি কুটিতেছেন, কেহ বা চরকা কাটিতেছেন। সকলেরই মুখ প্রসন্ন, যেন এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। নিকটে একটি বিল্ববৃক্ষ ছিল, তাহার নীচে বসিয়া কয়েকজন পূজাও করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, সকলেই যেন উমা, সকলেই যেন শিবের ধ্যানে তন্ময়, শিব-চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা কাহারও মনে ছায়াপাত করিতেছে না। বস্তুত, আশ্রমেও তাঁহারা উমা নামেই অভিহিত, তাঁহাদের আর অন্য নাম নাই। প্রত্যেকেই বল্কলবাসা কিশোরী। যাঁহারা যুবতী তাঁহাদের নাম পার্বতী, তাঁহারা গৃহকর্মরতা, তাঁহাদের অঙ্গে কাষায় বসন। ভৈরবী নামে অভিহিতা কয়েকজন সন্ন্যাসিনীও ছিলেন, তাঁহারা ত্রিশূলধারিণী গৈরিকবাসা। তাঁহারা প্রৌঢ়া, কেহ বৃদ্ধা। একজন অতি বৃদ্ধা ভৈরবী লাঠির উপর ভর দিয়া সমস্ত তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহর্ষি সাবর্ণি সসম্ভ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "জয় শঙ্কর! আশা করি ভগবানের কৃপায় সকলেই কুশলে আছেন। আপনি যে মধুচক্রের রাণী, সেই মধুচক্রে আমি আজ একটি মধুপ এনেছি। বেচারী উষর পুষ্পহীন প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে আমি অতি সন্তর্পণে নিজের অঙ্গুলির মধ্যে পুরে নিয়ে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাকে আশ্রয় দিন।"

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া নতজানু নিরঞ্জনাকে দেখাইলেন। নিরঞ্জনা ভৈরবীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়াছিল।

শিবানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার নিরঞ্জনার দিকে চাহিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলেন। তাহার পর তাহার ললাট চুম্বন করত সাবর্ণির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ, একে উমার দলে ভর্তি ক'রে নেব।"

সাবর্ণি তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন কি ভাবে তিনি নিরঞ্জনাকে উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "এখন কিছুদিন ওকে একা একটি নির্জন ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা প্রয়োজন। নির্জনে কিছুকাল নিজেকে নিয়ে থাকলে ওর আত্মোপলব্ধি হবে। অনুতাপের আগুনে কিছুকাল পুড়ে শুদ্ধ না হ'লে ওকে আর কারও সঙ্গে মিশতে দেওয়াও নিরাপদ নয়।"

ভৈরবী ইহাতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পূর্বে আশ্রমের একজন সন্ন্যাসিনী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিরটি শূন্য ছিল। নিরঞ্জনার সেই ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হইল।

ঘরের ভিতর একটি সাধারণ শয্যা, একটি মৃন্ময় কলস এবং একটি কুশাসন ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিয়া নিরঞ্জনার সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, ওর ঘরটা আমি নিজে হাতে তালা বন্ধ ক'রে যাব। ও যখন সত্যিই উমা হবে,স্বয়ং উমানাথ এসে ওর ঘরের চাবি খুলে দেবেন।"

ভৈরবী ইহাতেও আপত্তি করিলেন না।

দ্বারে একটি ক্ষুদ্র ফাটল ছিল। মহর্ষি সাবর্ণি কূপের নিকট হইতে খানিকটা কাদা লইয়া এবং কাদার ভিতর নিজের মাথার একটি চুল পুরিয়া সেটি ফাটলের উপর লাগাইয়া দিলেন।

ঘরের ছোট জানালাটির নিকট নিরঞ্জনা শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার নিকট আসিয়া মহর্ষি সাবর্ণি জানু পাতিয়া বসিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে তিনবার 'জয় শঙ্কর' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "জীবনের সত্য পথে এসে ওকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! কি সুন্দর ওর পা দুখানি! কি অপূর্ব দ্যুতি ওর মুখে!"

তাহার পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের ছিন্ন বেশ সম্বৃত করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিবৃদ্ধা ভৈরবী শিবানী তখন একজন কুমারীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "উমা, নিরঞ্জনার ঘরে রুটি, জল আর একটি ছোট বাঁশী দিয়ে এস।"

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহার অরণ্য-আশ্রমে ফিরিতেছিলেন। এবার তিনি পদব্রজে যাইতেছিলেন না, একটি বড় নৌকাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নৌকাটি হরিদ্বার অভিমুখে মাল লইয়া যাইতেছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অবশ্য কিছুদূর হাঁটিতে হইল। আশ্রমের নিকটবর্তী হইতেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও আনন্দের অভিব্যক্তি নানা ভাবে প্রকট হইল। কেহ আকাশে হস্ত উত্তোলন করিয়া গদগদ হইলেন, কেহ ভূম্যলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, কেহ কেহ পাদুকা চুম্বনও করিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে কি অসাধ্য সাধন যে করিয়া আসিয়াছেন—এ খবর তাঁহার আসিবার পূর্বেই আশ্রমে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সেকালে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদই মুখে মুখে স্থান হইতে স্থানান্তরে অতি দ্রুতবেগে নীত হইত।

মহর্ষি সাবর্ণি নিজের কুটিরে উপনীত হইবার পূর্বেই শিষ্যপরিবৃত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন পণ্ডিত হরানন্দ। তিনি এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সাবর্ণিকে দেখিবামাত্র তারস্বরে একটি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা সাবর্ণির কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সকলে নতজানু হইয়া নতমস্তকে উপবেশন করত বলিলেন, "পিতা, আমাদের আশীর্বাদ করুন, আর অনুমতি দিন আপনার প্রত্যাগমন উপলক্ষে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করি।"

শিষ্যদের মধ্যে বালক বাঞ্ছাই কেবল নতজানু হইল না। সে সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। সে মহর্ষি সাবর্ণিকে চিনিতেই পারিল না। প্রশ্ন করিল, "ইনি কে?" কিন্তু কেহ তাহাকে বিশেষ আমল দিল না। এই হাস্যকর উক্তিতে দুই-একজন মৃদু হাসিল মাত্র। সকলেই জানিত, বালকস্বভাব বাঞ্ছারামের অন্তঃকরণ যদিও পবিত্র, কিন্তু বুদ্ধি বড় কম।

নিজের কুটিরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল—"এতদিন পরে আমার আশ্রমে, আমার সাধনার পীঠস্থানে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার পর্ণকুটির তো আমাকে তেমন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না! কুটিরের মধ্যে জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে। শিবলিঙ্গটি, শিবপুরাণগুলি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই রয়েছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। তবু মনে হচ্ছে, কি যেন একটা নেই। আমার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটিতে যে সহজ সৌন্দর্য ছিল তা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। মনে হচ্ছে এ সব জিনিস যেন আর কারও। বহু বৎসর আগে যে শয্যা, যে আসন আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করেছি, পুরাণের যে সব ভগবৎকথা নিজের হাতে কষ্ট ক'রে টুকেছি, মনে হচ্ছে তা যেন আমার নয়, কোনও মৃত ব্যক্তির। যে সব জিনিস আমার অতি পরিচিত, একটা অপরিচয়ের আবরণ যেন তাদের ঘিরে রয়েছে। অথচ বাইরের আকারে প্রকারে এরা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। এরা যখন বদলায়নি, তখন আমিই নিশ্চয় বদলেছি। আমি তা হ'লে অন্য লোক। যে মারা গেছে, সেও আমি ছিলাম। এই জন্যেই আমার যেন জন্মান্তর হয়েছে। হে শঙ্কর, এ কি হ'ল? যে তোমার ভক্ত ছিল, সে কিসে রূপান্তরিত হ'ল? সে এখান থেকে কি নিয়ে গেল, কি রেখে গেল? আমিই বা কে?"

যে কুটিরে এতকাল তাঁহার স্থানাভাব হয় নাই, সেই কুটিরই এখন বড় সঙ্কীর্ণ মনে হইতে লাগিল। তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নিজেই তিনি বিস্মিতও হইলেন। যে কুটিরে বসিয়া তিনি শঙ্করের অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা তাঁহার চক্ষে সুবৃহৎ মনে হওয়া উচিত ছিল।

মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ তিনি প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে অশান্তি কতকটা কমিল। প্রার্থনার মধ্যেই কিন্তু নিরঞ্জনার মূর্তি তাঁহার মানসপটে বার বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি শঙ্করকে আবার মনে মনে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন, "দেবাদিদেব, আমি জানি তুমিই নিরঞ্জনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছ। তুমি করুণাময়, তুমিই তাকে বার বার মূর্ত করেছ আমার মনে। কারণ তুমি জান, যাকে তোমার পায়ে আমি সমর্পণ ক'রে এসেছি তাকে দেখলে আমি সুখী হব, নিশ্চিন্ত হব। সেই জন্যই তুমি তার মুখখানি বার বার আমার মনে ফুটিয়ে তুলছ। যাকে আমি অতি কষ্টে কলঙ্কমুক্ত করেছি, তার সরল হাসি, সহজ শ্রী, অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে আনন্দ দেবার জন্যই। তাই তুমি তাকে তোমার প্রার্থনার মধ্যেও নিয়ে এসেছ। তোমাকে উপহার দেব ব'লেই নিরঞ্জনাকে আমি পাপের পঙ্ক থেকে তুলে এনে চোখের জলে বিশুদ্ধ করেছি, এতে তুমি যে প্রসন্ন হয়েছ তাও অন্তর দিয়ে আমি অনুভব করছি। উপহার পেয়ে বন্ধু যেমন বন্ধুকে স্মিতহাস্যে অভিনন্দিত করে, নিরঞ্জনাকে পেয়ে তুমিও তাই করছ। তা না হ'লে নিরঞ্জনাকে আমার চোখের সামনে বারম্বার মূর্ত করছ কেন? এর অন্য কোনও অর্থ তো আমার মাথায় আসছে না। তুমিই নিরঞ্জনাকে দেখাচ্ছ, তাই তাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তুমি যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ যে, আমিই ওকে তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। ওকে তোমার পায়েই ঠাঁই দাও প্রভু, ওর রূপের অর্ঘ্য তোমার চরণেই নিঃশেষ হোক, আর কেউ যেন তা ভোগ না করে।"

সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি নিরঞ্জনা নানারূপে তাঁহার বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিলা-নিবাসে তাহাকে তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, তদপেক্ষা স্পষ্টতররূপে যেন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আর মনে মনে ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যা করেছি তা তাঁর জন্যই করেছি।"

কিন্তু তবু আশ্চর্যের বিষয়, একথা বার বার আবৃত্তি করিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তি ঘুচিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সম্বোধন করিয়া তখন তিনি বলিলেন, "কেন তুমি অশান্তি ভোগ করছ? কেন তুমি এমন বিমর্ষ।"

কিছুতেই কিন্তু মানসিক শান্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি ঘোর অশান্তির মধ্যে কাটিল। তপস্বীর পক্ষে ইহা ভয়ঙ্কর শাস্তি। নিরঞ্জনার মূর্তি দিনে বা রাত্রে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিল না। তিনি সরাইবার চেষ্টাও করিলেন না; কারণ তিনি নিজেকে বুঝাইয়াছিলেন যে, শঙ্করই

তাঁহাকে এ মূর্তি দেখাইতেছেন এবং নিরঞ্জনা আর কলঙ্কিতা বারনারী নাই, সে এখন তপস্বিনী। একদিন ভোরে নিরঞ্জনা স্বপ্নে তাঁহাকে যে মূর্তিতে দেখা দিল তাহা বেশ চাঞ্চল্যজনক। তাহার কবরীতে ফুলের মালা, বাহুতে অধরে যৌবনের প্রলেপ। আতঙ্কে সাবর্ণির ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন, ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। তখনও তাঁহার চোখ হইতে ভাল করিয়া ঘুম ছাড়ে নাই, তাঁহার মনে হইল কাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসও যেন তাঁহার মুখে লাগিতেছে। পর-মুহূর্তেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল। একটা শৃগাল ঘরে ঢুকিয়াছিল এবং তাঁহার মাথার শিয়রের দিকে দুইটি পা তুলিয়া দিয়া তাঁহার মুখ শুঁকিতেছিল। তাহার গায়ের দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তিনি উঠিয়া বসিতেই শৃগালটা পলায়ন করিল। মনে হইল, সে খুক খুক করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায় সাবর্ণি বড় দমিয়া গেলন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে উচ্চ মিনারের উপর তিনি এতকাল দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা ক্রমশ যেন মাটিতে বসিয়া যাইতেছে। সত্যই, তাঁহার আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় স্তম্ভটার ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছিল। কিছুকাল তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। কয়েক দিন পরে আত্মস্থ হইয়া তিনি অবশ্য চিন্তা করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মানসিক অশান্তি কমিল না, বরং বাড়িল।

উপরোক্ত স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মানসপটে নিরঞ্জনার আবির্ভাবের দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রার্থনা করিবার সময় নিরঞ্জনার চেহারা যখন বার বার তাঁহার মনে জাগিতেছিল তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, শঙ্করের ইচ্ছা অনুসারেই তাহা হইতেছে। ইহা সত্য হইলে এই স্বপ্নটাও শঙ্করের সৃষ্টি। তাঁহার কলুষিত মনই পবিত্র স্বপ্নকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, অপরিষ্কার পাত্রে রাখিলে উৎকৃষ্ট সুরাও যেমন পচিয়া যায় তেমনি আমার দোষেই সুন্দর অসুন্দরে পরিণত হইয়াছে এবং আমার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমার পশুপ্রকৃতিও শৃগালরূপে দেখা দিয়াছে। আর তাহা যদি না হয় অর্থাৎ এ স্বপ্নের সহিত শঙ্করের যদি কোনও সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে ইহা দানব চক্রান্ত, কামরূপী কোন পিশাচ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিরঞ্জনার প্রথম আবির্ভাবও তাহা হইলে এই পিশাচের কীর্তি, শঙ্করের নয়। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার হিতাহিতবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, যোগীজনসুলভ বিবেকের স্বচ্ছ দৃষ্টি তিনি হারাইয়াছেন। দেবতার লীলা ও দানবের চক্রান্তের পার্থক্য তিনি ধরিতে পারিতেছেন না।

এবম্প্রকার বিশ্লেষণ করিবার পর তিনি সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে করুণাময় শম্ভো, বল, কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে এমন সংশয়ের মধ্যে ফেলেছ? আমার মনোলোকে নিরঞ্জনার মতো তপস্বিনীর আবির্ভাবও যদি বিপজ্জনক হয়, তা হ'লে আমার উপায় কি! কি করব আমি! কোনও একটা সঙ্কেত ক'রে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও—এ তোমার লীলা, না, দানবের চক্রান্ত?"

শঙ্করের মহিমা দুর্বোধ্য। ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ আলোকপাত করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জমান সাবর্ণি তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, নিরঞ্জনার চিন্তাকে আর তিনি মনে স্থান দিবেন না। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। নিরঞ্জনা নানারূপে বারম্বার তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। অধ্যয়নের সময়, ধ্যানের সময়, প্রার্থনাকালে, চিন্তারত অবস্থায় সে আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। মনে হইত, সে যেন সশরীরে আসিয়াছে। আসিবার ঠিক পূর্বে সামান্য খস্‌খস্ শব্দ হইত—শাড়ি পরিয়া চলিলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমনি শব্দ। তাহার আসিবার সময়ও একেবারে সুনির্দিষ্ট ছিল, একচুল এদিক ওদিক হইত না। যাহা বাস্তব তাহা স্থূল বলিয়াই তাহার প্রকাশ অসম্বদ্ধ এবং অস্থির। যাহা অবাস্তব তাহা সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থির, অপরিবর্তনীয়।

নিরঞ্জনা নানা মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিত। কখনও বিষণ্ণ—মাথায় রত্নখচিত মুকুট, জীমূতবাহনের বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া গিয়াছিল অঙ্গে সেই পোশাক, ঈষৎ গোলাপী শাড়িতে উজ্জ্বল রূপার জরি; কখনও বা সে দেখা দিত কামোদ্দীপ্তা বারনারীর বেশে—অঙ্গে বাতাসের মতো স্বচ্ছ বসন, শিলা-নিবাসের আলোছায়ার মায়ায় মোহিনী কুহকিনী; কখনও আবার দেখা দিত ভৈরবীর মূর্তিতে—গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনীর বেশে; কখনও ভয়াবহ করুণ মূর্তিতে—নয়নের দৃষ্টি মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন, নগ্নবক্ষ রক্তাপ্লুত, যেন তাহার ভগ্নহৃদয়ের রক্তধারা পীবর স্তনদ্বয়কে রঞ্জিত করিয়াছে। সাবর্ণি ভীত হইয়া পড়িতেন।

মহর্ষি সাবর্ণি সর্বাপেক্ষা বিপন্ন বোধ করিতেন যখন নিরঞ্জনার দগ্ধ বসন-ভূষণগুলি পুনরায় তাঁহার সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিত। যে সব অলঙ্কার, যে সব শাড়ি, যে সব ওড়না তিনি স্বহস্তে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহারা যখন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্তবৎ রূপায়িত হইত তখন তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভাবিতেন, নির্জীব বস্তুরও কি আত্মা আছে, তাহারাও কি প্রেতরূপে দেখা দিতে পারে? মাঝে মাঝে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"মরেনি, মরেনি, কিছু মরেনি। নিরঞ্জনার অসংখ্য পাপের অসংখ্য নিদর্শন আবার বেঁচে উঠেছে, আমার কাছে ফিরে আসছে তারা।"

তিনি যখন ঘাড় ফিরাইতেন মনে হইত নিরঞ্জনা ঠিক তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে তিনি আরও অশান্ত হইয়া পড়িতেন। ক্রমশ তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটা আশা তাঁহার ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই সব প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহার দেহ এবং আত্মা অকলঙ্কিত আছে। তিনি শঙ্করকে মৃদু ভৎ'সনা করিয়া বলিতেন, "শঙ্কর, তোমার জন্যই আমি এত কষ্ট ক'রে নিরঞ্জনাকে খুঁজে আনবার জন্য পাপ পাটলিপুত্র নগরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যই—নিজের জন্য নয়। তোমার জন্য এত করলাম, তবু আমাকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি? এটা কি ন্যায় বিচার হচ্ছে? যা করেছি তোমার জন্যই করেছি। এজন্য আমাকে বিপন্ন ক'রো না করুণাময়, রক্ষা কর। সশরীরী নিরঞ্জনা যা পারেনি, অশরীরী নিরঞ্জনাকে দিয়ে তা করিও না। নিরঞ্জনার দৈহিক ঘনিষ্ঠতা আমাকে বিচলিত করতে পারেনি, তার কাছে আমি পরাভূত হইনি। তার ছায়া যেন আমাকে অভিভূত না করে, দেখো। একটা ঘোর বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি। বাস্তবের চেয়ে স্বপ্ন যে বেশী শক্তিশালী তা আমি জানি। স্বপ্ন তো বাস্তবেরই সূক্ষ্ম রূপ, আত্মার স্বরূপও আমরা স্বপ্নের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ করি। বড় বড় ঋষিরাও স্বপ্নের শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। পাটলিপুত্রে যে ধনীর পাষণ্ডদের ভোজন-উৎসবে তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে, সেখানে যারা তর্ক করেছিল তারা দুশ্চরিত্র হলেও মূর্খ নয়। তারা বলেছিল—যা আমরা ধ্যানে নির্জনে চিন্তায় বা সমাধিতে প্রত্যক্ষ করি তা অলীক নয়, তা সত্য। শাস্ত্রেও স্বপ্নের মহিমা বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে যে সব আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বাস্তবেরই মতো সত্য, তা তোমারই লীলা। অবশ্য দানবের ষড়যন্ত্রও হতে পারে, কারণ দানবরাও শক্তিশালী, দানবরাও মায়াবী।"

মহর্ষি সাবর্ণির মধ্যে একটি নূতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে তিনি শঙ্করের সহিত এ প্রকার ঘরোয়া আলোচনা করিতে পারিতেন না। আলোচনা সত্ত্বেও শঙ্কর কিন্তু তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন না। তাঁহার রাত্রিগুলি ক্রমশ স্বপ্নময় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং আরও কিছুদিন পরে দিবারাত্রির প্রভেদও আর রহিল না। একদিন অতি প্রত্যূষে আতঙ্কিত হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনে হইল, বুকের ভিতরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে।···রাত্রে নিরঞ্জনা রক্তাক্তচরণে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছিল। তাহার রক্তাক্তচরণ দেখিয়া তিনি যখন অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন, তখন প্রথমে সে তাঁহার শয্যার উপর বসিল, তাহার পর তাঁহার

পার্শ্বে শয়ন করিল। শয়ন করিল! তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না যে, নিরঞ্জনার এই স্বপ্ন-অভিসার তাঁহার কলুষিত আত্মারই বিকার মাত্র। তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, অপবিত্রতায় তাঁহার দেহ মন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শয্যাও আর পবিত্র নাই।

সঙ্কোভে সেই অপবিত্র শয্যা হইতে উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে দিবালোক অবলুপ্ত হইল। বহুক্ষণ তিনি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জার উপশম হইল না। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সেই নিঃশব্দ কুটিরে বসিয়া সার্বণি অনুভব করিলেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ একাকী, সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। নিরঞ্জনার ছায়ামূর্তিও কাছে নাই। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, স্বপ্নের স্মৃতিটাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য কিছু একটা কাছে থাকা দরকার। নিরঞ্জনার ছায়া-মূর্তিও হয়তো তাহা পারিবে। কিন্তু হায়, হায়, কেহ নাই। তিনি একান্তই একা।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কেন আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না? কেন তার হিমশীতল বাহু আর উত্তপ্ত জানু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম না?· "

ওই অপবিত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শঙ্করের নাম উচ্চারণ করিবার সাহস তাঁহার আর হইল না। মনে হইল, সমস্ত কুটিরটাই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। এ কুটিরে শঙ্করের কৃপার আশা আর নাই, ইহা এইবার দানব আর পিশাচদের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। তাহারা এইবার যখন খুশী যতবার খুশী আসিবে, তাহাদের আর রোধ করা যাইবে না। তাঁহার আশঙ্কাই যেন মূর্ত হইয়া উঠিল যখন তিনি দেখিলেন যে, সাতটি ক্ষুদ্র শৃগাল একে একে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার বিছানার নীচে ঢুকিয়া গেল।···সন্ধ্যার সময় আর একটি আসিল। এটির গায়ের গন্ধ বিকট। পরদিন নবম শৃগাল দেখা দিল। তাহার পর আর একটি। সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।·· ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট···আশীটি শৃগাল আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা সংখ্যায় যেমন বাড়িতে লাগিল, আকারে তেমনি ছোট হইতে লাগিল। অবশেষে সার্বণির মনে হইল, ওগুলি শৃগাল নয়, ইঁদুর। অসংখ্য ইঁদুর তাঁহার কুটিরের মেঝেতে, শয্যার নীচে, শয্যার উপরে চতুর্দিকে কিলবিল করিতেছে। একটি ইঁদুর তাঁহার শিবলিঙ্গের মাথার উপরও আরোহণ করিল, আরোহণ করিয়া স্পর্ধাভরে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। সে দৃষ্টি, যেন অগ্নিদৃষ্টি। মহর্ষি সার্বণি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

তিনি অবশেষে স্থির করিলেন, এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এই অপবিত্র

কুটির ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর উপায় নাই। আত্মনির্যাতন ও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এ পাপের প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। স্থির করিলেন, দুরূহ তপস্যায় পুনরায় নিজেকে নিযুক্ত করিবেন। আত্মনির্যাতনের বিস্ময়কর শক্তির উপর তাঁহার আস্থা ছিল। তাঁহার আশা হইল, পাপের আশ্রয়ভূমি দেহটাকে বিধ্বস্ত করিলেই তিনি পাপমুক্ত হইবেন। এই কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে তিনি প্রবীণ মহর্ষি শুভঙ্করের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিলেন।

মহর্ষি তাঁহার শাকক্ষেতে জলসেচন করিতেছিলেন। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। আকাশের ঘননীলে অস্তমান সূর্যের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া যে অপরূপ পটভূমিকা সৃজন করিয়াছিল তাহা পবিত্রচেতা মহর্ষি শুভঙ্করের সঞ্চরমান চিত্রেরই যোগ্য। মহর্ষি শুভঙ্কর অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করিতেছিলেন, কারণ তাঁহার কাঁধের উপর একটি বন্যকপোত বসিয়া ছিল। সার্বর্ণিকে দেখিতে পাইয়া তিনি সহাস্যে সম্বর্ধনা করিলেন।

"আরে, সাবর্ণি নাকি। এস, এস। শঙ্করের কৃপায় আশা করি কুশলে আছ। পশুপতির কাণ্ড দেখ, আমার কাছে তিনি পশুপাখীর রূপ ধরেই আসেন বোধ হয়। আমার কাঁধের উপর দেখতে পাচ্ছ তো, আর কেউ নয়, স্বয়ং তিনিই। আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। তা না হ'লে বনের পশু আকাশের পাখী আমার কাছে আসবে কেন? এই পাখীটিকে দেখ ভাল ক'রে, ওর ঘাড়ের কাছের পালকগুলির রঙ দেখেছ, ঠিক যেন সন্ধ্যার আকাশ। সামান্য একটা পাখীর পালকে কি মেঘের বিচিত্রবর্ণ দেখা যায়? ভাল ক'রে ভেবে দেখ ব্যাপারটা। অদ্ভুত, নয়? প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টিতে তিনিই আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাই সব সুন্দর, সবই অদ্ভুত! গাছের পাতা ফুল ফল পশু পক্ষী তুচ্ছ করবার কোন্‌টা বল? সবই চমৎকার! তিনি নিজেই সব। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি কোন সদালাপ করবে ব'লে এসেছ। আমার আবোল-তাবোল শুনে হয়তো ঘাবড়ে যাচ্ছ। কিছু বলবে না কি? ও, থাম তা হ'লে, কলসীটা রেখে আসি।"

মহর্ষি সার্বর্ণি তাঁহার পাটলিপুত্র গমন, পাটলিপুত্র হইতে প্রত্যাবর্তন, নিরঞ্জনা-উদ্ধার, তাহার পর দিবারাত্রি স্বপ্নে জাগরণে নিরঞ্জনার নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব, এমন কি জঘন্য কাম-ক্লিন্ন স্বপ্নটির কথাও অকপটে শুভঙ্করের নিকট বর্ণনা করিয়া অসংখ্য শৃগালের আক্রমণের কথাও তাঁহাকে বলিলেন। কিছুই গোপন করিলেন না।

"মহর্ষি, এখন কি করি বলুন তো? কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাই কি এর একমাত্র প্রতিষেধক নয়? তাই আমি স্থির করেছি গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ ক'রে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করব। তা হ'লে হয়তো দানবদের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারব। আমার মাথায় তো আর কিছু আসছে না।"

মহর্ষি শুভঙ্কর উত্তর দিলেন—"দেখ ভাই, আমিও স্বল্পবুদ্ধি লোক। সারাজীবন বনে বনেই কাটিয়েছি। বনের পশুপাখীদের আমি চিনি, খরগোশ হরিণ ঘুঘু হরিয়াল এরা আমার পরিচিত। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম। তবু আমার মনে হচ্ছে, দ্রুত স্থান পরিবর্তনের জন্যই তোমার চিত্ত বোধ হয় আন্দোলিত হয়েছে, আর সেই জন্যই ওই সব দেখছ। নগরের কোলাহল থেকে চট ক'রে অরণ্যের নীরবতায় ফিরে এসেছ ব'লেই সম্ভবত এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছ না। তোমার আত্মা সেই জন্য ক্লিষ্ট হয়েছেন। হঠাৎ গরম থেকে ঠাণ্ডায় এসে শরীর খারাপ হয়ে যেমন সর্দি-কাশি হয়ে যায়, তোমার মনেরও তাই হয়েছে। তাই আমার মতে গভীরতর জঙ্গলে না ঢুকে তুমি বরং লোকালয়ে যাও, অবশ্য ভদ্র লোকালয়ে, তোমার মতো সাধুসন্ত যেখানে আছেন। কাছেপিঠে তো অনেক আশ্রম আছে শুনি। যা শুনি তাতে দু-একটি তো খুব ভাল ব'লেই মনে হয়। নাম-শ্লোকপন্থী ধূর্জটি-আশ্রমে শুনেছি প্রায় দেড় হাজার সাধু থাকেন। সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত সেখানকার আশ্রমপতি। সেখানে সাধুরা প্রত্যেকে শিব-বিষয়ক এক-একটি শ্লোককে অবলম্বন ক'রে থাকেন শুনেছি। কেউ কেউ আবার শিবের একটি নামকেই সম্বল ক'রে নিজের সাধনাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা ধরনের সন্ন্যাসী আছেন সেখানে। এই আশ্রমটি তুমি দেখে এস একবার। একটু অন্যমনস্কও হবে, শেখবার জিনিসও অনেক কিছু পাবে। গঙ্গার ধার দিয়ে যদি যাও অনেক মঠ, অনেক আশ্রম, অনেক তপোবন চোখে পড়বে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এস না সব। তোমার মতো বিদ্বান লোকের পক্ষে এ সব করা কর্তব্যও বটে। মহাতান্ত্রিক মহর্ষি বনস্পতি শৈব সাধুদের কর্তব্য বিষয়ে বিরাট একখানা বই লিখেছেন শুনেছি। তুমি তো লিখতে জান, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে বইখানা নকল ক'রে ফেল। মস্ত কাজ হবে একটা। আমি লিখতে জানলে নিশ্চয় এটা ক'রে ফেলতাম, কিন্তু আমি কোদাল ধরতে পারি, কলম ধরতে পারি না। তুমি লেখাপড়া-জানা বিদ্বান লোক, তোমার কাজের অভাব কি! লেখাপড়ায় মন দিলে কি কোনও মন্দ চিন্তা ঘেঁষতে পারে? এই আশ্রমে মহর্ষি কারণ্ডব ছিলেন, তিনিতো এখন শৈব জগতের সম্রাট, কৈলাসে চ'লে যাবার আগে তিনিও বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন একটা—কারণ্ডবসংহিতা। সেইটেই

টুকে ফেল না তুমি। তুমি কলম ধরতে পার, তোমার ভাবনা কি! ঘুরে বেড়াও, লেখাপড়ায় মন দাও, তা হ'লেই তোমার মনের শান্তি আবার ফিরে আসবে। তখন বনের নির্জনতাই আবার ভাল লাগবে। তখন তপস্যা ক'রো। শহরে গিয়েই তোমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। মহর্ষি কারণ্ডব বলতেন শুনেছি—বেশী উপবাস করা ভাল নয়। বেশী উপবাস মানুষকে দুর্বল করে, বেশী দুর্বলতা মানুষকে অকর্মণ্য ক'রে ফেলে। অনেকে লম্বা লম্বা উপবাস ক'রে অনর্থক নিজেদের দেহটাকে ক্ষীণ ক'রে ফেলে। এ তো নিজের বুকে ছোরা মেরে দানবদের হাতে আত্মসমর্পণ করা! মহর্ষি কারণ্ডব এই সব কথা বলতেন। আমি মূর্খ মানুষ, আমি আর তোমাকে কি বলতে পারি! মহর্ষি কারণ্ডব এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আমাদের পিতার মতো। তাঁর কথাগুলো মনে ছিল, তাই তোমাকে বললাম।"

সাবর্ণি মহর্ষি শুভঙ্করকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার উপদেশগুলি তিনি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। মহর্ষি শুভঙ্করের নল-খাগড়া-বিনির্মিত বাগানের বেড়া পার হইয়া তিনি পিছু ফিরিয়া দেখিলেন, শুভঙ্কর শান্তভাবে পুনরায় শাকের ক্ষেতে জল সেচন করিতেছেন। বন্যকপোতটি তাঁহার কাঁধের উপর ঠিক বসিয়া আছে। সাবর্ণির চোখে জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, কাঁদিয়া হৃদয়ভার লঘু করেন।

নিজের কুটিরে ফিরিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হইল অসংখ্য বালুকণায় তাঁহার কুটিরের অভ্যন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, এ সব বালুকণা নয়, অসংখ্য কীটাকৃতি শৃগাল, দানবদের অনুচর। সেই রাত্রে তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিলেন। দেখিলেন, যেন একটি সু-উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপর একটি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। যেন বলিতেছে—তুমিও এই স্তম্ভের উপর আরোহণ কর।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি নিজেকে বুঝাইলেন, এ স্বপ্ন, ঈশ্বর-প্রেরিত। নিজের শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া তিনি তখন বলিলেন, "প্রিয় বৎসগণ, শঙ্করের আদেশে তোমাদের ছেড়ে আবার আমাকে বাইরে বেরুতে হচ্ছে। আমার অবর্তমানে পণ্ডিত হরানন্দকেই তোমরা গুরু ব'লে মান্য ক'রো। সরলমতি বালক বাঙ্কার প্রতিও একটু দৃষ্টি রেখো। তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি। সাবধানে থেকো। চললাম আমি।"

তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত ছিল, যখন উঠিল দেখিতে পাইল মহর্ষি সাবর্ণি দূর দিগন্তে কৃষ্ণমূর্তিবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

মহর্ষি সাবর্ণি দিবারাত্রি হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে তিনি সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পাটলিপুত্রের পথে যাইতে যাইতে যেখানে তিনি রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে বহুবিধ চিত্র উৎকীর্ণ ছিল। ত্রিশটি বিরাট বিরাট স্তম্ভ তখনও মন্দিরটিকে বহন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দিরের শেষে ছিল কেবল একটি একক স্তম্ভ। মন্দিরের সহিত তাহার কোন সংস্রব ছিল না। সুদূর অতীতে মন্দিরের সহিত কোনও কারণে তাহার যোগ ছিন্ন হইয়াছিল। স্তম্ভটির শীর্ষদেশে ছিল একটি রমণীর স্মিতানন। তাহার ললাটে শশিকলা, গণ্ড দুইটি পুষ্ট, নয়নযুগল আয়ত। মনে হইতেছিল, দৃষ্টি হইতে একটা চাপা হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে।

স্তম্ভটি দেখিয়া সাবর্ণির মনে পড়িল, এই স্তম্ভটিই শঙ্কর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। স্তম্ভটি প্রদক্ষিণ করিয়া আন্দাজ করিলেন, স্তম্ভটি উচ্চতায় প্রায় বত্রিশ হাত হইবে। মই না পাইলে উপরে উঠা যাইবে না। নিকটবর্তী এক গ্রামে গিয়া তিনি বড় একটি মই প্রস্তুত করাইলেন এবং মইয়ের সাহায্যে স্তম্ভশীর্ষে অবশেষে আরোহণ করিলেন। তাহার পর জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে শঙ্কর, তোমারই নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। তোমার কৃপা লাভ করবার জন্ত যে কোন কৃচ্ছ্র সাধন করিতে আমি প্রস্তুত। আমাকে কৃপা কর প্রভু।"

তাঁহার সঙ্গে কোনও খাবার ছিল না। বিশ্বাস ছিল, শঙ্করই তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামবাসীদের ভক্তির উপরও তাঁহার আস্থা ছিল। দেখা গেল, তাঁহার আস্থা ভিত্তিহীন নহে। প্রভাতে প্রার্থনার পর গ্রামের নারীরা ও শিশুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহার জন্ত কিছু ফলমূল ও জল আনিয়াছিল। একটি বালক মইয়ের উপর চড়িয়া সে সব তাঁহাকে দিয়া আসিল।

এই ভাবে কয়েকদিন কাটিল। আহার জুটিতে লাগিল, কিন্তু স্তম্ভের উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইবার মতো স্থান ছিল না।

মহর্ষি সাবর্ণি পা মুড়িয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এরূপ শ্রমসাধ্য নিদ্রায় শ্রান্তি তো দূর হয়ই না, বরং আরও বাড়িয়া যায়। প্রত্যুষে পাখীদের ডানার ঝাপটে তিনি সভয়ে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিতেন।

যে ছুতার মিস্ত্রি তাঁহাকে মইটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, সে ধর্মভীরু লোক। সাধু-সন্ন্যাসীদের সে চিরকাল খাতির-যত্ন করিয়া আসিয়াছে। মহর্ষি সাবর্ণির অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এই সাধু রৌদ্রে বৃষ্টিতে তো কষ্ট পাইবেনই,

ঘুমের ঘোরে পড়িয়াও যাইতে পারেন। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্তম্ভের উপর কাঠের ছাতা এবং কাঠের বেড়া প্রস্তুত করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এরূপ অদ্ভুত সাধুর অপূর্ব কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বেশীদিন চাপা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহা ছড়াইয়া পড়িল, দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। স্তম্ভের পাদদেশে তাহারা সবিস্ময়ে উন্মুখ হইয়া সার্বণির দিকে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমশ এ খবর সার্বণির শিষ্যগণেরও কর্ণগোচর হইল। তাহারা শুনিল, তাহাদের গুরুদেব এক অসাধারণ সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারও সমবেত-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ওই স্তম্ভের পাদদেশে কুটির নির্মাণ করিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সার্বণি অনুমতি দিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে বৃত্তাকারে স্তম্ভের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ শুনিতে লাগিল।

মহর্ষি সার্বণি প্রায়ই তাঁহাদের বলিতেন—"তোমরা শিশুর মতো হবার চেষ্টা কর। স্বয়ং ভোলানাথ শিশুপ্রকৃতির। তোমরাও যদি শিশুর মতো হতে পার, ভোলানাথ প্রসন্ন হবেন, তোমাদের মুক্তির পথ সরল হবে। দেহজ পাপই সকল পাপের মূল। পিতা যেমন সন্তানের জন্মদাতা, দেহজ পাপ তেমনি সর্বপ্রকার পাপের জন্মদাতা। অহঙ্কার, লোভ, আলস্য, ক্রোধ, ঈর্ষা—এ সবই ওই দেহজ পাপের প্রিয় সন্তান। পাটলিপুত্রে দেখে এলাম, ধনীরা বিলাসের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, সে স্রোত কর্দমাক্ত নদীর স্রোতের মতো। অনন্ত পঙ্কসমুদ্রের দিকে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

মহর্ষি সার্বণির কথা ক্রমশ আরও দূরে প্রচারিত হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতির কানেও কথাটা গেল। তাঁহারা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু প্রবল জনশ্রুতিকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিবেন স্থির করিলেন। মহর্ষি সার্বণি স্তম্ভশীর্ষ হইতে গঙ্গাবক্ষে তাঁহাদের নৌকার পাল দেখিয়া ভাবিলেন, শঙ্কর বোধ হয় অন্য তপস্বীগণের নিকট তাঁহাকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাই এই বৃদ্ধ তপস্বীযুগলকেও তাঁহার নিকট পাঠাইতেছেন। তপস্বী-যুগল কিন্তু সার্বণির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। দুইজনেই কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন, তাহার পরে দুইজনেই এরূপ উদ্ভট কৃচ্ছ্র সাধনের নিন্দা করিয়া সার্বণিকে স্তম্ভের উপর হইতে নামিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"এভাবে তপস্যা করবার বিধি কোনও শাস্ত্রে নেই, সাধারণ বুদ্ধিও এর অনুমোদন করে না। অদ্ভুত কাণ্ড করেছ তুমি। নেমে পড়।"

মহর্ষি সাবর্ণি কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

উত্তরে কেবল বলিলেন—"সন্ন্যাসীর জীবনই তো অদ্ভুত জীবন। তার আবার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম আছে না কি? সন্ন্যাসীর আচরণ অসাধারণ হবেই। শঙ্করের ইঙ্গিতেই এই স্তম্ভে আরোহণ করেছি। তিনি যতক্ষণ না নামবার ইঙ্গিত করছেন, ততক্ষণ নামব না।"

সাধকশ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি মৃদু হাস্য করিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। সাবর্ণির জনপ্রিয়তা কিন্তু বাড়িতে লাগিল। প্রতিদিন দলে দলে নূতন সন্ন্যাসীরা আসিয়া সাবর্ণির শিষ্যবর্গের সহিত যোগদান করিলেন। স্তম্ভের নিকট আরও অনেক কুটির নির্মিত হইল, অনেকে শূন্যেও কুটির নির্মাণ করাইলেন। সাবর্ণির অনুকরণে কোন কোন সাধু মন্দিরের অন্যান্য উচ্চ স্তম্ভগুলির উপরও বসবাস আরম্ভ করিতে উদ্যত হইলে বাকী সাধুরা তাহাদের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সেই জন্যও বটে এবং স্তম্ভের উপর বাস করা ক্লেশকর বলিয়াও অবশেষে তাঁহারা সে মতলব ত্যাগ করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণির খ্যাতি কিন্তু ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। বহু যাত্রী বহু দূর হইতে পদব্রজে আসিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতেন। জনৈকা বিধবা রমণী ইহার সুযোগ লইল। সে ছোটখাটো একটি ফলের দোকান আরম্ভ করিয়া দিল। জলও রাখিত। স্তম্ভের কাছে একটি রঙীন চাঁদোয়া খাটাইয়া, ফলের ঝুড়ি, জলের কলসী এবং মাটির খুরি প্রভৃতি সাজাইয়া স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া সে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিত—"টাটকা ফল, টাটকা জল—।" দোকান বেশ চলিতে লাগিল। তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ ভাত রুটি তরকারি প্রস্তুত করিবার আয়োজনও করিয়া ফেলিল। স্তম্ভের নিকটে দেখিতে দেখিতে একটি পাকশালা ও ভোজনশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। জনসমাগমের বিরাম ছিল না, সুতরাং খরিদ্দারের অভাব হইল না। ইহার পর বড় বড় শহর হইতে ধনীরাও আসিতে আরম্ভ করিলেন। ধনীদের জন্য মহার্ঘতর ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। শহর হইতে বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসিয়া বড় বড় পান্থশালা নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতির জন্যও মন্দুরা প্রভৃতি নির্মিত হইল। স্তম্ভটিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ বেশ বড় একটি বাজার গড়িয়া উঠিল, মাছ-মাংস-তরকারি-বিক্রেতারা আসিয়া জুটিলেন এবং দোকান খুলিয়া খরিদ্দারদের ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। একটি চটুল-ভাষী ক্ষৌরকারও আসিয়া নিজের ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিল। সে মাঠে বসিয়াই সকলের

দাড়ি ছাঁটিত, চুল-নখ কাটিত এবং রসালাপ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিত। যে ভগ্নমন্দির এতকাল নীরব নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল, হাস্যে কলরবে তর্কে গুজবে মুখরিত হইয়া উঠিল। মন্দিরের নিম্নভাগে যে অন্ধকার কক্ষগুলি ছিল ব্যবসায়ীরা সেগুলি অধিকার করিয়া বিপণিতে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল। বিপণির উপর বিপণির বিশেষত্বও বিজ্ঞাপিত হইল। অধিকাংশ বিপনি-শীর্ষে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখা যাইতে লাগিল : উপরে মহর্ষি সাবর্ণির একটি ধ্যানমগ্ন চিত্র, আর তাহার নীচে লেখা রহিয়াছে, 'এখানে ভাল দ্রাক্ষাসব পাওয়া যায়—উৎকৃষ্ট মাধ্বী, গৌড়ী এবং পৈঠী সুরাও মিলিবে।' স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ মনোহারিণী তরুণীগুলির উপর পেঁয়াজ, রসুন, শুঁটকি মাছ এবং পাঁঠার রাং ঝুলিতে লাগিল। মন্দিরের পুরাতন বাসিন্দা ইন্দুরেরা দলবদ্ধ হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। মুণ্ডক, বক, কপোত, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যে সব পক্ষী মাঝে মাঝে আসিয়া মন্দিরে বসিত অথবা নীড় নির্মাণ করিত তাহারাও রান্নাঘরের ধূমে, মাতালদের চীৎকারে এবং ভৃত্যদের কলরবে ভীত হইয়া মন্দিরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উড়িয়া গেল। বন্য নির্জনতা আর রহিল না।

জনসমাগম ক্রমশ এত অধিক হইতে লাগিল যে, সকলে নাগরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। স্থপতিবিদ্‌গণকে আহ্বান করা হইল। তাঁহারা স্তম্ভের চতুর্দিকে পাকা রাস্তা নির্মাণ করিতে লাগিলেন। পাকা বাড়ি এবং পাকা মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য রাজমিস্ত্রিরাও নিযুক্ত হইল। ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত একটা শহর গড়িয়া উঠিল, শহরের সমস্ত সাজসজ্জা উপকরণ উপচার সংগৃহীত হইল। সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কারাগার, চিকিৎসালয়, পাঠশালা কিছুই আর বাকি রহিল না।

অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসিতে লাগিল। ধর্মজগতেই একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। কেবল তীর্থযাত্রী নয়, বড় বড় শৈব পুরোহিত ও পণ্ডিতেরাও ভক্তিতে গদগদ হইয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। উত্তর প্রদেশের একজন প্রতাপশালী নৃপতি তাঁহার ধর্মযাজকদের লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণির দুরূহ তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরবর্গকেও মুগ্ধ হইতে হইল। সাধক-শ্রেষ্ঠ উপলচরিত এবং মহর্ষি বনস্পতি উক্ত নৃপতির শাসনাধীনে বাস করিতেন। নৃপতি মুগ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের একটু অস্বস্তি হইল, অবশেষে তাঁহারা পুনরায় আসিয়া তাঁহাদের পূর্বোক্ত আচরণ ও উক্তির জন্য সাবর্ণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষি সাবর্ণি তাঁহাদের বলিলেন—"ভাই, তোমরা বিশ্বাস কর, যে প্রচণ্ড

প্রলোভন আমাকে সর্বদা আক্রমণ করছে তার তুলনায় আমার এ প্রায়শ্চিত্ত কিছু নয়। মানুষকে বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখলে খুব ছোট দেখায়। শঙ্কর আমাকে যে স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছেন সেখান থেকে মানুষদের ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো তারা ইঁদুর নয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে বিচার করতে হয়, তখন বোঝা যায় মানুষ কত বড়, কত বড় তার সমস্যা। মানুষ পৃথিবীর মতোই বড়, কারণ সে-ই তো তার চেতনা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ধ'রে রেখেছে। এখান থেকে আমি কত কি দেখতে পাচ্ছি! কত নূতন মানুষ, নূতন মন্দির, নূতন গৃহ, পান্থশালা, নদী, নৌকা, বিরাট সৈকত, পর্বত, শস্যক্ষেত্র, দূরের গ্রামগুলি। কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে যা আছে তার তুলনায় এ সমস্তই তুচ্ছ। আমার মধ্যে অসংখ্য নগরও আছে, অনন্ত মরুভূমিও আছে। আর তাদের আবৃত ক'রে রেখেছে পাপ আর মৃত্যু, রাত্রি যেমন পৃথিবীকে আবৃত করে, ঠিক তেমনিভাবে। আমি শুধু জগৎ নই, কলুষিত জগৎ। তাই প্রায়শ্চিত্ত করছি।"

তিনি এ কথা বলিলেন, কারণ রিরংসা তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল।

এইভাবে ছয় মাস কাটিল। সপ্তম মাসে পাটলিপুত্র হইতে সুমতি এবং শারিকা নাম্নী দুইটি বন্ধ্যা প্রৌঢ়া রমণী সন্তানলাভের আশায় সার্বণির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জনশ্রুতি শুনিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, উক্ত স্তম্ভের স্পর্শ বিশেষ গুণসম্পন্ন, স্তম্ভের গুণে এবং মহর্ষি সার্বণির কৃপায় তাহারা নিশ্চয়ই জননীত্ব লাভ করিবে। তাহারা প্রায় উলঙ্গ হইয়া স্তম্ভের পাষাণে সর্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে ভীড় আরও বাড়িয়া গেল। নানা উদ্দেশ্য লইয়া নানারকম নরনারী ক্রমশ জুটিতে লাগিলেন। সার্বণি দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবল মানুষ আর মানুষ। অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত। কেহ রথে, কেহ শিবিকায়, কেহ অশ্বে, কেহ বা পদব্রজে স্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আর তাহাদের ভিতর রহিয়াছে ভয়াবহ কুৎসিত-দর্শন রোগীর দল। জননীরা অসুস্থ শিশুদের লইয়া আসিল—কাহারও হাত-পা বাঁকা, চক্ষু অন্ধ, মুখে সফেন লালা, কণ্ঠের স্বর কর্কশ। সার্বণি তাহাদের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া অন্ধের দল আসিল, মুখ উঁচু করিয়া সার্বণিকে তাহাদের রক্তাক্ত অক্ষি-গহ্বর দেখাইল। অনড় অসাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা আসিল, সার্বণি তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলেন। খঞ্জেরা তাহাদের ওই বিকৃত পদ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কর্কটরোগাক্রান্ত নারীরা তাহাদের ক্ষতবিধ্বস্ত স্তন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল এবং আর্তস্বরে নিবেদন করিল, রোগ-শকুনি কিভাবে

জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শোক-রোগাক্রান্ত স্ফীতকায় রোগীরাও স্তম্ভের পাদদেশে আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। যাহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, ভাল করিয়া চলিতে পারে না, তাহারাও লাঠির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভের সমীপবর্তী হইল এবং তাহাদের সিংহবৎ মুখ তুলিয়া সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। সার্বণি সব দেখিলেন, সব শুনিলেন এবং সকলের মঙ্গলের জন্য শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অনেকে আরোগ্য লাভ করিল। উজ্জয়িনী হইতে একটি তরুণীকে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা শিবিকায় বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তরুণীটি ক্রমাগত রক্তবমন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহার দেহ রক্তহীন, মুখ বিবর্ণ, চক্ষু মুদিত; আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবিয়াছিলেন, সে বোধ হয় মারাই গিয়াছে। সার্বণি তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেই সে মাথা তুলিল, চক্ষু খুলিল।

এই ধরনের আশ্চর্যজনক সংবাদ দ্রুতবেগে দূরদূরান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ফলে রোগীর ভীড় আরও বাড়িতে লাগিল। মৃগীরোগগ্রস্ত লোকেরা, এমন কি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকেরাও—চিকিৎসকেরা যাহাদের বহু পূর্বেই জবাব দিয়াছেন—তাহারাও আসিয়া হাজির হইল। সার্বণি স্তম্ভশীর্ষে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, স্তম্ভটি দেখিবামাত্র কোন কোন মৃগীরোগীর সমস্ত দেহ আক্ষিপ্ত হইতেছে, কেহ কেহ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কাহারও বা ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে। মৃগীরোগীদের দেখিয়া সার্বণির শিষ্যগণও বিচলিত হইলেন, অনেকে এত বিচলিত হইলেন যে মৃগীরোগীদের দেখিয়া তাঁহাদের দেহেও আক্ষেপ জাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারাও উন্মত্তবৎ ওই সব রোগীদের নকল করিতেছেন! ক্রমে মৃগীরোগীদের নকল করাটাই যেন মহর্ষির আশীর্বাদ আকর্ষণের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সাধু তীর্থযাত্রী, রোগী নিরোগ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিজেদের দেহকে নানাভাবে বাঁকাইয়া, ধূলায় লুটাইয়া, এমন কি মুঠা মুঠা ধূলা ভক্ষণ করিয়া স্তম্ভের চতুর্দিকে চীৎকার করিয়া সার্বণির করুণাকণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত পরিবেশটাই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহর্ষি সার্বণি স্তম্ভের শীর্ষদেশ হইতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। তিনি আকুলচিত্তে শঙ্করকে স্মরণ করিয়া বলিলেন—"প্রভু, ওরা নিজেদের পাপের জন্য আমাকে দায়ী করছে। পাপমোচন করতে করতে আমি নিজে যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম! আমাকে রক্ষা কর।"

কোনও রোগী রোগমুক্তি হইলেই চতুর্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। তাঁহার

শিষ্যগণ চীৎকার করিয়া লম্ফঝম্ফ করিতেন আর বলিতেন—"স্বয়ং বিশ্বেশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন। এ স্তম্ভ সাধারণ স্তম্ভ নয়, এ শিবলিঙ্গ।"

স্তম্ভগাত্রেও নানাবিধ বিচিত্র সমাবেশ ঘটিল। খঞ্জেরা যে যষ্টি বগলে লাগাইয়া চলাফেরা করে সেরূপ বহু যষ্টি স্তম্ভগাত্রে ঝুলিতে লাগিল, নারীরা নিজেদের অলঙ্কার এবং মালা তাহাতে টাঙাইয়া দিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শিববিষয়ক বহু শ্লোক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিলেন, বহু ব্যক্তি নিজেদের নামও খোদিত করাইলেন। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই স্তম্ভটি সংস্কৃত, ব্রাহ্মী, শৌরসেনী, পালি, প্রাকৃত, মাগধী, মৈথিলী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা ও বর্ণমালার সঙ্গমস্থল হইয়া উঠিল।

শিবরাত্রির সময় সেই অত্যাশ্চর্য স্তম্ভকে ঘিরিয়া এত ভীড় হইল যে, প্রাচীন বৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন—সত্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, সমতটবাসী জনতার সহিত কোশল, পাঞ্চাল, গান্ধার, উজ্জয়িনী, এমন কি চেল্লা প্রদেশবাসী জনতার মিলন ঘটিল। তাহাদের প্রত্যেকের ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং পোশাকের বৈশিষ্ট্য সেই বিরাট সম্মিলনকে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিল। অবগুণ্ঠিতা ও অনবগুণ্ঠিতা, সুশ্রী যুবতী ও বৃদ্ধারা বিবিধ বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া কেহ পদব্রজে, কেহ শিবিকারোহণে, কেহ বা গর্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া স্তম্ভটিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। জনতার চিত্তবিনোদন করিবার জন্য নর্তক-নর্তকীরা আসিল, বহু পালোয়ানও ভূমিতে বড় বড় কার্পেট পাতিয়া তাহার উপর কুস্তি শুরু করিয়া দিল, জনতা বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল। কোথাও সাপুড়েরা খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জনের প্রয়াস পাইল। বিরাট জনতা বিরাটরূপে মূর্ত হইল। অর্থ এবং শস্ত্রের ঝনৎকার, বিবিধ ভাষার কলহ, বিবিধ প্রকার বেশের বৈচিত্র্য, ধূলিধূম, সঙ্গীত ও চীৎকারের সংমিশ্রণ যে অপূর্বতার সৃষ্টি করিল তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শব্দরূপী ব্রহ্ম সেখানে যেন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষ্ট্র এবং অশ্ব পরিচারকদের গালাগালি, দোকানদারদের বাঙ্ময় বিজ্ঞাপন, দৈব ঔষধ ও মাদুলি-বিক্রেতার উচ্চ কণ্ঠস্বর, সন্ন্যাসীদের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ, বিফলমনোরথ নারীদের করুণ আর্তনাদ, ভিক্ষুকদের কলরব, ছাগল-ভেড়া-গাধাদের কর্কশ চীৎকার মিলিয়া এমন এক বিপুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে মদ্রদেশবাসী তক্রবিক্রেতাদের তীক্ষ্ণকণ্ঠও মাঝে মাঝে তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

এই বিপুল জনতার মাথার উপর ছিল নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, আর সে আকাশে ভাসিতেছিল বহু প্রকার গন্ধ। নারীদের প্রসাধনজনিত গন্ধ, অসুস্থ ও অসভ্যদের গায়ের দুর্গন্ধ, পাকশালার গন্ধ। সার্বণির জন্য বহু স্থান হইতে বহু

লোক বহুপ্রকার ধূপ ধুনা চন্দন ও গুগ্‌গুল আনিয়াছিলেন এবং অহোরাত্র সেগুলি পোড়াইতেছিলেন।

রাত্রির দৃশ্য আরও অদ্ভুত। মশাল ও নানারূপ দীপালোকে সমস্ত স্থানটা রক্তাভ হইয়া উঠিত। জনতার লোকগুলিকে মনে হইত কৃষ্ণকায় ছায়ামূর্তি। সেই রক্তাভ অন্ধকারে কোথাও বা দেখা যাইত একদল লোক গুঁড়ি মারিয়া নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনিতেছে। তাহাদের সম্মুখে এক ঋজুদেহ বৃদ্ধ বসিয়া অঙ্গভঙ্গী-সহকারে এক উদ্ভট গল্প ফাঁদিয়াছেন—কি করিয়া এক ডাইনী একবার তাঁহার হৃদয় চুরি করিয়া আমগাছের ভিতর পুরিয়া দিয়া অবশেষে তাঁহাকে এক হৃদয়হীন বাবলাগাছে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার অঙ্গভঙ্গীর দীর্ঘ ছায়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল। কোথাও মাতালেরা কোলাহল করিতেছিল, কোথাও নর্তকীরা রঙ মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া লম্পটদের লইয়া নাচগানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক যুবক প্যাশাখেলায় মাতিয়াছিল। অনেক বৃদ্ধ রূপজীবাদের পিছু পিছু ঘুরিতেছিল। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছায়াগুলোকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ছিল সেই বিরাট স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে উৎকীর্ণা স্মিতাননা সেই নারীটি যেন হাসিমুখেই সব দেখিতেছিল। আর স্তম্ভের উপরিভাগে বসিয়া ছিলেন মহর্ষি সাবর্ণি, স্বর্গ-মর্তের সন্ধিস্থলে।

অনেক রাত্রে সহসা আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। দিগন্তনিবদ্ধ ঈষৎ বক্র জাহ্নবীধারাকে রূপসী রমণীর বাহুর মতো দেখাইতে লাগিল। তীরবর্তী নীল পর্বতমালাকে জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন মখমলের কোমলতা ও নীলার দ্যুতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। সাবর্ণি জাহ্নবীধারার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনার লীলায়িত বাহুটিই যেন রাত্রির লীলাঞ্চলে দেখা যাইতেছে।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সাবর্ণি স্তম্ভের উপরই বসিয়া রহিলেন। বর্ষাকাল আসিল। সামান্য দারুনির্মিত আবরণ বর্ষার মুষলধারা রোধ করিতে পারিল না, তাঁহার সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে তাঁহার চর্ম ইতিপূর্বেই শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, বর্ষার জল পড়িয়া সেগুলি বড় বড় ক্ষতে পরিণত হইল। শীতে এবং ঠাণ্ডাতেও তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিলেন, তাঁহার হস্তপদ অসাড় অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু নিরঞ্জনাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না। কামনাকীট তাঁহার হৃদয় কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল।

তিনি কাতরহৃদয়ে কেবল প্রার্থনা করিতেন—"হে শঙ্কর, এখনও কি আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়নি? আর কত প্রলোভন, কত কুৎসিত চিন্তা, কত ভীষণ কামনা

আমার মনে জাগাবে প্রভু? শাস্তি যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে তা হ'লে ঘৃণ্যতম কামনার কর্দমে আমার মনকে আরও ডুবিয়ে দাও, আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হোক। অনেকে বলেন, কামুক ছাগ কামনার মূর্ত প্রতীক বলেই বলির পশুরূপে নির্বাচিত হয়। আবার অনেকে বলেন, সে সকলের কামনার বোঝা বহন ক'রে যূপকাষ্ঠে আত্ম-বলিদান দেয়। সে ঘৃণ্য পশু নয়, নমস্য। আগে এ সব কথা আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন মনে হয়, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। নিজের অন্তরেই এর সত্যতা অনুভব করছি। বিরাট গহ্বরে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার মতো ইতর সাধারণের সংখ্যা পাপ সন্ন্যাসীদের অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে তার আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোলে। এত লোকের পাপ, এত কামনা, রিরংসা তাদের অন্তরে এসে পুঞ্জীভূত হয় যে, তাদের মাথার ঠিক থাকে না। আমার তাই হয়েছে। প্রভু, তোমার বিধানেই যদি আমার এমন হয়ে থাকে, তবে তাই হোক, আমাকে নরককুণ্ডে পরিণত কর।

জনতার মধ্যে হঠাৎ এক গুজব উঠিল, পাটলিপুত্রের রণতরী অধ্যক্ষ জীমূতবাহন সাবর্ণি-সন্দর্শনে আসিতেছেন। এ কথা সাবর্ণির কর্ণগোচর হইল। ইহাও শোনা গেল যে, তিনি বেশীদূরে নাই, তাঁহার ময়ূরপঙ্খীর পাল গঙ্গাবক্ষে দেখা যাইতেছে।

সংবাদটি মিথ্যা নয়। বৃদ্ধ জীমূতবাহন রাজকীয় কর্তব্যের অনুরোধে গঙ্গানদী ও গঙ্গানদীর খালসমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন সাবর্ণির অলৌকিক কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কথাটা প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। তাহার পর আর এক স্থানে গিয়া কথাটা আবার শুনিলেন। এবার শুনিলেন, স্তম্ভকে ঘিরিয়া সাবর্ণিপুর নামে একটা নগরই নাকি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তিনি স্থির করিলেন সাবর্ণিকে ঘিরিয়া যে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া আসিবেন। নৌবহর সজ্জিত হইল, একদা প্রভাতে তিনি সাবর্ণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গার তীর সাবর্ণিপুর একটু দূরে অবস্থিত। তরণী হইতে অবতরণ করিয়া তিনি তাঁহার সহকারী লেখক শিখরনাথ এবং চিকিৎসক সুরসেনকে সঙ্গে লইয়া সাবর্ণি-সন্দর্শনে চলিলেন। তাঁহার পিছনে তাঁহার দেহরক্ষীগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের পোশাকের ও অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বরে সকলে চমকিত হইয়া গেল।

স্তম্ভের নিকটে আসিয়া জীমূতবাহন ঊর্ধ্বমুখে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিল। জীমূতবাহন কেবলমাত্র যোদ্ধাই ছিলেন না, গ্রন্থকারও ছিলেন। জলযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও আরও নানা রকম

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক রকম অভিজ্ঞতাও ছিল। জীবনে কত প্রকার অদ্ভুত জিনিস দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া একটি গ্রন্থ রচনা করিবার বাসনা তাঁহার অনেক দিন হইতেই ছিল। সাবর্ণিকে দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল।

মাথার ঘাম মুছিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এই সেই। কি আশ্চর্য! ভদ্রলোক আমারই বাড়িতে একদিন রাত্রে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন প্রায় এক বছর আগে। তার পরদিন শোনা গেল, একজন নামজাদা অভিনেত্রীকে নিয়ে সরে পড়েছেন পাটলিপুত্র থেকে।"

লেখক শিখরনাথের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "ওহে, এ কথাটা লিখে নাও তুমি। আর এই থামটার মাপজোকও সব টুকে নাও। থামের মাথায় যে হাস্যবদনা নারীমূর্তিটি আছে সেটির কথাও লিখতে ভুলো না। কি আশ্চর্য!"

পুনরায় কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, "সবাই বলছে ভদ্রলোক এক বৎসর ধরে এই থামের উপর চড়ে বসে আছেন। একবারও নামেন নি। সুরসেন, এ কথা বিশ্বাস কর তুমি? এ কি সম্ভব?"

সুরসেন বলিলেন, "নির্বোধ অথবা অসুস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু দেহ মন যার সুস্থ সে এ ভাবে ব'সে থাকতে পারবে না। এ ধরনের অসুস্থ লোকেরা, মানে পাগলেরা, এক রকম অসাধারণ শক্তিরও অধিকারী হয়। সাধারণ সুস্থ মানুষদের সে রকম শক্তি থাকে না। তবে কি জানেন, কে সুস্থ কে অসুস্থ তা ঠিক করাও শক্ত। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম। প্রত্যেকের মনের গঠন, দেহের গঠন আলাদা আলাদা। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে আর বহুরকম লোক দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র একটা জগৎ যেন। এমন কতকগুলো রোগেও আছে যে মনে হয়, ভাল কবিতার মতো তারাও ছন্দের নিয়ম মেনে চলে। সবিরাম জ্বরের কথাই ধরুন না, ঠিক সময়ে ছেড়ে যায়। আবার কোন কোন রোগ মানুষের চরিত্রই বদলে দেয়। কারও চিত্তবৃত্তি তীক্ষ্ণতর হয়, কারও বা ভোঁতা হয়ে যায়। কাঞ্চনকে চেনেন তো? বাল্যকালে অত্যন্ত বোকা ছিল সে। একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগল, আর অমনি তার বুদ্ধিও খুলে গেল, চরিত্রও বদলে গেল। সে এখন বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী একজন। এই সন্ন্যাসীরও তেমন কিছু হয়েছে বোধ হয়। ভদ্রলোক কোথাও কোন চোট খেয়েছেন—হয় শরীরে, না হয় মনে। তা ছাড়া ওই থামের উপর বসে থাকাটা আপনি অসম্ভবই বা মনে করছেন কেন? অনেক সন্ন্যাসীই তো স্থাণু হয়ে থাকতে পারেন। বাল্মীকির গল্পটা মনে করুন না।"

জীমূতবাহন বলিলেন, "কিন্তু এ যে বিদঘুটে কাণ্ড হে! থামের উপর চ'ড়ে ব'সে আছে! কি আশ্চর্য! নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকাটাই তো আমি অস্বাভাবিক মনে করি। সুস্থ মানুষ খাটবে-খুটবে, দৌড়ঝাঁপ করবে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন! এতে নিজের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। ধর্মবিশ্বাসের ফলে এ রকম হয়েছে বলছ? ওই স্তম্ভটা কি শিবলিঙ্গের প্রতীক? তা-ই যদি হয়, এ রকম কাণ্ড আর কোন শৈবকে তো করতে দেখি না। শিবমন্দিরে ধ্যানস্থ হয়ে অনেককে বসে থাকতে দেখেছি, শিবের সঙ্গে অনেকে কথা বলেন এও শুনেছি। কিন্তু ঠিক এ রকমটা কখনও দেখিও নি, শুনিও নি। আশ্চর্য ব্যাপার! রাজপুরুষ হিসাবে কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, প্রত্যেকে যাতে নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারে, তাই বরং আমাদের দেখা কর্তব্য। ধর্ম কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার নেই আমাদের। লোকে যেটাকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে, তা ভাল মন্দ যাই হোক, সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে জনসাধারণকে তুষ্ট রাখাই উচিত। জনসাধারণকে চটিয়েও লাভ নেই, ঘাঁটিয়েও লাভ নেই। ওদের কুসংস্কারগুলোকে এড়াবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ওদের না ঘাঁটানো। এ ক্ষেত্রেও তাই করা যাক। উনি থামের উপর ব'সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখুন আর কাক বক শালিক তাড়াতে থাকুন, ও নিয়ে আমরা মাথাই ঘামাব না। এ সম্বন্ধে যেটুকু খবর জানা গেছে, সেইটুকু লিখে রাখব কেবল।"

একবার কাশিয়া এবং আর একবার কপালের ঘাম মুছিয়া তিনি শিখরনাথকে বলিলেন, "লেখ, কোন কোন শৈব সাধু অভিনেত্রীকে নিয়ে স'রে পড়াটাকে সাধনার অঙ্গ ব'লে গণ্য করেন। সম্ভবত অভিনেত্রীরা উত্তরসাধিকারূপে ব্যবহৃত হন। কিন্তু ব্যাপারটা ওঁকে জিজ্ঞাসা করাই তো ভাল।"

তিনি মুখ উঁচু করিয়া সাবর্ণির দিকে চাহিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সূর্যের তীব্র কিরণ হইতে নিজের চক্ষু আড়াল করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মহর্ষি সাবর্ণি, আপনি একদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন—এ ঘটনা যদি আপনার স্মরণ থাকে তা হ'লে দয়া ক'রে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি এখানে কি করছেন? থামের উপর চড়লেন কেন, কেনই বা ওখানে বসে আছেন? শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?"

সাবর্ণি জানিতেন, জীমূতবাহন বৌদ্ধ। তাই তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত হরানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমি যতটুকু জানি তা বলবার যদি অনুমতি দেন।"

"আপনি কে?"

"আমি ওঁর শিষ্য একজন।"

"বেশ, কি জানেন বলুন?"

"আমাদের গুরুদেব পৃথিবীর দুঃখের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়ে তাকে ব্যাধিমুক্ত করছেন। ওঁর কৃপায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সেরেছে। অনেক পাগল, অনেক মৃগীরোগী ওঁর দর্শনমাত্রেই সুস্থ হয়েছে।"

জীমূতবাহন চিকিৎসক সুরসেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শুনছ সুরসেন, উনি সাধারণ সাধু নন। চিকিৎসাও করেন তোমার মতো। এ রকম উচ্চপ্রতিষ্ঠিত সহকর্মীর সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?"

সুরসেন মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কোনও কোনও রোগ উনি সারিয়ে থাকতে পারেন—এ আর বিচিত্র কি! যেমন মৃগী বা অপস্মার ব্যাধি, যাকে লোকে দৈব ব্যাধি বলে, তা উনি সারিয়েছেন হয়তো। সব ব্যাধিই অবশ্য দৈব, কারণ দেবতারাই ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাধিটির উদ্ভব মানুষের মনোলোকে। এই সন্ন্যাসী নারীমুণ্ডশোভিত স্তম্ভশীর্ষে ব'সে অপস্মার-রোগীর মনকে যতটা প্রভাবিত করতে পারবেন, আমি তা পারব না। আমার বিদ্যা খল আর নোড়ায় নিবদ্ধ। যুক্তি আর বিজ্ঞানের চেয়েও প্রবলতর শক্তি পৃথিবীতে আছে।"

"আছে না কি! সে শক্তির নাম?"

"অযুক্তি এবং অজ্ঞান।"

জীমূতবাহন হাসিয়া উঠিলেন।

"সে যাই হোক, এর চেয়ে আশ্চর্য জিনিস আমি খুব কমই দেখেছি। আশা করি, কোন কবি এ নিয়ে কাব্য লিখবেন বা কোন ঐতিহাসিক সার্বর্ণিপুর প্রতিষ্ঠার সত্য ইতিহাস রচনা করবেন। আমার কিন্তু সময় নেই, নানা কাজ বাকি এখনও, এ নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না। এখন আমাকে গঙ্গানদীর খালগুলি পরিদর্শন করতে হবে। যত অদ্ভুতই হোক না কেন, এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। চল, ফেরা যাক এবার। মহর্ষি সাবর্ণি, নমস্কার, চললাম আমি। আপনি যদি কোনদিন থামের উপর থেকে নামেন আর পাটলিপুত্রে যান, তা হ'লে আমার বাড়িতে নিশ্চয় যাবেন, নিমন্ত্রণ ক'রে গেলাম।"

সার্বর্ণির শিষ্যগণ উপরোক্ত কথাগুলি শুনিলেন এবং বিশ্বাসী ভক্তদের মুখে মুখে সেগুলি চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন। সার্বর্ণির মহিমা ইহাতে আরও যেন বাড়িয়া গেল। জীমূতবাহনের কথাগুলি এমন অতিরঞ্জিত হইয়া, এমন রূপকে অলঙ্কৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল যে, দেশে তিনি অবতাররূপে কীর্তিত হইতে

লাগিলেন। জীমূতবাহন সাবর্ণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—এই সাধারণ ব্যাপারটি ভক্তদের মুখে ব্যাখ্যাত হইয়া অসাধারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিলেন, রাজসিকতা আধ্যাত্মিকতার দিকে যে অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করে ইহা তাহারই নিদর্শন। রাজসিকতার শিখরে আরোহণ করিয়া বৃদ্ধ জীমূতবাহন তাই মহর্ষ সাবর্ণির সান্নিধ্য কামনা করিতেছেন। সত্য ঘটনার উপর নানা রকম রঙও চড়িল। যাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক রঙ চড়াইলেন, তাঁহারা নিজেরাই তাহা আবার বিশ্বাসও করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এ কথাও বলিলেন যে, জীমূতবাহন যখন ঘর্মাক্ত কলেবরে উর্ধ্বমুখ হইয়া সাবর্ণির কৃপা প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন স্বর্গ হইতে একটি অপ্সরী নামিয়া আসিয়া নাকি তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার সহকারী লেখক শিখরনাথ এবং চিকিৎসক সুরসেনও সাবর্ণির নিকট দীক্ষা লইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। দুই-একজন শিবপুরাণকার ঘটনাটিকে সত্য মনে করিয়া নিজেদের পুথিতে ঢুকিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে মহর্ষি সাবর্ণির নাম তো ছড়াইয়া পড়িলই, এশিয়ার অন্যান্য অংশ এবং ইয়োরোপের লোকেরাও শুনিল যে ভারতবর্ষে গঙ্গাতীরবর্তী এক স্তম্ভের উপর ভগবানের নূতন অবতার অবির্ভূত হইয়াছেন। তাহারা সবিস্ময়ে কথাটা বিশ্বাস করিল। পৃথিবীর ধর্মজগতে একটা আলোড়ন পড়িয়া গেল। বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজকেরা, এমন কি রাজদূতেরাও, মহাসমারোহে সাবর্ণিপুর সমাগত হইলেন এবং মহর্ষি সাবর্ণিকে বিভিন্ন রাজাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া গেলেন।

একদিন রাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্তম্ভের চতুর্দিকে মুক্ত আকাশতলে সমস্ত নগরী যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন সাবর্ণির কানে কানে কে যেন বলিল—"সাবর্ণি, তুমি তো এখন জগদ্বিখ্যাত বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছ। শঙ্কর নিজের মহিমা প্রচার করবার জন্যে তোমাকে অসাধারণ শক্তি দান করেছেন। তুমি এখন অসাধ্য সাধন করছ। ইচ্ছে করলে তুমি আরও অনেক কিছু করতে পার। আরও অনেক দুরারোগ্য রোগী সারাতে পার, নাস্তিককে আস্তিক করতে পার, বড় বড় পণ্ডিতদের পরাস্ত করতে পার, ইচ্ছে করলে সমস্ত পৃথিবীকেই শৈবধর্মে দীক্ষিত করতে পার। তোমার ক্ষমতা অসীম।"

"শঙ্কর আমাকে যা করাচ্ছেন তাই করছি। যা করাবেন তাই করব।"

উত্তরে শুনিলেন, "তুমি ওঠ। পাটলিপুত্রের প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে বল, হিন্দু সন্তান হয়ে তুমি বৌদ্ধধর্ম আঁকড়ে আছ কেন? দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা না ক'রে সাধারণ-মানুষ বুদ্ধের পূজা করছ কোন্ বুদ্ধিতে? তুমি যাও। তুমি গেলেই

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার আপনি খুলে যাবে, তোমার খড়মের শব্দে রাজার স্বর্ণসদন কম্পিত হয়ে উঠবে, রাজা নতমস্তকে তোমার কাছে এসে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। তুমিই তখন প্রকৃতপক্ষে মগধের রাজা হবে। তারপর ক্রমশ কোশল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কাঞ্চী, মধ্যপ্রদেশ, পৌণ্ড, কলিঙ্গ, গান্ধার, চোল, চেদি সকলেই একে একে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। সমস্ত ভারতেরই একচ্ছত্র সম্রাট হবে তুমি তখন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজারা তোমারই অধীন হয়ে থাকবেন! তুমি তখন ভারতের সকল ক্ষুধিতকে অন্ন দেবে, সকল অসুস্থকে সুস্থ করবে। ওই জীমূতবাহন তখন তোমার পদ-প্রক্ষালন করতে পেলে নিজেকে সম্মানিত মনে করবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার বসন পাদুকা ভস্ম অস্থি প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে বড় বড় মন্দির নির্মিত হবে। বড়·বড় পুরোহিত, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় তপস্বীরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলে ক্রমশ তোমার মহিমাকে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত ক'রে দেবেন। তুমি ওঠ, যাও।"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "শঙ্কর আমাকে যা করাবেন তাই করব।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নামিবার চেষ্টা করিলেন।

সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল, "সামান্য লোকের মতো তুমি মই বেয়ে নামবার চেষ্টা করছ কেন? তুমি তো অসামান্য শক্তিধর। দেবদূতের মতো তুমি শূন্য দিয়ে উড়ে যাও। তুমি উড়ে যেতে পারবে। লাফিয়ে পড়। শঙ্কর আছেন তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, তিনি এই চান।"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "শঙ্করের যদি তাই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তাই হোক।"

সাবর্ণি তাঁহার শীর্ণ হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিলেন। মনে হইতে লাগিল এক বিরাটকায় শীর্ণ পক্ষী যেন ডানা মেলিয়াছে। তিনি লাফাইতে যাইবেন এমন সময় একটা চাপা খিলখিল হাসি শুনিতে পাইলেন।

"ও রকম হাসছে কে?"

"আমি"—সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইল, "তোমার সঙ্গ এখনও ছাড়িনি বন্ধু। আশা ক'রে আছি আরও ঘনিষ্ঠতা হবে আমাদের। আমিই তো তোমাকে চালাচ্ছি—আমিই তোমাকে থামের উপর চড়িয়েছি, আমার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছ তুমি। সত্যি, সাবর্ণি খুব খুশী করেছ আমাকে।"

সাবর্ণি এবার বুঝিতে পারিলেন।

সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দূর হও—দূর হও। তোমাকে চিনেছি

আমি। তুমি মার, তুমি মায়া, তুমি শয়তান। শিবের তপোভঙ্গ করবার জন্ত তুমিই মদনকে প্ররোচিত করেছিলে।"

সাবর্ণি হতাশ-হৃদয়ে পাষাণময় স্তম্ভশীর্ষে পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি একে আগে চিনতে পারিনি কেন! যে সব অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আমার কৃপার আশায় এসে এখানে রোজ ভীড় করে, তাদেরই মতো আমি অন্ধ বধির পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি না কি! দেখছি আমার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পেয়েছে, সূক্ষ্মভাব আর আমি ধরতে পারছি না, দেবতা-দানবের পার্থক্য বোঝবার শক্তিও আমার লোপ পেয়েছে। পাগলেরও অধম হয়ে গেছি আমি। নরকের কোলাহল আর স্বর্গের সঙ্গীত আমার কানে একই রকম শোনাচ্ছে। সদ্যোজাত শিশুকে মাতৃস্তন থেকে সরিয়ে নিলে কেঁদে ওঠে, সামান্ত কুকুরও সহজবুদ্ধিবলে তার প্রভুকে অনুসরণ করে, ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদও সহজাত প্রেরণায় আলোর দিকে শাখা বাড়ায়। আমি এখন পাপের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। পাপের প্ররোচনাতেই এই থামের উপর উঠেছিলাম, আর আমার সঙ্গে বিলাস এবং অহমিকাও উঠে এসে আমার দু-পাশে ব'সে ছিল। প্রলোভনকে আমার ভয় নেই, ইতিপূর্বে অনেক তপস্বী এর চেয়ে বেশী প্রলোভনের কবলে পড়েছেন। আমি বরং কামনা করি শঙ্করের সামনে প্রলোভনের খড়্গ আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলুক। কৃচ্ছ্রসাধন করতে করতে আমার মৃত্যু হোক আপত্তি নেই, ওতে আমি আনন্দ পাব। কিন্তু শঙ্কর কই? তাঁর যে কোনও সাড়া পাচ্ছি না, কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না! তিনি কি তা হ'লে আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন? তিনিই যে আমার একমাত্র ভরসা, একমাত্র গতি। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি আমার কাছে নেই। ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ ক'রে তিনি দূরে চ'লে গেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে তো থাকতে পারব না। আমি তাঁর পিছু পিছু ছুটব। এই স্তম্ভের উপর ব'সে থাকা চলবে না। অসহ্য মনে হচ্ছে। এর স্পর্শে আমার অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। আর এখানে থাকব না, শঙ্করের কাছে যাব, তাঁকে আবার ধরব।"

তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মই দিয়া নামিতে শুরু করিলেন। এক ধাপ নামিয়াই তাঁহাকে পাষাণে খোদিত সেই স্মিতাননা নারীমুণ্ডটির সহিত মুখামুখি হইতে হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে যেন আর একটু হাসিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, তিনি এতদিন তপস্যার ছলে কামনার আসনে বসিয়া নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কীর্তির

মধ্যে কিছুমাত্র মহত্ত্ব নাই, তাহা কীর্তি নয়—কলঙ্ক, তাহা দানবীয় ষড়যন্ত্র মাত্র। তিনি তাড়াতাড়ি নামিতে লাগিলেন। মাটির উপর নামিয়া তাঁহার পা দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বহুকাল তাহারা মৃত্তিকার স্পর্শ পায় নাই। কিন্তু যেই তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অভিশপ্ত স্তম্ভটির ছায়া তাঁহার উপর পড়িয়াছে, তখন তিনি জোর করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। সাবর্ণিপুরের অধিবাসীরা তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি পান্থশালা, পশুশালা, বিপণিমালা পরিবেষ্টিত বিরাট চতুষ্কোণ সাবর্ণিপুর অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী পর্বতশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। কেবল একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সেও নিরস্ত হইল। শ্বাপদসরীসৃপপূর্ণ দস্যুতস্কর-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্য দিয়া তিনি পর্বতমালা লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। ক্রমাগত চলিতেই লাগিলেন। পরদিন এবং তাহারও পরদিন থামিলেন না।

ক্ষুৎপিপাসায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া তিনি অবশেষে এক অদ্ভুত নগরীতে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও জনমানব নাই। তাঁহার মনে হইল, এইবার কি আমি শঙ্করের কাছাকাছি আসলাম? কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নগরটি সত্যই অদ্ভুত। একেবারে নীরব; অথচ নিতান্ত ছোটও নয়, বামে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু সবগুলিই ধ্বংসোন্মুখ, একটি বাড়িরও তোরণ নাই। মনে হইল, তিনি হয়তো শঙ্করের অনুচর প্রেতদের পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, কোন কোন বাড়ির মধ্যে বন্য পশুও রহিয়াছে। তরক্ষু, হায়েনা প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুরা শাবকদের স্তনপান করাইতেছেন। কোথাও বা শবদেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে। সাবর্ণি হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে একটি ভগ্নগৃহের সম্মুখে আসিয়া বড়ই অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিলেন, এই বাড়িটি অন্য বাড়িগুলি হইতে একটু স্বতন্ত্র। প্রথমত শহরের বাহিরে, দ্বিতীয়ত যদিও ধ্বংসোন্মুখ তবু দেখিয়া মনে হয় এককালে ইহা কোনও ধনীর আবাস ছিল, বিধ্বস্ত প্রাকারগুলিতেও অতীত ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তৃতীয়ত কাছেই একটি ঝরণা এবং কয়েকটি খেজুরগাছ আছে। বাহির হইতে একটি ঘরের অভ্যন্তরভাগ দেখা যাইতেছিল। দেখিয়া সাবর্ণি শিহরিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর অনেক সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহার মনে হইল, তাড়া দিলেই সাপ পলায়ন করিবে। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিবেন, কোথায় থাকিবেন!

তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "ওই আমার স্থান। ওই ঘরে বসেই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

তিনি হামাগুড়ি দিয়া ঘরটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়াই সাপগুলি বাহির হইয়া গেল। তখন ঘরের মেঝের উপর তিনি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণ একভাবেই শুইয়া রহিলেন। চতুর্দিকের শান্ত নিঃশব্দ পরিবেশ তাঁহার ক্লান্তি অপনোদন করিল। প্রায় চার-পাঁচ প্রহর অতীত হইবার পর তিনি উঠিয়া ঝরনার কাছে গেলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন। ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। দেখিলেন, খেজুর ছাড়া আর কোনরূপ খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি খেজুরের সাহায্যেই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন। ঠিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তিনি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার পক্ষে এখন কৃচ্ছ্র সাধনই প্রশস্ত।

তিনি সমস্ত দিন ঘরের মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত একবারও মাথা তুলিতেন না।

একদিন যখন এইভাবে শুইয়া আছেন তখন কে যেন বলিল, "মাথা তোল, দেওয়ালের উপর কি আঁকা আছে দেখ। অনেক কিছু শিখতে পারবে।"

সার্বণি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, দেওয়াল জুড়িয়া সত্যই নানারকম ছবি আঁকা আছে। চিত্রের বিষয়বস্তুতে কোনও অসাধারণত্ব নাই, কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় চিত্রগুলি প্রাচীন এবং সুনিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি। অধিকাংশই গৃহস্থালীর চিত্র। কোন চিত্রে কেহ বা গাল ফুলাইয়া উনানে ফুঁ দিতেছে, কেহ হাঁস ছাড়াইতেছে, কোথাও বা রান্না হইতেছে। কিছুদূরে একটি চিত্রে এক শিকারী স্কন্ধে তীরবিদ্ধ একটি মৃগ লইয়া চলিয়াছে। কোন চিত্রে কৃষকেরা জমিতে লাঙল দিতেছে, কোথাও বা বীজ বুনিতেছে। অন্যত্র আবার একদল নৃত্যপরা যুবতী বিবিধ নৃত্যভঙ্গিমায় যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাদকেরাও আছে। কেহ বাঁশী, কেহ বেহালা, কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতেছে।

একটু তফাতে একটি মোহিনী যুবতীর ছবি রহিয়াছে, তাহার হাতে বীণা, শ্লথ কবরীতে পদ্মকলি। অপরূপ ছবি! স্বচ্ছ বসনের ভিতর দিয়া তাহার প্রস্ফুটিত যৌবনের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফুল্ল অধর, পীবর স্তন যেন কুসুমের মহিমায় মহিমান্বিত। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গীসহকারে সে যেন সার্বণির দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। সার্বণি চক্ষু নত করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কে আপনি, এ সব ছবি দেখতে আমাকে কেনই বা

আদেশ করলেন ? অসাধারণ কিছুই তো দেখলাম না। সবই তো নশ্বর জীবনের লীলাখেলা। যে ভোগী পুরুষের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য এ সব আঁকা হয়েছিল, তার দেহ নিশ্চয় শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে। ছবিগুলি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি দেখে সেই মৃত মানুষটির কথাই আমার মনে হচ্ছে। এ সবই তার ক্ষণস্থায়ী অহঙ্কারের চিহ্নমাত্র। সে কোথা ?"

উত্তর হইল—"সে মারা গেছে। কিন্তু সে যে একদিন মহা-সমারোহে সগৌরবে বেঁচে ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তুমিই কি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? তুমিও একদিন মরবে। কিন্তু ভেবে দেখ, ওর মতো সগৌরবে তুমি বাঁচতে পেরেছ কি ? সারাজীবন কি করলে ?"

সেই দিন হইতে সাবর্ণি আর এক মুহূর্ত সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই অজানা কণ্ঠস্বর ক্রমাগত তাঁহার কানে মন্ত্রণা দিতে লাগিল। চিত্রার্পিতা বীণাবাদিনীও ঢলঢল নয়ন মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমশ তাহার মুখে ভাষাও ফুটিল।

"দেখ, আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। আমি সামান্য রমণী নই। আমি রহস্যময়ী, আমি সুন্দরী ; আমাকে উপেক্ষা ক'রো না, ভালবাস। যে কামনার তাড়নায় তুমি ছটফট করছ, আমার বাহুপাশে ধরা দিয়ে তা নিঃশেষ ক'রে দাও। কিসের ভয় তোমার ? আমি কি ভয়ঙ্করী ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। আমাকে এড়িয়েও কি তুমি যেতে পারবে ? পারবে না। আমি চিরন্তনী নারীর প্রতীক, আমি সৌন্দর্যলক্ষ্মী। আমাকে ফেলে কোথায় পালাচ্ছ তুমি পাগলের মতো ? পালানো যে সম্ভব নয়। কুসুমের বিকাশে, বনানীর চিরতারুণ্যে, বিহঙ্গীর গতিতে, হরিণীর চাঞ্চল্যে, তরঙ্গিণীর ধারায়, জ্যোৎস্নার আবেশে, রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যে সর্বত্রই যে আমি নানা ভঙ্গীতে ওতপ্রোত হয়ে আছি। আমিই প্রকৃতি। যদি চোখ বুজেও থাক, তা হ'লেও আমাকে নিজের বুকের মধ্যে দেখতে পাবে। যার দেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হয়েছে বলে তুমি তোমার আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করছিলে, তার কথা শোন। সহস্র বৎসর পূর্বে সে রাজার মতো বেঁচে ছিল। আমি ছিলাম তার চক্ষের আলো, বক্ষের মণি। সহস্র বৎসর পূর্বে আমার অধর থেকেই সে তার শেষ চুম্বন নিয়ে গেছে, সে চুম্বনের সুরভিতে এখনও তার শ্মশানভস্ম আমোদিত। সাবর্ণি, তুমি তো আমাকে ভাল ক'রেই জান। চিনতে পারনি এখনও ? নিরঞ্জনা যে অসংখ্য রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তারই একটা রূপ। তুমি শিক্ষিত সন্ন্যাসী, তোমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, ভ্রমণ করলে জ্ঞান আরও বাড়ে। ঘরে ব'সে দশ বছরেও

যা পাওয়া যায় না, ভ্রমণ করতে করতে তা একদিনেই পাওয়া যায় অনেক সময়। বই প'ড়ে দেশভ্রমণ ক'রে অনেক জ্ঞান তুমি লাভ করেছ। তোমার অন্তত জানা উচিত যে, সমুদ্র মন্থনের সময় অকূল পাথার থেকে নিরঞ্জনাই উঠেছিল রম্ভার রূপ ধ'রে। সবাইকে মুগ্ধ করেছিল সে। ঋষি বিশ্বামিত্রকেও, রাক্ষস রাবণকেও। কালিদাসেও বিক্রমোর্বশী নাটকে নিরঞ্জনারই প্রেম-কাহিনী কীর্তত হয়েছে। পুরূরবা বিক্রমই চিরন্তন পুরুষ আর উর্বশী চিরন্তনী নারী। এ সব তুমি কি পড়নি? সহস্র বৎসর পূর্বে যখন আমি বেঁচে ছিলাম তখন অনেককে ভুলিয়েছি। এখন যদিও ছায়ামাত্র, কিন্তু এখনও আমি তোমাকে ভোলাতে পারি, তোমার কামনাসঙ্গিনীও হতে পারি। তোমাকে আমি ভালবেসেছি সন্ন্যাসী। বিস্মিত হচ্ছ? এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে জেনো, যেখানেই তুমি যাও, নিরঞ্জনা তোমার সঙ্গে থাকবে।"

এ কথা শুনিয়া সার্বণি পাথরে মাথা ঠুকিতেন আর আর্তনাদ করিতেন। প্রতিরাত্রে বীণাবাদিনী দেওয়াল হইতে নামিয়া আসিয়া স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিত। তাহার হিমশীতল নিশ্বাসও যেন তাঁহার গায়ে লাগিত। সার্বণির কঠোর সংযমে সে বিচলিত হইত না, বরং বলিত—"অমন করছ কেন, বন্ধু, এস, আলিঙ্গন কর আমাকে। যতক্ষণ ধরা না দেবে ততক্ষণ ছাড়ব না তোমাকে আমি। প্রেতিনীর অধ্যবসায় কত দৃঢ়, তা বোধ হয় জান না তুমি। আমি কেবল প্রেতিনী নই, আমি যাদুকরীও। আমি তোমার দেহ থেকে তোমার প্রাণ বার ক'রে নিয়ে আর একটা প্রাণ পুরে দিতে পারি তার ভিতর। তোমার সেই নবসঞ্জীবিত দেহ তখন আমাকে আলিঙ্গন করতে আপত্তি করবে না। তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ একবার। তোমার মুক্ত প্রাণ, আত্মাও বলতে পার, স্বর্গেও যদি যায় সেখান থেকে দেখতে পাবে যে, তোমার দেহটা আমার সঙ্গে সানন্দে পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তোমার ভগবানও এতে বিপন্ন বোধ করবেন। যাদুকরীর মোহে যার দেহ লালসার পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে তাকে তিনি স্বর্গে স্থান দেবেন কি ক'রে? এ সম্ভাবনার কথা তুমি বোধ হয় চিন্তা করনি। তোমার শঙ্করও করেন নি বোধ হয়। গোপনে তোমাকে একটা কথা বলছি শোন, তোমার শঙ্করের তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই। সামান্য যাদুকরীও তাঁকে ঠকিয়ে দিতে পারে। যুগে যুগে ঠকিয়েওছে। ওঁর তৃতীয় নয়নের রোষবহ্নি আর নন্দী-ভৃঙ্গীরা যদি না থাকত, তা হ'লে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ওঁর জটা আর দাড়ি

ধ'রে টানাটানি করত। ওঁর চেয়ে ওঁর শত্রুপক্ষের লোকেরা, যাদের তোমরা দানব পিশাচ প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছ, ঢের বেশী বুদ্ধিমান। তারা শিল্পীও অদ্ভুত। আমার এই যে রূপ, এই যে ছলা-কলা, এ তো তাদেরই সৃষ্টি। তাদেরই প্রেরণায় আমি এমন ক'রে বেণী দোলাতে শিখেছি, সাজাতে শিখেছি নিজেকে নানা-ভাবে। তুমি কিন্তু ওদের কখনও আমল দাওনি, কখনও শ্রদ্ধা করনি, ওদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে কখনও ইতস্তত করনি। এই ঘরে যখন তুমি ঢুকলে তখন সাপগুলোকে তাড়িয়ে দিলে, তাদের ডিমগুলোকে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেললে, একটুও দয়া হল না তোমার। একবারও মনে হল না যে, ওরা দানবদের আত্মীয়। অপমানিত দানবরা তোমাকে ছাড়বে কেন? আমার মনে হয়, তোমার সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। গুণীদের অপমান ক'রে কেউ কখনও নিস্তার পায় না। তুমি কি জান না, ওঁরা কত বড় রসিক, কত বড় প্রেমিক? তুমি চিরকাল ওঁদের ঘৃণা করেছ। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোহর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছ তুমি। তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন কেন? তাঁদের যিনি রাজা, যাঁর সামান্য ভ্রূভঙ্গীতে ত্রিভুবন কেঁপে উঠতে পারে, বিদেশীরা যাঁকে শয়তান উপাধি দিয়েছে, তিনি আমার প্রণয়ী। জান, সাবর্ণি, তিনি আমাকে চুম্বন করেন।"

যাদুবিদ্যার ক্ষমতা কত তাহা সাবর্ণির অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভীত হইলেন। ভাবিলেন, যাদুবিদ্যা-প্রভাবে হয়তো এখনই কোন দানবরাজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখেই ওই বীণাবাদিনীকে আলিঙ্গন করিবে। মাঝে মাঝে চুম্বনের মৃদু শব্দও যেন তিনি শুনিতে পাইলেন।

এইরূপ জটিল পরিস্থিতিতে পড়িয়া তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন, শঙ্কর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। চক্ষু খুলিতে, এমন কি চিন্তা করিতেও, তাঁহার ভয় করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার অভ্যাস মতো তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গীতে শুইয়া ছিলেন। এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল।—

"পৃথিবীতে কত প্রকার জীব আছে জান? জান না। আমি যা দেখেছি তা যদি তোমাকে বলি, তা হ'লে হয়তো ভয়ে তুমি মূর্ছা যাবে। একচক্ষু মানুষ আছে, তার চক্ষুটি কপালের ঠিক মাঝখানে থাকে। এক পা-ওলা মানুষ আছে, তারা হেঁটে চলে না, লাফিয়ে চলে। এমন লোক আছে যারা ইচ্ছামতো নিজেদের স্ত্রী বা পুরুষে রূপান্তরিত করতে পারে। বৃক্ষরূপী মানুষও আছে, জমির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত শিকড় চালিয়ে তারা ব'সে থাকে। মুণ্ডহীন মানুষও দেখেছি,

তাদের চোখ নাক মুখ দাঁত সব বুকের উপরে, কবন্ধের মতো চেহারা। তোমার শঙ্কর কি এদের সবাইকে ত্রাণ করবেন? তোমার কি বিশ্বাস?"

আর একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি বিস্তৃত মাঠ, নদী এবং বাগান দেখা যাইতেছে। মাঠে চারুদত্ত ও শুভদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছেন, গতিবেগের উন্মাদনা তাঁহাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট। একটি তোরণের নীচে দাঁড়াইয়া কবি চিন্ময় কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন, পরিতৃপ্ত অহঙ্কার তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কৃত হইতেছে, নয়নের দৃষ্টি আবেশময়। বাগানের ভিতর নভোনীল এবং মহাস্থবিরকেও দেখা যাইতেছে। নভোনীল সোনার আপেল তুলিতেছেন, এবং আদর করিতেছেন একটি বহুবর্ণবিচিত্র সর্পিণীকে। তাহারও চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন। পীতবসনাবৃত হর্ষগম্ভীর একটি আম্রবৃক্ষের দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। আম্রবৃক্ষের শাখায় ফল দুলিতেছে না, দুলিতেছে নানা-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মুণ্ড—মানুষের, দেবদেবীর, অবতারদের, পশুপক্ষীরও। কোন কোন শাখায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রও দুলিতেছে। কিছু দূরে সিন্ধুপতিকে দেখা যাইতেছে। তিনি একটি ফোয়ারার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি গোলক হাতে লইয়া তাহাতে জ্যোতিষ্কদের ভ্রমণপথ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাহার পর সাবর্ণির নিকট আগাইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে সপুষ্প একটি অশোক-পল্লব। তিনি সাবর্ণিকে বলিলেন, "দেখ, অনেকে অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিধিতেই অনন্তকে টেনে আনে। অনেকে আবার ওসব কথা ভাবেই না। তারা তাদের স্বভাবের নির্দেশ মেনে চলে, আর তাতেই সুখী হয়, তার মধ্যেই সৌন্দর্যের সন্ধান পায়। শুধু তাই নয় সহজ জীবন যাপন ক'রে তারা সেরাশিল্পী ভগবানের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীতে।। মানুষই তো ভগবানের সেরা কাব্য. সে কাব্যের মহত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে। তারা সুখের জাতিবিচার করে না, তারা সুখ মাত্রকেই নির্মল করে, জীবনকে ভোগ ক'রেই তাদের আনন্দ। তাদের আচরণ কি নিন্দনীয়! যদি তা না হয়, তা হ'লে ভেবে দেখুন, মহর্ষি, আপনি সারাজীবন কি করলেন।"

দৃশ্য মিলাইয়া গেল।

মহর্ষি সাবর্ণি অহোরাত্র প্রলুব্ধ হইতে লাগিলেন। শয়তান দেহে বা মনে তাঁহাকে এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকিতে দিল না। ক্রমশ ওই নির্জন কক্ষটি রাজধানীর চৌমাথা অপেক্ষাও বেশী জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দানবদের

অট্টহাস্য শুনিতে লাগিলেন। অসংখ্য জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গের জৈব-লীলা তাঁহার চোখের সম্মুখেই ঘটিতে লাগিল। যখন ঝরনায় তিনি জলপান করিতে যাইতেন তখন অপ্সরীরা সেখানে আসিয়া ভীড় করিত, গান গাহিত, নাচিত এবং তাঁহাকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিত। সার্বর্ণি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাহাদের অশ্লীল ইঙ্গিত, অকথ্য ভাষণ, অভব্য ব্যঙ্গ ও নৃত্য তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে তাহারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শও করিতে লাগিল। একদিন এক ক্ষুদ্রকায় কিন্নর একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল। যে দড়ি দিয়া তাঁহার কৌপীনটি কোমরে বাঁধা ছিল সেই দড়িটি সে কাড়িয়া লইয়া গেল।

সার্বর্ণি শিহরিয়া মনে মনে বলিলেন, "চিন্তা, আমাকে কোথায় তুমি নিয়ে এসেছ!"

চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি স্থির করলেন, হাতের কাজ করিবেন। ঝরনার নিকটে অনেক কলাগাছও ছিল। তিনি কিছু কলাপাতা সংগ্রহ করিলেন, এবং পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া ডাঁটাগুলি পাথর দিয়া ছেঁচিয়া দড়ির আকারে পাকাইতে লাগিলেন। মনস্থ করিলেন কৌপীনের দড়িটা সর্বাগ্রে পাকাইয়া ফেলা দরকার। ইহাতে মায়াবী দানবেরা একটু যেন জব্দ হইল। আর তাহারা শব্দ করিত না। বীণাবাদিনী কুহকিনীও পুনরায় চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রাচীর আশ্রয় করিল, যাদুকরীর বেশে আর সহসা তাঁহাকে বিচলিত করিবার প্রয়াস পাইল না। কলার ডাঁটা ছেঁচিতে ছেঁচিতে তাঁহার সাহস এবং আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ যেন ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি আশা করিতে লাগিলেন, শঙ্কর যদি দয়া করেন তাহা হইলে কামকে তিনি পরাস্ত করিতে পারিবেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার আত্মপ্রত্যয় এখনও নষ্ট হয়নি। মায়াবী দানবেরা বা ওই বীণাবাদিনী যাদুকরী আমাকে নাস্তিক ক'রে তুলতে পারবে না। তারা যদি আসে তাদের বলব—প্রথমে শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না, শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই শঙ্কর। ওরা যদি এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়, যদি বলে—এ আমার আজগুবি কল্পনা, তবু আমি বলব—ওই আজগুবি কল্পনাই আমি বিশ্বাস করি। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি মানেই তো তাই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা অসম্ভব, একমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তা সম্ভব হয় ভক্তের মনে। সাধারণ সম্ভবপর ব্যাপার তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানের সীমার পরেই। শঙ্কর যদি সাধারণ মানুষ হতেন তাঁকে জানতাম, বিশ্বাসের প্রয়োজনই হত না তা হ'লে। কিন্তু মোক্ষের পথে জ্ঞান আমাদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে! সে পথে বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল।..."

তিনি প্রতিদিন কলার সুতাগুলি রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া সযত্নে সেগুলিকে

আবার ঘরের ভিতরে লইয়া আসিতেন। নির্মল আনন্দে ক্রমশ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌপীনরজ্জুটি প্রস্তুত করিবার পর তিনি ঘাস উপড়াইয়া মাদুর ও ঝুড়ি নির্মাণে মন দিলেন। ক্রমশ ঘরটা ঝুড়ি ও মাদুরের কারখানা হইয়া উঠিল। কাজ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু, হায়, শঙ্কর তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। আবার একদিন রাত্রে কাহার অপরিচিত কণ্ঠে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন।

কে একজন চুপি চুপি মৃদু কণ্ঠে কাহাকে ডাকিতেছিল, "অঞ্জনা, অঞ্জনা, চল, আমরা স্নান ক'রে আসি। শিগগির এসো দেরি ক'রো না।"

ইহার উত্তরে যে নারীটি কথা কহিল, সার্বণি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, তাহার মুখটা তাঁহার শিয়রের দিকে রহিয়াছে।

সে উত্তর দিল, "আমি যাই কি ক'রে! একজন লোক যে আমার উপর শুয়ে আছে!"

সহসা সার্বণির সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, একটি যুবতীর স্তনের উপর তিনি গাল রাখিয়া শুইয়া আছেন। বীণাবাদিনীকে তিনি মুহূর্তের মধ্যে চিনিতে পারিলেন। সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতে তাহার স্তনদ্বয় আরও জীবন্ত আরও পীবর হইয়া উঠিল। সার্বণি আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না, সেই কলঙ্কিতা মাংসপিণ্ডকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যেও না, চ'লে যেও না, তুমিই স্বর্গ।"

সে কিন্তু রহিল না, উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। হাসি নয়, যেন জ্যোৎস্নার ঝলক। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "আমার থাকবার দরকার নেই তো! তোমার মতো কল্পনাকুশল প্রণয়ী তো ছায়ার ছায়াতেই সন্তুষ্ট। তা ছাড়া যা করবার তা তো তুমি করেইছ, আর কি চাও?"

হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান করিল।

মহর্ষি সার্বণি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন। যখন উষালোক দেখা গেল তখন তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"শঙ্কর, শঙ্কর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করছ? কি দোষ করেছি আমি? আমাকে এমন ক'রে ছেড়ে যেয়ো না। তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, নির্গুণ পরমব্রহ্মের ধারণা আমার নেই, তুমিই আমার একমাত্র সম্বল। মানুষের রূপেই তোমাকে আমি পুজো করেছি—মানুষের যত ক্ষমতা, যত ঐশ্বর্য, যত রূপ, যত বিভূতি কল্পনা করা সম্ভব, তা আমি তোমার মধ্যেই কল্পনা করেছি—তোমার মধ্যেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছি। তুমি আমার

পরমাত্মীয়, একমাত্র আত্মীয়, আমার পূজা কোন অলৌকিক মহিমার উদ্দেশে নয়, নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশেও নয়, তোমার উদ্দেশে—যাকে আমি মানুষরূপে কল্পনা করেছি। যে মদন একদিন তোমার তপোভঙ্গ করেছিল, সেই মদন আমাকেও বিব্রত করেছে। তুমি তাকে ভস্ম ক'রে ফেলেছিলে, কিন্তু আমার সে শক্তি কই ? আমার বিপদ কি বুঝতে পারছ না ? দুর্বল ব'লেই আমাকে ত্যাগ করবে ? মানুষ যে কত অসহায় তা তো তোমার অবিদিত নেই প্রভু, নিজেই কতবার তুমি নরদেহ ধারণ করেছ, দেহের ক্ষুধা যে কি তুমি জান না ? সেই ক্ষুধার তাড়নাতে কাতর হয়েছি ব'লে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবে ?···"

সাবর্ণি যখন স্তম্ভের উপরে ছিলেন তখন তিনি যে দানবের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, তাহাই আবার শুনিতে পাইলেন।

"তোমার শঙ্করকে শেষকালে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনলে ! বৌদ্ধদের মতো এবার সহজিয়া পন্থা ধরবে না কি ! হা হা হা হা।"

অট্টহাস্যে সমস্ত ঘর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সাবর্ণির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া গৈরিকবসন-পরিহিত বহু সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছেন, কেহ বা হাওয়া করিতেছেন।

একজন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে দারুণ চীৎকার শুনলাম, এসে দেখি আপনি মৃতবৎ প'ড়ে আছেন। মনে হ'ল সম্ভবত আপনি কোনও দানবের কবলে প'ড়ে ছিলেন, আমাদের দেখে দানবটা স'রে পড়েছে।"

সাবর্ণি মাথা তুলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ভাই, তোমরা কে ? এত লোক কেন ? তোমরা কি আমার শব দাহ করতে এসেছ ?"

তাহারা বলিল, "আপনি তো বেঁচে আছেন। আপনার বেশ দেখে মনে হয় আপনি সন্ন্যাসী। আপনি কি শোনেন নি যে, মহাবৃদ্ধ পরমশৈব মহর্ষি কারগুব একশ পাঁচ বৎসর বয়সে হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন সবাইকে আশীর্বাদ করতে ? তাঁর কাছেই যাচ্ছি আমরা—এত বড় সংবাদটা আপনি শোনেন নি ? এখানে কি একজন লোকও নেই !"

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "এ সংবাদ শোনবার যোগ্যতাই আমার নেই বোধ হয়। এ নগর শয়তান আর দানবদের লীলাভূমি, কোনও মানুষ এখানে আসে না। আপনারা আমার জন্যে প্রার্থনা করুন। আমি সাবর্ণি, হিমালয়ের অরণ্যে

বহুকাল শঙ্করের ধ্যানে কাটিয়েছি, কিন্তু হায়, তবু শঙ্করের কৃপা আজও পাইনি। তাঁর অযোগ্যতম সেবক আমি। বড় কষ্ট পাচ্ছি।”

সাবর্ণির নাম শুনিবামাত্র সকলে করজোড়ে প্রণত হইলেন। যিনি কথা বলিতেছিলেন তিনি বলিলেন, “আপনিই কি সেই বিখ্যাত মহর্ষি সাবর্ণি, যাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, যাঁর অসাধারণ তপস্যা বিদগ্ধ সমাজে প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকে মনে করেন মহর্ষি কারণ্ডব ছাড়া যাঁর সমতুল্য তপস্বী আর নেই—আপনিই কি তিনি? আমাদের কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম! আপনার কথা কে না জানে? আপনার সব কথা শুনেছি। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনাকে আপনিই তো ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন, স্তম্ভশীর্ষে আরোহণ ক'রে কঠোর তপস্যাপ্রভাবে আপনি শত শত রোগীকে আরোগ্য করেছেন, সেই স্তম্ভকে কেন্দ্র ক'রে বহু দেশের তীর্থিকদের নিয়ে বিরাট সাবর্ণিপুর নগর গড়ে উঠেছে, এ কথা সবাই জানে। স্তম্ভশীর্ষ থেকে আপনার বিস্ময়কর অন্তর্ধান—শুধু বিস্ময়কর নহে, মহিমময় বললেও অত্যুক্তি হবে না—এত অলৌকিক যে, স্বল্পবুদ্ধি লোকেরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। যারা স্তম্ভের পাদমূলে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁদের কাছে শুনেছি, স্বর্গের দেবদূতেরা এসে আপনাকে শুভ্রমেঘে আবৃত ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, কেবল দেখা যাচ্ছিল, আপনার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তটি, আপনি যেন সকলের শিরে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে আকাশ-পথে বিলীন হয়ে গেছেন। পরদিন সকালে আপনাকে স্তম্ভশীর্ষে দেখতে না পেয়ে সাবর্ণিপুর হাহাকারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আপনার অন্তর্ধানের বিস্ময়কর হেতু জনসমাজে যখন প্রচার করলেন, তখন সকলে একটু শান্ত হ'ল। তিনিই এখন আপনার শিষ্যসম্প্রদায়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। আপনার রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ এখন আর নেই। অবশ্য একটি লোক ছাড়া—সেও আপনার শিষ্য, তার নাম বালক বাপ্পা, সে বোধ হয় একটু পাগল-গোছের। তার ধারণা আপনাকে দেবদূতেরা নিয়ে যায়নি, দানবেরা নিয়ে গেছে। তার এ কথায় ঘোর আলোড়ন হয়েছিল, জনতা হয়তো ঢিল ছুঁড়ে তাকে মেরেই ফেলত। অনেক কষ্টে রক্ষা পেয়েছে সে। আমার নাম মনভ্রমর—যারা আপনাকে প্রণাম করছে, তারা সবাই আমারই শিষ্য। আমিও আপনার কাছে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। দেবদূতেরা আপনাকে স্তম্ভশীর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, শঙ্করের আশ্চর্য মহিমা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, শঙ্করেরই নিগূঢ় অভিপ্রায়ে হয়তো আপনি আবার এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি আগে আমাদের আশীর্বাদ করুন, তারপর সব বলুন, আমরা শুনে ধন্য হই।”

সাবর্ণি উত্তর দিলেন, "হায় হায়, তোমরা যা মনে করছ তার কিছুই হয়নি। শঙ্করের একবিন্দু কৃপাও আমি পাইনি। তিনি কেবল ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মধ্যে আমাকে ফেলেছেন। কোনও দেবদূত আমাকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যায় নি। বিরাট এক ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ ক'রে আমি এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। বাস করেছি মিথ্যা স্বপ্নলোকে। শঙ্কর ছাড়া সবই মিথ্যা, তাঁকে আমি পাইনি। যখন আমি পাটলিপুত্রে যাচ্ছিলাম, তখন পথে নানা লোকের মুখে নানা রকম কথা শুনেছি। তারা সকলেই আমাকে ভুল পথে চালাবার চেষ্টা করেছিল, আমার মনে হয়েছিল, মোহ নানারূপে এসে আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মোহ এখনও আমাকে ছাড়েনি, এখনও আমাকে অনুসরণ করছে, এখনও আমি অভিভূত, মনে হচ্ছে অহোরাত্র যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ব'সে আছি।"

মনভ্রমর উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা শুনেছি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জীবনে বহু প্রলোভন আসে। আপনি বলছেন—কোনও দেবদূত এসে আপনাকে নিয়ে যায়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন দেখেছে তখন মনে হয় শঙ্কর আপনার প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবিকেই বোধ হয় সে সম্মান দান করেছেন। কারণ পণ্ডিত হরানন্দ এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী স্বচক্ষে দেখেছেন যে, আপনি বা আপনার মত কেউ যেন দেবদূতবাহিত হয়ে আকাশপথে বিলীন হয়ে গেলেন।"

মহর্ষি সাবর্ণি কোন উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, তিনিও ইহাদের সহিত গিয়া মহর্ষি কারণ্ডবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

"ভাই মনভ্রমর, আমাকেও তোমাদের একটা ত্রিশূল দাও। তোমাদের সঙ্গে, চল, আমিও গিয়ে মহর্ষি কারণ্ডবের পদপ্রান্তে প্রণত হই। তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?"

"কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের আবার সুবিধা-অসুবিধা কি, আমরা তো সৈনিক। জীবন-যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের চেয়ে বড় সৈনিক আর কে আছে বলুন? আপনি আর আমি ত্রিশূল নিয়ে আগে আগে যাব। আর বাকি সকলে স্তোত্রগান করতে করতে আমাদের পিছু পিছু আসুক। সেনাবাহিনীর মতো আমরা অগ্রসর হই, চলুন।"

তাঁহাদের যাত্রা শুরু হইল।

মনভ্রমর সাবর্ণিকে বলিলেন, "মহর্ষি, ভগবানের বিষয় আমাদের কিছু শোনান।"

সাবর্ণি বলিতে লাগিলেন, "সর্বসত্যের সমন্বয়ই ভগবান, কারণ তিনি সত্য

ছাড়া আর কিছু নন ; আর সত্য এক অবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীর যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি তা মায়াময়, মনে ভ্রান্তির সঞ্চার করে কেবল। তাই প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ, আপাতদৃষ্টিতে যতই মনোহর হোক না কেন, সত্যলাভের পথে তা অন্তরায়। ওর থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি মনোহারিণী, তাই সে ভয়ঙ্করী। তাই যখনই দেখি কোনও গাছ মুঞ্জরিত হয়েছে, কোন লতা কোনও গাছকে বেষ্টন করেছে, আমার প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, বিষণ্ণ বোধ করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু আমরা অনুভব করি তা সবই ভয়ঙ্কর জানবে। তুচ্ছ একটা বালুকণাও বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস আমাদের লোভ দেখায়। নারী তো মূর্তিমতী প্রলোভন। জলে স্থলে আকাশে যত রকম প্রলোভন আছে সমস্ত পুঞ্জীভূত হয়েছে নারীর দেহে। যার ইন্দ্রিয়ের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ সে-ই যোগী, সে-ই সুখী। যে মূক বধির অন্ধ হতে জানে, প্রকৃতির মায়া যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সে-ই ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে।”

মনভ্রমর কথাগুলি প্রণিধান করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, “প্রভু, আপনি যখন আমার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করলেন, তখন আমিও করি। আমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তও অকপটে আপনাকে বলি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এ রীতিটা বহুকাল থেকে প্রচলিত, সুতরাং এটা কর্তব্যও বটে। আমার কথা শুনুন ! সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে আমি অতি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলাম। মাদুরা নামক শহরে উৎসন্নে গিয়েছিলাম আমি। মানে, মেয়েদের নিয়ে মেতেছিলাম। সে যে কত রঙের, কত ঢঙের মেয়ে তা বর্ণনা করব না। মানে সবাই বারাঙ্গনা। একদল মেয়ে নিয়ে সারাদিন নাচ-গান আর হুল্লোড় করতাম, তার মধ্যে যেটাকে পছন্দ হত সেইটেকে নিয়ে রাত কাটাতাম। আপনার মতো জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত, কি জঘন্য জীবন যাপন করেছিলাম আমি তখন ! কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়, গৃহস্থ, দেবদাসী কাউকে বাদ দিইনি। অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলো ছিল, ভগবানে বিশ্বাস হারাই নি। এসব ব্যাপারে যা হয় তাই হল শেষে। টাকাপয়সা যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর আর একটি ঘটনা ঘটল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে যে লোকটা ছিল সব চেয়ে বলিষ্ঠ, এক ভীষণ ব্যাধির কবলে পড়ে গেল সে। দেখতে দেখতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। শেষকালে এমন হল যে, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, পা থরথর ক'রে কাঁপে ; কিছু ধরতে পারে না, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এল, গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ ছাড়া আর কোনও কথা বেরোয় না। তার মনটা আরও

অপটু হয়ে পড়ল, সর্বদাই কেমন যেন অসাড় আচ্ছন্ন ভাব। যে পশুর জীবন যাপন করেছিল, ভগবান তাকে পশুই ক'রে দিলেন শেষে। টাকাকড়ি নিঃশেষ হওয়াতে আমি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এর অবস্থা দেখে আমার চৈতন্য হ'ল। আমি আর কালবিম্ব না ক'রে অরণ্যবাসী হলাম। তারপর থেকে কুড়ি বছর আমি পরম শান্তিতে কাটিয়েছি। আমি আর আমার শিষ্যেরা দৈহিক পরিশ্রম ক'রে জীবন যাপন করি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁতি, কেউ ঘরামি, কেউ চাষী, কেউ কেউ আবার লেখকও। আমি লেখার চেয়ে হাতের কাজই বেশী পছন্দ করি। এখন আমার সমস্ত দিন আনন্দে কাটে, রাত্রে গভীর নিদ্রা হয়। মনে হয় শঙ্কর আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন, কারণ ভয়ঙ্কর পাপেও যখন আমি লিপ্ত ছিলাম তখনও আমি বিশ্বাস হারাইনি, আশা ছাড়িনি।"

এ কথা শুনিয়া সাবর্ণি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিলেন, "যে লোক এত পাপ করেছে তাকে তুমি দয়া করেছ। কিন্তু আমি সারাজীবন তোমার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রেও তোমার কৃপাকণা পর্যন্ত পেলাম না! তোমার লীলা বোঝা শক্ত।"

মনভ্রমর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দেখুন দেখুন। চক্রবালরেখার দিকে চেয়ে দেখুন। মনে হচ্ছে না পঙ্গপাল আসছে ? কিন্তু পঙ্গপাল নয়, সন্ন্যাসীর দল। মহর্ষি কারণ্ডবের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।"

যে প্রান্তরে মহর্ষি কারণ্ডবের আসিবার কথা সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এক বিরাট জনতা দেখিতে পাইলেন। সকলেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা অর্ধবৃত্তাকারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন অতি প্রাচীন পর্বতবাসী সন্ন্যাসীগণ। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, জটা ভূমিস্পর্শী, হস্তে বিল্বশাখা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন মহর্ষি বনস্পতি এবং তাঁহাদের দলভুক্ত শিষ্যগণ। মহর্ষি সাবর্ণির শিষ্যেরা এবং পরিচিত সন্ন্যাসীরাও এই শ্রেণীতে ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন নানা দেশের নানা বর্ণের সন্ন্যাসীবৃন্দ। অধিকাংশই কৃষ্ণকায় এবং শীর্ণকান্তি। কাহারও অঙ্গে ছিন্নকন্থা, কেহ বা বল্কলধারী, কেহ কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যাহারা উলঙ্গ, মেষের মতো লোমশ করিয়া ভগবান তাহাদের আবরণের অভাব মোচন করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই হস্তে প্রচুর বিল্বপত্র—টাটকা সবুজ বিল্বপত্র। মনে হইতেছিল, সেই বিরাট প্রান্তরে একটি সবুজ ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে।

শ্রেণী তিনটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়া সাবর্ণি অনায়াসেই তাঁহার শিষ্যগণকে

দেখিতে পাইলেন। তিনিও তাহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পাছে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে এজন্য চাদরে মুখ ঢাকিয়া লইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, তাঁহাকে চিনিতে পারিলে হয়তো শান্তিভঙ্গ হইবে। অনেকের মানসিক সাম্যভাবও হয়তো বিচলিত হইবে।

সহসা তুমুল জয়ধ্বনি হইল।

"মহর্ষি কারণ্ডব আসছেন। জয় শঙ্কর, জয় মহাদেব, জয় কৈলাসপতি! ওই আসছেন উমানাথের প্রিয়তম শিষ্য, মৃত্যু পর্যন্ত যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি—আসছেন, আসছেন, ওই আসছেন।"

ইহার পর চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল, সকলে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

বিরাট প্রান্তরের উত্তর দিকে যে নাতিবৃহৎ পর্বতটি ছিল তাহার উপর হইতেই মহর্ষি কারণ্ডব অবতরণ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় হংসপক্ষ এবং কঙ্কধীমান তাঁহার দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, পাছে তিনি পড়িয়া যান। তিনি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামিতেছিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এত বয়সেও তিনি ন্যুব্জ হইয়া পড়েন নাই, বেশ সোজা হইয়াই হাঁটিতেছেন, দেহ-সৌষ্ঠবে নির্মল স্বাস্থ্যের দীপ্তি। শুভ্র শ্মশ্রুতে তাঁহার বিশাল বক্ষ আবৃত, কেশহীন মসৃণ মস্তক হইতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে মনে হইতেছে তাঁহারই তপস্যার দ্যুতি বুঝি বিচ্ছুরিত হইতেছে। অদ্ভুত তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। অধরে শিশুসুলভ সরল হাসি। শতাধিক বৎসর বয়স তাঁহার, কিন্তু জরার অবসন্নতা নাই। বলিষ্ঠ দুই হস্ত তুলিয়া তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "কি চমৎকার! ভগবান, তোমার সৃষ্টি কি সুন্দর!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, জয় ভক্তের জয়।"

বজ্রগর্জনবৎ সেই গম্ভীর নিনাদ দিগ্‌দিগন্তকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কঙ্কধীমান ও হংসপক্ষের সহিত সন্ন্যাসীশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কারণ্ডব অসাধারণ তপস্বী ছিলেন। লোকে বলিত, তিনি স্বর্গ নরক দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্মবিশ্বাসের জন্য অনেক বৌদ্ধ শাসনকর্তার হস্তে তিনি নির্যাতিত হইয়াছেন; কিন্তু ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই। বহু জিজ্ঞাসু নাস্তিক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভগবৎকৃপা লাভ

করিয়াছেন। বস্তুত সর্বপ্রকার সম্প্রদায়ই তাঁহার মহত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার তপস্যা, চরিত্র এবং ভাগবতী শক্তির কাহিনী ধার্মিক-সমাজে প্রবাদের মতো প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। হিমালয়শীর্ষে অবস্থানকরত প্রকৃতপক্ষে ইনি একাই সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করিতেন।

…মহর্ষি কারণ্ডব সকলের সহিত সস্নেহে সুমিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সকলের নিকটই বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, এইবার তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে, শঙ্কর তাঁহাকে চরণে স্থান দিয়াছেন।

মহর্ষি উপলচরিত এবং বনস্পতিকে দেখিয়া তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমাদের দুইজনেরই বহু শিষ্য। কৌশলী যোদ্ধার মতো তোমরা দুজনে ধর্মের বিজয়পতাকাকে আকাশে সমুড্ডীন ক'রে রেখেছ। স্বর্গেও আশা করি দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় তোমাদের স্বর্ণবর্মে ভূষিত ক'রে দৈত্যদলনে সেনানায়ক ক'রে পাঠাবেন। তোমরা প্রকৃতই বীর।"

মহর্ষি শুভঙ্করকে দেখিতে পাইয়া তিনি সাগ্রহে আগাইয়া গেলেন এবং তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমার এই শিষ্যটি সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে সহজ। গাছপালা নিয়েই ওর সারাজীবন কেটেছে, তাই গাছপালার মতোই সবুজ ওর মন। শুধু বিশুদ্ধ নয়—সুন্দর, সুরভিত।"

মনভ্রমরকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন।

বলিলেন, "তুমি আশাবাদী লোক নানা বিপদে প'ড়েও হাল ছাড়নি, তাই তোমার মনে শান্তি আছে। দুষ্কৃতির আবর্জনার সারে তুমি সুকৃতির ফুল ফুটিয়েছ। তোমার বাহাদুরি আছে।"

যে যেমন তাহার সহিত তিনি তেমনি ভাবেই আলাপ করিলেন এবং যাহা বলিলেন তাহা মধুর অর্থপূর্ণ।

বৃদ্ধদের বলিলেন, "ঈশ্বরের সিংহাসনকে ঘিরে বৃদ্ধেরাই ব'সে আছেন।"

যুবকদের বলিলেন, "তোমরা আনন্দ কর। যারা সংসারে আছে, দুঃখটা তাদের। তোমাদের খালি আনন্দ।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে চলিতে চলিতে এই ভাবে তিনি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সাবর্ণির কাছে আসিতেই সাবর্ণি আশাআকাঙ্ক্ষা-বিহ্বল চিত্তে নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পিতা, পিতা, আমি মরছি, আমাকে বাঁচান, আমাকে সাহায্য করুন। নিরঞ্জনাকে আমি শঙ্করের চরণে সমর্পণ করেছি, এক স্তম্ভশীর্ষে ব'সে বহুকাল কৃচ্ছ্র সাধনা করেছি, তার-পর এক প্রেতপুরীতে গিয়ে এতদিন ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছি। দেখুন প্রভু, মাটিতে

মাথা ঠুকে ঠুকে আমার কপাল বলদের কাঁধের মতো হয়েছে, কিন্তু তবু শঙ্কর আমাকে ত্যাগ ক'রে গেছেন। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন পিতা, আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি বেঁচে যাব, আমার সব পাপ ধুয়ে যাবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

মহর্ষি কারণ্ডব কোনও উত্তর না দিয়া সাবর্ণির দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। তাহার পর তিনি বালক বাপ্পাকে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। স্বল্পবুদ্ধি বাপ্পাকে নিকটে ডাকিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এই পাগলটা যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

মহর্ষি কারণ্ডব বলিলেন, "শঙ্কর আমাকে যা দেননি তা একে দিয়েছেন। এর দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। এ অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়। বাপ্পা, আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?"

বাপ্পা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বলিল, "হ্যাঁ, পাচ্ছি। আকাশে আমি একটা চমৎকার পালঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। পালঙ্কের চারিদিকে সোনার ঝালর আর ফুলের মালা দুলছে—অনেক ফুল। পালঙ্কের তিন দিকে তিন জন দেবী দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে পাহারা দিচ্ছেন, যার জন্য ওই শয্যা প্রস্তুত হয়েছে সে ছাড়া আর যেন কেউ কাছে আসতে না পারে।"

মহর্ষি সাবর্ণির মনে হইল, তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি বুঝি আসন্ন। এই পালঙ্ক বুঝি তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি শঙ্করকে ধন্যবাদ দিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহর্ষি কারণ্ডব ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বালক বাপ্পা যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিতে বলিলেন।

বালক বাপ্পা ভাব-সম্মোহিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিতে লাগিল, "দেবী তিনজন আমার সঙ্গে কথা বলছেন: বলছেন যে, অচিরে একজন দেবী মর্ত থেকে স্বর্গে আসবেন। পাটলিপুত্রের নটী নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, সে আর নটী নেই, সে এখন দেবী। তার জন্তেই আমরা এই দিব্য শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। আমরা তার ধর্মসহচরী। আমাদের বিশ্বাস, ভয় আর ভালবাসা—"

মহর্ষি কারণ্ডব প্রশ্ন করিলেন, "আর কিছু দেখছ কি? চারিদিকে চেয়ে দেখ।"

বালক বাপ্পা পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিল, কিন্তু প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর সহসা সাবর্ণিকে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষুর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল।

"পাচ্ছি পাচ্ছি। তিনটে ভয়ঙ্কর রাক্ষস এই লোকটাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। একজনের চেহারা থামের মতো, দ্বিতীয়টি নারী মূর্তি, তৃতীয়টি যাদুকর। ওদের নামও দাগা রয়েছে ওদের গায়ে। প্রথমটির কপালে, দ্বিতীয়টির পেটে, তৃতীয়টির বুকে। প্রথমটির নাম অহঙ্কার, দ্বিতীয়টি বাসনা, তৃতীয়টি সন্দেহ। আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

বালক বাঙ্গার সম্মোহিত ভাব কাটিয়া গিয়া স্বাভাবিক সরল মুখভাব ফিরিয়া আসিল। সাবর্ণি কাতরভাবে কারণ্ডবের দিকে চাহিলেন।

কারণ্ডব বলিলেন, "শঙ্করের অমোঘ বিধান আমরা শুনলাম। এ বিধান নতশিরে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।"

তিনি সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে আগাইয়া গেলনে। সূর্য অস্ত যাইতেছিল। অস্তমান সূর্যের রক্তিম স্বর্ণাভায় পশ্চিম দিগন্ত মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি কারণ্ডব পশ্চিম মুখে চলিয়াছিলেন। পিছনে তাঁহার দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতেছিল – মনে হইতেছিল একটি কোমল কালো মখমল যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে, সুধীসমাজের হৃদয়ে যে প্রগাঢ় সম্ভ্রম তিনি সুদীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রাখিবেন ওই সুদীর্ঘ ছায়া যেন তাহারই প্রতীক।

সাবর্ণি বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। একটি বাক্যই কেবল তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল—"নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন।" এ কথা তো তিনি কোনদিন ভাবেন নাই! মৃত্যুর স্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। বহুদিন পূর্বে নরকপাল লইয়া তিনি সাধনাও করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যু নিরঞ্জনার নয়নের দীপ্তিও নিবাইয়া দিবে—এ কথা তিনি ভাবেন নাই। রূঢ় সত্যটা তাঁহাকে নিদারুণ আঘাত করিল। তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

'নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? কি ভয়ানক কথা! নিরঞ্জনা বাঁচবে না? সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা ফুল ফল নদী নির্ঝরিণী—এসব তো অর্থহীন।"

কে যেন চাবুক মারিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দিল।

"দেখা কর, দেখা কর, অবিলম্বে দেখা কর তার সঙ্গে।"

তিনি ছুটিতে লাগিলেন। পথ জানা ছিল না, ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ঘাটে অনেক নৌকা ছিল, একটি নৌকা পাল তুলিয়া পূর্বমুখে পাড়ি জমাইবার উপক্রম করিতেছিল। সাবর্ণির চীৎকারে মাঝি

তীরে নৌকা ভিড়াইল, সাবর্ণি লাফাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেকালে সন্ন্যাসীদের বিরাগভাজন হইবার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। মাঝিরা কিছু বলিল না। সাবর্ণি নৌকার গলুয়ের উপর বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। নৌকা ভাসিয়া চলিল।

সাবর্ণি স্তব্ধ হইয়া দূর দিগন্তে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অন্তর কিন্তু স্তব্ধ ছিল না। তিনি মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলেন।

"মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! যখন সময় ছিল, সুযোগ ছিল তখন কিছু করিনি, হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে নিরঞ্জনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন বুঝিনি যে নিরঞ্জনাই সব, নিরঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, নিরঞ্জনাহীন পৃথিবী মরুভূমি। শঙ্কর শঙ্কর ক'রে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কেবল, পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যে শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো সারাটা জীবন কাটিয়েছি। কিন্তু নিরঞ্জনাকে দেখবার পর ওসবের কিছুমাত্র কি প্রয়োজন ছিল? কেন আমি বুঝলাম না যে, নিরঞ্জনার একটি মাত্র চুম্বনই অনন্ত সুখের আকর, নিরঞ্জনাই আনন্দ, নিরঞ্জনাহীন জীবন অর্থহীন। আমি মূর্খ, তাই নিরঞ্জনাকে দেখবার পরও আর একটা স্বর্গের কল্পনা করেছিলাম, শঙ্কর শঙ্কর ক'রে মিথ্যা আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলাম। নিরঞ্জনা যা তোকে দিতে পারত, শঙ্কর কি তার শতাংশের একাংশও দিয়েছে তোকে! স্বর্গ! কোথায় আছে শঙ্করের স্বর্গ! নিরঞ্জনার অধরেই তো স্বর্গসুখ ছিল, কত লোক সে সুখ ভোগও করেছে। তুই কি করছিলি মূর্খ! কে তোর বুদ্ধিভ্রংশ করেছিল, কে তোকে অন্ধ করেছিল যে এত বড় সত্যটা তুই দেখতে পেলি না! কলঙ্ক? নরক? ওরে মূর্খ, তার ক্ষণিকের সঙ্গলাভের জন্য যদি অনন্তকাল নরকে বাস করতে হ'ত তাও যে শ্রেয় ছিল—এ কথা তোর মাথায় ঢোকেনি কেন! সে দুহাত বাড়িয়ে তোকে আহ্বানও করেছিল, তুই তার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে মরলি না কেন? সংযম! সংযম! যে তোকে সংযম করতে শিখিয়েছিল সে তোকে ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে। ভুল পথ ধ'রে সারাজীবন কোথায় চলেছি আমি। হায় হায়! কি করেছি! নিরঞ্জনাকে পেয়েও পেলাম না, সে দু হাত বাড়িয়ে ডাকল তবু গেলাম না, ওই পরম মুহূর্তটির স্মৃতি যে অক্ষয় হয়ে থাকত আমার জীবনে, নরকে গিয়েও বিধাতাকে আমি বলতে পারতাম—আমাকে পোড়াও, আমার অস্থি চূর্ণ কর, আমাকে নিয়ে যা খুশী কর, কিন্তু যে স্মৃতি আমি বহন ক'রে এনেছি তা আমার সমস্ত সত্তাকে অনন্তকাল আনন্দিত ক'রে রাখবে, অনন্তকাল উদ্বুদ্ধ করবে। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন। শঙ্কর, তুমি শঙ্কর, না সং! আমাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছ? নরকের ভয় আমার নেই। আমার ভয় নিরঞ্জনাকে আর

দেখতে পাব না। নিরঞ্জনা মারা যাচ্ছে, আর সে থাকবে না, আর কখনও তাকে দেখতে পাব না—ওহো-হো-হো।"

তিনি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং চুপি চুপি একই কথা বলিতে লাগিলেন—"কখনও না, কখনও না, কখনও না।"

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, নিরঞ্জনাকে তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকে করিয়াছে। তাহার প্রেমধারায় অবগাহন করিয়া বহু লোক তৃপ্ত হইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছেন কেবল তিনি। কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি উত্তেজনা ভরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্ত পশুর মতো গর্জন করিতে করিতে নখর দিয়া বক্ষস্থল আঁচড়াইয়া হাত কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন। মাঝিরা অবাক এবং ভীত হইল। সাবর্ণি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"যারা ওকে ভোগ করেছে তাদের সবাইকে যদি খুন করতে পারতাম!"

হত্যার কথা মনে হওয়াতে তাঁহার একটা অদ্ভুত উন্মাদনা হইল। পাশবিক উন্মাদনা। তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন, তিনি যেন সিন্ধুপতিকে ধীরে ধীরে চর্বণ করিতেছেন। চর্বণ করিতে করিতে একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আছেন।

এ উন্মাদনা কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্বল হইয়া গেলেন, তাহার পর চুপ করিলেন। অস্থির চিত্ত যেন শান্ত হইল। ক্রমশ একটা অপূর্ব স্নেহরসে তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাল্যবন্ধু সিন্ধুপতির গলা জড়াইয়া বলেন—"ভাই সিন্ধু, তুমি নিরঞ্জনাকে ভালবেসেছিলে, আমিও তাই তোমাকে ভালবাসতে এসেছি। তার কথা বল আমাকে। তোমাকে সে যা যা বলত, তা আমাকে সব বল।"

কিন্তু এ চিন্তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না। যখনই মনে পড়িতেছিল নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল।

তিনি আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দিবসের আলো, রাত্রির জ্যোৎস্না, বনের জীবজন্তুরা যে যেখানে আছ, তোমরা কি বুঝতে পারছ নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন? নিরঞ্জনা যদি না থাকে তোমাদের থাকবার কি প্রয়োজন? তোমরাও লুপ্ত হয়ে যাও। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন, তার মানে পৃথিবীর মৃত্যু আসন্ন, নিরঞ্জনাই তো পৃথিবীর আলো, প্রাণ, রূপ। তার কাছে যে গেছে সেই এ কথা অনুভব ক'রে ধন্য হয়েছে। সেদিন রাত্রে জীমূতবাহনের বাড়িতে নিরঞ্জনার কাছে

কত জ্ঞানী, কত গুণী এসে বসেছিল। তাদের মুখে হাসি ফুটেছিল, আলাপে সুর লেগেছিল, চিন্তা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ নিরঞ্জনা কাছে ছিল যে। তার স্পর্শে সবাই মধুময় হয়ে উঠেছিল সেদিন। লালসা-কামনার মধ্যেও সত্য শিব সুন্দর মূর্ত হয়েছিলেন। এখন সবই স্বপ্ন। নিরঞ্জনার মৃত্যু আসন্ন! আহা, আমারও যদি এখন মৃত্যু হ'ত! কিন্তু ওরে নপুংসক, জীবনকে তুই কি ভোগ করেছিস যে, মৃত্যুর স্বাদ পাবি! শঙ্কর, তুমি কি আছ? যদি থাক, আমার কথা শোন। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার মুখের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছি আমি, আমাকে অভিশাপ দাও, আমাকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ কর। যে নিষ্ফল আক্রোশে আমার সারা বুক জ'লে যাচ্ছে, অনন্ত নরকে ব'সে অনন্তকাল সেই আগুনে পুড়তে চাই আমি।"

অত প্রত্যূষে শিবানী-আশ্রমে ভৈরবী শুভ্রধারা মহর্ষি সাবর্ণিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন মহর্ষি, আমাদের আশ্রম আপনার পাদস্পর্শে পূত হোক। যে সাধ্বীকে আপনি আমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে তাকে আশীর্বাদ করতেই আপনি এসেছেন। ঠিক সময়েই এসেছেন, কারণ তার আর সময় নেই, করুণাময় ভগবানের ডাক এসেছে। যে সংবাদ দেবদূতেরা দেশ-দেশান্তরে অরণ্যে পর্বতে ঘোষণা করেছে, সে সংবাদ আপনিও যে শুনেছেন তাতে আর আশ্চর্য কি! নিরঞ্জনার মুক্তির আর বিলম্ব নেই। তার তপস্যা শেষ হয়েছে। এখানে সে কি ভাবে ছিল তার বিবরণ আপনাকে সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। আপনি যখন তাকে ঘরে তালাবদ্ধ ক'রে রেখে গেলেন, তখন আমি ওর ঘরে রুটি জল আর একটি বাঁশীও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। নটীরা সাধারণত যে ধরনের বাঁশী বাজায় তেমনি বাঁশী একটি। বাঁশী দিয়েছিলাম যাতে ও বিমর্ষ হয়ে না পড়ে। মানব-সমাজে একদিন ওর প্রকাশ সুন্দর ছিল, শঙ্করের কাছেও ওর প্রকাশ সুন্দর হোক—এই ভেবেই দিয়েছিলাম। দিয়ে খারাপ করিনি। ওই ছোট বাঁশীতে কি সুন্দর সুরই যে সে বাজাত, মনে হ'ত সুরের ভিতর দিয়েই ও শঙ্করকে ডাকছে। শঙ্কর সে ডাকে সাড়াও দিলেন। পুরো ছ মাস যখন কেটে গেল, তখন একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, যে তালা আপনি স্বহস্তে বন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সে তালা আপনি খুলে গেছে। আমরা কেউ সে তালা স্পর্শও করিনি। আপনি তাকে ব'লে গিয়েছিলেন—শঙ্কর যেদিন তোমাকে

ক্ষমা করবেন সেদিন তিনি নিজে এসে তোমার ঘরের তালা খুলে দেবেন। তালা খোলা দেখে আমাদের বিশ্বাস হ'ল, শঙ্কর ওকে ক্ষমা করেছেন, ওর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওকে তখন বাইরে নিয়ে এলাম। অন্য আশ্রমবাসিনীদের সঙ্গে ও কাজ করত, প্রার্থনা করত, পুজো করত, ওর মধুর নম্র কথাবার্তায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ওকে দেখে মনে হ'ত, যেন ও লজ্জা আর সঙ্কোচের প্রতিমূর্তি। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে থাকত। ওর পূর্বজীবনের স্মৃতিই বোধ হয় এর কারণ। ক্রমশ আমি বুঝতে পারলাম—ওর বিশ্বাস, আশা আর ভালবাসার জোরে ও ভগবানকে নিজের কাছে টেনে এনেছে। ওর বিপথে যাবার আশঙ্কা আর নেই। তখন আমি নির্ভয়ে অনবদ্য রূপকে, ওর অভিনব প্রতিভাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করলাম। সীতা, সাবিত্রী, উমা প্রভৃতির ভূমিকায় কি সুন্দর অভিনয় যে ও করত তা ব'লে বোঝাতে পারব না, সত্যিই তা অবর্ণনীয়। মনে হ'ত—অভিনয় নয়, যেন সত্যি সীতা সাবিত্রী উমা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। মহর্ষি, আমি বুঝতে পারছি, অভিনয়ের কথা শুনে আপনি ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু ওর অভিনয় আপনি যদি স্বচক্ষে দেখতেন তা হ'লে আপনার হৃদয় গলে যেত, চোখে জল আসত। অভিনয় করতে করতে ওর চোখ দিয়েও জল পড়ত। নানা বয়সের নানা রকমের মেয়ে আমার আশ্রয়ে থাকে। আমি কখনও কারও স্বাভাবিক প্রতিভার প্রতিকূলতা করিনি। সব বীজ থেকে এক রকম গাছ হয় না, সব গাছ এক রকম ফুল বা ফল দেয় না। সকলের মুক্তিও তেমনি এক পথে হয় না। নিরঞ্জনার রূপ যৌবন অম্লান ছিল, তবু সে সব ত্যাগ ক'রে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছিল। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। তিন মাস অহরহ জ্বরভোগ ক'রেও ওর সৌন্দর্য এখনও অম্লান আছে। এই জ্বরই ওর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অসুখের সময় ও কেবল আকাশ দেখতে চাইত, তাই আমরা রোজ সকালে ওকে আমাদের উঠনে আমগাছের ছায়ায় নিয়ে আসি। ওই আমগাছ-তলাতেই আমাদের উপাসনাও হয়। ও এখন সেখানেই আছে। আপনি সেখানেই চলুন। বেশী বিলম্ব করবেন না, তার সময় হয়ে এসেছে, শঙ্কর তাকে ডাকছেন। তার যে রূপ একদিন সকলকে মাতিয়েছিল, সে রূপ এখন দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে, সে রূপ এইবার তার দেহকে ছেড়ে যাচ্ছে। চলুন।"

প্রভাতের আলোকে চতুর্দিক হাসিতেছিল। মহর্ষি সাবর্ণি শুভ্রধারার পিছু পিছু আসিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। শিবমন্দিরশীর্ষে একদল বন্য কপোত বসিয়া ছিল, মনে হইতেছিল মন্দিরের গাত্রে যেন রত্নের মালা বিলম্বিত করিয়া দিয়াছে। গাছের ছায়ায় একটি শুভ্র শয্যার উপর নিরঞ্জনা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। তাহার

পাণ্ডুর মুখ রক্তলেশহীন। আশ্রমের সেবিকারা তাহাকে ঘিরিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। নিরঞ্জনার মনের কথা যেন তাহাদের প্রার্থনায় ভাষা পাইতেছিল।

"শঙ্কর আমাকে ক্ষমা কর। তোমার করুণা দিয়ে আমার পাপ মোচন কর।"

মহর্ষি সাবর্ণি ডাকিলেন, "নিরঞ্জনা।"

নিরঞ্জনা চোখ খুলিয়া চাহিল এবং ধীরে ধীরে—অতি ধীরে ধীরে সাবর্ণির দিকে চোখের দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। শুভ্রধারা ইঙ্গিতে সেবিকাদের দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেন।

"নিরঞ্জনা।"

উপাধান হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া নিরঞ্জনা অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "প্রভু, আপনি? পথে আসতে আসতে আমরা সেই যে ছোট্ট নদীটির জল খেয়েছিলাম আপনার মনে আছে কি? সেই দিনই আমার নবজন্ম হয়েছিল।"

আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, তাহার মাথা উপাধানের উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুর ছায়া তাহার মুখের উপর নামিতে লাগিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা একটা বন্য কপোতের কূজন ভাসিয়া আসিল।

সেবিকাদের অন্তিম প্রার্থনা-স্তোত্র আবার প্রতিধ্বনিত হইল—"শঙ্কর, তোমার করুণাধারায় আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে দাও, সমস্ত তাপ মোচন কর। আমার পাপের কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না।"

সহসা নিরঞ্জনা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার নীল নয়ন বিস্ফারিত হইয়া গেল, দূর আকাশের দিকে দুই হাত বাড়াইতে সে বলিয়া উঠিল, "ওই যে! অনন্ত প্রভাতের উষালোক আমি দেখতে পাচ্ছি।"

তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখ উদ্ভাসিত। মনে হইল, মানবী নয়, সত্যই দেবী। মহর্ষি সাবর্ণি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া নিরঞ্জনাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"নিরঞ্জনা, তুমি যেয়ো না, তুমি থাক, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি থাক, তুমি থাক। নিরঞ্জনা, শোন, শোন, শুনে যাও—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, আমি মূর্খ, ভণ্ড, তাই তোমাকে ভুল পথে নিয়ে এসেছি। শঙ্কর, স্বর্গ—সব ভুল, সব ভুল, সব মিথ্যে। জীবনের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই, মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, মানুষের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা। আমি তোমাকে ভালবাসি নিরঞ্জনা, আমাকে ফেলে তুমি চ'লে যেয়ো না। তুমি ম'রে যাচ্ছ—এ কথা আমি ভাবতেও পারছি না। তুমি মরবে কেন? চল তুমি আমার সঙ্গে, তোমাকে বুকে

ক'রে নিয়ে আমি কোনও দূর দেশে পালিয়ে যাই। এসো, পরস্পরকে ভালবেসে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করি আমরা। নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনা, শোন আমার কথার উত্তর দাও, বল—আমি বাঁচব, বাঁচতে চাই। নিরঞ্জনা, ওঠ, ওঠ।"

নিরঞ্জনা তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না। তাহার দৃষ্টি অনন্তের সন্ধান করিতেছিল।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিতেছিল—"স্বর্গের দ্বার খুলে যাচ্ছে। দেব-দেবীদের দেখতে পাচ্ছি আমি। ওই যে কিঙ্করও দাঁড়িয়ে আছে, কিঙ্করের হাতে ফুল, কিঙ্কর হাসছে, আমাকে ডাকছে। দুটি দেবদূত যেন এগিয়ে আসছে। কি সুন্দর ওদের চেহারা! ও কে—ও যে শঙ্কর—শঙ্কর।"

নিরঞ্জনার মুখে আনন্দ ঝলমল করিতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার মৃত্যু হইল।

মহর্ষি সার্বর্ণি পাগলের মতো আবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু শুভ্রধারা বাধা দিলেন।

"যান, যান, স'রে যান আপনি। এ সব কি করছেন? আশ্চর্য!"

সার্বর্ণি সভয়ে সরিয়া গেলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বুঝি অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া এখনই বুঝি তাঁহাকে গ্রাস করিবে।

সেবিকারা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "জয় জয় শঙ্কর—জয় নীলকণ্ঠ।"

সহসা তাহাদের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সার্বর্ণিকে দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নররাক্ষস, নররাক্ষস!"

সত্যই তাঁহার মুখমণ্ডল রাক্ষসের মতো বীভৎস হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর হাত বুলাইয়া নিজেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ঊর্মিমালা

'উত্তরা'-সম্পাদক

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

করকমলেষু

বিজয়িনী

খুব লম্বা ঘোমটা টেনেই সুবাসিনী ট্রেন থেকে নাবল। ট্রেনে ঘোমটা টানবার প্রয়োজন হয়নি। প্রথম শ্রেণীর যে কামরাটিতে সে উঠেছিল তাতে আর কেউ ছিল না। তাই যে ছদ্মবেশে সে পুরন্দরপুরে গিয়ে বিজয় মল্লিকের বাসায় উঠবে ঠিক করেছিল, সেটাকে আরও ভালো করে ঠিক করে নেবার সুযোগও পেয়েছিল সে ট্রেনেই। ছদ্মবেশ অবশ্য তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়, সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশ। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি, গায়ে নামাবলী। বিজয় মল্লিকের কুলগুরুর কাছ থেকে চিঠিও একখানা জোগাড় করে এনেছিল সে। সে আশা করেছিল, বিজয় মল্লিক এ চিঠির অমর্যাদা করবেন না। যদিও ধার্মিক বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় বিজয় মল্লিক সে পর্যায়ের লোক নন, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর, তবু কিন্তু তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশে এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে নাস্তিক হতে দেয়নি। তিনি দেব দ্বিজ, মাদুলী কবচ, সিন্নি, স্বপ্ন সবই মানতেন, কেবল মুখে নয় অন্তরের সহিতই। কলেজের ইংরাজী শিক্ষা তাঁর মনের কুসংস্কারগুলোকে দূর তো করতেই পারেনি বরং যেন দৃঢ়তর করেছিল। সুবাসিনী একথা জানত, তাই সে কৌশল করে কুলগুরুর চিঠিখানি হস্তগত করে এনেছিল। সে জানত, এ চিঠির অমর্যাদা বিজয় মল্লিক করবেন না। এ-ও সে জানতো যে, বিজয় মল্লিক যদি তাকে হঠাৎ দেখেও ফেলেন, তাহলেও চিনতে পারবেন না। বিশ বছর আগে যে সুবাসিনী তাঁর হৃদয় হরণ করেছিল—সে আর নেই। সে বদলে গেছে, মরে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়ার মধ্যে তার কোনও চিহ্নই আর নেই, বিজয় মল্লিকের প্রথম যৌবনের সহচরী তন্বী সুবাসিনী কালের আবর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেছে। একটা চিহ্ন অবশ্য আছে। উল্‌কি দিয়ে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীর বুকে নিজের নামটা লিখেছিলেন একদিন, সেটা এখনও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু সেটা দেখবার সুযোগ কাউকে কখনও দেয়নি সে, দেবার ইচ্ছেও নেই। তিন- পুরু জামার নীচে তা লুকোনো আছে। বিজয় মল্লিককে অন্তত সুযোগ সে কখনও দেবে না। যে প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি তার বুকে নিজের নাম লিখিয়ে ছিলেন আর যে প্রেমের উপর বিশ্বাস করে সে সেটা লিখতে দিয়েছিল, সে প্রেমেরই যখন মর্যাদা রইল না, তখন ওই তুচ্ছ চিহ্নের মূল্য কি। সম্ভব হলে ওটা সে মুছেই ফেলত, কিন্তু তা

সম্ভব হয়নি। সুবাসিনীর চেয়ে হীনতর মনোবৃত্তির কোনও স্ত্রীলোক হয়তো ওটা নিয়ে আস্ফালন করত, সুবাসিনী করেনি। সুবাসিনী আলাদা জাতের মেয়ে। বিজয় মল্লিক তাকে ত্যাগ করে যখন অন্য আর একজনকে নিয়ে মাতলেন, তখন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে দশ হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। সে টাকা নাটকীয় ভঙ্গীতে সে ফেরত দিতে পারত, দেয়নি। সে টাকা খরচও করেনি সে। বিজয় মল্লিক তার নামে একটা বড় ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা করে তাকে পাশ বুক আর চেক বুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত একটি চেকও কাটেনি সে। টাকা ব্যাংকেই পড়ে আছে। এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্য তার স্বামীর জন্য। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। পদস্খলিতা সুবাসিনীকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন তিনি, সে যে বিজয় মল্লিকের রক্ষিতা রূপে কিছুকাল অন্যত্র ছিল—এ ঘটনাটাতে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি যেই আবিষ্কার করলেন যে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীকে ত্যাগ করে চলে গেছে অমনি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিলেন। এমন মহৎ লোককেও কিন্তু সুবাসিনী ভালবাসতে পারেনি। কারণও ছিল এর। এখনও সে বিজয় মল্লিককেই ভালবাসে।

ট্রেন থেকে নেমেই সে পরের স্টেশনের একটি টিকট কিনে ফেললে। উদ্দেশ্য ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ থাকবে। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে তারপর পুরন্দরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে গরুর গাড়ি করে। পৌছতে রাত হয়ে যাবে, তা হোক, দিনের আলোয় পুরন্দরপুরে পৌছবার ইচ্ছা হল না তার। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে কেউ ছিল না। সুবাসিনী স্নান করে, খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল। রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমটা কিন্তু প্রগাঢ় হল না, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এল। তার যে বিগত জীবনেরই কথা ভাবতে ভাবতে সে সারাটা পথ এসেছে সেই বিগত জীবনেরই খানিকটা মূর্ত হয়ে উঠল, তার স্বপ্নে। এমন সজীব মূর্ত হয়ে উঠল যেন কালকের ঘটনা।

বিজয় মল্লিক—যুবক বিজয় মল্লিক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, টকটকে রঙ, বাসনা-প্রদীপ্ত দৃষ্টি, সযত্ন লালিত গোঁফ—সুন্দর সুপুরুষ বিজয় মল্লিক তার ঘরে প্রবেশ করলেন, রোজই যেমন করতেন, রাত্রি ন'টার পর। যা বললেন, তা প্রত্যাশাই করছিল সুবাসিনী। রোজই এসে প্রথমে গান করতে বলেন, সেদিনও বললেন। গানটা শেষ হয়ে যাবার পর চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চোখ খুলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

"কি দেখছেন অমন করে?"

"তোমাকে আর দেখতে পাব না কি না, তাই ভাল করে দেখে নিচ্ছি।" কথাটা হেঁয়ালির মতো শুনিয়েছিল প্রথমে।

"তার মানে—?"

"তোমার স্বামী চিঠি লিখেছেন বিশ্বপতিকে।"

"কি লিখেছেন ?"

"লিখেছেন, তুমি যদি ঘরে ফিরে যাও তাহলে তিনি তোমাকে ঘরেই স্থান দেবেন। ত্যাগ করবেন না। তুমি যে আমার কাছে আছ এ খবর তিনি জানেন, কিন্তু কাউকে জানান নি। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা জানে যে তুমি বাপের বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছ। ভদ্রলোক মুশকিলে পড়েছেন মেয়েকে নিয়ে। তোমার যে মেয়ে ছিল তাতো জানতাম না। কত বড় মেয়ে ?"

চুপ করে রইল সুবাসিনী খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "বছর খানেকের।" ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর হেসে বললেন— তাহলে বাড়ীই ফিরে যাও তুমি। এসব জানলে তোমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি করতাম না, বিশ্বপতি আমাকে কিছুই বলেনি এসব। অন্তত তোমার বুকে নিজের নামটা লেখাতাম না তাহলে। বল তো ওটা তুলেও দিতে পারি। একটু হয়তো কষ্ট হবে।"

বিজয় মল্লিকের নির্বিকার ভাবভঙ্গী দেখে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সুবাসিনী। সে যেন মানুষ নয়, একটা খেলনা। কিন্তু এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেনি সে। কেমন যেন আত্মসম্মানে বেধেছিল। পেটের মেয়েটার জন্য অবশ্য মন কেমন করত তার—খুবই মন কেমন করত—সুযোগ থাকলে হয়তো তাকে নিয়েই আসত সে—কিন্তু সুযোগ ছিল না। বিশ্বপতির সঙ্গে গভীর রাত্রে সে যখন গৃহত্যাগ করেছিল তখন মেয়ের কাছে শুয়েছিলেন স্বামী। তাঁকে না জাগিয়ে মেয়েকে আনা সম্ভব ছিল না। সে যে সামান্য একটা খেলনা মাত্র, এ ধারণাটা বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হয়নি তার মনে—মেয়ের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ এসেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে, উৎসুক হয়ে উঠেছিল তার মন।

"উল্‌কিটা তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব ? স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছ, ওটা থাকা ঠিক নয়!"

স্বামীর আচরণ কি হবে তা না জেনেই নিদারুণ সত্য কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন।

"স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না।"

"আমার কাছেই থাকবে তাহলে ?"

"তাই বা থাকব কি করে! বিশ্বপতিবাবু বলছিলেন, ময়না বাঈজিকে আপনি বহাল করেছেন।"

'করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে রাখতে পারতাম! কিন্তু আমার একটা কুসংস্কার আছে। পরস্ত্রীকে আমি সব সময়ে মা বলে ভাবতে পারি না যদিও, কিন্তু যে পরস্ত্রী সত্যি সত্যি মা হয়ে গেছে, তার সংগে আর সংশ্রব রাখতে ইচ্ছে হয় না। আমাদের কুলগুরুর নিষেধও আছে। তাই তোমাকে ছাড়তে যদিও কষ্ট হচ্ছে খুব, তবু উপায় নেই, ছাড়তেই হবে। তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও তুমি, তিনি যখন এ নিয়ে কোনও গোলমাল করবেন না বলেছেন। একটু আশ্চর্য লাগছে যদিও কথাটা শুনে, এদেশে সাধারণত এরকমটা হয় না। তবু যাও! যদি ভদ্র ব্যবহার করেন ভালোই, আর না যদি করেন তাহলে একটা ব্যবস্থা কোরো কিছু। আমি লয়েড্‌সে তোমার নামে দশ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছি, ব্যাংকে গিয়ে কেবল তোমাকে টেস্ট্‌ সিগ্‌নেচার প্রভৃতি করতে হবে। বিশ্বপতি নিয়ে যাবে তোমাকে। যদি দরকার হয় আরও কিছু দেব। টাকা দিয়ে যতটা করা সম্ভব তা আমি করব।" আবার নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন বিজয় মল্লিক তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, "কোথা থেকে কি ঘটল দেখ। তোমার মামার বাড়ীর ঠিক পাশেই যদি আমার মামার বাড়ী না হ'ত, আর তোমার সঙ্গে সেখানে যদি ঘনিষ্ঠতা না হ'ত তাহলে এসব কিছুই হ'ত না। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিছু হ'ত না যদি বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু বাদ সাধল কুষ্ঠি। তোমার কুষ্ঠির সঙ্গে আমার কুষ্ঠির মিল তো হলই না, তাছাড়া তোমার বৈধব্য যোগ ছিল, আমাদের কুলগুরু কিছুতেই রাজী হলেন না! যদি হতেন, তাহলে এসব কিছুই হত না। আরও যোগাযোগ দেখ বিশ্বপতি তোমার স্বামীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বেরিয়ে গেল। তার কাছেই খবর পেলাম তোমাকে একজন নিঃসন্তান বুড়ো পণ্ডিত বিয়ে করেছেন—যাক্‌ ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই।"

এ স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল, এল আর একটা স্বপ্ন।

তার স্বামী যেন তাকে বলছেন, "আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম পুত্রার্থে। কিন্তু তোমার হল একটা মেয়ে। তারপর তুমি কালীঘাট যাবার নাম করে পালিয়ে গেলে বিশ্বপতির সঙ্গে। গিয়ে রইলে একটা লম্পট জমিদারের ছেলের উপপত্নী হয়ে। সে দিন কতক তোমাকে ভোগ করে এখন আর একটা বাঈজি

নিয়ে মেতেছে, তোমার বিপদ আসন্ন দেখে বিশ্বপতি আমার ভাগ্নে সুরেনকে এক মিথ্যে কাহিনী রচনা করে চিঠি লিখেছে যে তুমি নাকি কোলকাতার রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিলে, এতদিনে তোমাকে খুঁজে পেয়েছে সে, কিন্তু যেহেতু তুমি না বলে বাড়ী থেকে চলে এসেছ তাই তোমার ফিরতে ভয় করছে। আমি যদি অভয় দি তাহলে তুমি ফিরে আসবে। আসল কথা অবশ্য আমি সব জানতাম। আমার বাড়ীতে যদি দ্বিতীয় লোক থাকতো তাহলে তোমাকে আমি ফিরে আসতে বলতুম না, কিন্তু এই কচি মেয়েটাকে একা সামলাবার সামর্থ্য আমার নেই, এজন্যও বটে আর আমার বংশকে কেলেঙ্কারীর কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যও বটে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি আবার। এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। করবও না। কিন্তু অসতীর সঙ্গে অমি সহবাসও করব না। বুড়োও হয়েছি, আমি কাশী চললাম। ঘর-দোর বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে সব রইল, তুমি পার তো বাকী জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিয়ে মেয়েটিকে মানুষ কোরো। আমি আর ফিরব না।''

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। ঘুমও ভেঙে গেল। উঠে বসল সুবাসিনী। পুনর্জন্ম হল যেন তার। বিশ বছর আগেকার তার জীবন আবার যেন দেখা দিয়ে গেল তাকে। "স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না"—বিশ বছর আগে উচ্চারিত এই ভবিষ্যদ্বাণী মর্মান্তিকভাবে সফল হয়েছিল। স্বামী কাশী থেকে আর ফেরেন নি। কাশীতেই দেহ-রক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর সুবাসিনী আর গ্রামে থাকেনি। স্বামীর বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে চলে এসেছিল কোলকাতায়। সেই-খানেই সে এতদিন ধরে আছে, সযত্নে মানুষ করেছে মেয়েটিকে। বাধা সৃষ্টি করবার মতে কেউ ছিল না শ্বশুরকুলে। পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাননি। তাঁদের ভয় ছিল পাছে একটা বিধবার ভার তাঁদের কারো ঘাড়ে পড়ে যায়। ঝাড়া-হাত-পা বিধবা নয়, একটা মেয়েও আছে। সুতরাং সুবাসিনী নিজের ব্যবস্থা করে নেওয়াতে আপত্তি করেননি কেউ। সুবাসিনীর মা বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মেয়ের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁরাও বহুদিন গতাসু হয়েছেন, সুতরাং সুবাসিনী প্রায় নির্ঝঞ্ঝাটেই কোলকাতায় এক গলিতে বাসা ভাড়া করে এই কুড়ি বছর কাটিয়েছে। তার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথম মেয়েটিকে শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয় বিজয় মল্লিককেও শিক্ষা দেওয়া। বিজয় মল্লিককে সে ভোলেনি। বিজয় মল্লিক তাকে যে অপমান করেছিলেন তা-ও সে ভোলেনি। এই কুড়ি বছর ধরে সে ক্রমাগত ভেবেছে ঃ কি

করে এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি সে ভেদ করতে পারবে। বিজয় মল্লিক একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কি করে সে অপমানের শোধ তুলবে? বিজয় মল্লিক যেন সকাতরে কর-জোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এই কাল্পনিক ছবিটাই সে মনের মণিকোঠায় টাঙিয়ে রেখেছিল। এই একই ছবিই ছিল সেখানে, এতদিন ধরে এইটেতেই সে নানারকম রং ফলিয়েছে অহরহ। কিন্তু এই কল্পনা-বিলাস কি করে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে তা এতদিন ভেবে পায়নি সে। মধ্যবিত্ত অসহায় বিধবা কি করে জব্দ করবে অমন প্রতাপশালী জমিদারকে! যে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল তার কাছে যাবেই বা কি করে। তাই সে এতদিন কল্পনাতেই বিজয় মল্লিককে পদানত করে সুখী ছিল। হঠাৎ কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ চাকাটা ঘুরে গেল, যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল তা সম্ভাব্যের সীমায় চলে এল। সুবাসিনীর মেয়ে শুচিতা কলেজে বি. এ. পড়ছিল। সে হঠাৎ একদিন এসে বললে—"মা, এক ভদ্রলোককে রাত্রে আজ খেতে বলেছি। ভালো কিছু রান্না কর!"

"কাকে আবার খেতে বললি?"

শুচিতা হেসে বললে, "আমাদের কলেজের লেক্চারার একজন। খুব ভালো পড়ান। আজ তাঁর জন্মদিন। কলেজের ছেলে মেয়েরা তাঁকে চাঁদা করে কত কি কিনে দিয়েছে আজ। আমি তাঁকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি।"

সুবাসিনী প্রথমটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মনে মনে, "বাধ্য হয়েছি মানে?"

"আমরা তাঁকে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছি। একটা গ্রুপ ফোটো তুলে তিনি বললেন—সিংগল ছবি কার প্রথমে তুলব বল! লটারি করা হল। আমার উঠল। তিনি আমার ফোটো তুললেন। আমার যা লজ্জা করছিল। তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে তাঁর সংগে আবার দেখা হল রাস্তায়। কথায় কথায় তিনি বললেন, "আজ আমার মাকে মনে পড়ছে। জন্মদিনে তিনি আমাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। কতদিন হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু ঠিক এই দিনটিতে তাঁকে এত মনে পড়ে।" তখন তাঁকে বললাম— আপনি আজ আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের হাতের রান্না খাবেন? আসুন না। মা খুব খুশী হবেন। ও কথা শোনার পর নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভালো দেখায়?" তখনও সুবাসিনী জানে না, যে এই লেক্চারারই বিজয় মল্লিকের একমাত্র পুত্র অজয় মল্লিক। ক্রমশ সবই জানা গেল। শুধু তাই নয় ক্রমশ এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে হতে এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছুল, যে স্তরের মহিমা সর্বদেশের কাব্যকলার বিষয় বস্তু

হয়ে মানব সভ্যতাকে অলঙ্কৃত করছে। অর্থাৎ শুচিতা ও অজয় পরস্পরে প্রেমে পড়ল। সুবাসিনীও এইবার যেন সুযোগ পেলেন। তাঁর মনে হল বিজয় মল্লিককে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাওয়ার একটা রাস্তা হল এইবার বোধ হয়। অর্থাৎ যে বিজয় মল্লিক একেবারে নাগালের বাইরে ছিলেন তিনি হঠাৎ যেন খুব কাছে এসে পড়লেন। তবু কিন্তু ব্যাপারটা আবছা-অস্পষ্ট হয়েই রইল কিছুদিন। বিজয় মল্লিকের ছেলের সংগে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই বা তাঁর প্রতিশোধ-কামনা চরিতার্থ হবে কেমন করে? তার কল্পনার ছবিতে বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, যদি নির্বিঘ্নে বিয়েটা হয়েই যায় বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াতে যাবে কোন দুঃখে? সে ছেলের বাপ, বাঙালী সমাজে তারই তো উচ্চাসন। সুবাসিনীরই তো সেখানে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। কিন্তু হঠাৎ সূত্রটাই ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। অজয় নাকি শুচিতাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল। বিজয় মল্লিক যা উত্তর দিয়েছেন তা সাংঘাতিক। অজয় সুবাসিনীকে দেখিয়েছিল সে চিঠি। বিজয় মল্লিক লিখেছিলেন—"তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিও করছ। স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবার মতো সামর্থ্য তোমার হয়েছে। তবু তুমি বিবাহ বিষয়ে আমার পরামর্শ ও অনুমতি চেয়েছ এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এতে সুপুত্র-সুলভ শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা লিখছি তা হয়তো তোমার মনোমত হবে না। তবু আমার মত যখন চেয়েছ, তখন আমার মতই তোমাকে জানাতে হবে, তোমার মন-রাখা কথা বললে ভণ্ডামি হবে সেটা। আমার মতে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সামাজিক ব্যাপার এবং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' প্রাচীন এই উক্তিটি মূল্যবান উক্তি। যে পুত্র বংশের মর্যাদা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হবে, সে পুত্রের জননীকে যেখান সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা চলে না। অপরিণত-বুদ্ধি যুবকদের হাতেও সে নির্বাচন ভার অর্পণ করাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়। কারণ যুবকরা যে কোনও যুবতী মেয়েকে দেখেই সাধারণত মুগ্ধ হয়। তাই ঠিক করেছি আমার পুত্রবধূ আমি নিজে নির্বাচন করব তার কুল, কুষ্ঠি, বংশ, মর্যাদা, রূপ, স্বাস্থ্য সব দেখে। যে ঠাকুরঘরের পূজার আসনে তোমার মা ঠাকুমা বসে পুজো করে গেছেন সে ঠাকুর ঘরে যাকে তাকে আমি ঢুকতে দেব না। তবে আর একটা কথাও তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি। যদি কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লেগে থাকে, থাকো না তাকে নিয়ে দিনকতক, তার জন্যে যদি কিছু খরচ করতে চাও কর, তাতে আমি আপত্তি করব না। তোমার বাল্যে এবং কৈশোরে তোমাকে অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছি, যৌবনেও

কিনে দিতে আপত্তি নেই। আপত্তি করব যদি খেলনাটাকে বিয়ে করতে চাও। আমি নিজেও নানারকম নারীর সম্পর্কে এসেছি জীবনে তা তোমার অবিদিত নেই, কিন্তু তাদের বিয়ে করে গৃহিনী করবার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালির বাইরেই মানানসই, তাদের গৃহলক্ষ্মী করবার চেষ্টা করা হাস্যকর এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল। আমার এই সেকেলে মতামত হয়তো তোমাদের কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ভাল্‌গার বলে মনে হবে, তা হোক, বাকী জীবনটা ওই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে থাকব আমি। তুমি তো জানই নানা রকম কুসংস্কার আছে আমার। পাঁজি মানি, কুষ্ঠি মানি, আমাদের পূর্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক সেকালে কোলকাতা থেকে কাঁঠাল কাঠের যে প্রকাণ্ড সিন্ধুকটা কিনে এনেছিলেন এবং যার ভিতর রহস্যময়ভাবে একটি পিতলের লক্ষ্মীমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল সেই লক্ষ্মীমূর্তিটিকে আমি আমাদের বংশের উন্নতির কারণ বলে মানি এবং তাই আজও সেই সিন্ধুকবাহিনী লক্ষ্মীর পুজো সাড়ম্বরে করি। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, লক্ষ্মীকে সিন্ধুক থেকে বার করে ঠাকুর ঘরে স্থাপন করতে। কিন্তু আমার পিতা পিতামহ যা করেন নি আমিও তা করতে সাহস পাইনি। আমার এসব কুসংস্কারের কথা তুমি জানো, এসব জেনেও তুমি এতকাল আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এসেছ। বিবাহ প্রসঙ্গে আমার মতামত তোমাকে জানালাম, আশা করি এটাও তুমি বরদাস্ত করতে পারবে।"

চিঠিটা বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল ওদের স্বপ্ন-সৌধ-শীর্ষে। ওদের মানে শুচিতা অজয়ের। সুবাসিনীর মনে এ চিঠির প্রতিক্রিয়া কিন্তু হল অন্য রকম। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল যেমন করে হোক এ-বিয়ে ঘটাতেই হবে। যে বিজয় মল্লিক তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার ঘরেই মেয়েকে সর্বেসর্বা করে তবে সে ছাড়বে। বিজয় মল্লিকের চিঠি পেয়ে তাই অজয়-শুচিতা যদিও খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল—শুচিতা নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত, অজয়ের মুখের হাসি নিবে গিয়েছিল—কিন্তু সুবাসিনী দমল না। ভেবে চিন্তে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলল সে। প্রথমেই সে ঠিক করল তার পূর্ব-পরিচয় লোপ করে দিতে হবে। কোলকাতায় যে পাড়ায় সে থাকত সে পাড়ায় তার সুবাসিনী নামটা কেউ জানত না। শুচুর মা বলেই তাকে ডাকত সবাই। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে। তবু যে দুই একজন আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের কাছে সে কল্পিত এক লোকের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলে যে সুবাসিনী আর তার মেয়ে কলেরায় হঠাৎ মারা গেছে। মুমূর্ষু সুবাসিনীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে স্বাক্ষরকারী তাকে যেন এই সংবাদটা

জানাচ্ছে। আর একটা কাজও করল সুবাসিনী। অনেক আগেই আর একটা খবর জানত সে। তার প্রতিবেশী চতুর বাবু (পুরোনাম চতুর্মুখ সিংহ) স-পরিবারে বিজয় মল্লিকের কুলগুরু মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। চতুর বাবুর বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল সুবাসিনীর। সুবাসিনী একদা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনিও মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিতে চান। চতুর বাবুর সহায়তায় এ ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না। মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নেওয়ার একদিন পরেই সুবাসিনী তাঁকে বললেন, "গুরুদেব, সংসারে একটি মাত্র বন্ধন আমার ওই মেয়ে। তার যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে আমি নিশ্চিন্তমনে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে বিয়েটা হয়ে যায়।"

মাধবানন্দ লোক খারাপ নন। বললেন, "আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় ততটুকু আমি নিশ্চয় করব!"

"পুরন্দরপুরের বিজয় মল্লিক শুনেছি আপনার শিষ্য। তাঁর একটি চমৎকার ছেলে আছে। আপনি যদি একখানা চিঠি লিখে দেন।"

"চিঠি লিখে দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেবল চিঠি লিখে কাজ হয় না। যেতে হবে সেখানে।"

সুবাসিনী চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল।

"আমার তো পুরুষ অভিভাবক নেই। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমিই যাব। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে আর আপত্তি কি। তবে আপনি দয়া করে একখানা চিঠি দিয়ে দেবেন।"

"তা দোব।"

·

মাধবানন্দের কাছ থেকে চিঠিখানি সংগ্রহ করে সে রাখল বটে কিন্তু কল্পনায় আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হল সে। বিজয় মল্লিক নিশ্চয় মেয়েটির বংশ-পরিচয় জানতে চাইবেন। শুচিতাকে দেখে তার পছন্দ হবেই, একটা মিথ্যা কুষ্ঠি তৈরী করানোও অসম্ভব হবে না, কিন্তু বংশ পরিচয়? এযুগে টাকা দিয়ে প্রতিপত্তি, যশ, সতীত্ব সবই কেনা যায়, বংশ-পরিচয়ও নিশ্চয় কেনা যায়, কিন্তু বিক্রেতা কোথায়! সুবাসিনী চোখ কান খুলে রাখল চারিদিকে।

অজয় আর শুচিতা অবশ্য আধুনিক যুগোপযোগী নানা উপায় আবিষ্কার করতে ব্যাপৃত হয়েছিল। অজয় আরও গোটা দুই টিউশনি জোগাড় করে নিজের আয় বাড়িয়েছিল। শুচিতা ঠিক করেছিল বি. এ. পাশ করে বি. টি. পড়বে। দুজনে উপার্জন করলে সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবার

আগে তারা বিয়ে করবে না। যুক্তির পথ অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিল যদিও, কিন্তু উপনীত হয়ে সুখ পাচ্ছিল না। অজয় শুচিতাকে বলেছিল—"বাবার পয়সায় যে ষ্টাইলে এতকাল থেকে এসেছি, ঠিক সেই ষ্টাইলে থাকবার মতো পয়সা রোজগার করতে অবশ্য অনেক দেরী হবে, হয়তো পারবই না, কিন্তু মাসে অন্তত শ' পাচেক টাকার সংস্থান না হলে বিয়ে করা উচিত নয়। এখন আমাদের আয় শ' তিনেক টাকা মাত্র।"

শুচিতা হেসে উত্তর দিয়েছিল—"বাকী দু'শ টাকা আমি নিশ্চয়ই রোজগার করতে পারব। পারব না?"

"সন্দেহ আছে। টিচারদের মাইনে যে খুব কম।"

"আমি গানেরও ট্যুশনি করতে পারব—। পারব না?"

"আমারও চাকরির আরও উন্নতি হতে পারে।"

এই ধরনের আকাশ-কুসুম রচনা করেছিল তারা। শুচিতা গান বাজনা ভালো ভাবেই শিখেছিল। গান শিখিয়ে কিছু রোজগার সে এখনই করতে পারে, অজয়ের তাতে কিন্তু তেমন মত নেই। সে বলত, "আমাদের দেশের পুরুষেরা এখনও তেমন ভদ্র হয়নি।" শুচিতার মতো রূপসী যদি বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান শেখায় অঘটন ঘটে যাবার সম্ভাবনা। শুচিতাকে অবশ্য কলেজের নানা ফাংসানে—সভা সমিতি—চ্যারিটি শো'তে গান গাইতে হ'ত। নেচেওছে সে মাঝে মাঝে। নাচও সে ভাল শিখেছিল। এমনি এক চ্যারিটি শো'য়ে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুবাসিনীর সঙ্গে বিশ্বপতির দেখা হ'য়ে গেল। তার মনে হল কলেজের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী নিশ্চয় বিশ্বপতির কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, আর সে তো নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিল। বিশ্বপতি সুবাসিনীকে চিনতে পারেনি, ভীড়ের মধ্যে লক্ষ্যই করেনি বোধ হয়। সুবাসিনী কিন্তু করেছিল এবং প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। কিন্তু শো দেখতে দেখতে তার মাথায় অন্য ধরনের চিন্তা আবির্ভূত হল ক্রমশঃ। যে বিশ্বপতি একদিন টাকার লোভে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে তুলে দিয়েছিল, তার সঙ্গে এখন বিজয় মল্লিকের সম্পর্কটা কি রকম! এখনও তার সঙ্গে বিজয় মল্লিকের বন্ধুত্বটা অক্ষুণ্ণ আছে কি? এই সব চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগল। এমন সময় একটা ইণ্টারভ্যালে—অজয় এসে বললে—"চলুন, একটু চা কিম্বা সরবৎ খাওয়া যাক। গ্রীন রুমে চলুন।"

চা কিম্বা সরবৎ খাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না তার। বিশ্বপতির খবর নেওয়ার জন্যই সে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তার মনে হল অজয় হয়তো বিশ্বপতির খবর

জানতে পারে। বিশ্বপতি বিজয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, বিজয় মল্লিকের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল তার এককালে, অজয় হয়তো কিছু খবর দিতে পারবে।

একটু আড়াল পেয়ে সুবাসিনী জিগ্যেস করলে—"বিশ্বপতিবাবু এসেছেন দেখছি। চেন তুমি ওঁকে ?"

"খুব চিনি, বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এককালে। আমিই তো ওঁকে কম্‌প্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠিয়েছিলাম একটা। আজকাল বড় কষ্টে আছেন বিশু-কাকা। আপনি চেনেন নাকি ?"

"আমার দূর সম্পর্কের ভাই হন উনি। অনেকদিন দেখা শোনা নেই। এখানে কোথা থাকেন ?"

"সুকিয়া স্ট্রীটে। বড় কষ্টে আছেন। বাবাই তো ওঁকে বরাবর টাকা কড়ি দিতেন, হঠাৎ বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেছে—বাবা রগচটা মানুষ তো।"

"কি করেন উনি আজকাল ?"

"কিসের যেন দালালি করেন। বিশেষ কিছু হয় না। আমি মাঝেমাঝে কিছু কিছু করে দিই !"

"ছেলে মেয়ে আছে ?"

"না, সংসার বড় নয়, সেইটেই বাঁচোয়া। স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটি তাঁর মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছিল। সে-ও মারা গেছে শুনছি।"

সুবাসিনী একথা শুনে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। এই দুঃসংবাদটাই যেন সুসংবাদ বলে মনে হল তাঁর কাছে। অজয়ের কাছে তার ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন। ঠিক করলেন তার সঙ্গে গিয়ে দেখাই করবেন একদিন। তাকে যদি নিজের দলে টানতে পারেন তাহলে বিজয় মল্লিকের কাছে কথাটা অনায়াসে পাড়া যাবে। আর একটা সুবিধা—বিশ্বপতিবাবুও বিজয় মল্লিকের ঠিক পালটি ঘর। তিনি যদি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে রাজি হন তাহলে বংশ-পরিচয়ের হাঙ্গামাটা মিটে যায়।

সুবাসিনী আর বিলম্ব করল না। পরদিন সকালেই কালীঘাট যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে এবং খুঁজে খুঁজে বিশ্বপতির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হল। দেখল একটা তিনতলা বাড়ির নীচের একটি ঘরে তিনি থাকেন। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন। সুবাসিনী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

'আমাকে চিনতে পারেন দাদা ?''

বিশ্বপতির চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন সুবাসিনীর মুখের দিকে।

"না, ঠিক চিনতে পারছি না তো ?''

"আমি সুবাসিনী।''

"ও ?''

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বপতি। হঠাৎ সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকার লোভে একদা তিনি সুবাসিনীর কত বড় সর্বনাশ করেছিলেন তার পুরো ইতিহাসটা যেন বিদ্যুতের অক্ষরে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুবাসিনীও দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর প্রথমে সুবাসিনীই কথা কইল, "চলুন, ভিতরে চলুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে একটু।''

"এস এস !''

ভিতরে গিয়ে বিছানা পত্রের অবস্থা দেখে সুবাসিনীর বুঝতে দেরি হল না যে, বিশ্বপতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। নিজেই সে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি।

"এই একখানি মাত্র ঘর নিয়ে কোন রকমে আছি। অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। বস ওই খাটেই বস ! আমি এই মোড়াটায় বসছি।"

একটা জীর্ণ মোড়া ঘরের কোণ থেকে নিয়ে বসলেন তিনি। সুবাসিনী প্রশ্ন করল, "এমন দুরবস্থা কেন হল আপনার ?"

"ভগবান বলে একজন আছেন তো ! জীবনে অনেক পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর তুমি কি মনে করে ?"

"আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমার কন্যাদায় উদ্ধার হয়।"

"কি রকম, আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে ? আমি নিজেই তো সহায় সম্বলহীন।"

"বিজয়বাবুর সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্কটা কি রকম ?"

"খুব খারাপ। সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেককাল দেখা শোনা নেই, আগে দু'একটা চিঠিপত্র লিখতাম, আজ কাল তাও আর লিখি না।"

"অত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন আপনারা, হঠাৎ এরকম হল কেন ?"

"আর খোশামোদ করতে পারলাম না। ওর খেয়াল মেটাবার জন্যে অনেক কুকাজ করেছি জীবনে। শেষটা আর পারলাম না। একথা জানতে চাইছ কেন,

তার কাছে আবার ফিরে যাবার মতলব না কি। তোমার স্বামী তো মারা গেছেন শুনেছি।"

"ফিরে যাবারই মতলব আছে, কিন্তু ভিন্ন পথে। আমার মেয়ে শুচিতার সঙ্গে তার ছেলে অজয়ের বিয়ে দিতে চাই। আমার পদস্খলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে পদস্খলনের প্রভাব আমার মেয়ের মনে বা দেহে নেই। আমার দুর্মতি হবার আগেই যে ওর জন্ম হয়েছিল তা আপনি জানেন, আমার কলঙ্ক আমারই, আমার মেয়ের নয়, তাই ইচ্ছে করেই ওর নাম রেখেছি শুচিতা। অজয় যে কলেজে পড়ায়, সেই কলেজেই শুচিতাও পড়ে। দু'জনের ভাব হয়েছে খুব। অজয় তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল বিয়ের প্রস্তাব করে, তার উত্তর তিনি এই দিয়েছেন—"

অজয়ের চিঠিখানি সুবাসিনী অজয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল, আসবার সময় সঙ্গেও এনেছিল। বিশ্বপতি চিঠিখানি পড়ে বললেন—"এ চিঠির পর আর কথা কওয়া শক্ত। তোমার মেয়ে দেখতে কেমন?"

"কাল চ্যারিটি শোয়ে যে কথ্‌থক্ নাচছিল, সেই আমার মেয়ে।"

"ও! সে তো রূপসী।"

"বি. এ. পড়ছে। পড়াশোনায় খুব ভালো।"

"আটকাবে কিন্তু বংশ-পরিচয়ে।"

"শুচিতার বংশ-পরিচয়ে কোন দোষ নেই। সে সদ্বংশের মেয়ে, তার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।"

"কিন্তু তার মায়ের পরিচয় ঢাকবে কি করে! বিজয়ের কাছে অন্তত সেটা লুকোনো যাবে না।"

"যাবে, যদি আপনি সাহায্য করেন! আমি যে শুচিতার মা একথা বিজয়বাবুর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। আপনার একটি মেয়ে আপনার শালীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে মারা গেছে শুনেছি। বিজয়বাবুও কি শুনেছেন একথা?"

"না, সে শোনেনি, তার সঙ্গে অনেককাল চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে।"

"আপনি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিন তাহলে। আমি হই তার মাসী। বিজয়বাবুর কুলগুরুর কাছে আমিও মন্ত্র নিয়েছি! তিনি বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে অজয়ের সম্বন্ধ করছেন এই ভাবে একটা চিঠি লিখুন। আপনি ওঁর বন্ধু, আপনি ঠিক পালটি ঘরও, কিছু বেমানান হবে না।"

"আমি তা পারব না। এতক্ষণ বলিনি, সে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে একদিন। তার দ্বারস্থ হতে আর পারব না।"

"তাহলে আমি নিজেই যাব গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। ঘোমটা দিয়ে থাকব, আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে বলে শুচিতার পরিচয় দেব। তাতে আপত্তি আছে কি আপনার?"

বিশ্বপতি চুপ করে রইলেন। তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে সুবাসিনী বলল, "একটি কথা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি আপনাকে। আমার যে কলঙ্ক আজ আমার নিষ্পাপ মেয়ের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে তুলেছে, তার জন্য আমিই দায়ী, আমার দোষ আমি ঢাকতে চাইছি না। আমি বিজয়কে সত্যিই ভালবেসেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি যোগাযোগ না ঘটাতেন, তাহলে হয়ত বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যেতাম না। এতে যদি পাপ হয়ে থাকে, আপনারও পাপ কম হয়নি। আমি আজ আপনাকে যা করতে বলছি তা কিন্তু পুণ্য কর্ম। অজয়ের সঙ্গে শুচিতার যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা ন্যায় বিচারই হবে। ভেবে দেখুন ভাল করে—অমত করবেন না।"

বিশ্বপতি বললেন, "বেশ! কিন্তু আমি তাকে চিঠি লিখতে পারব না, যেতেও পারব না। বিজয় যদি আমাকে চিঠি লেখে তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দেব যে শুচিতা আমারই মেয়ে। কিন্তু শুচিতা অজয় কি এই মিথ্যাটাকে মেনে নেবে!"

"তাদের এখন জানাবই না। তারপর যদি জানতে পারে তখন সব খুলে বললেই হবে। সব শোনবার পর আমার মনে হয় ওরা আপত্তি করবে না। আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি?"

"দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় হবে না।"

বিশ্বপতির বাসা থেকে বেরিয়ে সুবাসিনী আবার গুরুদেবের কাছে গেল। তাঁকে গিয়ে বলল—"চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে শুচিতা আমারই মেয়ে, কিন্তু আসলে ও আমার বোনের মেয়ে, আমার বোন মারা গেছে অনেক দিন আগে, আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই কথাটাই লিখে দিন খুলে।"

মাধবানন্দ তাই লিখে দিলেন।

সুবাসিনী পুরন্দরপুরে যখন পৌছল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। বিজয় মল্লিকের প্রকাণ্ড বাড়িটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদরজা দিয়ে আধ-ঘোমটা টেনে সে যখন ভিতরের দিকে অগ্রসর হল তখন বিশেষ কেউ বাধা দিল না। গেটে দারোয়ান ছিল, দু'একটা চাকর-বাকরও আনাগোনা করছিল,

কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই সম্ভবত কেউ তাকে বিশেষ কিছু বলল না। আলোকিত বৈঠকখানার সামনে এসে অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। বারান্দায় দু'চার জন লোক ছিল, ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

সুবাসিনী ঘোমটা আর একটু টেনে এগিয়ে গেল এবং মৃদুস্বরে একজনকে ডেকে বলল, "আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠি আছে।"

লোকটি বিজয়বাবুর গোমস্তা একজন।

"আসুন, এইখানে বসুন। চিঠিটা দিন আমাকে—বাবু বাইরেই আছেন।"

বারান্দার উপর যে বেঞ্চটি ছিল তারই একধারে বসল সে। বসেই শুনতে পেল— সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার দারোগাবাবু! চোরে যদি আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত তাহলেও আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ওই সিন্ধুক—যে সিন্ধুক আমার প্রপিতামহ ভার্গব মল্লিক নৌকা করে কোলকাতা থেকে এনেছিলেন, যার ভিতর লক্ষ্মীর মূর্তি রহস্যময়ভাবে পাওয়া গিয়েছিল এবং যে সিন্ধুক আসবার পর থেকে আমাদের সংসারের সর্বপ্রকার উন্নতি হয়েছে— সেই সিন্ধুকটাকে ওরা চেলিয়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। লক্ষ্মীর মূর্তিটা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।—উঃ, এর একটা বিহিত করুন দারোগাবাবু, লক্ষ্মীর মূর্তিটা আমার চাই।"

যদিও অনেকদিন পরে শুনল তবু বিজয় মল্লিকের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হল না সুবাসিনীর। অজয়ের চিঠিতে এই সিন্ধুকের কথাও সে পড়েছিল। যিনি উত্তর দিলেন তিনিই সম্ভবত দারোগাবাবু। "আমার লোকজনেরা তো খুঁজেছে অনেক, এখনও খুঁজছে। কিন্তু ও মূর্তি আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওটা পিতলেরই ছিল কি?"

"আমরা তো পিতলের বলেই জানতাম। কিন্তু সত্যি কিসের ছিল তা কি করে বলব বলুন। আমার প্রপিতামহ তো ওটা বাজার থেকে কেনেন নি, তিনি কিনেছিলেন সিন্ধুকটা। বাড়ীতে সিন্ধুক যখন খোলা হল তখন দেখা গেল তার মধ্যে ওই মূর্তি রয়েছে। তখন আমাদের যিনি কুলগুরু ছিলেন, তিনি বললেন—সিন্ধুক থেকে ওঁকে বার কোরো না কখনও। নারিকেল ফলোম্বুবৎ উনি এসেছেন, ওই ভাবেই থাকুন, ওই বন্ধ সিন্ধুকের সামনেই পুজো কর তোমরা। তাই হয়ে এসেছে এতকাল, আমাদের উন্নতিও হয়েছে,—কিন্তু কাল একি কাণ্ড হল বলুন তো। মনে হচ্ছে আমার মেরুদণ্ডটাই যেন ভেঙে গেছে।"

দারোগাবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"কি আর করবেন বলুন। আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি যদি কোনও পাত্তা লাগাতে পারি।"

"দেখুন, দেখুন প্লীজ।"

এরপর দারোগাবাবু বেরিয়ে এলেন এবং চলে গেলেন।

গোমস্তাটি চিঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

"মেয়ে মানুষ? কি চিঠি এনেছে দেখি।"

বিজয় মল্লিকের গলা আবার শোনা গেল।

চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন—"গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছেন? আচ্ছা, ওকে ভিতরে পিসিমার কাছে নিয়ে যাও! আমি পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

বিজয় মল্লিকের অন্তঃপুরে গৃহকর্ত্রী ছিলেন এক স্থবিরা পিসীমা। তিনি সুবাসিনীর আগমনের হেতু শুনে পুলকিত হয়ে উঠলেন। অজয়ের বিবাহের জন্ম তিনি বহুকাল থেকে উৎসুক হয়ে আছেন। কত সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিজয় মল্লিক কাউকে পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেরই একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়েছে। সেই সবেরই বিবরণ বলতে লাগলেন তিনি সুবাসিনীকে। শেষে বললেন, "তোমার মেয়ে যখন সুন্দরী, আর ওর বন্ধুর মেয়ে, গুরুদেবও পছন্দ করেছেন বলছ, তখন হয়তো হয়ে যেতে পারে।"

কিন্তু হল না। সেইদিন বিজয় মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, "বিশ্বপতির মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, মাপ করবেন আমাকে।"

পরদিন ভোরের ট্রেনেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল সুবাসিনীকে।

সুবাসিনী অজয় আর শুচিতাকে বলেই গিয়েছিল যে সে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছে তাদের বিয়ের জন্ম চেষ্টা করতে। সে যখন হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদটা নিয়ে ফিরে এল, তখন শুচিতার চোখে মুখে একটা সপ্রতিভ হাসি উজ্জল হ'য়ে উঠল যদিও, কিন্তু সুবাসিনীর কাছে সে হাসির মেকিত্ব ধরা পড়ল অবিলম্বে। তার অন্তর্দৃষ্টির কাছে কিছুই লুকোনো রইল না। সে নিজেই যে একদিন প্রেমে পড়েছিল, শুচিতার হাসির অর্থ বুঝতে একটুও দেরি হল না তার। সুবাসিনী যখন ফিরল তখন অজয় ছিল না। সে এল সন্ধ্যার পর। সে আসতেই শুচিতা হেসে বলল—"মা ফিরে এসেছেন। একেবারে কলকে পাননি সেখানে।"

সুবাসিনী হাসি মুখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমি একটা খারাপ সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের বাড়ির সেই লক্ষ্মীর সিন্দুক চুরি গেছে। তোমার বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তার মনের ভাব দেখে মনে হল আমি যদি তার হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো উনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারেন। লক্ষ্মীর জন্যে উনি পাগল হয়ে উঠেছেন।"

"তাই না কি! আমি তো কোনও খবর পাইনি।"

তার পরদিন সকালেই কিন্তু অজয় এসে হাজির হল আবার।

"বাবা জগন্নাথ গোমস্তার হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তেমনি একটা সিন্দুক আর তেমনি একটা পেতলের লক্ষ্মী কিনে পাঠাতে। অত বড় সিন্দুক চট করে পাওয়া গেল না। জগন্নাথের হাতে চিঠি লিখে পাঠালাম যে আমি যতশীঘ্র সম্ভব সিন্দুক আর লক্ষ্মী পাঠাচ্ছি। আপনি কাল বলছিলেন তাঁর হারানো লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলে তিনি হয়তো রাজি হবেন। এই শুনে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি যদি রাজি হন আর শুচিতা যদি ভাল করে অভিনয় করতে পারে তাহলে কি হয় বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা একটু রিস্‌কি।"

"কি বলই না শুনি।"

সুবাসিনী শুচিতা দুজনেই উদগ্রীব হয়ে উঠল। অজয় মৃদু হেসে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

সুবাসিনী বলল—"শুনিই না তোমার প্ল্যানটা। অসম্মানকর যদি না হয় আপত্তি করব কেন।"

অজয় হেসে বললে—"ঠিকমতো অভিনয় করতে পারলে বাবার কুসংস্কারের রন্ধ্র দিয়ে শুচিতা আমাদের বাড়িতে হয়তো ঢুকতে পারে।"

"কি করতে হবে"—শুচিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

"আমাদের যে সিন্দুক চুরি গেছে তা প্রকাণ্ড সিন্দুক। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তা পাঠানো যাবে না। মাল গাড়িতে যেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক দেরী হবে। বাবা লিখেছেন আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই সিন্দুক আর পিতলের লক্ষ্মী পুরন্দরপুরে পৌছন চাই। একমাত্র উপায় হচ্ছে লরী করে পাঠানো। আমার এক বন্ধু লরী ড্রাইভার আছে। পুরন্দরপুরে পৌছবার ঠিক আগে শুচিতাকে যদি সিন্দুকের মধ্যে পুরে দেওয়া যায়, কেমন হয়! বাবার প্রপিতামহ ভার্গব মল্লিক সিন্দুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে পিতলের লক্ষ্মী পেয়েছিলেন, বাবা একেবারে জীবন্ত লক্ষ্মী পেয়ে যাবেন।"

"পাগল নাকি! দম আটকে যাবে না আমার!"

শুচিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

"দম আটকাবে কেন। প্রকাণ্ড সিন্দুক। আর কতক্ষণই বা থাকবে তার ভিতর। ডালাটা খুলেও বসে থাকতে পার। পুরন্দরপুরে ঢোকবার ঠিক আগে ডালাটা বন্ধ করে দিলেই হবে। আমাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তো বাবা সিন্দুকের ডালাটা খুলে দেখবেন। সিন্দুকের ভিতরে হাওয়া ঢোকবার একটা ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। অনায়াসেই সেটা হতে পারে।" কথাটা শুনে সুবাসিনীর কল্পনা পাখা মেলে উড়তে লাগল। শুচিতা পারবে কি? যদি পারে···! শুচিতার চোখ দুটোও জ্বল-জ্বল করে উঠল সকৌতুক উৎসাহে। তৎক্ষণাৎ সে ঠিক করে ফেলল এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতেই হবে। ব্যাপারটার অভিনবত্বেই উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। ঠিক বিয়ের লোভে নয়। বিয়ের সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। সে জানত অজয়কে সে জয় করেছে, বিয়ে একদিন না একদিন হবেই। কিন্তু সিন্দুকের ভিতর থেকে আবির্ভূত হয়ে এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুঁদে জমিদারকে অভিভূত করে ফেলার মধ্যে যে মজা আছে, সেইটে উপভোগ করবার জন্যেই সে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললে যাবে।

অজয়ের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে বললে—"সিন্দুক থেকে বেরিয়ে কি বলতে হবে আমাকে?"

"কিছু বলতে হবে না। খুব যেন আশ্চর্য হয়ে গেছ এইরকম ভান করতে হবে শুধু। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলবে—'আমি এই সিন্দুকের মধ্যে কি করে এলাম কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আমার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, কিছুই জানি না,' এই ধরনের দুচার কথা বলে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পরের ট্রেনেই এখানে চলে আসবে।"

'তারপর?" সুবাসিনী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে।

"তারপর খুব সম্ভব বাবাও ওর পিছু পিছু আসবেন। তখন আপনিও ওই কথাই বলবেন। ওঁকে এটা বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে শুচিতা রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল কি করে যে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করল তা আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি থানায় ডায়েরিও একটা করে দিতে পারেন! আচ্ছা বাবা কি আপনাকে দেখেছিলেন?"

"না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।"

"ভালই হয়েছে! আমিও বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাবার যখন আপত্তি আছে

তখন আমি সে ইচ্ছা বর্জন করলাম। এটা লেখবার উদ্দেশ্য বাবা যাতে না মনে করেন আমি এই ষড়যন্ত্র করে এই কাণ্ড করেছি।"

"এত বুদ্ধিও তোমার মাথায় খেলে!"

মুচকি হেসে শুচিতা পাশের ঘরে চলে গেল।

সুবাসিনী কিন্তু ব্যাপারটার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আশা করছিল যে অজয় যা বললে তা ঠিক যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে বিজয় মল্লিক ঠিক তার দ্বারস্থ হবে। এইটেই তো সে চায়।

"তোমার বাবা এসে পড়লে আমি কি করব?"

"কি আবার করবেন। আদর যত্ন করবেন, আর কথায়-বার্তায় জানিয়ে দেবেন যে, আপনি তাঁর পালটি ঘর। আর কিছু করতে হবে না।"

"বেশ, পারো যদি আমার আপত্তি নেই। এখন দেখ শুচিতা রাজী হয় কি না।"

তারপর সুবাসিনী হঠাৎ প্রশ্ন করল—"তোমার ড্রাইভার বন্ধু নিখিল বেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক তো?"

"খুব বিশ্বাসযোগ্য।"

"তাহলে দেখ যদি পারো।"

একটু পরেই আবার ফিরে এল অজয়। তার চোখ মুখ উত্তেজনায় আনন্দে উদ্ভাসিত। সুবাসিনীর সঙ্গেই প্রথমে দেখা হল তার।

"শুচিতা রাজি আছে তো?"

"হবে না আবার। আজকালকার মেয়ে।"

"আমি সিন্দুকটা কিনেছি, প্রকাণ্ড সিন্দুক, একটা ছোটখাটো ঘরের মতন। তার একধারে আমি ছোট একটা শ্লাইডিং জানালাও করতে দিয়ে এলাম। আর একটা কাজও করতে হবে। এ ঠিকানাটা বদলাতে হবে আপনাদের।"

"কেন?"

"আপনি যে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন। গুরুদেব কি বাসার ঠিকানা জানেন?"

"জানেন বোধ হয়।"

"তাহলে এ বাসায় থাকা চলবে না। আমি একটা খালি বাড়ি পেয়েছি, সেইখানেই চলুন আপনারা। কারণ, বাবা যদি আসেন গুরুদেবের কাছে যাবেনই, তিনি আপনার কথা বলবেন, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।"

'তা বটে!"

"শুচিতা কোথা?"

"সে বেরিয়েছে শাড়ি কিনতে। সবুজ রঙের শাড়ি।"

"কেন?"

"লক্ষ্মীর শাড়ী নাকি সবুজ রঙের। অবনী ঠাকুরের লেখায় আছে না কি?"

"আমি তাহলে বাড়িটা ঠিক করি গিয়ে। কালই যেতে হবে সেখানে।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেল অজয়।

অপূর্ব অভিনয় করল শুচিতা। নিখিল তালা-বন্ধ বিরাট সিন্ধুকটি নাবিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে চাবিটি দিয়ে চলে যাবার পরই সেই বিরাট সিন্ধুককে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে আনা হল। বিজয় মল্লিক শঙ্কিত হৃদয়ে স্বহস্তে চাবিটা খুললেন, তারপর ডালা খুলেই চমকে উঠলেন।

"একি, সিন্ধুকের ভিতর এ কে!"

শুচিতা চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে।

বিজয় মল্লিকের হাঁক ডাকে আরও অনেকে এসে জুটে গেল। তারপর শুচিতা উঠে বসল, দুহাতে চোখ কচলে, সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'আমি কোথায় এসেছি! এ কি।"

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বিজয় মল্লিক স-সম্ভ্রমে সরে গেলেন। যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তারাও পিছিয়ে গেল একটু। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্ম প্রস্তুত ছিল না কেউ।

"আমাকে বার করে দিন এই সিন্ধুক থেকে! এর ভিতর কি করে এলাম আমি! আশ্চর্য! কি করে বার হব আমি এর থেকে।"

বিজয় মল্লিক শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন নিজেই তাকে ধরে বার করবেন বলে, কিন্তু শুচিতা বলে উঠল—"না, না আমাকে ছোঁবেন না কেউ আপনারা। একটা টুল বা মোড়া দিন, আমি আপনিই বেরুতে পারব। কি আশ্চর্য, আমি কি করে এলাম এর মধ্যে!"

দুটো টুলের সহায়তায় শুচিতা বেরিয়ে পড়ল সিন্ধুক থেকে। তারপর ঘরের কোণে যে চেয়ারটা ছিল হঠাৎ তার উপর বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদছেন কেন ? কি হয়েছে খুলেই বলুন না।"

"কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি করে যে এই সিন্দুকের মধ্যে এলাম তা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোনও ভৌতিক কাণ্ড, আমি এখনই ফিরে যেতে চাই, মা হয়তো কান্নাকাটি করছেন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনি।"

বিস্মিত বিজয় মল্লিক প্রশ্ন করলেন।

"দেখলাম যেন একটি অপরূপ সুন্দরী আমাকে এসে বলছেন—মা এইবার তুমি নিজের ঘরে চল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন, তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল।"

অজয়ের মায়ের বিরাট অয়েল পেন্টিংটা সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটা দেখে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ালো শুচিতা।

"এঁকেই স্বপ্নে দেখছিলাম। ইনি কে—ইনি কে ?"

বিজয় মল্লিকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করছিল। শুধু নির্বাক নয় ঈষৎ ব্যায়ত আননও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

"কার ছবি এটা বলুন না ?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কোথায় তিনি ?"

"তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! তাহলে এটা ভৌতিক কাণ্ড? আমি আর থাকব না। চললুম। আমার বড় ভয় করছে। এখান থেকে স্টেশন কত দূর? কোলকাতার ট্রেন ক'টায়।"

"চলে যাবেন কেন! থাকুন না—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"না আমার বড্ড ভয় করছে! আমি চললাম—মাপ করবেন!"

নাটকীয় ভঙ্গিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শুচিতা।

বিজয় মল্লিকও পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন মেয়েটি স্টেশনের রাস্তা ধরে ছুটছে। স্টেশনের রাস্তা কোন দিকে তা অজয়ের কাছ থেকে জেনে এসেছিল শুচিতা। বিজয় মল্লিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"সুজিৎ সিং, মোটর নিকালো জলদি।"

অর্ধ পথেই ধরে ফেললেন তিনি শুচিতাকে।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দি।"

"স্টেশন কতদূর এখান থেকে! আমি হেঁটেই চলে যাব! আপনি আর কেন কষ্ট করছেন!"

"আমি একেবারে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। আসুন।" একটু ইতস্তত করে শেষে মোটরে উঠে বসল সে। যতক্ষণ মোটরে ছিল, চুপ করে বসেছিল একধারে জড়-সড় হয়ে, আর মাঝে মাঝে কাঁদছিল।

বিজয় মল্লিক বার বার প্রশ্ন করছিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?"

শুচিতা উত্তর দেয়নি, মাথা নিচু করে ঘাড় ফিরিয়ে বসে ছিল নীরবে। বিজয় মল্লিক বিস্মিত এবং বিব্রত তো হয়েই ছিলেন, শুচিতার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ থেকে মুগ্ধও হয়ে গেলেন। চমৎকার মেয়েটি। সত্যিই লক্ষ্মীর মতো চেহারা। ফিকে সবুজ শাড়িতে কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখাচ্ছে, কোলকাতার কাছাকাছি এসে শুচিতা হঠাৎ বললে—

"আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"রাখবো বই কি। সম্ভব হলেই রাখবো।"

"এই ঘটনার কথা কাউকে বলবেন না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, এ কথা শুনলে হয়তো ভেঙে যাবে।"

"ও।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বিজয় মল্লিক। তারপর প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জাত?"

"আমরা কায়স্থ। ঘোষ আমাদের উপাধি।"

"তাই নাকি! তাহলে তো আমাদের পালটি ঘর।"

শুচিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কোলকাতার ভিতর যখন গাড়ী এসে পড়ল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তোমাদের বাড়িটা কোথা?"

'বাদুড় বাগানে।"

অজয়ের পরামর্শে সুবাসিনী বাসা বদল করেছিল। সেই ঠিকানায় বিজয় মল্লিক শুচিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির ঝিটা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—'ওমা, এই যে দিদিমণি গো। মিছিমিছি থানায় খবর দেওয়া হল।"

শুচিতা নেবে সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বিজয় মল্লিক ঝিকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

"কি হয়েছিল বল তো?"

"তাই কি আমরা জানি। রাত্রে মেয়ে খেয়ে দেয়ে শুল, তারপর কোথায়

ষেন উপে গেল। ঘরের খিল বন্ধ রয়েছে, সদর দরজায় খিলও বন্ধ রয়েছে অথচ দিদিমণি নেই। সমস্ত দিন শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি কোথা পেলেন ওঁকে ?"

বিজয় মল্লিক শুচিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথাটা ভাঙলেন না ঝিয়ের কাছে। আর একটা প্রশ্ন করলেন।

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ কে আছে ?"

"কেউ নেই। বিধবা মা আছে শুধু।"

"তার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?"

"দেখি জিগ্যেস করে।"

ঝি ভিতরে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল—"না, উনি দেখা করবেন না।"

বিজয় মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সোজা চলে গেলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর মনে হল তিনি ছাড়া এই জটিল রহস্যের সমাধান আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁরই উপদেশ অনুসারে চলাই নিরাপদ। সিন্ধুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত ?

মাধবানন্দ অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ। তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা অসাধারণ। বিজয় মল্লিকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং বারবার হাতে জোড় করে প্রণাম করতে লাগলেন, কাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চোখ বুজে বসে রইলেন। বিজয় মল্লিক অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে। তাঁর ভয় হতে লাগল গুরুদেব যদি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তাহলে দু'তিন ঘণ্টার আগে চোখ খুলবেন না। তাই তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন।

"গুরুদেব আমার কি কর্তব্য এখন বলে দিন সেটা আগে।"

গুরুদেব চোখ খুলে বললেন—"ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

"সেটা কি করে সম্ভব। পরের মেয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম, বিয়ে হয়ে গেলে পরের বৌ হবে, আমার বাড়িতে নিয়ে যাব কি করে ?"

"যেমন করে হোক নিয়ে যেতে হবে। যদি না নিয়ে যেতে পার অমঙ্গল হবে তোমার। এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?"

"পাচ্ছি। কিন্তু কি করে সম্ভব সেটা। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?

ওরা আমাদের পালটি ঘর। অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করব? সমীচীন হবে কি সেটা?"

"অন্যায় তো কিছু মনে হচ্ছে না। মহাশক্তি নানারূপে ভক্তের কাছে আসেন, কখনও মা হয়ে, কখনও মেয়ে হয়ে, কখনও প্রিয়া হয়ে। অজস্র উদাহরণ আছে এর পুরাণে। আমার মনে হয় সেই চেষ্টাই কর তুমি। ও মেয়েকে বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারলে ঘোর অমঙ্গল আশঙ্কা করছি।" মাধবানন্দের চোখ দুটি আবার বুজে এল। বিজয় মল্লিক উঠে পড়লেন। কিন্তু তখনই তাঁর মনে পড়ল বিশ্বপতির শালী তাঁর কাছে গিয়েছিল গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেন করেছেন সে কথাটা গুরুদেবকে বলে যাওয়া উচিত। বললেন, "গুরুদেব, আপনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বিশ্বপতির শালী আমার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বপতিকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি, অত্যন্ত খারাপ লোক সে, তার মেয়ের সঙ্গে আমি অজয়ের বিয়ে দেব না। আশা করি এতে আপনি রাগ করবেন না।"

"না, না, রাগ করব কেন। ওই মেয়েটিও কিছুদিন আগে আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে, এসে অনুরোধ করলে তাই চিঠি লিখে দিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে সবই মহামায়ার খেলা। তুমি যদি রাজি হয়ে যেতে তাহলেই—বুঝতে পারছ ইঙ্গিতটা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে মেয়েটির মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাবই করি গিয়ে। কি বলুন?"

"তাই কর। তোমার ঠিক পালটি ঘরও যখন, তখন আর কথা কি।"

"অজয়ের কাছে যাই আগে, কি বলেন?"

"হ্যাঁ তাই যাও! ছেলে তোমার খুব ভাল, সে আপত্তি করবে না!"

বিজয় মল্লিক বেরিয়ে গেলেন অজয়ের উদ্দেশ্যে।

অজয়ও খুব ভাল অভিনয় করল। সে সন্দেহ করতে লাগল এর ভিতর কোনও 'ফাউল প্লে' আছে। সে বিজয় মল্লিককে নিয়ে গেল মোটর ড্রাইভার নিখিলের কাছে। নিখিল বলল, সে তো কিছুই বুঝতে পারেনি। মোটর ছেড়ে কোথাও যায়নি, কোথাও থামেনি পর্যন্ত। সেও খুব বিস্মিত হল শুনে।

"সিন্দুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মী মূর্তিটা ছিল তো?"

"না। ছিল ওই জীবন্ত মেয়েটা।"

"কি আশ্চর্য !"

বাবাকে নিয়ে অজয় যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু গুরুদেব আশ্চর্য হননি। তিনি বললেন পুরাণে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আচ্ছা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখেছিলে তার কি হল ?"

"কি আবার হবে। আপনার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম তাদের। তারপর তারা আর আসেনি।"

"আমার এখন মনে হচ্ছে, গুরুদেবও বলছেন, মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করি।"

"এই মেয়েটির সঙ্গে !"

ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করে অজয় এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

বিজয় মল্লিক বললেন, "ক্ষতি কি। মেয়েটি দেখতে চমৎকার, আমাদের পালটি ঘর, তাছাড়া গুরুদেব যা বলছেন, তা যদি মানতে হয়, উনি যদি সত্যিই আমাদের ঘরের লক্ষ্মীই হন তাহলে ওকে বরণ করে নিয়ে যাওয়াই উচিত। এ সুযোগ ত্যাগ করলে হয়তো আজীবন পস্তাতে হবে।"

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল—"যা ভাল বোঝেন করুন। আমার আর বলবার কি থাকতে পারে।"

"তাহলে আমি মেয়ের মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি গিয়ে ?"

"পাড়ুন।"

সুবাসিনী এইবার সুযোগ পেলেন।

যে ছবিটিকে তিনি মনের মণিকোঠায় এতদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন সেই ছবিটি সত্যই এবার জীবন্ত হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করল। সুবাসিনী বিজয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না। আড়াল থেকে কথাবার্তা হল। বিজয় মল্লিক যখন খোঁজ নিলেন যে তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল তার কি হল তখন সুবাসিনী বললেন—"আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আমার মেয়ের জন্মের পর আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ের যে সব সর্ত দিয়ে গেছেন তা এ যুগে কেউ মানবে না। তিনি বলে গেছেন মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তাহলে তাকে দীক্ষা দিয়ে কোনও ভাল মঠে পাঠিয়ে দিতে।"

"কি কি সর্ত্ত দিয়ে গেছেন তিনি।"

"প্রথম আমার কাছে হাতজোড় করে মেয়েটিকে চাইতে হবে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে আমাদের বংশ পরিচয় জানতে চাইতে পারবেন না, আমার যা খুশী তাই আমি দেব। আপনি বুঝতে পারছেন এ যুগের কোনও ছেলের বাপই এর একটা সর্ত মানতে চাইবেন না। তারপর এই যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল এটা যদি জানাজানি হ'য়ে যায় তাহলে তো—"

বিজয় মল্লিক তাড়াতাড়ি বললেন—"না, তা জানাজানি হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব আবার।"

"আবার দেখা করতে চাইছেন কেন?"

"সে তখনই বলব।"

বিজয় মল্লিক বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। পণ না হয় না-ই পাওয়া গেল। কিন্তু আর দুটো সর্ত যে বড় ভয়ঙ্কর! হাত জোড় করে মেয়ে চাইতেই হবে? ছি ছি! তাছাড়া মেয়ের বংশ-পরিচয় না জেনে বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? একমাত্র ছেলে তাঁর। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন এ বিয়ে দেবেন না। যেমন ছিল তেমনি একটা লক্ষ্মী প্রতিমাই কিনে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন সিন্দুকের ভিতর। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেল। তাঁর একটা ব্যাংকে কয়েক হাজার টাকা ছিল, সেই ব্যাংকটা ফেল করল হঠাৎ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন বিজয় মল্লিক। ছুটে চলে গেলেন আবার গুরুদেবের কাছে।

গুরুদেব সব শুনে বললেন—"ওই মেয়েকেই বরণ ক'রে নিয়ে যাও তুমি। আর দ্বিমত কোরো না।"

"কিন্তু মেয়ের মায়ের সর্ত তো শুনলেন।"

"সেই জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ও মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। ওর পিতা সে কথা জানতেন, তাই হাত জোড় ক'রে চাইবার আদেশ দিয়ে গেছেন। আর ওকে যদি লক্ষ্মী বলেই মনে কর তাহলে হাত জোড় করতে আপত্তিই বা কি। আর বংশ-পরিচয়? কার বংশের কতটুকু পরিচয় তুমি পেতে পার! ও মানুষ এইটিই কি ওর শ্রেষ্ঠ পরিচয় না? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চণ্ডীদাসের এই উক্তি কি শোননি?"

"শুনেছি। কিন্তু—।"

"আর কিন্তু কোরো না!—আমার মনে হচ্ছে তোমার সিন্দুক চুরিটাও মা

লক্ষ্মীর লীলা, এর ভিতরও নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে একটা। তা না হলে অতবড় সিন্দুক চুরি করা কি সহজ ব্যাপার! তুমি আর ইতস্তত কোরো না।”

বিজয় মল্লিক বাসায় ফিরে আর একটি দুঃসংবাদ পেলেন। জমিদারীতে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে, নায়েব মশাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খুবই ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'তে লাগল অপমানিতা লক্ষ্মীর অভিশাপেই এই সব হচ্ছে বুঝি। আর বেশী দেরী করলে হয়তো সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। তিনি স্থির করলেন সর্তগুলির কথা অজয়কে জানাবেন না। আজকালকার ছেলে, হয়তো বলে বসবে ও সর্তে আমি বিয়ে করব না।

গোপনেই তিনি গেলেন পরদিন সুবাসিনীর বাসায়। ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালেন। পাশের ঘরের পর্দার অন্তরালে সুবাসিনী এসে দাঁড়াল আবার।

“কি জন্যে ডেকেছেন আমাকে?”

“আমার একমাত্র ছেলে অজয়ের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। পণের কোনও দাবী আমার নেই। অন্য সর্ত দুটিও আমি পালন করব। তবে ঝিটাকে বাইরে যেতে বলুন।”

সুবাসিনীর আদেশে ঝি বাইরে চলে গেল।

বিজয় মল্লিক তখন করজোড়ে বললেন—“আপনার মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করতে চাই, দয়া করে অনুমতি দিন। আপনার বংশ-পরিচয় এখন জানতে চাই না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও কি সেটা জানবেন না?”

সুবাসিনী বললেন, “জানাব। কিন্তু কেবল আপনাকে।”

“বেশ!”

মহাসমারোহে বিবাহ হ'য়ে গেল।

কিন্তু নাটকটা জমল বিয়ের গোলমাল চুকে যাবার পর। এক নির্জন দুপুরে বিজয় মল্লিক এসে বংশ-পরিচয়টা জানতে চাইলেন সুবাসিনীর কাছে। সুবাসিনী এতদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, আড়ালে আড়ালেই ছিল। সেদিন হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, “বংশ-পরিচয় জানতে চাইছেন? এই দেখুন।”

বুকের কাপড়টা সরিয়ে দেখাল—বিজয় মল্লিকের নামটা জলজল করছে সেখানে।

সুবাসিনী হেসে বলল—"পণও আমি দেব। আপনি আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন তার থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করিনি। চেক বুক আর পাশ বুক যেমনকার তেমনি আছে। এই নিন।"

বিজয় মল্লিক প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাবি

ডাক্তার অরূপকুমার ক্রমাগত চিৎকার করিতেছেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই।"

ব্যাপারটা তাহা হইলে গোড়া হইতে শুনুন।

ডাক্তার অরূপকুমার নিজে অবশ্য উদরের দাবিতে ব্যাপারটিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কোন ব্যাপারেই নির্বিঘ্নে লিপ্ত হওয়া যায় না। সুখাদ্যও কেহ যদি মুখে পুরিয়া দেয়, তবু তাহা চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরা আটকাইয়া এই সরল ব্যাপারটাও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, তুচ্ছ একটা খড়্‌কের জন্য তখন অস্থির হইয়া পড়িতে হয়।

ডাক্তার অরূপকুমারকেও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি যদি সোজাসুজি ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো প্র্যাকটিস করিতে বসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্যা হয়তো এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তিনি মফঃস্বল শহরে প্যাথোলজিস্ট হইয়া ডব্লিউ. আর (W. R) নামক দুরূহ রক্ত পরীক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন মনস্থ করিলেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহাকে গিনিপিগের সন্ধানে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণাপন্ন হইতে হইল। কলিকাতা শহর নয়, মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। ট্যারা পাখি-ওলাটাই জোগাড় করিয়া দিতে পারে। অরূপ জানিতেন, লোকটা চড়াই পাখিকে 'আগ্‌গিন' এবং বাঁশপাতিকে 'হরবোলা' বলিয়া চালায়, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণ পায়রাই 'গেরবাজ' নাম দিয়া বিক্রয় করে। চুরির অপরাধে একবার জেলও খাটিয়াছিল। কিন্তু এই লোকটার খোশামোদ না করিলে মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। কেবলমাত্র পয়সায় কাজ হইবে না। কলিকাতা

হইতে অবশ্য আনানো যায়, কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে ট্যান্না পাখি-ওলাটার শরণ লইতে হইল। প্রথমে সে তেমন গা করিল না। অনেক অনুরোধ করার পর বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিবে। চার পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কয়েকটি শীর্ণ লোম-ওঠা গিনিপিগ আনিয়া সে হাজির করিয়াছে। বলিল, অনেক কষ্টে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি গিনিপিগের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বলিল, ডাক্তারবাবুকে খাতির করে বলিয়া সে কম দামই চাহিতেছে। যদিও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল, তবু ডাক্তার অরূপকুমার দরদস্তর করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তিন টাকাতে রফা হইল। গিনিপিগ জুটিল, এবার খরগোস এবং ভেড়া চাই।

পাখি-ওলা বলিল, "আমিই আপনাকে খরগোস দিতে পারতাম। কিন্তু এ অঞ্চলের যত খরগোস সব দীনু মিঞা কিনে চালান দিচ্ছে। আপনি তাকে ধরুন। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাঁওতালরা জংলী খরগোস বিক্রি করে যায়। তা-ও আমি দীনু মিঞার কাছেই পাঠিয়ে দিই। তার কাছেই আপনি খরগোস পাবেন।"

দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞাকে অরূপবাবু মৎস্য-ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিতেন। সে যে খরগোসের ব্যবসায় ধরিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। দীনু মিঞার সহিত দেখা করিয়া তিনি দেখিলেন শুধু খরগোস নয়, নেউল, ইঁদুর, কাছিম, জোঁক প্রভৃতি জানোয়ার দীনু মিঞা নানাস্থানে চালান দেয়। এসব নাকি তাহার শাখা-ব্যবসায়। অরূপবাবুকে বলিল, "সাদা খরগোস তো সব চালান হয়ে গেছে। তবে ব্রৌন কাবুলী খরগোস একজোড়া আছে। দাম একটু বেশী লাগবে। পঁচিশ টাকা জোড়ায় বেচি, আপনি কুড়ি টাকা দেবেন।"

অরূপকুমার কাবুলী বিড়ালের কথা আগে শুনিয়াছিলেন, কাবুলী খরগোসের কথা প্রথম শুনিলেন। দীনু মিঞা খরগোস যখন বাহির করিল, তখন কিন্তু দেখা গেল 'কাবুলী' বিশেষণ সত্ত্বেও খরগোস দুইটি সাধারণ খরগোসের মতোই। রঙটা কেবল বাদামী। পুনরায় দরদস্তর। কিছু দাম কমিল। অরূপবাবু বলিলেন, "আমার একটা ভেড়াও চাই মিঞা সাহেব।"

"ভেড়া তো আমি রাখি না। আপনি কিষণগঞ্জের হাটে লোক পাঠান। সেখানে সস্তায় ভেড়া পাবেন।"

ষোল টাকা দামে একটি ছোট ভেড়াও পাওয়া গেল।

এই ব্যাপারের জন্ত ডাক্তারবাবুকে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতিও ইতিপূর্বে কিনিতে হইয়াছিল। দরদস্তর করিবার সুযোগ পান নাই ; কারণ যন্ত্রগুলি সবই বিদেশী, কিংবা বিদেশী জিনিসের স্বদেশী সমন্বয়, দাম একেবারে বাঁধাধরা। ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটারবাথ, ইনকিউবেটার, সেনট্রিকিউজ, রেফ্রিজারেটার, কেমিক্যাল ব্যালান্স এবং খুঁটিনাটি আরও নানারকম কাচের জিনিসপত্র কিনিতে প্রায় হাজার পাচেক টাকা লাগিয়া গিয়াছিল। টাকাটা তাঁহার শ্বশুর দিয়াছিলেন।

অতঃপর, তিনি কাজ শুরু করিলেন। হিতৈষী ডাক্তারদের সুপারিশে পরীক্ষা করিবার জন্ত রক্তও জুটিতে লাগিল। ডাক্তার অরূপের ক্লিনিকে সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীরা ভিড় করিতে লাগিলেন। তিনি গিনিপিগ্‌, খরগোস এবং ভেড়ার রক্তের সহিত রোগী-রোগিণীর রক্ত মিশাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কাহার রক্তে ভাসারম্যান রিয়াক্‌শন্ (Wassermann Reaction) কিরূপ। এই টেস্‌ট্ পজিটিভ হইলে বোঝা যায় রোগীর রক্তে উপদংশের বিষ আছে কি না।

কিছুদিন তাঁহার ব্যবসায় ভালই চলিল। গুরুতর সমস্যাটি দেখা দিল পরে। দাবির প্রশ্নটা সম্ভবত খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাগজে কাগজে সীমানা-বিভাগ লইয়া তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছিল, ভারতবর্ষের মাটির উপর কাহার কতখানি দাবি। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞেও এই একই দাবির প্রশ্ন—জমিতে আসল দাবি কাহার, জমিদারের, না চাষীর ? প্রতিদিন দাবি-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই সম্ভবত ডাক্তার অরূপের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন না, তর্ক করিলেন না, বক্তৃতাও করিলেন না। স্বপ্ন দেখিলেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখিলেন—একটি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে তিনি এবং একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটি তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি যে রক্ত পরীক্ষা করে রোগী-পিছু ষোল টাকা করে 'ফী' নাও, সে টাকায় কি তোমার একার দাবি ? কতগুলি দাবিদার আছে দেখ।…"

যবনিকা সরিয়া গেল। অরূপ ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন ট্যারা পাখি-ওলা এবং দাড়িতে মেহেদি-লাগানো দীনু মিঞা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাসিয়া

বলিল, "আমরা আপনার জন্তে যা করেছি ক'টা টাকা দিয়ে কি তার মূল্য শোধ করা যায়। আপনি শিক্ষিত লোক, আমাদের আসল দাবির কথাটা আশা করি মনে রাখবেন। আমাদের দাবি সর্বাগ্রে।"

কথা কয়টি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিং উঁচাইয়া প্রবেশ করিল ভেড়াটা। চোখোচোখি হইবামাত্র শুদ্ধ ভাষায় বলিল, "সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার রক্ত লইয়াছ। আমার দাবির কথা বিস্মৃত হইও না।" ভেড়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পর আসিল গিনিপিগ্-খরগোশ-পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ডাক্তার অরূপ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। প্রত্যেকেই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষের মতো চলিতেছে। প্রত্যেকের হাতে রক্তবর্ণ পতাকা, তাহাতে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—"আমরা বুকের রক্ত দিয়েছি···" শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন তিনজন বিদেশী। ভাষা শুনিয়া বোঝা গেল ঃ একজন জার্মান, একজন সুইস্ এবং আর একজন ইংরেজ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় বলিলেন, 'আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তোমাকে যদি সরবরাহ না করিতাম, তাহা হইলে কি তুমি রক্ত পরীক্ষা করিতে পারিতে? পাখি-ওলা এবং দীনু মিঞা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থমূল্য দিলেই দাবি শেষ হয় না। ইহার একটা নৈতিক মূল্যও আছে। একটু ভাবিয়া দেখিও। গুড্ বাই ··।"

ডাক্তার অরূপ একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিদেশী তিনজন চলিয়া যাইবার পর যিনি আসিলেন তাহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি অন্য কেহ নন, তাঁহার পূজনীয় শ্বশুরমশায়, যিনি যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর একে একে আসিতে লাগিলেন তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ। পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় হইতে শুরু করিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসাররা পর্যন্ত। ইহারাও কেহ কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একে একে চলিয়া গেলেন। অরূপবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহাদের দাবিও তুচ্ছ করিবার মতো নয়। বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। পর মুহূর্তেই কিন্তু আরও ঘাবড়াইতে হইল। শিক্ষকরা চলিয়া গেলে আসিলেন সেইসব ডাক্তারেরা যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর রোগী সরবরাহ করিয়াছেন। তাঁহারাও মুখে কেহ কিছু বলিলেন না, দুই-একজন ডাক্তার কেবল ভুরু নাচাইলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে অরূপবাবুর কোনও কষ্ট হইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাও তাহার উপার্জনের কিছু অংশ দাবি করেন। ডাক্তাররা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিল,

তাহা অপ্রত্যাশিত এবং রোমাঞ্চকর। অরূপবাবুর মৃত পিতামাতা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরাই তোমাকে জন্মদান করিয়াছি, লালন-পালন করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তোমার উপার্জনে আমরাও কিছু দাবি রাখি।" তাঁহারা অন্তর্হিত হইবার পর যাহা পর পর ঘটিল, তাহা আরও চমকপ্রদ। আরও দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখা দিলেন। এক জোড়া বলিলেন, "আমরা তোমার মাতামহ-মাতামহী।" তাহার পর চারজনেই সমস্বরে বলিলেন, "আমাদের ভুলো না।" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাগম হইল, সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা যেন ভরিয়া গেল। প্র-বৃদ্ধ অতি-বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী মাতামহ-মাতামহীরা আসিয়া নিজ নিজ দাবির কথা বলিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুর মনে হইল উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সকলেই বোধহয় আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কলরব করিলেন, তাহার পর সহসা একযোগে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর দেখা দিল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। অম্লান কুসুমের মতো একদল শিশু। আধো আধো ভাষায় তাহারা বলিল, "আমরা এখনও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের কথাও মনে রেখ। আমাদের জন্যেও কিছু রেখ।" শিশুরা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্জন হইল। তাহার পর কলকণ্ঠের একটা হাসি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই স্খলিতবসনা স্খলিতচরণা এক তরুণীর পিছু পিছু দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল এক তরুণ। তাহারা দুইজনেই ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা দুজনে যদি বিপথে না যেতাম তাহলে কার রক্ত নিয়ে ডব্লিউ. আর করতেন আপনি? সুতরাং আমাদেরও কিছু দাবি আছে, মনে রাখবেন!"—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিয়া গেল।

অরূপকুমার প্রত্যহ এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাত্রে তো বটেই, দিনেও। চোখ বুজিলেই রঙ্গমঞ্চটা চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

শেষে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

পাগলা গারদে বসিয়া দিনরাত চিৎকার করেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই।"

পাগলা-গারদের ডাক্তার দাবি করিয়াছেন, "ডাক্তার অরূপকুমারের রক্ত ডব্লিউ. আর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হউক।"

অরূপকুমার রক্ত দিতে চান নাই। অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রক্ত লওয়া হইয়াছে। ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ধারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া সেদিনও উপবেশন করিলেন। রোজই উপবেশন করেন। বৈকালে রোদটা যখন পড়িয়া আসে, তখন তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁহাকে গঙ্গার ওই স্থানটির দিকে টানিতে থাকে।

স্থানটির যে বিশেষ কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও নয়। হেলিয়া পড়া একটা বটগাছের আড়ালে সামান্য একটু স্থান। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, ময়লা আবর্জনাও আছে। ভাদুড়ী মহাশয় যে স্থানে প্রত্যহ বসেন, কেবল সেই স্থানটি ছোট আসনের মত একটু জায়গা—বেশ পরিচ্ছন্ন। মনে হয় কেহ যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়, ভাদুড়ী মহাশয় রোজ ওই স্থানটিতে বসেন বলিয়া স্থানটি তৃণশূন্য। ভাদুড়ী মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া যখন বসিতে যান তখন ওই তৃণশূন্য স্থানটুকু তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের সঞ্চার করে। একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া ভাবেন, "আমার ছোঁয়াচ লেগে কচি ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেল!" ভাবেন, কিন্তু ঠিক সেই স্থানটিতেই আবার উপবেশন করেন। উপবেশন করিবার পূর্বে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্থানটি একবার ঝাড়িয়া লন। বহুদিন হইতেই এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গভর্ণমেণ্টে চাকুরি করিতেন। ভাল চাকুরিই করিতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করিয়াছেন। যখন চাকুরি করিতেন, তখন তাঁহার মোটর ছিল, আরদালি-চাপরাশি ছিল, মান-সম্ভ্রম ছিল, অনেক লোক ঝুঁকিয়া সেলাম করিত, ভাল ভাল বাড়িতে বাস করিতেন, তিন পুত্র এবং রূপসী পত্নী লইয়া তিনি বহুলোকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই, সব গিয়াছে। বড় ছেলেটি কুসঙ্গে পড়িয়া বহুদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন খবর তিনি আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মেজ ছেলের পত্নীর সহিত তাঁহার পত্নীর বনিবনাও হয় নাই, সে বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এখন মীরাটে চাকরি করে। চিঠি-পত্রও লেখে না। মেজ ছেলের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ঠিক পরেই তিনি রিটায়ার করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তাঁহার এক বন্ধু স্বামিজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কয়েকদিন

স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনিলেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার সহিতও মিলিয়া গেল। ইহাও তাঁহার মনে হইল এতকাল তো সংসারের মোহে আবদ্ধ হইয়া কলুর বলদের মত ঘানি টানিয়াছেন, এখন রিটায়ার করার পরও সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। এইবার পরলোকের চিন্তায় মন দেওয়া উচিত। তাঁহার বন্ধু বিনোদ লস্কর যখন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে আলো দেখিতে পাইয়াছেন, মারোয়াড়ী পূরণমল যখন মন্ত্রের সাহায্যে নিজের আসন হইতে প্রায় এক বিঘৎ উঠিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনিই বা ব্যর্থকাম হইবেন কেন? ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উহাই যদি পথ হয়, তাহা হইলে সে পথে চলিবার যোগ্যতা তাঁহারও নিশ্চয় আছে কিংবা হইবে। বিনোদ লস্কর স্কুলে, কলেজে, চাকুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই তাঁহার তুলনায় হীনপ্রভ ছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং রিটায়ার করার পর তিনি দীক্ষা লইয়া গুরু-প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রহিলেন।

কিছুদিন ইহা লইয়া, আর কিছু না হোক, সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল। নির্জন একটা ঘরে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে ভালই লাগিত। সেই সময়টা অন্তত গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। এই পথে লাগিয়া থাকিলে হয়ত তিনিও ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আলোক-বিন্দু দেখিতে পাইতেন, শূন্যেও হয়ত উঠিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রথমত তাঁহার কৃতী তৃতীয় পুত্রটি হঠাৎ যখন যক্ষ্মারোগে মারা গেল, তখন তিনি সহসা ধর্মেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। কোনও করুণাময় সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার শক্তিই যেন তাঁহার আর রহিল না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন হইতে প্রাণায়াম করিবার সময় বুকের এক পাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, একথা শুনিয়া একজন ডাক্তার তাঁহাকে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গুরু-প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিলেন না। গুরুর সংস্রবও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কারণ রিটায়ার করিয়া কলিকাতার যে বাসাটি ভাড়া করিয়া তিনি ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সে বাসায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে বহুকাল পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতাও রিটায়ার করিবার পর দেশে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের কল্পনা ছিল সুবিধা মত খরিদ্দার পাইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিবেন।

স্থির করিয়াছিলেন কলিকাতাতেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কলিকাতার গৃহস্থালী পাতিয়াছিলেন, সেই পুত্রই যখন বাঁচিল না তখন কলিকাতার সম্বন্ধে আর কোনও মোহ তাঁহার রহিল না। এমনিতেই কলিকাতায় বাস তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। যখন চাকুরি করিতেন, ফাঁকা জায়গায় সুনির্মিত বড় বড় বাড়িতে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইত। সে সব বাড়ির তুলনায় কলিকাতার এঁদো গলির মধ্যে অবস্থিত সঙ্কীর্ণ বাসাটি নরকবৎ। তাছাড়া প্রত্যহ থলি হাতে ভিড় ঠেলিয়া বাজার করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল তাঁহার পক্ষে। এ সব কাজ পূর্বে তাঁহার আরদালিরা করিত। কিন্তু এখন অত বেতন দিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য নাই। নিজেকেই বাজার করিতে হয়। আয় কমিয়া গিয়াছিল, তৃতীয় পুত্রের পড়া তখনও শেষ হয় নাই। তাছাড়া চিররুগ্না গৃহিনীর চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হইত। চাকর রাখিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিত না। পুত্রের জন্যই কষ্ট করিয়া কলিকাতায় ছিলেন, পুত্রই যখন চলিয়া গেল, তখন তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া পূর্বপুরুষদের ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলেন। বাড়িটি পাকা, বেশ প্রশস্ত উঠান। পাশেই একটি পুষ্করিণী। উঠানে তরিতরকারি লাগাইয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, পাড়াপড়শীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া একটা নূতন জীবনের স্বাদ কিছু দিনের জন্য তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। গৃহিনীর স্বাস্থ্য পূর্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বাতের প্রকোপে তিনি সাধারণত শয্যাগতই থাকিতেন, পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহার উপর তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। ডাক্তার থাকেন দুই ক্রোশ দূরে। পদব্রজে গিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হয়। খবর দিবার পরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন না, আসিতে পারেন না। অনেক সময় একদিন, কখনও কখনও দুইদিন পরে আসেন। পোস্টাফিস হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন কিনিয়া কিছুদিন চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোস্টাফিসও কাছে নয়, প্রায় মাইল দুই দূরে। কুইনিন ফুরাইয়া গেলে পোস্টাফিস হইতেও আনা সব সময় হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কম্প দিয়া জ্বর আসিত, পেটে গোলমাল তো ছিলই, তাছাড়া বয়স ক্রমশ বাড়িতেছিল, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং এমন দিনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিল যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখে পড়িয়া আছেন, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবার লোক নাই। পল্লীগ্রামে চাকর বা রাঁধুনী পাওয়া

সহজ নয়, অনেক খোশামোদ করিয়া একটি স্থবিরা ব্রাহ্মণীকে তিনি পাচিকা-রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে-ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িত। একটি বাগ্দী বউ আসিয়া কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি করিত। কিন্তু তাহাকে লইয়াও শান্তি ছিল না। সে যুবতী ছিল, কথায় কথায় ফিক ফিক করিয়া হাসিত, ভাদুড়ী মহাশয়ের সহধর্মিণী সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধ ভাদুড়ী মহাশয় গোপনে গোপনে হয়ত উহার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।

ভাদুড়ী মহাশয় চলৎশক্তিরহিত না হইলে প্রায়ই বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইত। বাহিরে বসিবার স্থান কোথায়? একটু দূরে মিত্র মহাশয়ও আছেন, ভাদুড়ী মহাশয় গেলে তিনি অভ্যর্থনাও করেন, কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয় সেখানে যাইতে চান না। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমান গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনও প্রকার আলোচনা করিতে মিত্র মহাশয় হয় অপারগ না হয় অনিচ্ছুক। ভাদুড়ী মহাশয়ের ওসব ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি মিত্র মহাশয়কে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলেন।

মিত্র মহাশয়কে বাদ দিলে কাছাকাছি আর দুইটি মাত্র বাড়ি বাকি থাকে। কিন্তু সে দুইটিও অগম্য। একটি চৌধুরীদের বাড়ি, সেখানে নানাবয়সের বহু বিধবা বাড়ির বৃদ্ধ চাকর নিতাইচরণের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাড়ির কর্তা কলিকাতার 'চৌধুরী অ্যাণ্ড দাস' নামক লৌহব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্ধ-স্বত্বাধিকারী। তিনি নিজে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, আত্মীয় বিধবাগুলিকে তিনি দেশের বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছু জমি আছে, বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাইচরণের আনুকূল্যে সেই জমি হইতে বৎসরের খাবারটা সংগৃহীত হয়। চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে ত্রিশটি টাকাও নিতাইচরণের নিকট পাঠান। জনশ্রুতি এই ত্রিশ টাকার অংশ লইয়া বারটি বিধবার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। যেদিন পিওন আসিয়া টাকাটি দিয়া যায় তাহার পর তিন চারদিন বাড়িতে নাকি কাক-চিল পর্যন্ত বসিতে সাহস করে না।

দ্বিতীয় বাড়িটি অপুত্রক কেনারাম চক্রবর্তীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শুচি বায়ুগ্রস্ত। স্নান করা, হাত ধোয়া, চতুর্দিকে গোবরজল এবং গঙ্গাজল ছিটানো এই সব লইয়াই থাকেন তাঁহারা। ভাদুড়ী মহাশয় দুই একবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় লোক খারাপ নন,

হাসিমুখেই আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে যদিও কেনারামবাবু মুখে ভদ্রতার চূড়ান্ত করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা অস্বস্তি হইতেছে। তাঁহার চোখের ভাষা অন্যরকম। একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তিনি উঠিয়া আসিবার পরই চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতর হইতে এক বালতি গোবরজল পাঠাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে ভাদুড়ী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেই স্থানটি চক্রবর্তী মহাশয় স্বহস্তে পূর্ণ উদ্যম সহকারে ধুইতে লাগিলেন। ইহার পর ভাদুড়ী মহাশয় আর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই।

সুতরাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাদুড়ী মহাশয় একটু মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কোথাও আশ্রয় নাই। কলিকাতার পার্কগুলির কথা মনে পড়িত, চায়ের দোকানগুলি বিশেষ করিয়া বোস মহাশয়ের ছোট দোকানটির ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবার আর উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। লজ্জার মাথা খাইয়া মেজছেলেকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, মেজছেলে তাহার উত্তরও দিয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি ও মা এখানে চলিয়া আসুন। দেশে কষ্ট করিয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার কি!' তাঁহার স্ত্রী কিন্তু যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি গ্রামে পড়িয়া থাকিবেন তবু পুত্রবধূর হাত তোলা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্বামীর আত্মসম্মানহীনতার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনাও দিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় অনুভব করিলেন তিনি পঁকে অর্থাৎ কর্দমে আটকাইয়া গিয়াছেন এবং এইভাবেই বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। কাটাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, অসুস্থ এবং রুগ্ন স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, এই অজ পাড়াগাঁয়ে বাকী জীবনটা কাটাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কি লইয়া থাকিবেন? মনের কিছু একটা অবলম্বন চাই তো। ধর্মের উপর আর আস্থা ছিল না, সময় পাইলে মাঝে মাঝে বই পড়িতেন, কিছু বই তাঁহার ছিল। কিন্তু কতক্ষণ বই পড়া যায়? সর্বাপেক্ষা মুস্কিল হইত বিকাল বেলাটা। যখন চাকুরী করিতেন, ক্লাবের মেম্বর ছিলেন, টেনিস খেলিতেন, ব্রিজ খেলিতেন, সময় কাটাইবার কত উপায় ছিল। কিন্তু এই গ্রামে ক্লাব দূরের কথা, পোস্টাফিস নাই, রেলওয়ে স্টেশন নাই। গঙ্গার ওপারে স্টেশন। সেখানে নামিয়া নৌকাযোগে এখানে আসিতে হয়।

ভাদুড়ী মহাশয় অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন ওই স্থানটুকু ছাড়া গ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিবার আর কোন স্থান নাই।

এদিক-ওদিক চাহিয়া হেলিয়া-পড়া বটগাছটার নীচে ওই স্থানটুকু তিনি আবিষ্কার করিলেন। গঙ্গাতীরে ওই স্থানটুকু যে তাহার সমস্যার সমাধান করিবে একথা অবশ্য তিনি কল্পনা করেন নাই। কিন্তু বসিবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন—ঠিক কি যে অনুভব করিলেন তাহা বর্ণনা করা শক্ত—তবে একটা অননুভূতপূর্ব আরাম যেন তাঁহার সত্তাকে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা সোজা গিয়া উত্তর আকাশে মিশিয়াছে, বামে পশ্চিম আকাশের মেঘমালায় অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণমালা, সে বর্ণের আভা গঙ্গার বুকে এবং উত্তর আকাশের স্তূপীকৃত মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গা চিরকালই বহিতেছে, আকাশে মেঘের আবির্ভাবও কোনও নূতন ঘটনা নহে, কিন্তু সেদিন তাঁহার চক্ষে সবই যেন বড় নূতন ঠেকিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতে রোজই তিনি ওই স্থানটিতে গিয়া বসেন। গত দশ বছর হইতে প্রত্যহ বসিতেছেন। প্রতিদিন ওই উত্তর আকাশে নূতন ছবি দেখিতে পান। কোনদিন মেঘ থাকে, কোনদিন থাকে না। যে দিন থাকে সেদিন নূতন ধরনে থাকে, কখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। রোজই নূতন ছবি, সে ছবিও চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকে। পশ্চিম আকাশেও ঠিক তাই। প্রতিদিনে নূতন ঢং নূতন দৃশ্য। গঙ্গার তরঙ্গমালাও যেন প্রতিদিন নূতন রূপে সাজিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বৈকালের এই সময়টুকুর জন্য ভাদুড়ী মহাশয় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, এই সময়টুকুও যেন অভিনব সাজে সাজিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে। এই দশ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মেজছেলেটিও আর নাই, প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সে সপরিবারে মারা গিয়াছে। যে স্থবিরা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত, সে বহুপূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছে। বাগ্‌দী মেয়েটি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী মহাশয় এখন সম্পূর্ণ একা—একবেলা স্বপাক খান। রান্নার আয়োজন করিতে সকালটুকু কাটিয়া যায়। আহার করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করেন, তাহার পর গঙ্গার ধারের ওই স্থানটুকুতে গিয়া বসেন।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন ভাদুড়ী মহাশয় আহারাদির পর একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস পাঠ করিলেন—'যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, যখন পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আকাশও ছিল

না, তখন কি ছিল ? তখন কে সেই মহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলেন ? যখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না, দিবারাত্রির বিভেদ যখন ছিল না, তখন সেই নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সেই মহাশূন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিই স্পন্দিত হইতেছিলেন। তিনিই কালক্রমে তেজোরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমে আবির্ভূত হইল কামনা '

এই ধরনের অনেক কথা ছিল। পড়িতে পড়িতে ভাদুড়ী মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে বসিয়া কথাগুলি পুনরায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাশূন্যের মধ্যেই সৃষ্টি-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার জীবনও তো এখন মহাশূন্যে, সে শূন্যতার মধ্যে কোনও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে কি ? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখে একটা তিক্ত অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর আকাশের মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তর আকাশে কিছু দুগ্ধ-শুভ্র স্তূপ-মেঘ একধারে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল খানিকটা মেঘ আকাশ হইতে খুলিয়া গিয়া যেন তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। একটু পরেই অবশ্য তাঁহার ভুল ভাঙিল। মেঘ নয়, নৌকার পাল। নৌকাটির দিকেই তিনি চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নৌকাটি খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটের ঘাটেই ভিড়িল। নৌকায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পাশেই একটি সুন্দরী মহিলা। চার পাঁচটি নানা বয়সের ছেলেমেয়েও রহিয়াছে।

ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া ভাদুড়ী মহাশয়কেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতে পারেন হরনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি কোনটা ?"

"কেন—তাঁর বাড়ি খুঁজছেন কেন আপনি ?"

"আমি তাঁর বড় ছেলে। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। অনেকদিন পরে ফিরেছি। কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন বাবা এখানেই আছেন।"

"কে, নবু ?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে ভাদুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমার পিতাকে সত্যই চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর হঠাৎ পারিলেন এবং আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"এরা কে ?"

"আমি রেঙ্গুনে বিয়ে করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে এসেছি।"

সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সবাই আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শূন্য জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ণ হইয়া গেল।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রৌঢ় ভবানন্দ সেন নিজের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার ব্রহ্মচারী তখন সবে তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধ বাজারে তখনও চালু হয় নাই। ভবানন্দ সেনের কালাজ্বর হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মচারীই চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, ভবানন্দের পুত্র শ্যামানন্দ মেডিকেল কলেজে পড়িত, সুতরাং ছোট বড় মাঝারি আরও কয়েকজন ডাক্তারও জুটিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফলই হইতেছিল না। সকলে হিম-সিম খাইতেছিলেন মাত্র। কুইনাইন এবং আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে গোপনে গোপনে চলিতেছিল হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজি পাঁচন। বাংলা দেশের অনেকেই সময়নিষ্ঠ নহেন, জ্বর কিন্তু এক মিনিটও দেরী করে না। ঠিক যথাসময়ে আসে। ভবানন্দের বেলাতেও ইহার অন্যথা হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া জ্বর প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিল। ভবানন্দ-গৃহিণী তখন অনন্যোপায় হইয়া কুল-পুরোহিত কালিকানন্দ শর্মাকে খবর দিলেন।

তিনি আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন চণ্ডীপাঠের এবং কালীপূজার। তাহাও চলিতে লাগিল।

ডাক্তাররা সকলেই একটি কথা বরাবর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সাবধান পেট যেন না খারাপ হয়। পেট ভাঙিলেই সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কালাজ্বর রোগীরা সাধারণত খুব লোভী হয়, কুপথ্য করার দিকেই তাহাদের ঝোঁক বেশী। এ বিষয়ে যেন একটু কড়া নজর রাখা হয়। পুত্র শ্যামানন্দ এবং গৃহিণী মৃন্ময়ী সর্বতোভাবে মনোযোগী হইলেন এ বিষয়ে। বাড়িতে মশলা কেনাই বন্ধ হইয়া গেল। মৌরলা মাছ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মাছও আর তাঁহারা কিনিতে সাহস করিল না। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন পেটের গোলমাল দেখা দিল।

ডাক্তাররা আসিয়া মৃন্ময়ীকে জেরা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বলিলেন দশ বৎসরের পুরাতন চাউল এবং মৌরলা মাছের মশলাহীন ঝোলের অপেক্ষা গুরুতর কোনও পথ্য স্বামীকে তিনি দেন না।

একজন ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "দুধ কতটা খাচ্ছেন ?"

"দু-বেলায় তিন পোয়া।"

"জল মিশিয়ে দেন তো!"

"না, জল মেশাই না। কোলকাতার দুধে এমনিই তো জল অনেক থাকে।"

"না জল মিশিয়ে দেবেন।"

জল মিশাইতে গিয়া মৃন্ময়ী অনুভব করিলেন যে জল মিশাইলে দুধের রং-ও বজায় থাকিবে না। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করিতে তিনি সাহস করিলেন না।

পেটের গোলমাল কিন্তু যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। জ্বরও। ভবানন্দ দেখিলেন ডাক্তাররা তাঁহার খাবার ছাড়া আর কিছুই কমাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ তিনি মরীয়া হইয়া উঠিলেন। মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এরা আমাকে না খেতে দিয়েই মেরে ফেলবে দেখছি। এদের কথা আমি আর শুনব না। আমি আজ রাত্রে আর বার্লি খাব না, লুচি খাব!"

"লুচি ?"

"হ্যাঁ, গরম ফুলকো লুচি খেলে পেটটা ধ'রে যেতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে।"

"কিন্তু শামু এসে যদি শোনে আমি তোমাকে লুচি দিয়েছি তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে সে।"

"তাকে শোনাবার দরকার কি। সে তো সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। তার আগেই আমি খেয়ে নেব।"

"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে ?"

"খুব ঠিক হবে, আমি যা বলছি তাই কর। বেশী নয়, গোটা পাঁচ ছয় লুচি বেগুন-ভাজা দিয়ে খাব। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আমার ইচ্ছায় আর তোমরা বাধা দিও না।"

মৃন্ময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি লুচি ভাজিবারই আয়োজন করিতে গেলেন।

...উনুনের কাছেই ভবানন্দ খাইতে বসিয়াছিলেন। সবে একখানি মাত্র লুচি থালার উপর দেওয়া হইয়াছে, অত্যন্ত গরম বলিয়া ভবানন্দ সেটি তখনও ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এমন সময় পুত্র শ্যামানন্দ আসিয়া উপস্থিত।

"এ কি!"

"উনি লুচি খাবেন বলে জেদ ধরেছেন"—মৃন্ময়ী বলিলেন।

"ডাক্তাররা বার্লি দিতে বলেছে, তুমি লুচি দিচ্ছ?"

"আমি কি করব বাবা! ওঁকে বল।"

ভবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি লুচি খাবই। তোমার ও ডাক্তারেরা গবেট্, কিচ্ছু জানে না।"

"না, লুচি খাওয়া হবে না।"

"আমি খাবই"—ভবানন্দ গর্জন করিয়া উঠিলেন। শ্যামানন্দ তর্ক না করিয়া লুচি সুদ্ধ থালাটা তুলিয়া লইল। ভবানন্দ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে জলস্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে ভবানন্দ পাটনা-প্রবাসী ভ্রাতা পরমানন্দকে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিলেন।

কল্যাণবরেষু,

কিছু টাকার জন্য ইতিপূর্বে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহার কোনও উত্তর পর্যন্ত দিলে না। এখানে জলের মতো অর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু অসুখের কোনও উপশম নাই। মনে হইতেছে আর বেশী দিন বাঁচিব না। তোমার বউদিদি এবং শামুও আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হাতী কাদায় পড়িলে ব্যাঙেও তাহাকে লাথি মারে। তুমি যদি আমাকে শেষ দেখা দেখিতে চাও, এই পত্রকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। হাতে পয়সা থাকিলে টেলিগ্রামই করিতাম, কিন্তু পয়সা তোমার বউদির কাছে থাকে। চাহিলে দেয় না। তাহার ধারণা হাতে পয়সা পাইলে আমি কুপথ্য কিনিয়া খাইব। এখন মরাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে। সাক্ষাতে সব কথাই বলিব। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
ভবানন্দ সেন

পরমানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি শ্যামসুন্দরেরও।

"আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমরা বাবাকে আর সামলাতে পাচ্ছি না।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে পরমানন্দ উত্তর দিলেন, "ভয় কি সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্যামানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কি যে পরামর্শ করিলেন তাহা মৃন্ময়ী টের পাইলেন না। দ্বারে কান দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু শুনিতে পান নাই।··

···বেলা তিনটার সময় পরমানন্দ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে ট্রেনে না কি ঘুম হয় নাই।

মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিলেন, "চা করে দেব ঠাকুরপো?"

"না। দাদাকে নিয়ে এখুনি একবার বেরুব। আমার পরিচিত একটি ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেক কালাজ্বর রোগী তিনি আরাম করেছেন শুনেছি।"

"তাঁকে বাড়িতেই 'কল' দাও না। তোমার দাদা কি যেতে পারবেন?"

"তিনি 'কল' দিলে আসেন না। তাঁর বাড়িতে যেতে হয়। আমরা গাড়ি করে যাব। তুমি চাকরটাকে বল একটা রিক্শা ডেকে দিক।"

"এই পাড়াতেই একটা রিকশা-ওলা থাকে, চেনা-শোনা লোক। মোহন দেখ তো চামরু যদি থাকে তাকে ডেকে আন!"

চামরুর রিক্শাতে আরোহণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে দুই ভাই রিক্শাতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ফিরিলেন ঘণ্টা দুই পরে।

শ্যামানন্দও তখন কলেজ হইতে ফিরিয়াছিল। সে খুড়ামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"সে তুই চিনবি না, আমার এক গুরু ভাই। বেলেঘাটায় থাকে।"

রাত্রে শুইবার সময় পরমানন্দ লক্ষ্য করিলেন টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া ভবানন্দ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। 'বাল্ব'টা হঠাৎ ফিউজড হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ না পড়িলে ভবানন্দের ঘুম আসে না। মোমবাতির কাছে মশারিটা বাতাসে দুলিতেছে। পরমানন্দের আশঙ্কা হইতে লাগিল মশারিতে আগুন ধরিয়া গেলেই মুশকিল!···এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"পর্মা, ওরে পর্মা।"

ভবানন্দের কাতর ডাকে পরমানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মশারির ভিতর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখ

ধাঁধাইয়া দিল। ভবানন্দের পাশেই যে বাথরুম এবং তাহাতে যে একটি বেশী শক্তিশালী 'বালব' লাগানো আছে তাহা পরমানন্দ জানিতেন না। তিনি মশারির ভিতর বসিয়াই পট পট করিয়া নিজের মশারির দড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পরই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ইহাই একটু পরেই গুরুভার পতনের শব্দে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল আপাদমস্তক মশারি জড়াইয়া পরমানন্দ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর চোট লাগিয়াছে।

ভবানন্দ ক্ষীণকণ্ঠে বাথরুম হইতে বলিলেন, "শামু এখানে আয়। আমি উঠতে পাচ্ছি না। জলের মতো পায়খানা হয়ে যাচ্ছে খালি।"

শামু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়কে লইয়া মেডিকেল কলেজে চলিয়া গেল।

পরদিন রিক্‌শা-চালক চামরু বলিল, উঁহারা কোন ডাক্তারের কাছে যান নাই, একটি খাবারের দোকানে বসিয়া লুচি, বুটের ডাল, আলুর দম এবং রাজভোগ খাইয়াছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখনও উল্লেখ করি নাই। ভবানন্দ সেন একজন প্রবীণ ডাক্তার এবং পরমানন্দ সেন প্রবীণ শিক্ষক।

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে।"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্ত নৌকা পাঠাইলাম। ইতি—

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রপাঠ অভব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উহার খাতকও নহি, কর্মচারিও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙাইয়া নিজের মহিমা-পতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্রনারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুস আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'—এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার দুশমনের মত চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তার বাবু। আসুন বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয়নি।"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একেবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।" তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। "পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি?"

"একটা খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকীল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম।"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার, মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার।"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, নবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু'একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে যাব। আপনাদের এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি।"

"শুনুন আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।" বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই।"

"কেন, হঠাৎ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি এমন সময় ধাববান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসার সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি?"

গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

"আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।"

"পাগল না কি! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য! টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিলিভ সার্জনের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না, প্লীজ।"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

বন্য মহিষ

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

...ঘড়িতে টং করে যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারা জীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা।"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাট্‌কা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্স্ট ক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে ফেল দিকি মাছগুলোর—!"

"এখন, এত রাত্রে? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায়!"

মায়া বলল—"আমি সব করে দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে! যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিল-দরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয় লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে! আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ' দুই টাকা ধার করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তারবাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তারবাবুকে নিজের অর্থ কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক।"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশ পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে।"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও ত কখনও আসেনি।"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে।"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসেনি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলি গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে ?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সেই ওকে পৌছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে হেদো পর্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ্ করে উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে পড়ল, কিন্তু চড়তে পারতেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভীড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে—হ'তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে।"

রাত দশটা পর্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্মে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হল এবার ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে অনেকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্‌সায় চড়ে গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্‌সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন।"

রিকসা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্‌সাওয়ালা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না।"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে রইল। তার মনে হল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন।"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"

"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিক্‌সাওয়ালা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা?"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পূর্ণিয়া জেলায়।"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়।"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিক্‌সাওলাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, 'সরকার বাই লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।" জগুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই-লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন নীলমণিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্বাদে মাছের ব্যবসা করে ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে? কোন্ ডাক্তার দেখছে?"

"ডাক্তার এস. কে. মিত্র।"

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে? মেয়ে? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয়নি দেখছি।

সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন।"

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ'ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে জন দুই কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, "দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো? খদ্দরধারী দুটি ছোকরা।"

"তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

"চলুন।"

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ'ল এবং জেলে মৃত্যু হল।

পাচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

"চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল! আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয়নি।"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা, আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্তে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিষ্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—"ও তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে! তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস।" খুব আদর-যত্ন করলেন। তারপর বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

স্থলোচনা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় যে গুণী লোক এর একটা অকাট্য প্রমাণ আমি এসেই পেয়েছিলাম। আমার এক মাস্টার মশাই আমাকে বলেছিলেন যদি কোনও শহরে গিয়ে কোনও লোকের নামে নিন্দা শোন, তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে আলাপ কোরো, জেনো লোকটির মধ্যে বস্তু আছে কিছু। বাঙালী জাতটা সমঝদার জাত, শ্রী-র স্বরূপ চিনতে দেরি হয় না তাদের, কিন্তু সেই শ্রী পর-শ্রী হলে বেচারারা কাতর হয়ে পড়ে একটু। কিন্তু তা সত্বেও তাকে মর্যাদা দেয় খুব, সেলামই করে, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে। বাঙালীর মুখনিঃসৃত নিন্দাটা প্রশংসারই নামান্তর যেন। বাজে লোকের নিন্দা তারা করে না। মাস্টার মশাই-এর এ উপদেশটা যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছি।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ করা অবশ্য শক্ত একটু। তিনি থাকেন শহর থেকে বেশ একটু দূরে। তাঁর বাড়ির সিংহ দরজাটি লৌহনির্মিত এবং সেটি প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে। সেটি খুলতে হলে গলার বেশ জোর থাকা চাই। কারণ যে ভৃত্য সেটি খোলে সম্ভবত সে একটু বধির, থাকেও সে বাড়ির ভিতর দিকে। উচ্চকণ্ঠে অনেক ডাকাডাকি না করলে তাকে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করা যায় না। তাছাড়া কুকুর আছে একটি, সেটি আবার কর্তব্য বিষয়ে একটু বেশী সচেতন। গেটের কাছে কেউ এসে দাঁড়ালেই হল, তার দাঁড়ানোর সন্তোষজনক

হেতুনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত সে তারস্বরে চীৎকার করে। সম্ভবত তার চীৎকারেই নীলকণ্ঠবাবুর অর্ধবধির দ্বারপাল বুঝতে পারে যে কেউ এসেছে।

এত রকম বাধা থাকা সত্ত্বেও নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল ভদ্রলোককে। সাহিত্যবিষয়ে দু'চারটি মাত্র কথা বলেছিলেন। একটি কথা এখনও মনে আছে।

বলেছিলেন, "বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি?"

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। "কি ধরনের বেকার সমস্যা! আমাদের দেশে সাহিত্যিক মাত্রেই বোধহয় বেকার।"

"না, তা ঠিক নয়। যাঁরা কোনরকম সার্থক সৃষ্টি করেন না, অথচ যাঁরা লেখেন হয় পেটের দায়ে, না হয় মানসিক কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য তাঁদেরই আমি বেকার বলছি। এঁরা প্রায়ই দেখবেন সমালোচক হন। এঁদের চেহারা দেখিনি কারও, কিন্তু আমার মনে হয় এঁরা সকলেই বোধহয় রোগা। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে এঁরা যে-রকম ভাবনা ভাবেন, তাতে মনে হয় রাত্রে ঘুমই হয় না হয়তো অনেকের। বাংলাসাহিত্যের এই গার্জেনদের জটিল ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলো পড়লেই বুঝতে পারি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনেও বেকারের দল ভীড় করছে। ওদের প্রবন্ধ পড়লে আমার একজনকে মনে পড়ে।" বলে তিনি স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, 'মনে পড়ে নিধু পাগলাকে। নিধু পাগলা গাছেদের লক্ষ্য ক'রে হাত-পা নেড়ে ক্রমাগত উপদেশ দিত। একবার দেখেছিলাম একটা ফলন্ত কাঁঠাল গাছকে লক্ষ্য করে নিধু বলছে—একটিও কাঁঠাল ভাল হয়নি বাপু তোমার। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়, যাক আর গুণে সময় নষ্ট করতে চাই না, অনেক কাঁঠাল ফলিয়েছ মানছি, কিন্তু একটিও ভাল ফল হয়নি। আমাদের অনেক সমালোচকদের সেই দশা। এঁদের কেউ মানে না কিন্তু এঁরা সব মোড়ল সেজে বসেছেন।"

গুরুগম্ভীর সমালোচকদের তিনি নিধু পাগলার সঙ্গে তুলনা করলেন শুনে বেশ মজা লেগেছিল সেদিন। লোকটিকে কিন্তু আরও ভাল লেগেছিল। আমি যখন গেলাম তখন তিনি খুব ধূমধাম ক'রে ঘরে ধুনো দিচ্ছিলেন। চতুর্দিক গন্ধে ও ধূমে পরিপূর্ণ। বড় বড় চারটে পেতলের ধুনুচিতে জ্বলছিল ধুনো, গুগ্‌গুল, অগুরু আর চন্দন, কিছুদূরে বনবন ক'রে ঘুরছিল বড় ইলেকট্রিক ফ্যান একখানা, দেখে মনে হল ধুনুচির আগুন যাতে নিবে না যায় তাই এই ব্যবস্থা।

লোকটি প্রৌঢ়, ঈষৎ স্থূলকায়। মুখে কিন্তু শিশুর সারল্য। মন মনে হল আরও কচি।

আমাকে বললেন, "কিসমিস খাবেন? অনেকদিন কিসমিস খাইনি, তাই কিছু আনিয়েছিলাম কাল।" নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পরেই একটা শাদা পাথরের রেকাবি ক'রে প্রচুর কিসমিস এনে বললেন, "খান। একটু গোলাপ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। গোলাপ জলের গন্ধ ভাল লাগে তো আপনার। এই সবই হল আসল কাব্য! আসুন।"

প্রচুর কিসমিস খেয়েছিলাম সেদিন।

"আসুন, আর একটা মজার জিনিস দেখাই আপনাকে। টবের উপর ওটা কি বলুন তো, চেনেন?"

দেখলাম লতা একটা, ঠিক চিনতে পারলাম না। একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলাম।

"অপ্রস্তুত হবার দরকার নেই। এদেশে কেউ কিছু চেনে না। আমিও চিনতাম না কিছুদিন আগে। ওটা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু এখন আর লজ্জা নেই, বেহায়া হয়ে গেছে, ছুঁয়ে দেখুন।"

ছুঁয়ে দেখলাম, বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

"আগে ছোঁওয়ামাত্র পাতাগুলো মুড়ে যেত। এখন ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে লজ্জাহীনা করে তুলেছি ওকে।"

কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর একটু হেসে একটু শিস্ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেওয়ালের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন। দেখলাম সবুজ পোকা একটা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চেনেন ওটাকে?"

"না।"

"কাচপোকা। আমার স্ত্রীর খুব সখ ছিল কাচপোকার টিপ পরবার। অনেক টিপ পরিয়েছি তাকে। সে এখন নেই, পোকাগুলোকে দেখলে তার কথা মনে পড়ে। ভাবি ভাগ্যে তার টিপ পরার সখ ছিল তাই পোকাগুলো আর পোকা নেই, সবুজ স্মৃতি হয়ে গেছে আমার চোখে।"

আরও হয়তো আলাপ চলত কিছুক্ষণ। কিন্তু একটা ছোঁড়া চাকর এসে বললে, "খোকাবাবু ডাকছে আপনাকে ওপরে।"

"এই রে মাটি করেছে! আপনি এসেছেন টের পেয়ে গেছে বোধহয়। আমার কাছে কোনও লোক আসে, এটা ও পছন্দ করে না। আচ্ছা, চললুম।"

নমস্কার করে দ্রুতপদে চলে গেলেন। মনে হল মনিবের ডাকে চাকর ছুটে গেল বুঝি।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলকণ্ঠবাবুকে দেখে সেদিন। এত বড় বিদ্বান লোক, ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন কাটিয়েছেন, ফরাসী, জার্মাণী, ইংরেজী ভাষায় ভাল ভাল বইও রচনা করেছেন অনেক—লোকটি কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ যেন।

ওঁর নিন্দায় কিন্তু সকলেই শতমুখ। লোকটি নাকি অহঙ্কারী, স্বভাব-চরিত্রও নাকি ভাল নয়, ওঁর বইও নাকি ওঁর লেখা নয়, বিদেশে কোন মেমসাহেবের প্রেমে পড়েছিলেন, সেই নাকি সব বই ওঁর নামে লিখে দিয়েছিল, বড়লোকের ছেলে বলেই সব মানিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক রকম কথাই ওঁর বিরুদ্ধে শুনেছিলাম। ওঁর ছেলেটি এম-এ'তে ফার্স্ট হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলত তা-ও নাকি অনেক রকম তদ্বির করার ফলে হয়েছে। টাকা ঢাললে সবই সম্ভব আজকাল।

যাই হোক যে প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর নামটা মনে পড়ল, সেই প্রসঙ্গটা এবার বলি। শহরে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরী ছিল। ছেলে-ছোকরাদের শখ হল সেই লাইব্রেরিতে একটি বাংলাসাহিত্য সভা স্থাপন করবার। আমাদের শখ আছে—কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। শখ মেটাবার জন্যেও ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, ঘুরেও সব সময় আশানুরূপ অর্থ জোটে না। একজন উপদেশ দিলেন, 'এখন যে নূতন কমিশনার সাহেব এসেছেন (তখনও আমরা স্বাধীনতা পাইনি) তিনি একজন সাহিত্যমোদী ব্যক্তি, তিনি ইচ্ছে করলে গবর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে কিছু সাহায্য করতে পারেন।' কয়েকজন মিলে কমিশনার সাহেবের কাছে গেলেন। কমিশনার সব শুনে বললেন, "শুনেছি নীলকণ্ঠ ব্যানার্জি এখানে থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তাম। তিনি যদি তোমাদের সভার ভার নেন তাহলে আমি শ'পাঁচেক টাকা দেব তোমাদের।"

নীলকণ্ঠ ব্যানার্জির উপর কেউ প্রসন্ন নন, কিন্তু স্বয়ং কমিশনার যখন তাঁর উপর প্রসন্ন তখন আর কথা কি। লোকটাকে দলে টানলে যদি শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি! তাকেই না হয় সাহিত্যসভার সভাপতিই করে দেওয়া যাক। উপায় কি তাছাড়া। কথা ছিল শহরের একজন বড় উকিলকে সভাপতি করা হবে। তিনি নগদ পাঁচ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। কেবল মাসিকপত্রের পাতা

উল্টে সাহিত্যিক হতে চান যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন উক্ত উকিলকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে নিজেই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ওই অহঙ্কারী লোকটারই দ্বারস্থ হতে হল শেষকালে সবাইকে।

নীলকণ্ঠবাবু রাজি হলেন না। বললেন, "আমি নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি যেতে পারব না। আমাকে মাপ করুন আপনারা। যদি কিছু চাঁদা চান, দিয়ে দিচ্ছি।"

লোকটার স্পর্ধা দেখে মনে মনে সবাই জ্বলে গেলেন কিন্তু মুখে খোশামোদ করে যেতে হল। প্রথমত কমিশনার সাহেব, দ্বিতীয়ত পাঁচশ টাকা। কমিশনার সাহেবের একজন ক্লার্ক (যাঁর পাকা মাথা থেকে বিলেতের মেমসাহেবের কাহিনীটা বেরিয়েছিল) গললগ্নীকৃতবাসে শেষকালে বলে বসলেন, "আপনি যদি এ সভায় না যোগ দেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে। সাহেব যখন গোঁ ধরেছে তখন আর উপায় নেই। আপনি না গেলে একটি পয়সা তো দেবেই না আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। আপনি দয়া করুন। অন্তত যেদিন সভার উদ্বোধন হবে সেদিনটি আপনি সভাপতি হোন।"

নীলকণ্ঠবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। সভার দিন স্থির হল। নীলকণ্ঠবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ঠিক পাঁচটার সময় সভায় উপস্থিত হবেন।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তবু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই।

সভায় লোক গিসগিস করছে, মাঝে মাঝে হাত-তালি, শিস-দেওয়া যথারীতি চলছে, কলরবে চীৎকারে কান পাতবার উপায় নেই, সভার উদ্যোক্তারা এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করছেন কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই। কাছে-পিঠে বাড়ি হলে কেউ ডাকতে যেত, কিন্তু তাঁর বাড়ি শহর থেকে বেশ দূরে, তাছাড়া তাঁর লোহার গেট, কালা চাকর আর কুকুরের কথা ভেবে যেতেও উৎসাহ হচ্ছিল না কারো, একটা বাইক জোগাড় করে আমিই যাব ভাবছিলাম এমন সময় তাঁর মোটরটা দেখা গেল।

সভায় যথারীতি সম্বর্ধনা-সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি, গীত-বিতান হারমোনিয়মের উপর রেখে নাকিসুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একে একে হল। সভাপতি তাঁর ভাষণে শেষকালে বললেন যে, সভায় ঠিক সময় আসতে পারেননি বলে তিনি দুঃখিত। তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি কিছুদিন ছিলেন, তিনি হঠাৎ চলে গেলেন, তাঁর বিদায়কালীন ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিলম্ব

হয়ে গেল একটু। সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর জানা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটি ঠিক সাড়ে চারটের সময় হার্টফেল করে মারা গেছে। সে নাকি অনেকদিন থেকে হৃদ্‌রোগে ভুগছিল।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে

উমাশঙ্করবাবু বিনয়কে যখন দেখিয়াছিলেন তখন তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা ছিল না। বিনয় ট্রেনের একটি কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছিল, উমাশঙ্করের বন্ধু তিনকড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, "যে ছেলেটির কথা তোমাকে বলছিলাম ওই দেখ সেই ছেলেটি। চমৎকার দেখতে নয়?"

তিনকড়িও বিনয়কে ভাল করিয়া চিনিতেন না। তিনিও তাঁহার বন্ধু হরপ্রসাদের নিকট সন্ধানটি পাইয়াছিলেন এবং কলিকাতার ট্রামে তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। দৈবাৎ আজ ট্রেনে আবার তিনি বিনয়কে দেখিতে পাইলেন এবং উমাশঙ্করকে দেখাইয়া দিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত উমাশঙ্করের কন্যা প্রতিমার জন্য তিনি সৎপাত্রের খোঁজে ছিলেন। হরপ্রসাদ তাঁহাকে বিনয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন।

উমাশঙ্কর এবং তিনকড়ি স্টেশনে আসিয়াছিলেন অন্য প্রয়োজনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিনয়ের দেখা পাওয়া গেল। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। উমাশঙ্করের খুব পছন্দ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার (শুদ্ধ বাংলায় যাহাকে পর্যবেক্ষণ করা বলে) সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রেন ছাড়িয়া গেল। উমাশঙ্করবাবু ইহার পরেও বিনয়কে দেখিবার সুযোগ পান নাই। বিনয় থাকে বেরিলিতে, উমাশঙ্করবাবু থাকেন বর্ধমানে। বিনয়কে দেখিতে হইলে অনেকগুলি গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। প্রয়োজন বুঝিলে উমাশঙ্করবাবু হয়তো তাহা করিতেন, কিন্তু তিনি প্রয়োজনই বোধ করিলেন না। পাত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিবার জন্য কেহই বিশেষ ব্যগ্র হয় না, পাত্রী হইলে বরং কথা ছিল। সুতরাং বিনয়কে ট্রেনের কামরায় একনজর দেখিয়াই উমাশঙ্কর সন্তুষ্ট রহিলেন।

বিবাহের কথাবার্তা কিন্তু চলিতে লাগিল। তিনকড়ির সঙ্গেই একদা উমাশঙ্কর

কলিকাতানিবাসী হরপ্রসাদের দ্বারস্থ হইলেন। হরপ্রসাদ বলিলেন, "বিনয়ের বাবাকে আমি চিনতাম। এক আপিসেই আমরা কাজ করতাম সিমলায়। তিনি অবশ্য মারা গেছেন, বিনয়ের মা-ও নেই। কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে ওদের, ছেলেটিও ভালো। বিয়ের মালিক ও নিজেই। লিখে দেখি ও যদি রাজী হয়। আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন তো ?"

"দেখেছি, খুব পছন্দ হয়েছে আমার।"

"ওর আর একটা ঝোঁক আছে। ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়ে লেখাপড়া করেছে কতদূর ?"

"বি-এ পাশ করেছে। বাংলায় এম-এ পড়ছে।"

"বাঃ, তাহলে তো ভালই। আমি তাকে চিঠি লিখছি, আপনিও লিখুন, ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে। ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন তো ভাল করে, না দেখে থাকেন তো গিয়ে দেখে আসুন।"

"না, আর দেখবার দরকার নেই, যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট।"

"তাহলে বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠি লিখুন, আমিও লিখছি, আমার মনে হয় হয়ে যাবে। বিনয় আদর্শবাদী ছেলে, পণ টন-ও আপনার লাগবে না তেমন।"

হরপ্রসাদ আসল কথাটি জানিতেন, কিন্তু ভাঙিলেন না। বন্ধুপুত্র বিনয়ের একটি ভালো বিবাহ দিবার জন্য তিনিও বহুদিন হইতে চেষ্টিত ছিলেন।

…চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। বিনয়ের পত্র পাইয়া উমাশঙ্কর অবাক হইয়া গেলেন। এ যুগে এমনটা হওয়া যে সম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। বিনয় মেয়ে পর্যন্ত দেখিতে চাহিল না। লিখিয়াছে 'আপনার কন্যা বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে গেলে সে হয়তো অপমানিত বোধ করিবে। ভাবী বধূকে অপমান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি তো লিখিয়াছেনই মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী, ইহার পর মেয়ে দেখিতে যাওয়ার অর্থ আপনাকে অবিশ্বাস করা। তাহা করা কি উচিত ? এই সব ভাবিয়া স্থির করিলাম মেয়ে দেখিতে যাইব না।'

উমাশঙ্কর অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সত্যই এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আশা হইল এতদিনে বোধহয় মেয়েটার সদ্গতি হইবে। একমাত্র মেয়ে, উমাশঙ্করের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ নয়, তবু তিনি কন্যার জন্য সৎপাত্র জুটাইতে পারেন নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের আমোল, স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগ চলিতেছে, বাঙলার নব জাগ্রত যৌবনকে নিষ্পিষ্ট

করিয়া দিবার জন্ত প্রতাপশালী ইংরেজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি যুবক-যুবতীর পিছনে স্পাই ঘুরিতেছে। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন, অথবা যাঁহারা ইংরেজের পদলেহী তাঁহারা বোমারুদের সংশ্রব যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন, সুযোগ পাইলে কেহ কেহ আবার তাহাদের ধরাইয়াও দেন। তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একদল লোকও অবশ্য ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি করিতেন, কেহ কেহ সাহায্যও করিতেন। উমাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের লোক। গোপনে গোপনে তিনি বোমারুদের অর্থ সাহায্য করিতেন, মাঝে মাঝে দুই একজন পলাতক বোমারুকে আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহীন কন্যা নন্দিনীরও অনুরূপ মনোভাব ছিল, শোনা যায় বাক্সের ভিতর সে ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন, উল্লাসকরের ছবিও নাকি লুকাইয়া রাখিত। ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা থাকে নাই, অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে উমাশঙ্কর বোমারুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। চাকুরিয়া এবং পদলেহীরা তাঁহাকে তাই এড়াইয়া চলিত। কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করাও তাই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সম্প্রদায় হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করেন, সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরিজীবী। তাহারা যেই শুনিল যে উমাশঙ্করবাবুর সহিত টেরারিস্টদের সম্পর্ক আছে, অমনি তাহারা পিছাইয়া গেল। ওই বাড়ীতে বিবাহ দিয়া কে পুলিশের কবলে পড়িতে যাইবে! পিতৃনাম স্মরণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশঙ্করবাবু সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ির সহায়তায় বিনয়ের নাগাল পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিনয় নামটাও তাঁহার খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিপ্লবীদের ইতিহাসে 'বিনয়' নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বলা বাহুল্য, নন্দিনীও মনে মনে খুব খুসী হইয়াছিল। বিনয়ের চিঠি পড়িয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। উমাশঙ্করবাবু তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উত্তীর্ণ হইলেন।

স্বর্গ হইতে কিন্তু পতন হইল। বিবাহের দিন বিনয় যখন ট্রেন হইতে নামিল তখন উমাশঙ্করবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি এবং পাড়ার আর একজন মাতব্বর লোক মোটর লইয়া বিনয়কে স্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, দেখিলেন বিনয় ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে ট্রেন হইতে নামিল। বিনয় খোঁড়া, ভয়ঙ্কর খোঁড়া। লাঠির সাহায্য ছাড়া চলিতেই পারে না। সঙ্গে বরযাত্রী একজনও নাই।

সে একাই আসিয়াছে। উমাশঙ্করবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে মাতব্বরটি সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি একবার উমাশঙ্করের দিকে চাহিয়া উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষুদ্বয় জলজল করিতে লাগিল। কিন্তু স্টেশনে ইহা লইয়া হুজ্জৎ করা শোভন নহে। খোঁড়া বিনয়কেই মোটরে চড়াইয়া তাঁহারা বর ও বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটিতে লইয়া গেলেন। মাতব্বর ব্যক্তিটি যাইবার পূর্বে আড়ালে উমাশঙ্করকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করে দাও। ব্যাটাচ্ছেলে, জোচ্চোর!"

"সেটা কি ভালো হবে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে খোঁড়া পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবে না কি! যারা ঘটক তারা কোথায়?"

"তাদের তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।"

"সব যোগসাজস্, ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছ না, দূর করে দাও ব্যাটাকে।" মোটরে চড়িয়া মাতব্বর ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। মোটরটি তাঁহারই। উমাশঙ্কর ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন মনে করিলেন। গত্যন্তরও ছিল না।

"আচ্ছা, তোমার পা এমনভাবে খোঁড়া হয়ে গেল কি করে?"

"হাঁটুতে খুব চোট লেগেছিল একবার, বছর পাঁচেক আগে।"

"কি করে চোট লাগল, খেলতে গিয়ে কি?"

"মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে বাধাটা কি?"

"বলতে বাধা আছে।"

এ উত্তর শুনিয়া উমাশঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গোপন করিবার অর্থ কি? বিশেষত, হবু-শ্বশুরের কাছে! উমাশঙ্কর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার সঙ্গে একজনও বরযাত্রী আসেনি কেন?"

"দু'চারজন আসতে চেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই আনিনি। আমার হাটুতে কি হয়েছিল সেটা দু'একজন জানে, তাদের মুখ থেকে কথাটা হয়তো প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে একলাই চলে এসেছি।"

"হরপ্রসাদবাবু কি জানেন ব্যাপারটা?"

"জানেন। কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাপারটা কোথাও ফাঁস করবেন না?"

বিনয় হাসি মুখে উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারও সন্দেহ হইল ইহার অন্তরালে কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাঁহারা কোনও কালেই উমাশঙ্করের হিতৈষী ছিলেন না তাঁহারা সহসা অত্যন্ত হিতৈষী হইয়া পড়িলেন। সকলেই লাঠি উচাইয়া বলিল, "ব্যাটা, জোচ্চোরকে মেরে দূর করে দাও!"

উমাশঙ্করের অনেক আত্মীয়-স্বজন বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উমাশঙ্করের বিষয়টি হস্তগত করিবার আশায় পাড়ার লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁহার নন্-ম্যাট্রিক পুত্রটির সহিত নন্দিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় প্রস্তাবটি করিলেন।

"ওই খোঁড়া অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার গদাইয়ের হাতে দেওয়া শতগুণে ভাল। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। গদাই আজকাল কণ্ট্রাক্টরি করে বেশ রোজগার করছে।"

উমাশঙ্কর হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। সত্যই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয় যে মাতুলটি আসিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে বলিলেন, "ওর হাতে আমরা মেয়ে দেব না। তোমার বলতে যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমিই বলে আসছি গিয়ে।"

তিনি গিয়া দেখিলেন, বিনয় নাই।

চাকরটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "তিনি নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে স্টেশনে চলে গেছেন।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে হরপ্রসাদ এবং তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি একটা বিশেষ কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সময় মতো উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে যে ঘটনা ঘটিল তাহাকে নাটকীয় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃশ্যটা এইরূপ। উমাশঙ্কর, উমাশঙ্করের মাতুল এবং তিনকড়ি তিনজনেই করজোড়ে বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় স্মিতমুখে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

উমাশঙ্কর বলিতেছিলেন, "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমরা তো

জানতাম না, হরপ্রসাদবাবুর কাছে সব শুনলাম। রাত তিনটের সময় আর একটা লগ্ন আছে, চল।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন ?"

মাতুল বলিলেন, "সে বলছে আপনার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।"

তিনকড়ি বলিলেন, "উমাশঙ্করবাবু মেয়ের বাপ, তাঁর মনোভাবটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনাকে বেশী বলা বৃথা। চলুন।"

বিনয় বলিল, "যেতে পারি একটি সর্তে। তামা তুলসী গঙ্গাজল আর গীতা স্পর্শ করে আপনাদের শপথ করতে হবে যে যা শুনেছেন তা জীবনে কখনও প্রকাশ করবেন না।"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিলেন—"আমাদের কিছু আপত্তি নেই।"

বিনয় খ্যাংচাইতে খ্যাংচাইতে গিয়া পুনরায় মোটরে উঠিল।

হরপ্রসাদবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে বিনয় একদা একটি বিপ্লবী দলে ছিল। একবার সেই দল স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে তাহার হাঁটুতে গুলি লাগে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার দলের লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। দলের কেহই ধরা পড়ে নাই। তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন এখন চাকরিও করিতেছে। কথাটা প্রকাশ হইয়া গেলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না। তাই বিনয়ের এই সাবধানতা।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

পালোয়ান

আপনারা আজকালকার ছেলেদের যত বোকা মনে করেন তত বোকা তারা নয়। তাদের প্যাণ্ট পরা, গোঁফ ছাঁটা, তাদের পরীক্ষায় ফেল করা, তাদের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেন তাঁদের কাছে সবিনয়ে আমি একটি নিবেদন কেবল করব। তাঁরা আজকালকার ছেলেদের চেনেন না, চিনলে অতটা হতাশ হয়তো হতেন না। ইংরেজরা প্রথমে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন আমাদের দেশের যে কি দুর্দশা

ছিল তা ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কত রকম কসরৎ করে, কত রকম ইংরেজী অভিধান মুখস্থ করে, কত রকম কায়দায় ইংরেজদের সেলাম করে, তাদের বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করে তাদের সভ্যতার নকল করে যে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তা-ও ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালেই জানতে পারবেন। আপনারা আড্ডায়, খবরের কাগজে, সভায় যাদের নিন্দা পঞ্চমুখে করেও শেষ করতে পারছেন না, আমি সবিনয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারাও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক মহাজনদেরই আধুনিকতম বংশধর। জীব জগতে কোথাও যা হয় না, মানুষের বেলাতেই বা তা হবে কেন? আম গাছে আমই ফলবে, আমড়া নয়। ফলছেও, বাঙালীর ছেলের ঘিলু এখনও গোবর হয়ে যায়নি, কেবল রাজনীতির ছটকা একটু বদলে গেছে বলে বেচারা চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তারা দমে যায়নি, তার প্রমাণ চোখ মেললেই দেখতে পাবেন। কোনও সিনেমা, কোনও ফুটবল ম্যাচ, কোনও নাচ-গানের জলসা, কোনও সাহিত্যের মজলিশ, কোন রাজনৈতিক সভা তারা বাদ দেয় না। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখুন, মনে হবে কি যে এই ছোকরা বেকার? হবে না। তারা তাদের বাইরের মর্যাদাটুকু অন্তত অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পালোয়ান পাকড়াশীর কাণ্ড দেখে সত্যি তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি।

বার চারেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করে পালোয়ান আবিষ্কার করলে যে, সে চৌকাণা চৌকষ লোক, ম্যাট্রিকুলেশনের গোল গর্তে তার পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। বাবাকে সে কথা বোঝাতেও চেষ্টা করলে, বাবা কিন্তু সেকেলে মানুষ, বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জুতো নিয়ে তাড়া করে গেলেন। এরকম অবুঝ লোকের অধীনে বাস করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার ছেলে পালোয়ান নয়। পালোয়ান পালাল একদিন বাড়ি থেকে। ছেলে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই দেখি আজকাল নানারকম মন্তব্য করে, আড্ডায় আসর গুলজার করেন। একটা কথা তাঁরা ভুলে যান, বুদ্ধদেবও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেকালে খবরের কাগজ থাকলে সম্ভবত রাজা শুদ্ধোধনও 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামা দিয়ে কাগজের সাহায্যে ছেলের খোঁজ করতেন।

পলাতক পালোয়ান পাকড়াশীও সিদ্ধার্থের মতো স্বকীয় ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করেছিল। যে সিদ্ধিলাভের জন্ত বাঙালীর ছেলে নোটবুক মুখস্থ করে দলে দলে পরীক্ষা পাশ করছে সেই সিদ্ধিই লাভ করেছিল সে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে গঙ্গাই সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, কিন্তু এ যুগে আমরা

জেনেছি ওটা বাজে কথা। সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী যদি কিছু থাকে তার নাম রাজনীতি। পালোয়ান বাড়ি থেকে পালিয়ে রাজনীতি তরঙ্গ গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধ-সমুদ্র-মুখিনী এ তরঙ্গিনীর বৈশিষ্ট্য অন্ত তরঙ্গিনীর মতোই। এর তরঙ্গে গা ভাসালেও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা সম্ভবপর হয় না। প্রগতিশীলা এ তরঙ্গিনীর প্রবাহে একবার পড়লে নানা ঘাটের জল খেতে হয়।

পালোয়ানকেও খেতে হয়েছিল। সেও ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট, র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি হয়ে নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে যখন তীরে উঠল তখন চাকরি জুটে গেছে তার একটা। মাইনে বেশী নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে।

এই সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হল একদিন হঠাৎ রাস্তায়। সহপাঠী ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হওয়াতে আনন্দিত হলাম। কথা কইতে কইতে কখন যে কলেজ স্ট্রীট থেকে জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি খেয়াল ছিল না। হেঁটেই যাচ্ছিলাম, পালোয়ানের রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে।

পালোয়ান হঠাৎ থেমে বললে—"এই কাছেই আমার মেস, যাবি ?"

গেলাম তার মেসে। তেতলার একখানি পুরো ঘর নিয়ে পালোয়ান থাকে দেখলাম। মার্জিত রুচির পরিচয় ঘরের চতুর্দিকে ছড়ানো। বললে মাত্র একশ কুড়ি টাকা মাইনে পায়, তাতে এরকম ভাবে থাকে কি করে ? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটল। এ ঘটনার পূর্বাভাস পেলে পালোয়ান আমাকে তার মেসে নিয়ে যেত না হয়তো।

একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল—"সুখলালবাবু, আপনাকে নীচে ফোনে ডাকছে।"

"ও আচ্ছা, যাচ্ছি আমি !" আমার দিকে ফিরে বললে—"আসছি ভাই এখুনি—"সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—পালোয়ানের ভাল নাম কি সুখলাল ? জানতাম না তো ? টেবিলের উপর দেখলাম চিঠি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকটির উপর যে নাম রয়েছে তা পালোয়ান পাকড়াশী নয়, সুখলাল রায়। সত্যিই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। একটু পরেই পালোয়ান ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম "সুখলাল নাম তোর আগে শুনিনি।"

পালোয়ান স্মিতমুখে চুপ করে রইল ক্ষণকাল। তারপর হেসে বললে—"নাম বদলেছি। নামটা তো বাইরের পোষাক, দরকার মতো ওটা বদলাতে হয়।

সুখলাল রায় নামটা কি খারাপ হয়েছে ? চমৎকার গোল নাম, নিজেকে বাঙালী, বেহারী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ এমন কি হরিজন বলেও চালানো যায়।"

তারপর আর একটু হেসে বললে, "চা খাবি, না কফি।"

"কিছু দরকার নেই। তুই নামটা বদলালি কেন সেইটেই বরং বল, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।"

"না, তোকে বলতে আর বাধা কি। তবে কথাটা ব'লে বেড়াস না যেন। চল, বেরুই তাহলে, রাস্তায় যেতে যেতে বলব। আমাকে যেতেও হবে এক জায়গায়।"

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

পালোয়ান হেসে বললে, "এক জায়গায় মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। যাবি ?"

"মেয়ে ? কার জন্যে ?"

"তোর যদি পছন্দ হয় তুইই বিয়ে করতে পারিস। তোকে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দেব।"

ব'লে হাসলে একটু। তারপর আসল কথাটা বললে। মেয়ে দেখে বেড়ানো ওর পেশা একটা। রোজ দু'টো করে মেয়ে দেখে, একটা সকালে, একটা বিকেলে। ওতেই প্রায় দু' বেলার খাওয়াটা হয়ে যায়। কন্যাপক্ষরা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন না।

বছর খানেক পরে—তখন আমি মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন, হঠাৎ একদিন ইডেনের সামনে পালোয়ানের সঙ্গে আবার দেখা।

"কিরে এখানে কেন ?"

"আমার বউ-এর পেটে অপারেশন হয়েছে।"

"কি অপারেশন ?"

"হিস্টেরেক্টমি। জরায়ুটা কেটে বাদ দিয়েছে একেবারে।"

"ছেলে পিলে হয়েছে তোর ?

"না।"

"চল দেখে আসি।"

গিয়ে দেখলাম পালোয়ানের বউকে। বেশ রূপসী বউ। দুঃখ হ'ল তার আর ছেলে-মেয়ে হবে না ভেবে। অমন সুন্দরী মেয়ে, মা হলে কি চমৎকার মানাতো ! নিঃসন্তান জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বেচারার।

একেবারে ব্যর্থ কিন্তু হয়নি। উক্ত ঘটনার বছর খানেক পরে আবার দেখা হয়েছিল পালোয়ানের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। দেখলাম একটা দামী মোটরে সে তার বউকে তুলে দিচ্ছে। আমি যে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম তা সে টের পায়নি। মোটরটা যখন চ'লে গেল তখন ফিরেই সে আমাকে দেখতে পেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মোটরে তোর বউ গেল, না ?"

'হ্যাঁ।"

"প্রাইভেট কার দেখলাম। তোর না তোর শ্বশুরের ?"

পালোয়ান হাসল একটু।

"চল, ওপরে চল, সব বলছি। হ্যাঁ, এই সিঁড়ি, আজকাল এইখানেই থাকি। ওপরে একটা ফ্ল্যাট্ নিয়েছি।"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, এখানে ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকা সোজা নয়, অনেক পয়সা লাগে।

ওপরে গিয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। রীতিমত আমিরী কাণ্ডকারখানা।

পালোয়ান হঠাৎ আমার দু' কাঁধে দু'টো হাত রেখে বললে—"তোর কাছে লুকোব না কিছু! বউকে আমি ভাড়া দিই। মাসে অ্যাভারেজে হাজার দুই টাকা রোজগার হয়!"

বজ্রপাত হলেও আমি অত বিস্মিত হ'তাম না।

"তোর বউ আপত্তি করে না ?"

"প্রথম প্রথম করত, এখন আর করে না। কিছুদিন পরে ছবির পর্দাতেও ওকে দেখতে পাবি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই নিজে এতে সুখী হয়েছিস্ ?"

"আমি আর একটা বিয়ে করেছি। সাদামাটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে। মাস দুই আগে একটি খোকা হয়েছে। তোকে নিয়ে যাব একদিন সেখানে। যাবি ?"

গিয়েছিলাম। সত্যিই দেখলাম পালোয়ানের ছোট্ট সংসারটি চমৎকার। তার স্ত্রী অবশ্য একথা জানত না যে তার সংসার খরচের টাকা জোগাচ্ছে তার সুন্দরী সতীন। সতীনও পালোয়ানের দ্বিতীয় সংসারের খবর জানত না।

কিছুদিন আগেই চার্লি চ্যাপলিনের মঁশিয়ে ভারদু দেখেছিলাম, দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম। সুতরাং পালোয়ানের উপর রাগ করতে পারলাম না।

আপনারাও করবেন না।

কাক চরিত্র

আমি যেখানে বসিয়া লিখি তাহার ঠিক সামনেই একটি জানালা আছে। জানালা দিয়া খানিকটা আকাশ এবং একটি সজিনা গাছ দেখা যায়। সজিনা গাছের একটি ডাল আমার জানালার দিকে প্রসারিত। মনে হয় সে যেন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার সহিত আলাপ জমাইতে চায়। তাহার পত্র-পল্লব-ফুল-ফলের নীরব আলাপ দূর হইতেই রোজ শুনি, প্রতি ঋতুতে তাহার আলাপের সুর বদলাইয়া যায় তাহাও লক্ষ্য করি, কিন্তু সবটা যে বুঝিতে পারি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তবু রোজ চাহিয়া থাকি। প্রত্যহ লিখিতে বসিয়া ওই তরুণ সজিনা-শাখাটির জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হয়। একদিন এই সজিনা-শাখায় একটি কাক আসিয়া বসিল। শুধু বসিল না, নানাভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। মনে হইল সে-ও যেন আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক। এ বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য কম নয়। আড্ডা দিতে চিরকালই ভালবাসি। অবশ্য আড্ডাটা যদি মনোমত হয়। মানে, তাহাতে যদি পরনিন্দা এবং পরচর্চার মশলা থাকে। সাধারণ লোকেদের সহিত এ বিষয়ে আমাদের (মানে, লেখকদের) বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। একটু তফাৎ অবশ্য আছে। সাধারণ লোকেরা সকলের সহিত সমানভাবে আড্ডা দিতে পারে না। লেখকরা পারে। আকাশ, বাতাস, ফুল, পশু, পক্ষী সকলেরই সহিত আড্ডা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের, এ সব ক্ষেত্রে যে ভাষাও তাহারা ব্যবহার করে তাহা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা। কল্পনার ভাষাও বলিতে পারেন।

এই ভাষায় উক্ত কাকের সহিত আমার আলাপ জমিয়া গেল। আপনাদের সুবিধার জন্য সে আলাপ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। হয়তো কিছু মজা পাইবেন।

"আপনাকে মশায় রোজ ঐ টেবিলে বসে থাকতে দেখি। কখনও হাঁটু দোলান, কখনও দাড়ির ভিতর আঙুল চালান, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে শিস্ দেন। কি করেন বলুন তো ওখানে বসে ?"

"লিখি।"

"মানুষদের মধ্যে অনেকেই লেখেন দেখেছি। আমাদের খাজাঞ্চি মশাইও রোজ হিসেব লেখেন। আপনি ?"

"আমি গল্প লিখি, কবিতাও লিখি।"

"কিসের গল্প ?"

"মানুষেরই গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, রং-ঢং এই সব আর কি।"

"ও, তা আমি আপনাকে অনেক গল্প বলতে পারি। অনেক লোকের বাড়িতে যাই তো, অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখি। আমার কাছে কেউ কিছু গোপন করে না, মনে করে ও একটা কাক তো! কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। বেশ মজা লাগে। আপনি আপনার পাশের বাড়ির লোকের যে খবর জানেন না, আমি তা জানি।"

"পাশের বাড়িতে তো নগেনবাবু থাকেন।"

"হ্যাঁ। তার কি খবর জানেন আপনি বলুন !"

"পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে ভদ্রলোক বলেই তো মনে হয়। কথাবার্তাও ভালো। খুব দামী স্যুট প'রে রোজ বেরিয়ে যান আপিসে, মনে হয় ভালো চাকরিই করেন।"

"চাকরির খবর জানি না, কিন্তু বাড়িতে কি খান তা জানি। একবেলা মুড়ি, আর একবেলা এক-তরকারি ভাত, তাও নিরামিষ। ন'মাসে ছ'মাসে মাছ ঢোকে বাড়িতে। ভদ্দরলোক বাইরে খুব ফিটফাট বটে কিন্তু বগলে দাদ আছে, রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মলম লাগান। জানতেন এ-সব কথা ?"

স্বীকার করিতে হইল জানিতাম না।

ঘাড়টি বাঁকাইয়া কাক পুনরায় সুরু করিল—"নিকুঞ্জবাবুকে চেনেন ?"

"চিনি বই কি। খুব গোঁড়া ধার্মিক লোক।"

"কক্ কক্ কক্।"

মনে হইল হাসিতেছে।

"নিকুঞ্জবাবু ধার্মিক হয় তো, কিন্তু ওঁর স্ত্রীটি ডুবে ডুবে জল খান। আমি রোজ সেই সময় ওদের উঠোনে গিয়ে ওদের এঁটো থালা-বাসন হাঁট্‌কে দেখি যদি খাবারের টুক্‌রোটাক্‌রা পাওয়া যায় কিছু। প্রায়ই থাকে না, ওরা অধিকাংশ দিনই ডিম খায় কি না।"

"নিকুঞ্জবাবুর অতবড় টিকি, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, উনিও ডিম খান ?"

"উনি ডিমের যম একটি !"

কাক পুনরায় কক্ কক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"দেখুন, আপনি আপনার পাড়া-পড়শীর কোন খবরই রাখেন না। আপনার জানালা দিয়ে দূরে ওই যে প্রকাণ্ড সাদা দোতলা বাড়িটা দেখছেন ওর খবর রাখেন কিছু ?"

"ওটা তো শালিকপুরের জমিদারদের বাড়ি।"

"এককালে ছিল হয়তো। এখন ওর বংশের একগাদা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী হয়েছে। শালিকপুরের জমিদারি ভাগ হয়ে হয়ে চটকস্য মাংসের-চেয়েও কম পড়েছে প্রত্যেকের ভাগে। কিন্তু ওদের ঠাট্‌টা দেখেছেন ?"

"তাতো দেখেছি।"

"পয়সা আসে কোত্থেকে ?"

"তাতো জানি না।"

"শুনুন তাহলে। হাবুলবাবু কালোবাজারের দালালী করেন, কমলবাবু করেন ঘুসের দালালী। বড় বড় অফিসাররা ওঁর মারফৎ ঘুস নেয়, উনি কমিশন মারেন। চামেলী মেয়েটা একটা মাড়োয়ারীর সঙ্গে ভাব করেছে। রোজ বিকেলে প্রকাণ্ড একখানা মাস্টার বুইক আসে দেখেন নি ? শেফালী সিনেমা-ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছে। মণ্টু জুয়ার আড্ডায় ভিড়েছে। জানতেন এ-সব খবর ?"

"না।"

"আরও শুনুন।"

কাক ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিল। অবাক হইয়া গেলাম। এতগুলি প্রতারক দুশ্চরিত্র নর-নারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেছি, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। একটা লোকও ভাল নয়। কি আশ্চর্য !

"আবার আসব। আরও অনেক গল্প শোনাব আপনাকে।"

কাক উড়িয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল সজিনার ডালটাও যেন আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

কাকটি উপর্যুপরি তিন দিন আসিল না।

চতুর্থ দিনে পুনরায় তাহার দেখা পাইলাম। মনে হইল কেমন যেন বিমর্ষ উস্‌কো-খুস্‌কো ভাব।

"কি খবর ?"

"খবর খুব সাংঘাতিক।"

"কি রকম ?"

"এখনই আবিষ্কার করলাম যে বাচ্ছাগুলিকে এতদিন নিজের ব'লে মনে করছিলাম—সেগুলি আমার বাচ্ছা নয়, কোকিলের বাচ্ছা। একটিও আমার নয়।"

তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

কাক উত্তর দিল—"আমাকে কি আপনি নিকুঞ্জবাবু পেয়েছেন? কি করে সম্ভব হয়েছে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ওর সঙ্গে আর পোষাবে না। থাকুক ও কোকিলের বাচ্ছা নিয়ে। আমি আবার একটা জুটিয়ে নেব। ওদের তো অভাব নেই।"

কা কা করিতে করিতে কাক উড়িয়া গেল।

ছবি

ভ্রমর কুসুমকে ঘিরিয়া গান করে, চিরকালই করিতেছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সেদিন কিন্তু কিছু নূতনত্ব হইল। যে যুবক-ভ্রমরটি অর্ধ-স্ফুট মালতী মুকুলের দিকে আবেগভরে উড়িয়া আসিতেছিল, সে সহসা থামিয়া গেল। মালতীমুকুলের কাছে ওটা কি? সাপ না কি! সাপের মতোই ফণা তুলিয়া আছে যেন! ভ্রমর দূর হইতেই উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিল ব্যাপারটা কি। দেখিল জিনিসটা অনড়। সাপ হইলে নড়িত নিশ্চয়। সহসা খানিকটা রোদের ঝলক পড়িল তাহার উপর। চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। ভ্রমরের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। কি ওটা!…

সহসা তাহার চোখে পড়িল মালতীমুকুল আর একটু ফুটিয়াছে। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। উড়িয়া গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। ঠিক পাশেই সাপের মতো ফণা তুলিয়া যে অদ্ভুত জিনিসটা ছিল তাহার অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গেল।

কাছেই আরও দুইজন লোক আরও কয়েকরকম যন্ত্র লইয়া বসিয়াছিল, ভ্রমর তাহাদেরও দেখিতে পাইল না।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দেখিতেছি সেই ভ্রমর এখনও সেই মালতীমুকুলকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতেছে। অর্ধ-স্ফুট মুকুল এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। যেমন ছিল, তেমনি আছে। সবই আছে নাই কেবল……

"ছি, ছি কি করছ, ছাড় লাগে!"

"দুষ্টু কোথাকার, মিথ্যুক!"

"সত্যি লাগছে!"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটা ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি বলিতেছিলাম? সবই আছে, নাই কেবল সেই সজীব শ্যামল কানন-কুঞ্জটি। ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে ছায়া-ছবির পরদায়। দুই বৎসর পূর্বে কৌশলী বিজ্ঞানীরা তাহার অভিসার-লীলার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সহসা মনে হইল দ্বিতীয় যে ছবিটি আমার মানসপটে জাগিল, যাহা বহুকাল পূর্বে হারাইয়া গিয়াছে, তাহা কি কোথাও কোনও ছায়াছবিতে এমনি করিয়া বাঁচিয়া আছে?

দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল।

"দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমণশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অদ্ভুত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাদ্যসন্ধানে। যে স্থানে প্রত্যহ খাদ্য পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাদ্যের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিস্ময়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরি, আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না,

কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম, ওই গন্ধকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের ঢিপির উপর উঠিয়াছি। ঢিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, ঢিপিটাই চলিতেছে। সে-ও যেন গন্ধটাকেই অনুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম, ঢিপির উপর লম্বা গাছের মত কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝট্‌কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মত কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় মসৃণ। এরূপ দেশ পূর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র—আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নের মত দ্রুতপদে সেই মসৃণ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্যজনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল মনে হইল তাহার উৎস যেন ঊর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বর্ষিত হইতেছে। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্যামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ, আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বুঝি স্বর্গ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্যামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকণ্ঠ পান করিলাম। এমন সুস্বাদু সুমিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সেই সুমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কি না। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে

পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধনদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সন্তরণযোগ্য কোনও ক্ষীণ ধারা পাই।…"

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি রবিনসন্ ক্রুশো, গালিভার অথবা সিন্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ—

এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটি টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায়া বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচ পাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

শিল্পী

অহির সহিত নকুলের অথবা ঘাসের সহিত ছাগলের বন্ধুত্ব আছে ইহা কল্পনা করা কঠিন। জিতুবাবুর সহিত কিন্তু পানুর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন আর পানু তাঁহার কবলস্থ খাতক। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, চেহারারও নয়, বয়সেরও নয়। জিতুবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি, পানুর বয়স চল্লিশের নীচে। জিতুবাবু কালো, বেঁটে এবং ঈষৎ কুঁজো, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন, সোজা দাঁড়াইতে পারেন না।

পানু ছিপছিপে লম্বা, উন্নত মস্তক এবং সুদর্শন। মতেরও কিছুমাত্র মিল নাই। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন, অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আনন্দ। পানু চিত্রকর, ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়, রং আর তুলি লইয়া খেলা করে এবং পয়সা পাইলেই উড়াইয়া দেয়। তবু দুইজনের বন্ধুত্ব আছে এবং তাহাকে প্রগাঢ় বিশেষণে ভূষিত করিলেও মিথ্যাভাষণ হয় না। জিতুবাবু কখনও যাহা করেন না পানুর ক্ষেত্রে তাহা করেন অর্থাৎ বিনা সুদে, বিনা হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে টাকা দেন। আর পানুও কখনও যাহা করে না, জিতুবাবুর ক্ষেত্রে তাহা করে—অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক দিনে ঋণটি পরিশোধ করিয়া দেয়। দুই চারিদিন পরে আবার তাহাকে জিতুবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়, জিতুবাবুও পুনরায় টাকা দিতে আপত্তি করেন না। এইভাবেই বহুকাল হইতে চলিতেছে। জিতুবাবুর ধারণা: পানু একটা লক্ষ্মী-ছাড়া, পানুর ধারণা: জিতুবাবু লোকটি স্বল্পবুদ্ধি জানোয়ার বিশেষ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পা-শীল, অথচ বন্ধুত্বও খুব।

সেদিন জিতুবাবু পানুর ঘরে ঢুকিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। জিতুবাবু নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পানু টের পায় নাই। সে পিছন ফিরিয়া ছবি আঁকিতেছিল। কুব্জ জিতুবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন।

"ওটা কি আঁকছ, পেত্নীর ছবি না কি।"

পানু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আর একটু দূর থেকে দেখুন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

জিতুবাবু একটু পিছাইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আর একবার দেখিয়া বলিলেন, "সুঁটকো কালো মেয়েমানুষ একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। এই তো? বুকের কাছটা কি বিশ্রী করেছ, এ যে অশ্লীল একেবারে হে! দাঁত বার করে হাসছে আবার। এই ছবি বাজারে বার করবে না কি?"

"বহরমপুরের এক জমিদার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ছবিটা।"

"বল কি! হাজার টাকা! পেয়েছ টাকাটা?"

"না পাইনি এখনও। ছবি যেদিন নেবেন সেইদিনই টাকাটা দেবেন বলে গেছেন।"

"ও।"

জিতুবাবু কপালের উপর বাম হাতটা রাখিয়া পুনরায় ছবিটি দেখিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন, "আমার বিশ্বাস তিনি আর আসবেন না। বদ্ধ পাগল না হলে এ ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কেনে না। মেয়েমানুষই যদি আঁকলে

একটা ভদ্র চেহারা আঁকলে না কেন। এই স্ঁটকো মেয়ে আঁকবার কল্পনা তোমার হল কি করে?"

পানু ক্ষণকাল স্মিতমুখে জিতুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কালিদাস কে জানেন?"

"জানি বই কি। ব্যাংকের সেই কেরাণী ছোক্‌রা তো।"

"না, আমি কবি কালিদাসের কথা বলছি।"

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি নামটা।"

"তাঁর মেঘদূতের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন ছবির মানেটা।"

"কি রকম।"

"তাতে কবি যক্ষ-প্রিয়ার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা অনেকটা এই রকম—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি
মধ্যে শ্যামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
নিম্ননাভিঃ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব
ধাতুঃ—"

জিতুবাবু ঈষৎ ব্যায়ত আননে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন: ছোক্‌রার গুণ আছে অনেক। এই সব কারণেই পানুকে ভালবাসেন তিনি।

"শ্লোকের মানে কি?"

"যক্ষ-প্রিয়ার চেহারা কেমন? না, তিনি তন্বী, মানে ছিপছিপে, আপনার ভাষায় স্ঁটকো, শ্যামা কিনা শ্যামাঙ্গিনী, শিখরিদশনা মানে যার দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মানে যার নীচের ঠোঁট পাকা তেলাকুচো ফলের মতো, মধ্যে শ্যামা, যার কোমর খুব সরু, চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা—যার ছোট চোখ দুটি চকিত হরিণীর মতো, নিম্ননাভিঃ—যার নাভিদেশ খুব গভীর, শ্রোণীভারদলস-গমনা যিনি নিতম্বের ভারে আস্তে আস্তে চলেন, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—স্তনের ভারে যিনি ঈষৎ অবনত—"

জিতুবাবু হাত তুলিয়া পানুকে থামাইয়া দিলেন।

"হয়েছে হয়েছে থাম। আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—পেত্নী! কবি কালিদাস না হয় সংস্কৃতে বলেছেন যক্ষ-প্রিয়া। যক্ষ মানে ভূত! যাক—আমি যেজন্য এসেছিলাম বলি। টাকাটা সোমবার দিতে পারবে?"

"আমার তো টাকা দেবার কথা বুধবার।"

"তা জানি। কিন্তু সোমবার পেলে আমার ভাল হত!"

"আপনি তো ব্যাংকে জমা দেবেন? বুধবারেই দেবেন না হয়, সেদিনও তো ব্যাংক খোলা।"

"ব্যাংকে জমা দেব না। অন্য কাজ আছে।"

"কেন আমাকে মিছে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আমি জানি এ টাকা আপনি একটিও খরচ করেন না, সব জমা দেন।"

জিতুবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খরচ করব না। তবে ব্যাংকেও পাঠাব না।"

"পুঁতবেন না কি?"

জিতুবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"কি করে জানলে তুমি?"

"আন্দাজ করলুম।"

"কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায় ভাই। ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের যে রকম ব্যাপার ব্যাংকের অ্যাকাউণ্ট দেখতে চায়। তাই ভেবেছি যে সব টাকার খবর খাতায় নেই সেগুলো পুঁতে রাখব।"

"বেশ, বুধবারেই পুঁতবেন।"

"সোমবার ভাল দিন। আমি দু' তিনজনকে দিয়ে পাজি দেখিয়েছি। মাত্র একশোটা টাকা তো—দিয়ে দিও ভাই।"

"আমার কাছে এক কপর্দকও নেই এখন। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার লোক পাঠাবেন বলে গেছেন, সেইদিনই না হয় টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে সন্ধ্যাবেলা।"

"না, সোমবার সকালে আমার চাই। দিও বুঝলে।"

জিতুবাবু পানুর হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিলেন।

পানু স্মিতমুখে বিপন্ন জিতুবাবুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলল। কি অসহায় জীব!

'বেশ, চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা নয়, চাই-ই সেদিন !"

"বেশ।"

শুক্রবার সকালে পান্নু এক ঝুড়ি লিচু লইয়া জিতুবাবুর বাসায় হাজির হইল। হাতে একটি পাঁজি। পাঁজি খুলিয়া পান্নু বলিল, "আজও দিন ভাল, এই দেখুন। শিবু ভট্‌চাজ দেখে দিয়েছে।"

"সোমবার দিন তো আমি কাজ চুকিয়ে ফেলেছি। আর ভাল দিন দেখে কি হবে !"

পান্নু হাসিয়া বলিল—"আমি সেদিন আপনাকে যে একশ টাকার নোটটা দিয়েছিলাম সেটা বার করে এই টাকাগুলো সেখানে রেখে দিন।"

"কেন ?"

"সে নোটটা জাল ছিল। আমি এঁকে দিয়েছিলাম। আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কত সহজ দেখুন। এই নিন—একশ টাকার কয়েন।"

গণিয়া গণিয়া টাকাগুলি জিতুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া পান্নু বলিল, "আপনি লিচু ভালবাসেন তাই আপনার জন্য কিছু লিচু কিনে নিয়ে এলাম। আপনার জন্যে খুব ভাল একটা স্টীল-বক্‌সেরও অর্ডার দিয়েছি। কাল নাগাদ পেয়ে যাবেন।"

জিতুবাবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

"এ সব বলছ কি তুমি ?"

"ঠিকই বলছি। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার দিন এসে ছবিটা নিয়ে গেছেন। আমি বুধবারেই আসতাম, কিন্তু শিবু ভট্‌চাজ বললে বুধ বৃহস্পতি দুটো দিনই খারাপ। তাই আজ এসেছি, আজ দিন ভালো। নোটটা আমাকে বার করে দিন।"

"হাজার টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ। আগামী সপ্তাহে কিন্তু আমার কিছু চাই। বেশী নয় গোটা পঞ্চাশেক।"

"হাজার টাকা তো পেয়েছ ?"

"সব ফুঁকে দিয়েছি।"

পান্নুর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিতে লাগিল।

দৈত্যটিকে দেখে আমি মোটেই ভয় পেলাম না, বরং খুশীই হলাম। দৈত্য আমার দিকে খানিকক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি সর্বশক্তিমান, তোমার কি চাই বল ?"

"একটি চাকরি।"

"কি রকম চাকরি ?"

"ভালো চাকরি।"

"বেশ, তাহলে তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসি।"

প্রকাণ্ড দৈত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। দৈত্যটির গগনচুম্বী শির, তালগাছের মতো প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ দেখে আমি বসে বসে আশা করতে লাগলাম, এত বড় শক্তিমান পুরুষ নিশ্চয়ই আমার জন্যে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারবেন একটা।

কিছুক্ষণ পরে দৈত্য ফিরল। তার বগলে প্রচুর কাগজ, হাতে একটা ফাউন্টেন পেন।

"দরখাস্ত লেখ।"

"কোথায় দরখাস্ত লিখতে হবে ?"

"ঠিকানা এনেছি।"

কয়েকটি খবরের কাগজ আমার সামনে ফেলে দিয়ে দৈত্য বললে—"এগুলোর মধ্যে অনেক চাকরির খবর আছে। সব জায়গায় দরখাস্ত করে দাও। তারপর আমি ওগুলো নিয়ে টাইপ করিয়ে যেখানে যেখানে দেবার দিয়ে আসব।"

পঁচিশ খানা দরখাস্ত লিখে দৈত্যের হাতে দিলাম। দৈত্য চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে যখন সে আবার ফিরল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম দৈত্য আর দৈত্য নেই বামন হয়ে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি হল ?"

কোনও কথা বললে না, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগল শুধু।

"আপনি এত ছোট হয়ে গেলেন কি করে ?"

"অপমানে ! আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি চাকরি দেবার যাঁরা মালিক তাঁরা আমার চেয়েও ঢের বেশী শক্তিমান।"

"আমার গতি তাহলে কি হবে ?"

"গতি করেছি একটা।"

বামন পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু ইশারা করতেই একটি ভদ্রলোক শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন।

"এঁর একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে। তাকে তুমি বিয়ে কর। ইনি তোমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণ দেবেন। সেই টাকা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা কর একটা।"

এই বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যার ললাট গগন স্পর্শ করেছিল দেখতে দেখতে শূন্যে মিলিয়ে গেল সে।

বামনের আদেশ অমান্য করিনি। এই যে মনোহারী দোকানটি দেখছেন এটি আমার শ্বশুর মশায়ের টাকাতেই করেছি।

দৈত্য আর বামনের কথা শুনে আপনারা হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন, ভাবছেন হয়তো গাঁজা-টাজা খাই।

না, সে সব কিছু নয়। জ্ঞান-সমুদ্রে আমি যে জালটি ফেলেছিলাম তাতে একটি কলসী উঠেছিল, আর সে কলসীর ভিতর ছিল ওই দৈত্যটি! কলসীটির নাম ডিগ্রি আর দৈত্যটির নাম অহমিকা। আরব্য উপন্যাসে এই কাহিনীরই আপনারা যে রূপ দেখেছেন এ গল্পে সে রূপ নেই। থাকবে কি করে? আমি তো আরবী নই আমি বাঙালী, আর দেশটাও আরব নয়, ভারতবর্ষ।

প্রারব্ধ

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বিশ্বম্ভর তখনও আপিস হইতে ফিরিল না। পত্নী দুর্গামণি খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার পাশেই শুইয়া ছিল। পাশের বাড়ির ঘড়িটা দশটা বাজার শব্দে উঠিয়া বসিল। এখনও উনি আপিস হইতে ফিরিলেন না কেন? বিশ্বম্ভর ব্যাংকে কাজ করে, আপিস হইতে ফিরিতে তাঁহার একটু দেরী-ই হয়, কিন্তু এতো দেরী তো কোনদিন হয় না। ইহার পর দুর্গামণির মনে পড়িল ও-বেলার রাঁধা ভাত ডাল তরকারি খারাপ হইয়া গেল না তো! চাল ডাল ফুরাইয়াছে, এবেলা তাই সে রাঁধিতে পারে নাই। বাজার করিতে গিয়াই কি উনি এত দেরি করিতেছেন? কিন্তু আজ তো মাহিনা পাইবার দিন নয়, কাল মুদির দোকান হইতে ধারেই জিনিসপত্র কিনিয়া দিবেন বলিয়া গিয়াছেন, এত রাত্রে কি মুদির দোকান খোলা আছে? এই ধরনের নানা চিন্তা দুর্গামণির মনে

জাগিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল এ মাসে কাপড়ও কিনিতে হইবে। একটা মশারি কিনিলেও ভালো হয়, যে মশারিটা আছে তাহা বড়ই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, একটু টান পড়িলেই ছিঁড়িয়া যায়, তালির পর তালি পড়িয়াছে, আর কত তালি দেওয়া যায়, দিয়া লাভও নাই, ঠিক তালির পাশটিতেই ছিঁড়িয়া যায় আবার। তাহার পর মনে পড়িল দুই মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। বাড়ি-ওলা প্রত্যহ আসিতেছে। সেমিজ ছিঁড়িয়াছে, বালিশের ওয়াড় নাই। এসব কথা স্বামীর কাছে বলিতেও তাহার সঙ্কোচ হয়। মাত্র পঁচাত্তর টাকা তো মাহিনা। আগে কিছু বাঁচিত কিন্তু খোকা হওয়ার পর, খরচ বাড়িয়াছে। দুধের রোজ করিতে হইয়াছে, টুকিটাকি নানা জিনিসও কিনিতে হয়। উনি সংসারের ন্যায্য খরচের বিষয় কৃপণ, কিন্তু খোকনের বেলায় দিলদরিয়া। সেদিন পট্ করিয়া গোটা দুই রঙীন ফ্রক কিনিয়া আনিয়াছেন, কিছুই দরকার ছিল না অথচ সমস্ত মাসের খরচ দুই সের ডাল তাহা প্রাণে ধরিয়া কিনিয়া দিতে পারেন না। বলেন দেড় সের হইলেই চলিয়া যাইবে। খোকনের বয়স তিনমাস হইতে না হইতেই তাহার জন্য একটি রঙীন ঝাড়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া! এমনি নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল দুর্গামণির। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে আবার খোকনের পাশে শুইয়া পড়িল।

বিশ্বম্ভর ফিরিল রাত্রি বারোটার পর। দুর্গামণি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তুমি কি ক'রে এলে, সদর দরজা তো বন্ধ!"

"চুপ! আমি জানলা গ'লে ঢুকেছি!"

"কেন?"

"চেঁচিও না, সব বলছি। এই নাও।"

বিশ্বম্ভর একটা কাগজের প্রকাণ্ড পুলিন্দা দিলেন।

"কি এতে?"

"টাকা। ত্রিশ হাজার টাকা।"

"ত্রিশ হাজার টাকা! কোথা পেলে?"

"কালই জানতে পারবে। আমি এখন চললুম। টাকাটা সাবধানে রেখ, লুকিয়ে রেখ। এই টাকা দিয়ে খোকনকে মানুষ কোরো, আমি হয়তো আর ফিরব না, ফিরতে পারব না। কিন্তু তোমরা সুখে আছ, টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না, এ ধারণাটাকেই আঁকড়ে যেখানেই থাকি আমি সুখে থাকব। টাকাটা কিন্তু

সাবধানে রেখ আর পারো তো কালই বাপের বাড়ি পালিয়ে যেও—আমি চললুম। খোকন ঘুমুচ্ছে?”

ঘুমন্ত খোকনকে বুকে তুলিয়া বিশ্বম্ভর চুম্বন করিল। দুর্গামণিকেও করিল। তাহার পর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল।

“ভেবে দেখলাম তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়। তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে যাই। টাকাটা তা না হলে হয়তো বেহাত হ'য়ে যাবে। এখুনি হয়তো পুলিশ এসে পড়বে।”

পরদিন জানা গেল ব্যাংকের খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া বিশ্বম্ভর ত্রিশ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে। যথারীতি পুলিশ তদন্ত করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর কিন্তু ধরা পড়িল না। পুলিশ বিশ্বম্ভরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়াও হানা দিয়াছিল, কিন্তু দুর্গামণির নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারে নাই। দুর্গামণি বলিয়াছিল বিশ্বম্ভর তাহাদের সেই রাত্রেই এখানে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে নাই। সেই রাত্রেই বিশ্বম্ভর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর ফেরে নাই, কোনও খবরও দেয় নাই।

পুলিশ প্রশ্ন করিয়াছিল—“টাকার কথা কিছু জান?”

“না।”

বিশ্বম্ভর স্বহস্তে টাকাটা মাটির নীচে পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিল। কোথায় পুঁতিয়াছে তাহা অবশ্য দুর্গামণির অবিদিত ছিল না।

বিশ্বম্ভর রাত্রির অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে অবশেষে খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছিল। শুনিল একটু পরেই নাকি মাদ্রাজ মেল আসিবে। মাদ্রাজেরই একটা টিকিট কাটিয়া সে মাদ্রাজ মেলে চড়িয়া বসিল। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া সে বেশ পরিবর্তন করিয়া কুলি সাজিল। কিছুদিন কুলি-গিরি করিয়াই কাটাইল। তাহার পর একটা মিলে কিছুদিন কাজ করিল। রিক্‌শা টানিল কিছুদিন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর আসিল গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন। একজন নেতা দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য 'ভাড়া-করা' ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করিতেছিলেন। বেশী মজুরির লোভে বিশ্বম্ভর কিছুদিন ভলান্টিয়ারিও করিল। কিন্তু বেশীদিন করিতে সাহস করিল না, মনে হইল পুলিশের সংশ্রব এড়াইয়া চলাই ভালো। একটা হোটেলে কিছুদিন কাজ করিল, নানারকম রান্না শিখিল। তাহার পর একটা সাহেবের খানসামা হইয়া

গেল। সাহেবের সিংহলে নারিকেলের ব্যবসা ছিল, মাদ্রাজ হইতে তিনি সিংহলে গেলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহার সহিত গেল। সাহেবের নারিকেল ব্যবসায় সিংহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত কারবার ছিল তাঁহার। বিশ্বম্ভর তাঁহার ভৃত্য-রূপে সর্বত্র ভ্রমণ করিল। তাহার আচার-ব্যবহার, বেশ-বাস, ভাব-ভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন ঘটিল, পূর্বপরিচিত অনেক কিছুই সে ভুলিয়া গেল, কিন্তু দুর্গামণি ও খোকনকে এক নিমেষের জন্য ভুলিল না। তাহারা যে সুখে আছে, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, এই ধারণায় মশগুল হইয়া সে সর্বপ্রকার দুঃখকে তুচ্ছ করিতে লাগিল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে সাহেবের অধীনে বিশ্বম্ভর চাকরি করিতেছিল সে সাহেবও আর বাঁচিয়া নাই। বিশ্বম্ভরের কর্ম-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বিশ্বম্ভরকে তাঁহার একটা কুঠির ম্যানেজার পদে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের আজ অর্থাভাব ঘুচিয়াছে। তাঁহার ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। মানসিক বিপর্যয়। বিশ্বম্ভরের মনে হইল সে নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু যে নিরীহ খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া সে টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার পরিবারের জন্য সে তো কিছুই করে নাই! খাজাঞ্চি লোক খারাপ ছিল না, তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যুগল, রক্তাক্ত দেহটা বিশ্বম্ভরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাতুড়ির এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে ভালো করিয়া আর্তনাদও করিতে পারে নাই। সে-ই হয়তো পরিবারের একমাত্র ভরসা-স্থল ছিল…চিন্তাটা ক্রমশ তাহাকে পাইয়া বসিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই পাপের ফলে দুর্গামণি এবং খোকনও হয়তো কষ্ট পাইতেছে। টাকা পাইয়াও হয়তো কিছু সুবিধা হয় নাই, হয়তো পুলিশে টের পাইয়াছে, হয়তো চোরে বা ডাকাতে চুরি করিয়া লইয়াছে… । বিশ্বম্ভর বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল। অবশেষে সে ঠিক করিল দেশে ফিরিবে, খাজাঞ্চির খোঁজ করিয়া, তাহার পরিবারবর্গকে কিছু অর্থ দিয়া আসিবে। সম্ভব হইলে দুর্গামণি ও খোকনের খবরও লইবে।

বিশ্বম্ভর দেশে ফিরিয়া প্রথমে খাজাঞ্চিরই খোঁজ করিল। শুনিল তাহার একটি পুত্র এক সওদাগরি অফিসে চাকুরি করে। ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সে তাহাদের বাসায় গিয়া হাজির হইল। বলিল, "আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি। বিশ্বম্ভর বাবু টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বিশ্বম্ভর বাবু কে !"

"যিনি আপনার বাবাকে খুন করেছিলেন।"

'ও ! কোথায় তিনি ?"

"মারা গেছেন। আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন আমি যেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই।"

"আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল কি করে ?"

"সিলোনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।"

"ও, আচ্ছা। সন্ধ্যাবেলা আসবেন, তখনই টাকা নেব। এখন আমি একটু দরকারে বাইরে বেরুচ্ছি।"

বিশ্বম্ভর ভাবিয়াছিল ছেলেটির চোখে সে ধূলা দিতে পারিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু তাহার ভুল ভাঙিল। ছেলেটি পুলিশে খবর দিয়াছিল। ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বিশ্বম্ভর আর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান লইবার সময় পাইল না।

বিচারে বিশ্বম্ভরের ফাঁসি হইয়া গেল।

একটি খবর জানিতে পারিলে বিশ্বম্ভরের মনোভাব কি হইত তাহা জানি না। হয়তো হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিত, কিংবা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে বিস্মিত হইত। যে বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিল সে তাহার খোকন। যে অর্থ সে রাখিয়া গিয়াছিল সেই অর্থে-ই সুশিক্ষিত হইয়া বিলাত হইতে আই. সি. এস. পাশ করিয়া খোকন জজ হইয়াছিল।

চুনোপুঁটি

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি দেশে ফিরিতেছে। দেশ মানে, মোহনপুর গ্রাম। এই মোহনপুর হইতে পুঁটিকে একদা পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সে চুরি কিম্বা খুন করে নাই, বস্তুত পিনাল কোডের কোনও ধারাই তাহার গ্রাম-ত্যাগের হেতু ছিল না। তাহার অপরাধ—সে কালো। তদুপরি পিতৃহীন এবং দরিদ্র। শতাধিক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধূরূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা পায় নাই। পুঁটির বিধবা মা একজনের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়াছিলেন তবু তাহার মন গলে নাই। শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছিল।

এক্ষেত্রেও একজন বড়লোকের ছেলে ছিল। গ্রামেরই একজন ধনী মহাজনের পুত্র, ধীরেশ। পালটি ঘর বলিয়া পুঁটির মা সসঙ্কোচে একদিন তাহার নিকট কথাটা পাড়িয়াছিলেন। ধীরেশ তাহার প্রিয় বন্ধু কদমের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পুঁটির বিধবা মা পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিলেন। সুযোগ দেখিয়া পুঁটির মা কথাটা তাহার কাছে পাড়েন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধীরেশ যদি আশ্বাস দেয় তাহা হইলে তাহার বাবার পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবেন। কথাটা শুনিয়া ধীরেশ কয়েক মুহূর্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা বি-এস-সি পর্যন্ত পড়িয়াছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"নেপচুনের নাম শুনেছেন ?"

"নেপচুন ? না। নেপালের নাম শুনেছি। ও হ্যাঁ, আমাদের ফুলুর খোঁড়া ছেলের নাম নেংচু রেখেছিল, তার কথাই বলছ কি, ওরা তো এখানে নেই।"

কদম বলিল—"ও কথা ছেড়ে দিন মাসীমা। ধীরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক জায়গায়।"

"ও, তাতো জানতুম না বাবা। আমার পুঁটির জন্যে একটি পাত্র দেখে দাও না বাবা তোমরা।"

"চেষ্টা করব।"

পুঁটির মা চলিয়া গেলে কদম জিজ্ঞাসা করিল।

"হঠাৎ নেপচুনের কথা ওঁকে জিগ্যেস করলে কেন ?"

"বামন হয়ে চাঁদে হাত কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু বামন হয়ে নেপচুনে হাত দিতে চাইছেন উনি। সেই কথাটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম।"

"কল্পনা বটে তোমার।"

কদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরেশ বলিল, "মেয়েটার রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তাহলেও ভেবে দেখতাম। মুখ চোখ গড়ন ভালই, কি বলিস।"

কদম বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল।

ইহার পর হইতে পুঁটির বাড়ির চারিদিকে গ্রামের যুবকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। কেহ 'সিটি' দিত, কেহ বাঁশী বাজাইত, কেহ কেহবা জটলা করিত।

পুঁটির মা অবশেষে পুঁটিকে লইয়া গভীর রাত্রিতে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও বলিয়া গেলেন না, কোথায় যাইতেছেন।

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি তাহাদের জ্ঞাতিপুত্র চঞ্চলকুমারকে জানাইয়াছে যে সে তাহার স্বামীর সহিত মোহনপুরে আসিতেছে। চঞ্চলকুমার যেন তাহার বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখে। ইহার জন্য সে দুইশত টাকা টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়াও দিয়াছে।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে পুঁটি ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুঁটির সাজসজ্জা রাণীর মতো। সঙ্গে তিনজন চাকর, দুইজন ঝি। পুঁটির স্বামী অনিন্দ্যকান্তি, ঠিক যেন রাজপুত্র! চোখ ধাঁধিয়া গেল সকলের। পুঁটি বলিল, "বছর খানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে। সেই জন্যই বিশেষ ক'রে এসেছি আমরা।"

বিরাট আয়োজন করিয়া বিরাট ভোজের আয়োজন করিল সে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর চণ্ডাল, ইতর ভদ্র কেউই বাদ গেল না। গরীব দুঃখীদের কাপড় দিল, পয়সা দিল। গ্রামের স্কুলে, মন্দিরে মোটা টাকা চাঁদা দিল। ধীরেশ এবং কদমেরও তাক লাগিয়া গেল। গরীব দুঃখীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গ্রামের পাড়াপড়শীরা যাহারা পূর্বে পুঁটির রূপ লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ করিত তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শতমুখে পুঁটির রূপের এবং ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লজ্জাবোধ করিল না। পুঁটির স্বামীকে লইয়া গ্রামের ছোকরারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, যেমন ধনী, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। চাহিতে না চাহিতে গ্রামের ফুটবল ক্লাবে, শখের থিয়েটারে, হরিসভায় ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চাঁদা দিল। সকলের সহিত একদিন থিয়েটারও করিল। গানের কি গলা!

দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতাইয়া অবশেষে বিদায় লইল তাহারা।

বর্ধমান স্টেশন।

পুঁটি বলিল, "চুণো দা এইখানেই নাববে?"

"হ্যাঁ। টাকাটা দিয়ে দাও।"

"দিচ্ছি। দুশো টাকাই নেবে?"

"বাঃ, তাই তো কথা হয়েছিল।"

"বেশ নাও।"

টাকাটা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, 'কেমন যেন স্বপ্নের মতো পনেরটা দিন কেটে গেল! আহা, যদি সত্য হত।"

"স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়? চললুম, আবার স্টুডিওতে দেখা হবে।"

চুণো দা—ওরফে চুণীলাল নামিয়া গেল।

চুণীলাল এবং পুঁটি উভয়েই অভিনেতা অভিনেত্রী। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুঁটি চুণীলালসহ গ্রামে গিয়া স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করিয়া আসিল।

ট্রেন চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় খোলা জানলার সামনে দিগন্তের দিকে চাহিয়া পুঁটি একা বসিয়া আছে। মাথার চুল উড়িতেছে, শাড়িটা এলো-মেলো হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে।

অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে সে। বাড়ি গাড়ি সব হইয়াছে। অনেক শাড়ি, অনেক জামা, অনেক গহনা কিনিয়াছে, অনেক লোক তাহার পিছু পিছু ঘোরে। কিন্তু—।

সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ভদ্রলোক

ভদ্রলোকের বিবেকেই গলদ ছিল, তাহার উপর ট্রেনটা ছিল লেট্। তিনি হাওড়া স্টেশনে নামিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরও কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘড়িটার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। ঘড়ি কোন সান্ত্বনা দিল না। প্লাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহই আসে নাই। একটু আরাম বোধ করিলেন। ভদ্রলোকের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেলে একটু অপ্রস্তুত হইতে হইত। ভদ্রলোক আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। স্টেশনে না আসিবার অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে—ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়, হইতেই পারে না, কিন্তু যতীনবাবুকে স্টেশনে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি বেশ একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিবেকে একটু গলদ ছিল। বিবেকে যে গলদ আছে, তাঁহার আচরণ যে অশোভন হইতেছে, এতকাল তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, লিখিয়াছেন, কার্যকালে যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ

করিতেছেন, একথা যতীনবাবু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। চিঠিতে অবশ্য সে কথার আভাস পর্যন্ত দেন নাই, বুদ্ধিমান লোক তো কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, গৃহিণীর উপর রাগ হইল। উঁহারই প্ররোচনায় তিনি এই অপকর্মটি করিতে রাজি হইয়াছেন! সহধর্মিণী! হঠাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'কচু'! যে কুলিটি তাঁহার স্যুটকেসটি নামাইয়াছিল সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও।"

কুলি বলিল, "ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।"

"কেন ?"

"রাত হয়েছে। এত রাত্রে ট্যাক্সি আজকাল থাকে না। তার উপর হাল্লা হয়েছে মেছুয়াবাজারে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি—সব ভেগেছে তাই।"

"রায়ট্ ?"

"ঠিক জানি না। রিক্সা, ঘোড়াগাড়ী পাবেন।"

ভদ্রলোকের ভ্রূযুগল আর একবার কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, এই ওজুহাতে ফিরিয়া গেলে কেমন হয়!

"সাহেবগঞ্জে ফেরার ট্রেন কখন ?"

"সকালের আগে কোনও ট্রেন নেই" অর্থাৎ সমস্ত রাত স্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে। সহধর্মিণী দাক্ষায়ণীর মুখটাও মনে পড়িল। ভারী মাংসল মুখ। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন। দাঙ্গা বা যুদ্ধ যা-ই হোক, হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গেলে দাম্পত্য-সৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হইবে। যদিও লাইট্নিং কণ্ডাক্টার আছে, ভিত্তিও বেশ মজবুত, তবু ভদ্রলোক সাহস করিলেন না।

কুলিটি তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতেই তুলিয়া দিয়াছিল। গাড়োয়ান প্রথমে কিছু বলে নাই, কিন্তু কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জাংসানে গাড়োয়ানী ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, সে শ্যামবাজার অভিমুখে যাইবে না, কারণ তাহার ঘোড়া দুইটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত হইয়াছে। সে তাহাদের এইবার বউ-বাজারে অবস্থিত আস্তাবলে লইয়া যাইতে চায়।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নামিয়া পড়িলেন। ঘোড়ার দুঃখে বিগলিত হইয়া নয়, একটি রিক্সা দেখিয়া। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া

গাড়োয়ানের সহিত বচসা করা যে তাঁহার সাধ্যাতীত ইহা তিনি জানিতেন, রিক্‌সাটা আসিয়া পড়াতে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। সোজা রিক্‌সায় উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্‌সাওয়ালাও তেমন যেন উৎসাহ দেখাইল না। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকের মুখে বেশ ঘন কাঁচা-পাকা চাপদাড়ি, গোঁফও বেশ ঝাঁকড়া, ভ্রূ-দুইটি যেন দুইটি শুঁয়োপোকা। মাথায় বাব্‌রি। চেহারাটা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-ছাগলের মতো। ইহার উপর ভদ্রলোকের পরিধানে মোটা খদ্দরের জামা কাপড়। রিক্‌সাওয়ালার বিশেষ দোষ নাই।

"কোথা যাবেন?" রিক্‌সাওয়ালা প্রশ্ন করিল।

"হেদোর ধারে নামিয়ে দিলেই হবে।"

সুযোগ বুঝিয়াই হোক বা তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই হোক, রিক্‌সা-ওয়ালা বলিল,—

"দেড় টাকা ভাড়া লাগবে বাবু!"

"তাই দেব, চল!"

ভদ্রলোক উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্‌সাওয়ালা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"আমার অন্য একটা সোয়ারি আছে বাবু, হেদুয়া পর্যন্ত যেতে পারব না।"

বলিয়া সোজা শিয়ালদহের দিকে ছুট দিল। ভাগ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রিক্‌সা পাইয়া গেলেন, তাহা না হইলে একটু বিপদে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় রিক্‌সাওয়ালাটিকে দেখিয়া তিনি ভরসা পাইলেন। বেশ গম্ভীর লোক—আট আনা চাহিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এ অঞ্চলে কোন দাঙ্গা হয়েছে না কি?"

"মেছোবাজারে ঘটেছিল একটা হাল্লা। কতকগুলো মাতালের কাণ্ড। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে···।"

ভদ্রলোকের সন্দেহ রহিল না যে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তিনি রিক্‌সা হইতে অবতরণ করিয়া একটু মুশ্‌কিলে পড়িলেন। সুটকেশটি ফুটপাথে নামাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দরজা খুলিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রিক্‌সাওয়ালাকে দিয়াই সুটকেসটি ভিতরে বহন করাইবেন। কিন্তু কয়েকবার কড়া নাড়িয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন রিক্‌সাওয়ালাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রিক্‌সাওয়ালা চলিয়া গেলে বাড়ির নম্বরটি আর একবার

ভাল করিয়া দেখিলেন। না, নম্বর ভুল হয় নাই। উপরের জানালা খুলিয়া গেল।

"কে ?"

"আমি।"

"আমি কে ? নাম বলুন।"

"যজ্ঞেশ্বর আইচ।"

"কি চান ?"

"যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পূর্বেই বলিয়াছি ভদ্রলোকের বিবেকে গলদ ছিল। যতীনবাবুর সহিত এইবার অনিবার্যভাবে দেখা হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন। যে কোনও গলার আওয়াজ এমন কি নিজের গলার আওয়াজও বিপদের সময় মনে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার করে। করিল। যতীনবাবুর সম্মুখীন হইবার জন্য সপ্রতিভতার ভান করিতে সক্ষম হইলেন। উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল—

"বাবা বাড়ি নেই।"

ভদ্রলোক একটু যেন আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্যাটার অপর দিকটা মনে পড়াতে আবার একটু বিব্রতও হইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা কোথায় ?"

"মাও বাবার সঙ্গে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন ?"

"তার ঠিক নেই। দু'তিন দিন দেরি হতে পারে। মামার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে গেছেন।"

"তুমি যতীনবাবুর কে হও ?"

"আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার কলেজ কামাই হবে বলে, আমাকে নিয়ে যাননি। আপনার কি দরকার বলে যান তিনি এলে তাঁকে বলব।"

"কপাটটা খোল তাহলে।"

"আপনাকে আমি চিনি না, কপাট খুলব কেমন করে ?…"

পাশের বাড়ির ছাদ হইতে কে একজন প্রশ্ন করিলেন, "বিজলী, কার সঙ্গে কথা কইচিস ?"

"কি জানি আমি চিনি না। কপাট খুলতে বলছেন।"

"খবরদার খুলিস নি। দাঁড়া আমি দেখছি।"

হঠাৎ একটা টর্চের আলো ভদ্রলোকের মুখে পড়ল।

"ওরে বাবা, এ যে চাপদাড়ি। টম্! টম্!—" পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা আল্‌সেশিয়ান পাশের বাড়ির ছাদ হইতে উঁকি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও মোড় ঘুরিল। ভদ্রলোক আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"রোকো।"

উপরের জানলা হইতে শোনা গেল—

'বীরেন দা তোমার কুকুর ডেকে নাও। ছি, ছি, কি করছ তুমি।"

"যে রকম চেহারা। কিছু বলা যায় না।"—ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভদ্রলোক উহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটিকে মুছিয়া ফেলিলেন।

দিন চারেক পরে যতীনবাবু যজ্ঞেশ্বর আইচের নিকট হইতে যে পত্রটি পাইলেন তাহা এই—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

বিবাহের সময় মেয়েদের যে গরু ভেড়ার মতো করিয়া দেখা উচিত নয় এই মতবাদ আমি বহুকাল হইতেই পোষণ করিতেছি। তথাপি নিজের ভাবী পুত্র-বধূকে ঘটা করিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। আপনাকে একটি পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, বোধহয় সেটি পান নাই। ভালই হইয়াছে, পাইলে হয়তো আপনি থাকিতেন এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিজলীর চুল, দাঁত, নখ, রং, চেহারা দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া, সে কি কি রান্না করিতে পারে তাহার ফর্দ লইয়া বিবেককে বলিদান দিয়া আসিতাম। আপনার হয়তো অসুস্থ আত্মীয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পরমেশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তবু বিজলীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনার সুবিধা মতো যে দিন স্থির করিবেন সেইদিনই তাহাকে পুত্র-বধূরূপে বরণ করিয়া আনিব। আমার নমস্কার জানিবেন। বিজলীর মামা কেমন আছেন জানাইবেন। আশা করি আশঙ্কার কিছু নাই। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ

ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব, কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না। প্রথম প্রথম দু'চারবার তাগাদা করেছিলাম, এখন আর তাগাদাও করি না। নিজেরই চক্ষুলজ্জা হয়। তবে আসি রোজ। তার দোকানটিতে বসে খবরের কাগজটি পড়ি, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটে টুকরো আলাপ করি, আর মনে মনে প্রত্যাশা করে থাকি : হয়তো ছকুই নিজে থেকে ঋণশোধের প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু তোলে না। ঘড়িতে টং টং করে ন'টা বাজলে ছকু হাই তুলে টুস্‌কি দিয়ে সামনের দেওয়ালে রক্ষিত গণেশকে প্রণাম করে দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করে। আমিও উঠে বাড়ী চলে যাই। আবার তার পরদিন সন্ধ্যায় হাজির হই। এমনি বহুকাল ধরে চলছে। ব্যাংক থেকে করকরে পাঁচশ টাকা বার করে আমিই একদিন ছকুর এই ঘড়ির দোকানটি করে দিয়েছিলাম।

বি. এ. ফেল করে বাড়িতে বসেছিল বেচারা, নানারকম চেষ্টা করে কোথাও কিছু জোগাড় করতে পারছিল না, আমিই তাকে পরামর্শ দিই—"এ শহরে ভালো ঘড়ির দোকান নেই, তুমি একটা ঘড়ির দোকান কর। আগে ঘড়ি সারাতে শিখে এস, তারপর বাজারের মাঝখানে একটা ঘর ভাড়া করে বসে যাও, কিছু কিছু হবেই।" ছকু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"তা কি আমি জানি না, কিন্তু ক্যাপিটাল পাচ্ছি কোথায়!" হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমি বলে বসলাম, "যা ক্যাপিটাল লাগে আমি ধার দেব তোমাকে, তুমি লেগে পড়!"

ছকু লেগে পড়ল। আমার চেনা-শোনা এক ঘড়ির কারিগর ছিল কোলকাতায়। তার নামে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ছকুকে। ছকু কোলকাতায় গিয়ে প্রায় বছরখানেক রইল। থাকবার কোনও অসুবিধা হয়নি, ছকুর এক পিসেমশায় চাকরি করতেন খিদিরপুরে। তাঁর স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে ঘড়ি সারানো বিদ্যেটা আয়ত্ত করে ফেললে সে। তারপর আমাকে একদিন এসে বললে "এইবার ক্যাপিটাল দিন। বাজারের ঠিক মাঝখানে ভালো ঘর খালি হয়েছে একটা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে আজই ওটাকে 'বুক' করে ফেলি, কিছু আসবাবপত্রও কিনতে হবে, ভাঙা ঘড়ি জোগাড় করেছি কয়েকটা, আপনার ঘরে যে দেওয়াল ঘড়িটা আছে সেটাও আমি দোকানে টাঙাব, আপনার একটা

'টাইম্‌পীস' তো রয়েছে, নতুন ঘড়িও কিনতে হবে দু'চারটে, ঘড়ির ব্যাণ্ড, কাচ, এসব-ও চাই"...হড়হড় করে বলে যেতে লাগল।

আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়ছিলাম। বেশী টাকা তো আমার নেই, রিটায়ার করেছি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডটুকুই সম্বল। বললাম, "আমি শ'দুই টাকার বেশী দিতে পারব না, ওতেই কুলিয়ে নাও এখন।" ছকু চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলল—"আপনি ক্ষেপেছেন না কি! বিড়ির দোকান নয়, ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটাল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে, পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিষ্ট।" আমি লিষ্ট দেখিনি। বলেছিলাম, "দেখ হাজার টাকা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। খুব মেরে কেটে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।" ছকু চোখ বড় বড় করে নাক ফুলিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার দিকে। তারপর বললে—"আপনি শেষে এমনভাবে বিট্রে (betray) করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরিটা নিয়েই চলে যেতাম।" সাউথ আফ্রিকায় কোনও চাকরি অবশ্য সে পায়নি, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দু'একদিন জল্পনা করেছিল মাত্র যাবে কি না। পাঁচশ টাকাতেই রফা হল শেষ পর্যন্ত। ছকু ঘড়ির দোকান করে ফেললে। এ প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দোকান নিশ্চয়ই ভালো চলছে। কারণ যে স্টাইলে সে থাকে তাতে মনে হয় টাকাকড়ি রোজগার করে নিশ্চয়। তা না-হলে অত সিগারেট, অত সিনেমা অমন ছিম্‌ছাম হয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না। চার পাঁচ রকম জুতোই পায়ে দেয়। এক জামা কখনও দু'দিন পরে না সে উপর্যুপরি। সুতরাং মনে হয় দোকান মন্দ চলছে না। আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দেয়নি এখনও পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না। আগেই বলেছি এখন আর মুখ ফুটে তাগাদা করতে পারি না, মনে মনে করি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম এবং ছকুর মুখে তার যে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে আশা ছাড়তে হ'ল।

দোকানের কোণটিতে বসে রোজ যেমন করি সেদিনও তেমনি খবরের কাগজ খুলে কোরিয়া এবং লাল-চীন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটি ছেলে দোকানে এসে ঢুকল। তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স।

"ছকু বাবু, এই রিস্ট ওয়াচটি বদলে দিতে হবে। এর পিছন দিকে একটা দাগ রয়েছে, তখন লক্ষ্য করে দেখিনি, এই দেখুন।"

ছেলেটি বাক্স থেকে রিস্ট ওয়াচটি বার করে দেখালে। পিছন দিকে সত্যিই একটা আঁচড়ের মতো দাগ ছিল।

ছকু মৃদু হেসে বললে—"সরি, এখন আর বদলে দিতে পারব না। নেবার সময় আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"তা অবশ্য ছিল, আমার দোষ হয়েছে সেটা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওটা, মানে ওই দাগটা, আপনার দোকান থেকেই হয়েছে। আমরা কেউ হাতও দিইনি ও ঘড়িতে, আজ হঠাৎ উল্টে দেখি।"

ছকু নির্বিকারভাবে উত্তর দিলে—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রিন্সিপ্‌লের। জিনিস নেবার সময় সেটা ভালো করে দেখে না নিলে উভয়তই মুশকিল। মাপ করুন আমাকে। পিছন দিকে ওটুকু দাগ থাকলে ক্ষতিই বা কি।"

"এমনিতে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বিয়ের উপহার কি না, দাগী জিনিস দেওয়া যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমিই ব্যবহার করব, আমাকে আর একটা দিন।"

ছকু তাকে আর একটি ঘড়ি বিক্রি করলে। ছেলেটি এবার উল্‌টে পাল্‌টে ভাল করে দেখে নিয়ে চলে গেল।

আসল কথাটি আমি জানতাম। ঘড়িটা কোলকাতা থেকে ছকু যখন এনেছিল তখন ছকুই দেখিয়েছিল আমাকে দাগটা। বলেছিল—"এই দাগটুকুর জন্যে দাম পাঁচটাকা কম দিয়েছি। কিন্তু দেখবেন ঠিক কাউকে ক্যাটালগ প্রাইসে ঝেড়ে দেব।"

ছোকরাটি চলে গেলে ছকু উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে চাইলে আমার দিকে। আমি কেবল দু'টি মাত্র কথা বললাম—"অন্যায় করেছ"।

ছকু ইতিহাসের ছাত্র। সে ইতিহাসের নজীর তুলে বললে—"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের যে কত ঘনিষ্ট সম্পর্ক তা যদি মানেন তাহলে কিছুই অন্যায় করিনি। জিতেছি এইটেই আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি। এভ্‌রিথিং ইজ ফেয়ার ইন্‌ ওয়র এণ্ড লাভ্‌।"

"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কি, ঠিক বুঝলাম না।"

"ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবেন। আজকালকার যত যুদ্ধ তার মূলে আছে ব্যবসা। পুরাকালেও তাই ছিল। ক্রুজেডাররা ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল বাণিজ্যপথ দখল করবার জন্য। আমার মতে ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হ'ল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো

কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে, পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে যেমন করে হোক।"

ছকুর বিদ্যাবত্তা আর চিন্তাশীলতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছকু উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই যেতে লাগল—"এই হালের কথাই ধরুন না। ইংরেজরা যখন প্রথমে এদেশে এসেছিল তখন তাদের ব্যবসা বুদ্ধি ভালো ছিল, তাই তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদকে লাল-কাগজ শাদা কাগজের ভেল্‌কি দেখিয়ে ঠকিয়েছিল, হেস্টিংস নন্দকুমারকে ফাঁসী দিয়েছিল, আরও কত কি করেছিল। অর্থাৎ তখন তারা খাঁটি ব্যবসাদার ছিল। তাই শুধু ব্যবসা নয়, এত বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকবার পর এদেশের জল হাওয়ার ফল ফলল। জল হাওয়ার গুণ যাবে কোথা, মহৎ হ'য়ে উঠল ব্যাটারা। তাদের ব্যবসাদারগুলো পর্যন্ত মহৎ হ'য়ে উঠল। বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা বলছি শুনুন, আমার পার্সোনাল এক্‌স্‌পীরিয়েন্স। ঘটনাটা এতদিন কাউকে বলিনি। মল্লিকদের বাড়ির বিয়ের কথা মনে আছে আপনার? সেই যে কোলকাতা থেকে শানাই এসেছিল? ঘেঁটু মল্লিকের মেয়ের বিয়ে।"

"মনে আছে।"

"আমি তখন কোলকাতায়। ঘেঁটু মল্লিক আমাকে চিঠি লিখলে: 'ভাই, তুমি জামাইয়ের জন্য ভালো দেখে একটি রিস্টওয়াচ কিনে এনো। পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি। ঘড়িটি সোনার হওয়া চাই।' একটা নামজাদা সায়েবী দোকানে গিয়ে খুব ভাল ঘড়ি একটা কিনে ফেললাম। দোকানের নামটা আর বলব না, নামটা প্রকাশ করতে চাই না। ঘড়িটা কেনবার পর আরও দু' তিন দিন কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল আমাকে। কি যে দুর্বুদ্ধি হল ঘড়িটা হাতে পরে বেড়াতে লাগলাম। শ্যামবাজারে নরুদের বাড়ী গেছেন আপনি? তাদের বৈঠকখানার ফ্যানটা দেখেছেন? এমন নীচু করে টাঙানো যে কোনও লম্বা লোক যদি হাত তোলে হাতে ব্লেড ঠেকে যায়। আমি জানেনই তো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। নরুদের বাড়ী গেছি, বন্ বন্ করে ফ্যানটা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে কইতে হাতটা তুলেছি—বাস্! ব্লেড্ লেগে ঘড়ির কাচটা চুরমার, কাঁটাও একটা ভেঙে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম খানিকক্ষণের জন্য। পাঁচশ টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই আমার, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাঙা ঘড়িটা

ঘড়ির বাক্সে পুরে ক্যাশ্‌মেমোটা নিয়ে হাজির হলাম সেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে। দেখা করলাম বড় সাহেবের সঙ্গে। বললাম আমি এই ঘড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখে নিইনি, আজ খুলে দেখছি ঘড়িটা ভাঙ্গা। যদি কাইণ্ড্‌লি বদলে দেন, এটা ম্যারেজ প্রেজেণ্ট। সাহেব কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের উপর পাতা দুটো উঠল-পড়ল বার কয়েক, তারপর বললেন—'আপনি দেখে নেন নি ? ও আচ্ছা, বসুন।' টং করে ঘণ্টা বাজালেন, কর্মচারী এল একজন। সাহেব তাকে বললেন—'এই ঘড়িটা বদলে নিয়ে আসুন।' নতুন ঘড়ি নিয়ে সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ব্যাটাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে। এইবার চাটিবাটি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে। পড়তেও হল। মহাত্মাজি যেই কুইট্‌ করে বললেন : কুইট্‌ ইণ্ডিয়া—অমনি সুট সুট করে চলে যেতে হ'ল।"

ছকুর ব্যবসা-নীতি এবং ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল আমার টাকা আর ফেরত পাব না। ছকু কিন্তু আমার ঋণ শোধ করেছিল, যদিও একটু তির্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যাকরা বসে আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন ? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্য একটা হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি আমাকে দেখালে সে। বেশ ভাল হার।

"দাম কত পড়ল ?"

"পাঁচ-শো টাকা।"

"টাকাটা পেয়ে গেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলেও আমার মেয়ে তো পেল পাঁচ-শো টাকা। গল্পের রস হানি হবে বলে আগে বলিনি ছকু আমার জামাই।

পিওন ডাক দিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি শুভ-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আগামীকল্য তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ, আমি যেন শুভকার্যে যোগদান করিয়া তাঁহাকে বাধিত করি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, বাধিত করিব। ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন ডাকের চিঠিগুলি খুলিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ডাকে একটি না একটি কৌতুকজনক পত্র থাকে, সেদিনও ছিল। যাঁহারা সাহিত্য-চর্চা করেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই যে, সাহিত্য-জগতে এমন কতকগুলি জীব বিচরণ করেন যাঁহারা নিজেরা সাহিত্যিক নহেন, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁহাদের সব। ইহাদের ঠিক শ্রদ্ধা করা যায় না, এড়ানোও যায় না। সাহিত্যিকদের নানারূপ সঙ্গত-অসঙ্গত, ফাই-ফরমাস ইহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে খাটেন বলিয়া অনেক সময় ইহাদের সঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অনেক সময় ইহারা স্নেহভাজনও হন। শ্রীমান রাইমোহন মাইতি আমার জীবনে এইরূপ একটি লোক। রাইমোহন লিখিতেছে—

শ্রীচরণেষু,

দাদা, নূতন একটি কবির সন্ধান পেয়েছি। আমার মনে হয়, এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এঁর দুটি কবিতা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল লাগবে। যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন ভাল হয়। আজকাল ভাল কবিতা তো চোখেই পড়ে না। মনে হয়, যে কোন সম্পাদক এ দুটি পেলে লুফে নেবেন। ইনি 'ভেক' এই ছদ্মনামে লিখতে চান। আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি,

প্রণত—রাইমোহন মাইতি।

এইবার কবিতা দুইটি শুনুন।—

সাগরের প্রতি

আমার মনের গোপন কথাটি জেনেছ তুমি
অথচ বল না কিছু
তোমার না-বলা-কথা-আলেয়ারে ধরিব বলি
ফিরি তার পিছু পিছু।

ধরিতে পারি না, ঠিকানা জানি না তার
আনমনে শুধু ঘোরাটাই হয় সার
ফুলেরা পাখিরা সূর্য-তারারা
আসে যায় বার বার
পথের চেহারা কভু সমতল,
কভু উঁচু, কভু নীচু।
অনেক আকাশ নেমেছে নেমেছে
অনেক সাগর-কোলে
তাদের মিতালি আমার শিথানে
নিদালি স্বপনে দোলে।—"ভেক"

কূপের প্রতি

তোমার মনের গোপন কথাটি জেনেছি আমি
তবু আছি নিশ্চুপ
দেখিতেছি শুধু নীরব বেদনে আপন মনে
জ্বলিছে মৌন ধূপ।
সাগরে ভাসিবে ময়ূর-পংখী মোর
তাহারই আশায় কত নিশি ভোর
জাগর-নয়নে নিদ নাহি নামে
সাগর যে মন-চোর।
তুমি তারে ওগো কেন চাও বল
তুমি যে ক্ষুদ্র কূপ।
আমি যে ভুখারী, আমি যে দিশারী
আমি যে তাতল তট
বুলবুলি-চরা মাঠে মাঠে আমি
গড়ি যে প্রেমের মঠ।—"ভেক"

কবিতা দুইটি বার দুই পড়িয়া রাখিয়া দিলাম। কাহাকে যে উল্লিখিত রত্ন-যুগল লুফিয়া লইবার সুযোগ দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে স্বয়ং রাইমোহন আসিয়া উপস্থিত। সে যে কলিকাতা হইতে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে প্রত্যাশা করি নাই।

"কি রাইমোহন, হঠাৎ এসে পড়লে যে ?"

"যে কবিতা দুটো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি।"

"কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি ?

"না।"

"যাক, বাঁচা গেল। কোথাও পাঠাতে হবে না, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিন।"

"কেন, ব্যাপার কি ?"

"যত সব বোগাস্।"

একবার শিস দিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর মাথার সামনের দিকের লম্বা চুলের গোছাটা দক্ষিণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বুঝিলাম, যে কারণেই হোক, ছোকরা বেশ বিচলিত হইয়াছে।

"ব্যাপার কি বল তো ?"

"বলছি। কিছু খাওয়ান, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন খবর পেলাম, ছুটে ট্রেন ধরেছি। পয়সাও বেশি ছিল না সঙ্গে। সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে।"

"চাকরকে ডাকিয়া চা ও খাবার আনিতে বলিলাম।"

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

"পরশু পর্যন্ত আমাকে যা চিঠি লিখেছে, এখনও সঙ্গে আছে আমার, বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখুন আপনি।"

"কে চিঠি লিখেছে ?"

"ওই ভেক ভেক, যার কবিতা আপনাকে পাঠিয়েছি। ও শেষে কুয়ার ভেতরই লাফিয়ে পড়ল। আপনারই পাশের বাড়িতে আছে তো। নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি ?"

এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ আলোক দেখিতে পাইলাম।

"ভেক মেয়েছেলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, বিনোদিনী। এম. এ. পাস, মার্জিত রুচি, কিন্তু বিয়ে করছে কাকে জানেন ? একটা নন্-ম্যাট্রিক জরদ্গবকে।"

"কেন ?"

'কলকাতায় তার সাতখানা বাড়ি আছে। মিলও আছে একটা। ছি ছি, এতটা আশা করিনি। করা সম্ভব? আপনিই বলুন। আমাকে পরশু পূর্বস্থ যে চিঠি লিখেছে, দেখুন আপনি।"

"তা না হয় দেখব। কিন্তু আমি—।" থামিয়া গেলাম। কারণ আবার সে শিস দিবার চেষ্টা করিল, আবার চুল মুঠা করিয়া ধরিল। ধৃত-কেশ অবস্থায় নত-মস্তকে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

"ব্যাপারটা কি, বল দেখি খুলে। হঠাৎ এলে কেন তুমি?"

"ট্র্যাজেডিটা স্বচক্ষে দেখব ব'লে এলাম। গ্রিম্ ট্র্যাজেডি। উঃ!"

আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কূপের খবর পাইয়াছিলাম। এইবার সাগরের খবর পাইলাম। প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর।

নারীর মন

সুমিতা ঘরে এসে সুইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না, একটু বিব্রত হয়ে পড়ল বেচারী। বাল্‌বটা ফিউজ্ হ'য়ে গেল না কি? হাতে একটিও পয়সা নেই, মাইনে পেতে এখনও দিন পাঁচেক দেরি আছে। অথচ আলো একটা না হলেও চলবে না। নবেন্দু থাকলে তার কাছ থেকে কিছু ধার চাওয়া যেত। কিন্তু সে-ও তো আজ বাড়ি চলে গেল। দুপুরে দেখা করতে এসেছিল, তখনই যদি চেয়ে রাখত। কথটা মনে হয়েছিল কিন্তু চাইতে লজ্জা করল। কেন লজ্জা করল? নবেন্দু তাকে ভালবাসে, চাইলে সে খুশীই হ'ত হয়তো, তবু কিন্তু চাইতে পারেনি। কেন? নবেন্দু যদি তার স্বামী হ'ত তাহলে এ সঙ্কোচ নিশ্চই হ'ত না। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে তার মনে হল নবেন্দু তাকে বিয়ে করবে কি? কই, কোন দিন তো মুখ ফুটে কিছু বলেনি। সঙ্গে সঙ্গে সুরনের কথাও মনে পড়ল। সুরেনও আসে তার কাছে। তারও ভাব-ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে-ও যেন তাকে চায়, কিন্তু সে-ও মুখ ফুটে বলেনি এখনও।

...অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে নিঃস্ব সুমিতা বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। সে রোজগার করে, মাসে ষাট টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কিছুতেই কুলোতে পারে না ওই ক'টা টাকায়। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, ভাল শাড়ি

দেখলে লোভ সামলাতেই পারে না। তুচ্ছ পাথরের একটা হার, তাই কিনতেই দশটা টাকা বেরিয়ে গেল সেদিন। বুঝতে পারে অন্যায় করছে কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারে না কিছুতে। ওই হারটা না কিনলে মাসের শেষে এমন নিঃস্ব হ'য়ে পড়তে হত না। যদি একজন সঙ্গী থাকত তাহলে দু'জনের রোজগারে স্বচ্ছন্দে চ'লে যেত জীবন। অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। এমন পয়সা নেই যে একটা মোমবাতি কিনে আনে? একটা বোর্ডিংয়ে খায় সে, মাইনে পেলে তাদের টাকা দিয়ে দেয়। একটা মনোহারী দোকানের সঙ্গে চেনা আছে, তারা মাঝে মাঝে তাকে স্নো পাউডার ধারে দিয়েছে, তাদের কাছে মোমবাতি পাওয়া যাবে কি? হঠাৎ চমকে উঠল সুমিতা। দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। সুরেন নিশ্চয়। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে সুরেনকে ডেকে আনা কি ঠিক হবে? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কোন সাড়া দিলে না। কড়া কিন্তু সমানে নড়ে চলেছে। শেষে ডাকও শোনা গেল।

"সুমিতা, সুমিতা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি!"

সুরেনের গলা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুমিতা। কপাট খুলে বললে—

"ও, তুমি এসেছ। আমি বেরুচ্ছি একটু।"

"কোথায়?"

"এই এমনি বেড়াতে।"

"চল, আমিও যাই। অমি তোমার সঙ্গে গল্প করবার জন্তেই এসেছিলাম।"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

সুমিতা বললে—"আমার কাছে কিন্তু একটিও পয়সা নেই, হাঁটতে হবে।"

"আমার কাছে আছে। চল মাঠেই যাওয়া যাক।"

একটা ট্রামে উঠে বসল দু'জনে। সুমিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল লজ্জায়। কেন সে সুরেনের পয়সায় ট্রামে চড়ল? কেন সে তাকে বলতে পারল না যে আমি হেঁটেই যাব, আমার সান্নিধ্য তোমার যদি কাম্য হয় হেঁটেই চল আমার সঙ্গে। কেন একথা সে বলতে পারল না! পারেনি বলে কেমম যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল সে মনে মনে। মনে হল বরাবরই কাঙালিনীর মতো নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন না কোন পুরুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আছে সে মনে মনে। এই একটু আগে যে জীবনসঙ্গীর কথা সে ভাবছিল সে তার এই কাঙাল মনোবৃত্তিরই সৃষ্টি।...

"চল এবার নাবা যাক।"

মাঠে এসে পড়েছিল তারা। একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসল দুজনে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সুরেন গলা-খাঁকরি দিয়ে বললে—

"আজ একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম।"

"কি কথা ?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

সুমিতার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। তবু কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। তারপর আত্মসম্বরণ করে ধীর কণ্ঠে বললে,

"আমি যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"স্ত্রী কি কখনও স্বামীর গলগ্রহ হয় ?"

"হয়।"

সুরেন অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুমিতা কিছুতেই বুঝল না। আত্মসম্মানের যে তুঙ্গশিখরে সে সহসা নীত হয়েছিল সেখানে সুরেন তার নাগাল পেল না কিছুতে। হেঁটেই বাড়ি ফিরল সে। বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে কাঁদতে লাগল। আবার দুয়ারে কড়া নড়ল একটু পরে।

"কে ?"

"আমি নবেন্দু।"

"আমার ঘরের আলোটা ফিউজ্‌ হয়ে গেছে। শুয়ে পড়েছি আমি।"

"কপাট খোল। আমি বাল্‌ব এনেছি।"

আশ্চর্য হয়ে গেল সুমিতা। নবেন্দু কি করে জানলে যে তার 'বাল্‌ব'টা ফিউজ্‌ হয়ে গেছে! কপাট খুলে সেই প্রশ্নই করল সে।

"দুপুরে তুমি যখন চান করবার জন্যে বেরিয়ে গেলে তখন আমিই তোমার ভাল বাল্‌ব'টা খুলে নিয়ে তার জায়গায় ফিউজ্‌ড্‌ বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিলাম একটা।"

"সে কি! কেন ?"

"সুরেনকে ঠকাবার জন্যে। ভাবলাম ঘর অন্ধকার দেখলে সে হয়তো বসবে না।"

সুমিতার কর্ণমূলে অরুণিমা দেখা দিল।

"কেন, এলোই বা সুরেন! তোমার তাতে আপত্তি কিসের ?"

"ঘোর আপত্তি! সে তোমাকে বিয়ে করবার তালে আছে। তোমার সঙ্গে তাকে একলা থাকবার সুযোগ কি আমি দিতে পারি?—দাঁড়াও আলোটা লাগিয়ে দিই।"

টর্চের সাহায্যে বাল্‌ব্‌টা লাগিয়ে দিলে নবেন্দু।

সুমিতা মুচকি হেসে বললে, "সুরেনের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিলাম। বিয়ের প্রস্তাব সে করছে।"

"তাই নাকি! তুমি কি উত্তর দিলে।"

"বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো রোজগার করতে না পারছি ততক্ষণ বিয়ে করব না। আমি স্বামীর গলগ্রহ হতে চাই না।"

"বেশ বলছ!—কিন্তু—"

বিবর্ণ মুখে চুপ করে গেল নবেন্দু। তারপর মুখে হাসি টেনে এনে বলল—

"কিন্তু আমাকেও কি তুমি ওই উত্তর দেবে?"

সুমিতা বলতে পারলে না, 'দেব—'। সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল তার মনে। বললে—

"তা জানি না। রাত হয়েছে, বাড়ি যাও তুমি!"

তারপর হেসে ফেললে।

সাঁতারের পোষাক

আমি মফঃস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থিদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুকে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি।"

"বাঃ। তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হবে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্ট্যুম আছে?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভালো কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভরতি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও অবিলম্বে সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেরের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে কস্ট্যুম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

'আর কিছু নেই?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয় প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচ রকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই?"

'আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট্ এ মিনিট।"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল।

কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভালো নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। কস্ট্যুম স্তূপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই?"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত ?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হয়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের চাই। কাইণ্ড্লি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্! আলাদা প্যাকেট করে রেখে দিচ্ছি।"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পর-মুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই!"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন!"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন!"

"কোন্ বড় সাহেব ?"

"দোকানের। চলুন না।"

একটু অবাক হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না শোনাই যাক—কী বলে!"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমদের পোষাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হল না বুঝি ?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়ছে ?"

"চোদ্দ আনা।"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জেসিকো সেলাম দেও!"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চৌদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এঁদের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওঁদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশমেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলা টেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাশ করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

সাঁতারের পোষাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফঃস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোষাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোষাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি, শাড়ী, গামছা, ছিট্। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার,' সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সহযোগে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্তি আর এক ভদ্রলোকের সহিত রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মডারেট্রা ভাল, না একস্ট্রিমিষ্ট্রা ভাল, এই আলোচনাই করিতে লাগিলেন।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোন ঔষধ কিনিতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোষাক খুঁজছি।" বুঝাইয়া বলিলাম।

"ও, বুঝেছি। কাগজে টাইট্‌ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোক্‌রা-ছুক্‌রিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না!"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হবে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু দুলালচাঁদ আসছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক।"

আর আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই দুলালচাঁদ, বসুন, বসুন।"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

আমি উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোষাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, গফুর, গফুর, ও গফুর!"

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গিপরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো! যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোষাক পেয়ে যাবেন।"

"করিয়ে দেবেন বলছেন?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভালো কাপড়ের করিয়ে দেব। কলকাতায় এমনটি পাবেন না।"

"কী কাপড়ের?"

"সে দেখবেন তখন!"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না। গফুর দর্জির ঘরে গিয়া মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতারণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন।"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর-দর্জি পাশের একটি গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন! টেঁকে রেখেছি, এইবার কলটা চালিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খস্‌খসে গোছের।

গফুর বলিল, "ছাতার কাপড়। বাবু বললেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যাণ্টটা একটু আঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল।

একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামি লোক, গরিবের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে।"

সাঁতারের পোষাক সম্পর্কে একটি বিলাতী দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগ্‌নের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতিযোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। সুইমিং কস্ট্যুম না হলে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেলে কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময় থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্ট্যুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়।"

"বেংকট বাবা কে?"

মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

"কী করে আনিয়ে দিয়েছিলেন?"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতূহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকায় ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্তে আবার পোষাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোষাক নিয়ে কী হবে!"

বন্দেমাতরম্

শহরের গণ্যমান্ত নাগরিক রায়বাহাদুর জগজ্জ্যোতি সিংহরায়ের কন্যা সুশীলা সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াতে আমার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। চোর, ডাকাত খুনী জালিয়াত, ইহাদের লইয়াই আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, বিবিধ প্রকার পাপী ও শয়তানদের পিছু পিছু ঘুরিয়া দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া ফেলিতেছি—রায়বাহাদুরকে সবিনয়ে সে কথা নিবেদন করিলাম। তিনি কিন্তু না-ছোড়। অত বড় মানী লোক আমার কাছে হাতজোড় করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,

"ওসব কোনও ওজর শুনব না ভাই। সি-আই-ডি হিসেবে তোমার যে সুনাম শুনেছি তার মর্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার মান সম্ভ্রম কলঙ্কে কালো হয়ে যাবে, আর তুমি বাঙালীর ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সেটা!"

কি আর বলিব, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া শেষে কথা দিয়া আসিলাম।

সুশীলার যে এই পরিণাম হইবে, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। মনোমত পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া রায়বাহাদুর তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। যে ধরণের পাত্র সাধারণত আমাদের মনোমত হয় তাহা এদেশে দুর্লভ। অনেক টাকা খরচ করিয়াও মেলে না, এ যুক্তি কিন্তু বয়স বা যৌবনের উদ্দাম গতিকে রোধ করিতে পারে না। রায়বাহাদুর রোধ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুবিধ সৌখীন শাড়ি এবং অলঙ্কারে মেয়েকে সাজাইয়া ঐশ্বর্যের ময়ূরপংখীটিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সংসার সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে সে নাচিয়া গাহিয়া

বেড়াইতেছিল। কোনও সিনেমা, কোনও থিয়েটার, কোনও পার্টি সে বাদ দিত না। কলেজে কো-এডুকেশন তো ছিলই। ইহাই আজকালকার হাওয়া এবং ইহাই নাকি সভ্যতার মানদণ্ড। এ অবস্থায় যাহা ঘটবার তাহাই ঘটিয়াছে, বিস্ময়ের কিছু নাই।

সুশীলার নাগাল কিন্তু সহজে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রায়বাহাদুর পরিচিত মহলে প্রচার করিয়া দিলেন সুশীলা ব্যাঙ্গালোরে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়াছে, সেখানে একজন খাঁটি মেমসাহেবের নিকট সে নাকি লেখাপড়ার সহিত বিলাতী সহবৎ শিক্ষা করিতেছে। তাহার পর বিলাত যাইবে। পরিচিত-মহল রায়বাহাদুরের সামনে দেঁতো হাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু আড়ালে তাহারা যে হাসি হাসিল তাহা অন্য প্রকার। যাই হোক, এই ভাবেই চলিতে লাগিল। আমি পারতপক্ষে রায়বাহাদুরের সহিত দেখা করিতাম না। দেখা হইয়া গেলে সত্য কথাই বলিতাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। লোক লাগাইয়া চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না, কারণ রায়বাহাদুর ব্যাপারটা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে সিধু গুণ্ডার পিছু লইয়াছিলাম। সিধু গুণ্ডাই যে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মাড়োয়ারিকে খুন করিয়া তাহার টাকার থলিটা ছিনাইয়া লইয়াছিল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু লোকটা এমনই ধূর্ত যে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছিলাম না। সে যে এই শহরেই আছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় যে আছে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছিল না। সমস্ত হোটেলে এবং খাবারের দোকানে আমার গুপ্তচর ছিল। একজন আসিয়া খবর দিল যে শহরের বাহিরে যে ডাষ্টবিনটা আছে সেখানে নাকি গভীর রাত্রে সিধু খাবার লইবার জন্য আসে। একটা লোক সন্ধ্যার সময় সেই ডাষ্টবিনের ভিতর তাহার জন্য খাবার রাখিয়া যায়। কাছেই একটা গাছ ছিল, সন্ধ্যার পর তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সত্যই দেখিলাম একটা লোক তাহার ভিতর শালপাতা মুড়িয়া কি যেন রাখিয়া গেল। বুঝিলাম, একটু পরে সিধু আসিবে। সিধু অনেক রাত্রে আসিল এবং আসিল সাইকেল চড়িয়া। এটা আমি প্রত্যাশা করি নাই। আমি গাছ হইতে নামিতে নামিতেই সে খাবার লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল। আমার কিম্বা আমার সঙ্গের কনেষ্টবল দুইজনের সাইকেল ছিল না। আমরা পদব্রজেই সিধু যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। সাইকেলটা কিছুক্ষণ পরেই আঁধারে মিলাইয়া

গেল। তবু আমরা চলিতে লাগিলাম। দুইদিকে ফাঁকা মাঠ, জনমানবের চিহ্ন নাই, গভীর অন্ধকার। ফিরিয়া আসিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় কিছুদূরে একটা পোড়ো বাড়ি চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম, খোলার বাড়ি, দুই দিকে মাটির দেওয়াল কোনক্রমে দাঁড়াইয়া আছে। টর্চের আলো ফেলিয়া ফেলিয়া কাছে গেলাম এবং ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সাধারণ দেশী কুকুর, লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম কুকুরী। তাহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সিধুকে দেখিতে পাইলাম না।

"কে আপনি ?"

টর্চের আলো ফেলিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শত ছিন্ন মলিন বসন, মাথার চুল রুক্ষ, একটি সদ্যোজাত শিশুকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ঠিক পাশেই দেখিলাম কতকগুলি কুকুর ছানাও রহিয়াছে। তাহাদের মা-ও পরমুহূর্তে আসিল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাচ্চাগুলিকে ঘিরিয়া বসিল। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি, দেখিলাম সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি একটি কথাও বলিলাম না। বলিতে পারিলাম না। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

ভদ্রলোক সত্যই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিও বেশ বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কম টাকা নয়, প্রায় দু'হাজার টাকা। আমার কথায় অত টাকা সে কি ছেড়ে দিতে রাজি হবে ? আমাকে অবশ্য সে খুবই খাতির করে। কিন্তু খাতির ক'রে বলেই কি অসঙ্গত অনুরোধ করা যায়। ভদ্রলোক কিন্তু না-ছোড়। হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—"দয়া করুন ডাক্তার বাবু, বিশ্বাস করুন, তিন দিন না খেয়ে আছি।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তাঁর। নিরুপায় হয়ে শেষে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর উত্তমর্ণকে অনুরোধ করব যাতে তিনি সুদের টাকাটা ছেড়ে দেন। তাকে বুঝিয়ে বলব যে বসতবাটি বিক্রি করেও সব টাকা দিতে পারবেন না ভদ্রলোক। যতটা দিচ্ছেন ততটা নিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিভিল জেল দিয়ে আর লাভ কি ? ক্ষতিই বরং। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা। পরনে ছিন্ন মলিন বসন। দেখে সত্যিই দুঃখ হ'ল।

একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, প্রায় বিশ বছরের। আমার এক বন্ধু হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

"অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম নেবে পড়ি এখানে। পাটনায় যাচ্ছি একটা বিয়েতে। কাল বিয়ে, আজ রাত্রের ট্রেনে এখান থেকে রওনা হলেও ঠিক সময় পৌছান যায়। তারপর কেমন আছিস ?"

অনেকদিন পর রতনকে দেখে খুব খুসী হলাম। রতনকে সত্যিই ভালবাসতাম, অন্য কোনও কারণে নয়, তার নিরহঙ্কার সরলতার জন্য। লক্ষপতির একমাত্র ছেলে সে, লেখাপড়াতেও খুব ভাল, কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদে বা কথা-বার্ত্তায় কখনও কোন রকম চালিয়াতি লক্ষ্য করিনি। সদা-হাস্যময় আত্মভোলা লোক। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, দেখলাম একটুও বদলায়নি। তখন আমি সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছি, রোগীর ঝামেলা বিশেষ ছিল না, সমস্ত দিন খুব আড্ডা দেওয়া গেল তার সঙ্গে।

হঠাৎ রতন বলে উঠল—"ওহো, একটা জিনিষ ভুল হয়ে গেছে! ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্যাক্সি করে এসে ট্রেন ধরেছি শাড়িখানা কিনে আনা হয়নি! এখানে ভালো কাপড়ের দোকান আছে ?"

আমি ব্যাপারটা ধরতে পারিনি প্রথমে।

"কিসের শাড়ি ?"

"বাঃ, বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি শুধু হাতে কি যাওয়া যায়? একটা ভালো বেনারসী শাড়ি নিয়ে যাব ভেবেছি। এখানে দোকান আছে ?"

"আছে। বেশ বড় বাঙালীর দোকান আছে একটা।"

"চল তাহলে সেখানে। একটা শাড়ি কিনে ফেলা যাক।"

আমার পরিচিত জগৎবাবুর জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারে রতনকে নিয়ে গেলাম। জগৎবাবুর নিজের মৃতা পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নামের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে নিজের নামের ব্যঞ্জন সন্ধি করে দোকানটির নামকরণ করেছিলেন। দোকানটির তখন খুব চলতি।

আমরা যখন দোকানে গেলাম তখন বেলা আড়াইটে হবে। জগৎবাবু নিজেই দোকানে ছিলেন, কর্ম্মচারী কেউ ছিল না। তারা খেতে গিয়েছিল বোধ হয়। জগৎবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঢুলছিলেন। আমরা দোকানে ঢুকতেই তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হ'ল একটু যেন অপ্রসন্ন হলেন। তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখে তাই-ই অনুমান করলাম। কিন্তু

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই মুখে একটা ভদ্রতার হাসি টেনে আনলেন।

"ডাক্তার বাবু যে, আসুন! দুপুর রোদে বেরিয়েছেন যে!"

"আমার এই বন্ধুটির কাপড় কেনার দরকার। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, একটা বেনারসী শাড়ি নিয়ে যেতে চায়। দিন একখানা।"

জগৎবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর দোকানের শেল্‌ফগুলোর দিকে চেয়ে বললেন—"শাড়ি? বেনারসী? আছে বোধ হয় নাগালের মধ্যে। দেখি।"

তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে গিয়ে কাছাটা খুলে গেল। সেটা গুঁজে কসিটা ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা শেল্‌ফের দিকে। সেখান থেকে একটা কাপড়ের বস্তা নামালেন ধপাস্ করে। তারপর তার পাশে উবু হ'য়ে বসে বস্তাটি খুলে বার করলেন একখানি শাড়ি।

"নিন দেখুন।"

রতনের কিন্তু পছন্দ হল না।

"আর একটা দেখান।"

আর একটা দেখালেন তিনি। সেটাও কিন্তু রতনের পছন্দ হল না। তৃতীয় শাড়িখানাও যখন রতনের পছন্দ হ'ল না তখন জগৎবাবুর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরেছে। গুম হয়ে নির্নিমেয়ে চেয়ে আছেন তিনি রতনের দিকে।

প্রশ্ন করলেন—"কি রকম শাড়ি চাই আপনার?"

মিতভাষী রতন বললে—"ভালো শাড়ি। আছে কি আপনার?"

"আছে। আড়াই-শ' তিন-শ' টাকা দামের শাড়ি আছে।"

নির্বিকার কণ্ঠে রতন বললে—"বেশ, দেখান।"

"সত্যি সত্যি যদি নেন তাহলে দেখাই। তা না হলে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে ওই ওপরের তাক থেকে নাবানোর কোন মানে হয় না! নেবেন কি?"

"থাক আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মৃদু হেসে উঠে পড়ল রতন, দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"কিনবি না?"

"অন্য দোকানে চল। এখানে কিনব না। অভদ্র লোক।"

মনে পড়ল মথুরা দাসের কথা। মথুরা দাস আমার রোগী। ছোট একটি কাপড়ের দোকান করেছে সম্প্রতি। তার দোকানেই গেলাম। আমাদের দেখেই

মথুরা দাস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করল যেন আমাদের পথ চেয়েই তার দিন কাটছিল।

"একখানা ভাল বেনারসী শাড়ী চাই শেঠজী, আমার দোস্তের জন্ত।"

"আইয়ে বৈঠিয়ে।"

সাগ্রহে আহ্বান করল আমাদের, তারপর শাড়ি বার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার—আর ছিল না বেচারীর দোকানে। রতনের একটাও পছন্দ হ'ল না। শেঠজী কিন্তু দমলেন না তাতে।

হিন্দি ভাষায় বললেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আরও শাড়ি এনে দেখাচ্ছি। অন্য দোকান থেকে আনছি।"

দুপুরের রোদ তুচ্ছ করে বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পরে ফিরল একগাদা শাড়ি নিয়ে, নানা দামের, নানা রঙের। একখানা শাড়ির জমি রতনের পছন্দ হ'ল, কিন্তু রংটা হ'ল না।

শেঠজী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজির কোন রং পছন্দ তাহলে?"

"ফিকে সবুজ।"

"হুজ্‌রিমলের দোকানটা এখন বন্ধ আছে। সেখানে ফিকে সবুজ রঙের কাপড় আছে। কাল এনে রাখব বাবু, কিম্বা বলেন তো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

"বাবু তো কাল পর্যন্ত থাকবেন না। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন।"

"ও, আচ্ছা দেখি।"

বেরিয়ে এলাম আমরা দোকান থেকে।

রতন বললে—"পাটনাতেই পেয়ে যাব বোধ হয়!"

সন্ধ্যার সময় রতনকে স্টেশনে তুলে দিতে যাবার জন্য বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় মথুরাদাস মারোয়াড়ি এসে হাজির। হাতে ফিকে সবুজ রঙের তিনখানা শাড়ি। রতনের একখানা শাড়ি পছন্দ হ'ল। সাড়ে আট-শ' টাকা দিয়ে কিনলে শাড়িখানা।

পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ওই শাড়িখানা বেচে একশ টাকা লাভ করেছিল মথুরাদাস।

বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে এই যে ঘটনাটা মনে পড়ল এটাকে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক। কারণ ঐ বিপন্ন ভদ্রলোকটিই

একদা-ধনী জগৎ চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডার ঋণের বন্যায় বহুকাল আগেই ভেসে গেছে। আর যার থেকে টাকা ধার করে তিনি এই বিপুল বন্যায় নিজের নাকটি কোনক্রমে বার করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তার নাম শেঠ মথুরদাস,—যে একদিন রতনকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি বেচেছিল বাড়িতে এসে। তার এখন চারটে দোকান, দুটো মিল, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

আমার অনুরোধে মথুরাদাস জগৎবাবুকে ঋণমুক্ত করে দিয়েছিল।

অন্তরালে

পুরাতন বন্ধু উমানাথ বাজপেয়ী কর্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছিল। দিল্লী এক্সপ্রেস ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়া গেল। সামনের স্টেশনে একটি গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পথ আটকাইয়াছিল। উমানাথ জানিত আমি ভাগলপুরে আছি। গাড়ী ছাড়িবার প্রচুর দেরী আছে দেখিয়া সে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালাইয়া লইবার মতলবে নিজের জিনিষপত্র নামাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে আরোহণ করিল এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত লইলাম। বলিলাম,—

"আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। এসেছ যখন থেকেই যাও দু'একদিন।"

"আজকের দিনটা তো থাকতেই হবে মনে হচ্ছে, কাল যদি গাড়ি চলে তখন দেখা যাবে।"

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর ক্যাম্প-চেয়ার বিছাইয়া উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলাম। পূর্বজীবনের নানা কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি তো এস, পি, হয়েই রিটায়ার করলে।"

"হ্যাঁ। ডি, আই, জি, হওয়া আর হল না।"

"চাকরি জীবনটা কেমন লাগল ?"

"রটন্‌! নরক বাস!"

"পয়সা-কড়ি কেমন রোজগার হল ?"

"তা মন্দ হয়নি। গোটা দুই ছেলে আছে, তাদের উচ্ছন্ন যাবার পাথেয় রেখে যাব।"

"কেন, লেখাপড়া শেখেনি তারা?"

"ম্যাট্রিকের বেড়া পার হতে পারেনি।"

"আর ছেলে-পিলে নেই তোমার?"

"তিনটি মেয়ে আছে। তিনটেই বিধবা, তার মধ্যে একটি পাগল।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। বাজপেয়ী-ই হঠাৎ আবার বলিল।

"বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে যাচ্ছি। ভরসা আছে তিনি ঠেলে ফেলে দেবেন না, দু'চারটে ভাল কাজ করেছি জীবনে।" বলিলাম—

"তোমাদের জীবনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র। কোন সাহিত্যিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের সাহিত্যেও শার্লক হোমস্, পইরো বা ফাদার ব্রাউন দেখা যেত।"

"ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, কিন্তু আমার যে-ধরণের অভিজ্ঞতা তা অত্যন্ত সাদা-মাটা, চাঁছা-ছোলা, পরিষ্কার ব্যাপার। কোনও বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভের দরকার হয় না তার জন্যে। ডিটেক্‌টিভ দরকার হতে পারে কে কি ভাবে ঘুস খাচ্ছে তাই ধরবার জন্যে, চোর ডাকাত খুনী ধরবার জন্যে নয়। আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভরা, ইংরেজ আমলে অন্তত, দেশের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেদেরই ফাঁসাবার চেষ্টা করত খালি। টেররিস্ট মুভ্‌মেণ্টের কথা ভেবে দেখ। আমি নিজের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপ্লবী দু'একটি ছেলেকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই হয় তো বিশ্বেশ্বর আমাকে দয়া করতে পারেন।"

"বল না শুনি দু'একটা ঘটনা!"

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে গৃহিনীর আহ্বান আসিল।

"খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা খাবে এস!"

গল্পটা চাপা পড়িয়া গেল। সকালেই আমার কাজের ভীড়। গল্প শুনিবার অবসর নাই। বলিলাম—

"তোমার গল্পটা আর শোনা হল না। আজ থেকে যাও।"

"না ভাই, জিনিষপত্র সব পৌঁছে গেছে, স্টেশনেই পড়ে আছে হয়ত। গল্পটা লিখে পাঠিয়ে দেব, তবে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই। তবে গল্পটা তোমার মন্দ লাগবে না বোধ হয়। বীভৎস গল্প, তবে তার অন্তরালে কিছু পাবে হয়তো।"

বাজপেয়ী সেইদিনই চলিয়া গেল। দিন দশ-বারো পরে সত্যই সে নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

আমি যখন শেরপুরায় বদলি হইয়া আসিলাম তখন আমাকে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একেবারে নূতন জায়গা, পরিচিত লোক তেমন কেহ নাই যে কাজকর্মের পর দুই দণ্ড গল্প করিয়া কাটাই। তখনও আমি বিবাহ করি নাই, মন্ত্রও লই নাই। অবসর পাইলে তাস খেলিতাম। কিন্তু শেরপুরায় তখন কোনও ক্লাব ছিল না। সাধারণত দারোগার সঙ্গীর অভাব হয় না, অনেকে বরং দারোগার সহিত ভাবই করিতে চায়। কিন্তু ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-জাতীয় লোক হয় তাহাদের সহিত অবসর-বিনোদন করিবার মতো প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়-নিষ্ঠ ভাবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং পারতপক্ষে এমন কোনও লোকের সহিত মিশিতাম না, যাহারা আমার নিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং শেরপুরায় প্রথম কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন বিধাতা কৃপা করিলেন, বাল্যবন্ধু সুরনাথের সহিত বহুকাল পরে হঠাৎ পথে দেখা হইয়া গেল। সুরনাথ শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতিও। বলা বাহুল্য হাতে স্বর্গ পাইলাম। শুনিলাম সুরনাথ শেরপুরা হইতে ক্রোশ দুই দূরে সস্তায় কিছু জমি কিনিয়াছে এবং সেই জমিতেই বসবাস করিতেছে। আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিশ্রুতি দিলাম: যাইব এবং সেইদিনই গেলাম। আমার ঘোড়া ছিল, বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। বৈকালে গিয়াছিলাম তখনও দিনের আলো ছিল। দেখিলাম সুরনাথ যে-স্থানে বসবাস করিয়াছে সে-স্থানটি লোকালয়ের একেবারে বাহিরে। একটু বিস্মিত হইলাম। বীরভূম জেলায় তাহার বাড়ি ছিল, কিছু জমিদারীও ছিল, সে এরকম নির্বান্ধব পুরীতে আসিয়া বসবাস করিতে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম।—

"মীনুও এখানে আছে তো?"

মীনু আমার দূরসম্পর্কীয়া সেই ভগ্নীর নাম।

"না, সে ভাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। সেই জন্যেই তো দেশে আর ভাল লাগল না। এখানে পালিয়ে এসেছি।"

"দেশের বিষয়-সম্পত্তি?"

"সব বিক্রী ক'রে দিয়ে এখানেই বিঘে পঞ্চাশেক জমি কিনেছি।"

"ছেলে-পিলে হয়নি?"

"না।"

"একেবারে একা থাক এখানে?"

"ঠিক একা নয়। ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখছ ওখানে আমার এক বন্ধু

থাকে। সে-ও আমার সঙ্গেই জমি কিনেছিল। দু'জনে একসঙ্গে চাষবাষ করি, বেশ আছি। ওরে ভজুয়া, চা নিয়ে আয়! চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না কি?"

"না।"

"আর বিয়ে করনি?"

"না। ওসবে আর রুচি নেই।"

ভজুয়া একটু পরে চা লইয়া আসিল। ভজুয়াকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিলাম। কুচকুচে কালো রং, খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কিছু গোঁফ-দাড়িও আছে, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়, খাপ্‌চা-খাপ্‌চা। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর। মনে হয় শ্বাপদের চক্ষু। ভজুয়া চা দিয়া চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এ চাকর কোথায় পেলে? এখানকারই লোক?"

"না, বাইরের। মাসখানেক হ'ল এসেছে। কেন?"

"অতি বদ চেহারা।"

"তা বটে। মাইনে নেয় না, পেট-ভাতাতেই কাজ করে, তাই রেখেছি। চেহারা খারাপ বটে কিন্তু খুব কাজের, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে। চেহারাটা অবশ্য খুবই খারাপ।"

ভজুয়া-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুরনাথের বন্ধু কালিপ্রসাদ দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। লোকটি একচক্ষু। আলাপ করিয়া মনে হইল বেশ আমোদপ্রিয়। প্রকাশ পাইল তিনিও অবিবাহিত। আমারও তখন বিবাহ হয় নাই। হাসিয়া বলিলাম।

"চতুর্থ আর একজন অবিবাহিত লোক জুটলে আমরা ব্যাচিলার্স কার্ড-ক্লাব করতে পারতাম।"

কালিপ্রসাদ বলিলেন—

"আছেন একজন। আমাদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয় নি এখনও। মাস দুই আগে তিনিও জমি কিনবেন ব'লে এসেছেন। সুরনাথ, মিস্টার বক্‌শীকে খবর পাঠাও না একটা, দারোগাবাবুর নাম শুনলে হয়তো চ'লে আসবেন! আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপটাও হয়ে যাবে, কার্ড-ক্লাবটারও গোড়া-পত্তন হবে।"

"বেশ, ভজুয়াকে পাঠাচ্ছি।"

একটা চিঠি লইয়া ভজুয়া সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। গল্প কিন্তু জমিল না। কালিপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত এক্‌-চক্ষুটি গল্পের রসভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"আপনার চোখটি গেল কি করে?"

"এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম।"

"বাঘিনী? শিকার করার শখ আছে নাকি?"

"ছিল এককালে।"

কালিপ্রসাদবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা ভাব ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম সুরনাথও তাহার দিকে চাহিয়া একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতেছে। আমি বলিলাম।

"তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশায়। বলুন, বলুন শুনি আপনার শিকার-কাহিনী।"

কালিপ্রসাদবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"সে অনেক লম্বা কাহিনী, আর একদিন শুনবেন। আজ আমার একটু কাজ আছে।"

কলিপ্রসাদবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল গল্পের সুরটা যেন কাটিয়া গেল। কালিপ্রসাদবাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটা ব্যাপারে একটু বিস্মিত হইলাম। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠের একটা কলহাস্য ভাসিয়া আসিল। সুরনাথ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিল অর্থাৎ বুঝিবার চেষ্টা করিল হাসিটা আমি শুনিয়াছি কি না, শুনিয়া থাকিলে কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম।

"বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে আছে না কি?"

"তা আছে বই কি। চাকরানী আছে, চাকরদের বউ আছে। কেন তুমি অন্য কিছু ভাবছ না কি?"

"না, না!"

সুরনাথের চোখে-মুখে কেমন একটা হিংস্রভাব যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। সুরনাথ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, কিন্তু সহসা অনুভব করিলাম তাহাকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি চিনিতাম, সে অন্য লোক।

ভজুয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল বক্‌শীবাবুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিলেন না।

আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছি এমন সময় ভজুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"হুজুর, আমি লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে আপনাকে মাঠটুকু পার ক'রে দিয়ে আসি।"

"কেন ?"

"এ-মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে হুজুর। সেদিন একটা ঘোড়াকেই কামড়েছিল।"

সুরনাথও সে-কথার সমর্থন করিল। বলিলাম,—

"তবে চল।"

আমি অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিলাম। ভজুয়া লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তোমার দেশ কোথা ?"

"আজ্ঞে মানভূম হুজুর। পুরুলে থেকে কোশ পাঁচেক হবে।"

"দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন ?"

"কলেরায় সব মরে গেল যে হুজুর। তাই যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে এলাম।"

ভজুয়াকে বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ আমার হাবিলদার সাহেব সাইকেলে চড়িয়া আমার খোঁজে আসিতেছিলেন। থানায় একটা দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছিল। হাবিলদার সাহেব দেখিলাম ভজুয়াকে চেনেন। বলিলেন,—

"কে ভজু না কি। আজ শহরে যাও নি ?"

"না।"

ভজুয়া চলিয়া গেলে হাবিলদার সাহেব বলিলেন, ভজু প্রত্যহ গাঁজা কিনিবার জন্য আবগারির দোকানে যায়। বলিয়া একটু হাসিলেন।

'তাই নাকি ! আপনি জানলেন কি ক'রে ?"

'আমিও ভাং কিনিতে যাই যে। রোজই দেখা হয়।"

'ও।"

হাবিলদার সাহেব আর একটা কথাও বলিলেন।

'ভজু খুব গুণী লোক হুজুর। অনেক রকম গাছ-গাছড়া চেনে, অনেক ভাল ওষুধও দিতে পারে। শুনলাম সুরনাথবাবু ওঁকে নিজের চিকিৎসার জন্যেই রেখেছেন।"

"সুরনাথবাবুর অসুখ আছে না কি কোনও ? দেখে তো কিছু মনে হল না।"

হাবিলদার সাহেব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন।

"শুনেছি পুরোনো গণোরিয়া। এখানকার অনেক ডাক্তার কঁবিরাজ হাকিম ওঁর চিকিৎসা করেছেন, কিছু হয়নি। এখন ভজু ওকে ওষুধ দিচ্ছে।"

আমি এ-সব খবর শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিচলিতও হইলাম।

"আপনি এত-সব খবর জানলেন কি ক'রে?"

"আমি তো এখানে অনেকদিন আছি হুজুর। অনেকের অনেক খবর জানি। সুরনাথবাবুর সব্‌জি বাগানের মালীই আমাকে বলেছিল একদিন। সুরনাথবাবু আপনার কেউ হয় না কি।"

এ-সব খবর শোনার পর তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে এ-কথা আর বলিতে পারিলাম না। বলিলাম—

"ছেলেবেলায় এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই এসেছিলাম।"

হাবিলদার বলিলেন।

"ওঁর ভারী বদনাম এখানে। ওঁর কানা দোস্তটিও ভাল নয়।"

উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আর সুরনাথের কাছে যাই নাই, যাইবার উৎসাহ পাই নাই। একদিন কিন্তু যাইতে হইল। গভীর রাত্রে সুরনাথের একটি চাকর ভজুয়া নয়, অন্য চাকর, আসিয়া আমাকে যে-সংবাদটি দিল তাহা ভয়ানক। বলিল, সুরনাথকে এক প্রকাণ্ড গোক্ষুর দংশন করিয়াছে। সুরনাথ অবিলম্বে আমাকে একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম।

"সাপে কামড়েছে? সাপটাকে দেখেছিস?"

"সবাই দেখেছে হুজুর, প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ। বাবুর ঠোঁট মুখ সব নীল হয়ে গেছে। অতি কষ্টে কথা বলতে পারছেন, অতি কষ্টে আপনার কথা বললেন।"

ডাক্তার মৈত্রকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সুরনাথ মারা গিয়াছে। তাহার মুখটা নীল, মনে হইতেছে কেহ যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। পায়ের গোছে দুই তিন স্থানে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে, শুনিলাম পায়ের পাতায় সাপটা কামড়াইয়াছিল। ক্ষতস্থানের উপর ভজুয়া কি একটা জংলি-গাছের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার মৈত্র পাতা-বাটাটা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ক্ষত-চিহ্নটি দেখিলেন। দুইটি কালো বিন্দু পাশাপাশি দেখা গেল। দুইটি বিন্দুর মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যবধান! ডাক্তার মৈত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টর্চ ফেলিয়া বিন্দু দুইটিকে বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—

"খুব বড় সাপ মনে হচ্ছে। সাপটা কত বড় ছিল?"

"প্রকাণ্ড সাপ হুজুর। পাঁচ ছ'হাত হবে।"

ভজুয়া বলিল, "আরও বড়।"

আমি ডাক্তার মৈত্রকে প্রশ্ন করিলাম।

"বড় সাপ বুঝলেন কি ক'রে ?"

"হুটো দাঁতের মাঝখানে কত বড় ফাঁক দেখছেন না ? আমি এত বড় ফাঁক আগে দেখিনি।"

ভজুয়া বলিল, "অত বড় সাপও, আজ্ঞা, আমরা দেখিনি কখনও। কি বল যহু ?"

যহু নামক মালীটি সে-কথা স্বীকার করিল। আরও অনেকে সাপটি দেখিয়াছিল। সকলেই সমস্বরে বলিল সাপটি সত্যই প্রকাণ্ড বড়। ঘরের মধ্যে এবং বারান্দায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক সমবেত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এতগুলো লোক সবই কি সুরনাথের চাকর ?"

কে একজন উত্তর দিল।

"কালিপ্রসাদবাবুর চাকরদেরও ভজুয়া ডেকে এনেছে।"

"কালিপ্রসাদবাবু কোথা ?"

"তিনি আসেন নি তো দেখছি! ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।"

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল।

"ভজুয়া, কালিপ্রসাদবাবুকে খবর দেয়নি ? ভজুয়া কোথা গেল ?"

ভজুয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীড়ের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল।—

"বাবুকে কি ডেকে আনব ?"

"তুমি কে ?"

"আমি তাঁর চাকর। তিনি ন'টার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। ঘুম এসে গেলে ভজুয়া তাঁর ঘুম ভাঙাতে মানা ক'রে দিয়েছে, তাই তাঁকে আমরা কেউ ওঠাই নি।"

"ভজুয়া মানা করেছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরা দু'জনই তো ভজুয়ার তৈরি কি ওষুধ রোজ খান। আমি ডেকে আনছি তাঁকে।"

লোকটি চলিয়া গেল। আমি যহু নামক মালীটির নিকট হইতে সন্ধ্যা হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, কে কে আসিয়াছিল খবর লইতেছিলাম এমন সময় সেই

লোকটি, যে, কালিপ্রসাদবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে কালিপ্রসাদবাবুকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমরা ঘটনাস্থলে পৌছিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। দেখিলাম—কালিপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় চক্ষুটি কে উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত বালিশ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। আর একটা চমকপ্রদ ঘটনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। কালিপ্রসাদবাবুর ঘরের পাশেই আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে একটা খড় খড় শব্দ শোনা গেল। দুই ঘরের ভিতর ছোট একটা বন্ধ কপাট ছিল। কপাটটা খুলিতে তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা নেউল বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই দেখিতে পাইল নেউলটার পায়ে এবং মুখে রক্ত মাখা। সে যেদিক দিয়া চলিয়া গেল লণ্ঠন লইয়া দেখিলাম রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বলিলাম—

"ভজুয়াকে ডাক!"

ভজুয়ার কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে অন্তর্ধান করিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। একজন বলিল—

"সে হয়তো বক্শীবাবুকে খবর দিতে গেছে।"

"দেখ তো!"

আমি এবং ডাক্তারবাবু বাড়িটির চারিদিক লণ্ঠন এবং টর্চ লইয়া যতটা পারিলাম দেখিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। যে লোকটি বকশীবাবুর বাড়ি গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বক্শীবাবুর বাড়ীতে ভজুয়া তো নাই-ই, বক্শীবাবু-ও নাই।

তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলাম—

"ব্যাপার ক্রমশ ঘোরতর হয়ে আসছে ডাক্তার মৈত্র। আমি তো সঙ্গে কোনও পুলিশ আনি নি। আপনি বাইক ক'রে থানায় চলে যান, হাবিলদার সাহেবকে জনকয়েক কনেষ্টবল নিয়ে এখুনি চলে আসতে বলুন! তারা যেন বন্দুকও আনে।"

ডাক্তার মৈত্র বলিলেন—

"আমি যাচ্ছি, লাস দু'টোকে পোষ্টমর্টেম করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর ভিতর অনেক রহস্য আছে।"

...পুলিশ এবং বন্দুকের নাম শুনিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িল। আমি, সুরনাথের মালী যদু এবং আরও গোটা দুই লোক হাবিলদার সাহেবের

অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এ-রকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ফাঁকা মাঠের মাঝে অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে, আকাশে নক্ষত্রের ঝাঁক, কাছে দূরে বড় বড় গাছ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহাদের খুন করিল এবং কেন করিল। সুরনাথের মৃত্যু যে সর্পাঘাতে হয় নাই এবং কালিপ্রসাদের চক্ষুও যে নেউলে উপড়াইয়া লয় নাই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাপটাকে অনেকে দেখিয়াছে, নেউলটাকেও আমরা দেখিলাম, নেউলটার মুখে এবং পায়ে রক্তও ছিল। ডাক্তার মৈত্র বলিতেছেন সুরনাথের পায়ের ক্ষত-চিহ্নটি সন্দেহজনক, ক্ষত-বিন্দু দুইটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, কিন্তু সাপ যদি একান্ত হয় তাহা হইলে···আমার চিন্তা-ধারা সহসা ব্যাহত হইল। একটা নারীকণ্ঠের কলহাস্যে চমকাইয়া উঠিলাম। মনে পড়িল প্রথম দিনও ওই হাসি শুনিয়াছিলাম। যদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

'হাসছে কে?"

"ছুকরি বোধ হয়।"

"ছুকরি কে?'

যদু একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উত্তর দিল।

"ওকে বাবু কিছুদিন আগে রেখেছিল।"

"কোথা সে?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়।"

"ডেকে নিয়ে এস তো!"

যদু ভিতরে চলিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"কই ভিতরে দেখছি না, বাইরে কোথাও আছে বোধ হয়!"

"ডাক তাকে।"

"বাইরে বড় অন্ধকার বাবু! আমার ভয় করছে বেরুতে!"

যদুর দোষ ছিল না, আমার নিজেরই গা ছমছম করিতেছিল। যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল সেটারও শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নাড়িয়া দেখিলাম তেল নাই। শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম।

"আর তেল আছে?"

"তেল আর নেই। তবে পেট্রোম্যাক্স আছে একটা। তাতে তেল থাকতে পারে। পিছন দিকের ঘরে আছে পেট্রোম্যাক্সটা।"

'পেট্রোম্যাক্সটাই জ্বাল। স্পিরিট আছে তো?"

"দেখি।"

যদু লণ্ঠনটা লইয়া ভিতরে গেল এবং একটু পরেই আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সাপ সাপ।'

ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম পিছনের ঘরে সত্যই একটা বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদু বলিল—

"সাপটা ওই ঝুড়ির মধ্যে ছিল। এ-রকম ঝুড়ি এখানে আগে দেখি নি। তাই মনে হল এটা কোথা থেকে এল। যেই তুলে দেখতে গেছি—আর অমনি বাপরে বাপ! উঃ খুব বেঁচে গেছি।"

যদু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি দেখিলাম ঝুড়িটা সাপুড়েদের ঝুড়ি। সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার কাছে লোডেড্ রিভলভারটা ছিল, সাপটা পলাইতে পারিল না। এক গুলিতেই ভূশায়ী হইল। গুলিটা মাথায় লাগে নাই, ঘাড়ের কাছে লাগিয়াছিল। আবার সেই হাসিটা শুনিতে পাইলাম। এবার অনেক দূরে। কি যে করিব মাথায় আসিল না। হাবিলদার সাহেব ও কনেষ্টবলরা না আসা পর্যন্ত কিছুই করিবার উপায় ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাহারা আসিল। তাহারা আসিবার পর চারিদিকটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু ভজুয়া বা ছুক্‌রির সন্ধান পাইলাম না। বকশীবাবুও অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন।

পাঁচ ছয়জন পুলিশকে পাহারায় রাখিয়া আমি অবশেষে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন বোঝা গেল পুলিশরা অবশ্য জাগিয়া পাহারা দেয় নাই, কারণ সকালে পোস্টমর্টেম (শব-ব্যবচ্ছেদ) করিবার জন্য ডোমেরা যখন লাস লইতে আসিল, তখন দেখা গেল, সুরনাথেরও চক্ষু দুইটি নাই, কেবল দুইটি রক্তাক্ত গহ্বর রহিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই পেট হইতে প্রচুর আফিং পাওয়া গেল। সিভিল সার্জন বলিলেন আফিংই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। সাপটার শবও ব্যবচ্ছেদিত হইয়াছিল, এটা অবশ্য ডাক্তার মৈত্র আলাদা করিয়াছিলেন। দেখা গেল সাপটার বিষ দাঁত নাই, দুই একদিন পূর্বেই তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে বকশীবাবু, ভজুয়া এবং ছুক্‌রিই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। কয়েকটা পায়ের এবং হাতের ছাপ সংগ্রহ করিয়া আমরা 'হুলিয়া' করিয়া দিলাম, পুরস্কারও ঘোষণা করিলাম, কিন্তু তাহাদের আর নাগাল পাইলাম না। কেন যে তাহারা উভয়কে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই কারণ সুরনাথ এবং কালিপ্রসাদের একটি জিনিসও চুরি যায় নাই।

বুঝিতে পারিলাম মাসখানেক পরে। একটি পত্র আসিয়া রহস্যোদ্‌ঘাটন করিল। পত্রটি এই—

দারোগাবাবু,

ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদের ফাঁকি দিয়াছি এবারও দিলাম। এ পত্র আপনাদের লিখিতাম না, কিন্তু পাছে আপনারা কতকগুলি নির্দোষ লোককে ধরিয়া সাজা দেন, তাই সত্য ঘটনাটা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের আমরা খুন করিয়াছি তাহারা উভয়েই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল। অকথ্য অসংযমের ফলে উভয়েরই সিফিলিস, গণোরিয়া তো হইয়াছিলই, উভয়ে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক অপটুতা কিন্তু তাহাদের মানসিক কামনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এ নষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া বসিল। জানি না কাহার নিকট হইতে তাহারা শুনিয়াছিল যে, কোনও জীবন্ত কুমারীর চক্ষু উপড়াইয়া যদি তাহা কাঁচা গিলিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসে একদিন রাস্তা হইতে একটি ছোট মেয়েকে তাহারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। মেয়েটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার এমনই চক্র যখন তাহারা একটি নির্জন পড়ো বাড়ীতে মেয়েটির চক্ষু উৎপাটন করিতেছিল তখন মেয়েটির মাসী সেখানে আসিয়া পড়ে। মেয়েটির মাসী চুড়ি ফেরি করিত। চুড়ি ফেরি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ওই পোড়ো বাড়ীতে ভিতরে দিকের বারান্দায় একটু হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসিত। সেদিন আসিয়া সে দেখিল ভিতরের দিকে একটা ঘরে বসিয়া দুইটা লোক মদ খাইতেছে, তাহাদের হাতে, কাপড়ে রক্তের দাগ। তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার বোনের মেয়েকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে নিঃশব্দে ঢুকিয়াছিল এবং উঠানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ লোক দুইটা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জানলা টপকাইয়া পলায়ন করিল। তখন মেয়েটি কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক। তাহার বোনঝি মুনিয়ার রক্তাক্ত চক্ষুহীন মৃতদেহটা পাশের ঘরেই পড়িয়াছিল। সে চীৎকার করিল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে সে নিজেই হয়তো খুনের দায়ে জড়াইয়া পড়িবে। সে পুলিশেও গেল না। আমার সহিত তাহার এবং তাহার বোনের যোগাযোগ আছে পুলিশের এ সন্দেহ ছিল, তাই তাহারা পুলিশকে এড়াইয়া চলিত। সে সোজা আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত

ঘটনা বলিল। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথাটা খুলিয়া না বলিলে আপনার মনে হয়তো নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে, তাই কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি। আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের একজন। যে সব পুলিশ অফিসার আমাদের জ্বালাতন করিত, কিম্বা আমাদের দলের যেসব লোক অ্যাপ্রুভার হইয়া আমাদের ধরাইয়া দিত তাহাদের হত্যা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্রফুল্ল চাকীকে যে সাবইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি পুলিশে ধরাইয়া দেয় সেই নন্দলাল ব্যানার্জিকে আমিই হত্যা করি। এ সব কাজ করিবার জন্য আমাদের অনেক রকম লোকের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইত। এই চুড়িওয়ালী ভগ্নী দুইটি আমাকে অনেক খবর আনিয়া দিত। তাহারা আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করিত, আমিও তাহাদের স্নেহ করিতাম। আমি গিয়া সেই হতভাগিনী বালিকার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, তাহার মা-ও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরাও অনেক খুন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বীভৎস ব্যাপার আমাদের-ও জীবনে ঘটে নাই। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মা কিন্তু এক বিন্দু চোখের জল ফেলে নাই। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। এই দুই ভগ্নি 'জিপ্‌সি' জাতের মেয়ে, ইহাদের নীতিজ্ঞান খুব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা আমাকে বলিল ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, আমি যেন তাহাদের সাহায্য করি

সেইদিন হইতে ঐ দুইটি নর-রূপী পিশাচের আমি পিছু লইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের একদিনও চোখের আড়াল করি নাই। উহারা যখন শেরপুরে জমি কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, তখন আমিও উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং প্রচার করিলাম যে আমিও জমি কিনিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইব। কিছুদিন আলাপ করিয়া বুঝিলাম উহাদের কামপ্রবৃত্তি এখনও প্রশমিত হয় নাই। যুবতী নারী দেখিলে এখনও উহারা লোলুপ হইয়া ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তাহাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। আমি উহাদের এই কামপ্রবৃত্তির সুযোগ লইলাম। যাহার কন্যাকে উহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল সে গিয়া উহাদের সহিত বসবাস করিতে রাজি হইল। জিপ্‌সি মেয়েদের মোহিনী শক্তি উহার ছিল, সুতরাং বেশী বেগ পাইতে হইল না। একদিন চুড়ি বিক্রয় করিবার ছলে সে কালিপ্রসাদবাবুর বাসায় গেল এবং আর ফিরল না। সেখানেই রক্ষিতারূপে থাকিয়া গেল। ইহার দিন দশেক পরে একদিন দেখিলাম কালিপ্রসাদবাবু বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি একটা জঙ্গলে শিকার

করিতে গিয়াছিলেন হঠাৎ একটা বাঘিনীর দেখা পান, বাঘিনীটা চোখে একটা থাবা মারিয়াছে। আমি মনে মনে হাসিলাম, বুঝিলাম বাঘিনীটি কে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুকরিরই নখরাঘাতে তাহার চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছিল। আমি ছুকরিকে সাবধান করিয়া দিলাম, প্রকাশ্যভাবে সে যেন আর কিছু না করে। কিন্তু ওই লোক দুইটা এমন কামান্ধ ছিল যে ওই ঘটনার পরও তাহারা ছুকরিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেয় নাই। ছুকরির মুখ হইতেই আমি খবর পাই যে, উহারা উভয়েই পুরুষত্বহীন। তখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই, কি উপায়ে উহাদের হত্যা করিব। এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কিছুদিন আমি সাপুড়ের ছদ্মবেশে সাপুড়েদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভজুয়া নামক যে লোকটিকে আপনারা দেখিয়াছিলেন সে আমার পূর্বপরিচিত একজন সাপুড়ে। তাহাকে পূর্বে আমি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া সে পুলকিত হইল, আমার বাসাতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল এবং নিজের নানা দুঃখের বর্ণনা করিয়া অবশেষে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিল। দেখিলাম তাহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর এবং একটি প্রকাণ্ড নেউল রহিয়াছে। নেউল ও সাপের খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জন করে। সাপটা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বলিল সাপের বিষদাঁত নাই, কয়েকদিন অন্তর অন্তর সে বিষদাঁত ভাঙিয়া দেয়। ভজুয়াকে কাজে লাগাইব স্থির করিলাম। সাপ ও নেউলে দুইটি ঝুড়িতে আমার পিছন দিকের একটি ঘরে বন্দী রহিল। ভজুয়াকে তখন সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলাম। কেবল অর্থের লোভে নহে, এই বীভৎস কাহিনী শুনিয়া ওই পিশাচ দুইটিকে শাস্তি দিবার আগ্রহেও সে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করিলাম। তাহাকে বলিলাম 'প্রথমে উহাদের কাছে গিয়া বলিতে হইবে যে তুমি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির দেশী ঔষধ জান। ধাতু-দৌর্বল্য, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তোমার নিকট আছে। ইহাও তোমাকে বলিতে হইবে যে অর্থাভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ, যে কোনও কাজ পাইলে পেটভাতাতেও তুমি করিতে প্রস্তুত আছ। খুব সম্ভব ইহা শুনিয়া উহারা তোমাকে বহাল করিবে। তাহার পর তোমাকে চিকিৎসা শুরু করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন উহাদের মদনানন্দ মোদক খাওয়াও। কিন্তু শেষ দিন একটু বেশী পরিমাণে আফিং খাওয়াইতে হইবে। সেই দিন তোমার সাপটাও একজনের ঘরে ছাড়িয়া দিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে সর্পাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। একটা ছুঁচ লইয়া উহার পায়ের পাতায় দুইটা ক্ষতচিহ্ন করিয়া

দিলে কাহারও কোন সন্দেহ হইবে না। মেয়েটির মায়ের একান্ত ইচ্ছা উহাদের চোখও উপড়াইয়া লইতে হইবে, না লইলে প্রতিশোধ পুরা হইবে না। সুরনাথের ঘরে যখন সাপ লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবে তখন অহিফেন-বিষে অজ্ঞান কিম্বা মৃত কালিপ্রসাদের চোখটা ছুকৃরি অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। চোখ ওপড়ানো হইয়া গেলে তোমার নেউলটার মুখে এবং সামনের পায়ে রক্ত লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে অনেক বোকা লোকের হয়তো ধারণা হইবে যে, নেউলটাই কালিপ্রসাদের চক্ষুটি নষ্ট করিয়াছে। ছুকৃরির ইচ্ছা সুরনাথের চোখ দুইটাও সে উপড়াইবে। যদি পাওয়া যায় তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টাও আমরা করিব।'

আশা করি ব্যাপারটা এইবার আপনার নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। আর একটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করি। এ-পত্রের হস্তাক্ষর আমার নয়। ছুকৃরি, ভজুয়া এবং বকৃশী এ নাম তিনটিও ছদ্‌নাম। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমরা নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী। একটা সান্ত্বনা শুধু আছে উপর-ওয়ালার আইনে হয়তো আমরা ছাড়া পাইব। ইতি—

বকৃশীবাবু

এই চিঠি পাইবার মাসখানেক পরে আমি ট্রেণে করিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিতে যাইতেছিলাম। মাঠের মাঝখানে ট্রেণটা থামিয়া গেল শুনিলাম একটা লোক কাটা পড়িয়াছে। ট্রেণ হইতে সকলে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া শুনিলাম লাইনের মাঝখানে একটা কুকুর ছানা আসিয়া পড়িয়াছিল; সেই কুকুর ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য একটা লোক ছুটিয়া আসে এবং কুকুর ছানাটাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নিজে সে পড়িয়া যায়। ড্রাইভার সময় মতো গাড়ি থামাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা না হইলে কাটা পড়িত। ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া দেখিলাম ভজুয়া এবং একটি জিপ্‌সি মেয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবককে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটির মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, জ্ঞান নাই। রেলের ধারে মাঝখানে একটি জিপ্‌সিদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সম্মুখে একটি কুকুরী তাহার নশ্বর শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে।

সেদিন আমি ভজুয়া, ছুকৃরী এবং বকৃশীবাবুকে ধরিতে পারিতাম। কারণ ওই বলিষ্ঠ যুবকটিই যে বকৃশীবাবু তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কিছুই করিলাম না। ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে কেবল চাহিয়া রহিলাম। জীবনে যে দুই চারিটি সৎকার্য করিয়াছি এইটি মনে হয় তাহার মধ্যে অন্যতম।